তীর্থ পথে

তৃতীয় খণ্ড

দাক্ষিণাত্য

তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-কল্প
ব্লক-সি, ৭, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
গীতা গোস্বামী
১২৮-এ, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ :
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
২২শে বৈশাখ, ১৩৭৩ সাল

প্রচ্ছদ পট :
শ্রীনারায়ণ দেবনাথ

মুদ্রক :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫।১-এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

পরিবেশক :
তারাপদ বসু
সাহিত্য-কল্প
ব্লক-সি/৭, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

এই লেখকের অন্যান্য বই—

তীর্থ পথে :
প্রথম খণ্ড—উত্তর খণ্ড ও রাজস্থান
আট টাকা

তীর্থ পথে :
দ্বিতীয় খণ্ড—সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র ও মধ্যভারত।
আট টাকা

তীর্থ পথে :
চতুর্থ খণ্ড—কাশ্মীর থেকে কামরূপ
(যন্ত্রস্থ)

দাম : দশ টাকা

উৎসর্গ

তীর্থ পথে যাঁরা হয়েছিলেন আমার সাথী,

তাঁদের মধ্যে কোনো দিনই যাঁদের আর সাথীরূপে পাব না ;

আমার এই তীর্থ পথের তৃতীয় খণ্ড তাঁদেরই উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম

সাথীহারা—

পাদবিক।

যাযাবর হয়ে সৌন্দর্য দর্শনের বাসনায় এবার এলাম দক্ষিণ-ভারতে। সমুদ্র, নদী, গিরি, উপত্যকা ঈশ্বরের সৃষ্টি। দৃষ্টিশক্তি থাকলে সে-রূপের মোহে মানুষ পাগল হয়ে ঘোরে পাহাড়ে, জঙ্গলে। নদী তীরে সারাজীবন কাটিয়ে দেয় পর্ণ-কুটীর বেঁধে। মানুষ পাষাণ খোদাই ক'রে নির্মাণ করেছে ঈশ্বরের মোহন-মূর্তি। সেই প্রতিমাকে অলঙ্কৃত করেছে স্বর্ণালঙ্কার, হীরা, জহরত আভরণে। মন্দির নির্মাণ করেছে অমরাবতীর কল্পনায়। এ সকল বিগ্রহ যেন পাষাণ প্রতিমা নয়, জাগ্রত দেবতা। নিরীক্ষণ করছেন ভক্তের ভক্তিকে। এ সকলের বিবরণ অবর্ণনীয়। উপলব্ধি করতে হবে মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে।

আর পেয়েছিলাম এই পথে দরদী সাথীদের। একদিন হয়তো স্মৃতি-পট থেকে মুছে যাবে দেব-বিগ্রহের মোহন চিত্র। নয়ন বিভ্রান্তকারী মন্দিরের দৃশ্যাবলী। কিন্তু কোনদিনই ভুলতে পারব না আমার সেই পথের সাথীদের। পেয়েছি সাথীদের স্নেহ, দরদ, শ্রদ্ধা। সেগুলির কিছু বিবরণ দিতে প্রচেষ্টা করেছি। যদি কোন সদাশয় পাঠক আমার এই লিপি পাঠ ক'রে আনন্দবোধ করেন আমার সকল শ্রম ও ক্লেশ সার্থক হবে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় পাণ্ডুলিপি সংশোধন ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

—তীর্থ পথের পথিক

তীর্থ পথে

তৃতীয় খণ্ড

॥ দাক্ষিণাত্য ॥

উদ্‌ভ্রান্ত মনে ভাবি, জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির কথা। একে একে সম্মুখে ঘুরছে সারাজীবনের অতৃপ্ত অফুরন্ত বাসনাগুলি। বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। পথে সংগ্রহ করেছি মনের অবসাদ দেহের ক্লান্তি। ভাবলাম প্রয়োজন কি আর এগিয়ে চলার? ভাবতে ভাবতে ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে শ্লোকাংশ স্মরণ পথে এল—

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু মুদুম্বরম্

সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমানাং যো ন তন্দ্রায়তে চরন্

চরৈবেতি চরৈবেতি।"

অর্থাৎ চলাটাই অমৃতলাভ, চলাটাই স্বাদুফল। চেয়ে দেখ সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলতে চলতে সূর্য্যের আলোক সম্পদ একদিনের জন্যও তন্দ্রাগ্রস্ত হয় নি। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

অমৃত ফলের আশায় এগিয়ে যেতে হবে। ঋগ্বেদের আদেশ। কিন্তু আমার মত জ্ঞানান্ধদের এগিয়ে চলার সার্থকতা কোথায়? এগিয়ে চলতে চলতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপলব্ধি করলাম দেহ ও মন ক্লান্ত। স্বাদুফল সরে গেছে দূরে। হয়তো হাতের পাশে এসেছিল কোনদিন। দৃষ্টিশক্তির অভাবে চিনতে পারি নি।

নদী, বারিধি, গিরি, উপত্যকা পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলেছি। এ-সকলের বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মনে কোন রোমাঞ্চ জাগে নি। আরাবল্লীর আশে পাশে ঘুরেছি, বিন্ধ্য উল্লঙ্ঘন করেছি, নেপালের কিনারায় দাঁড়িয়ে এভারেষ্টের রজতশৃঙ্গ দেখেছি। দার্জ্জিলিং থেকে দেখেছি কাঞ্চন জঙ্ঘার তুষার-ধবল রূপ। আজ এগিয়ে চলেছি নীলগিরির

দিকে। শুনেছি মানুষের মনের সঙ্গে গিরির তীব্র আকর্ষণ আছে। সেই টানে এগিয়ে চলেছি দাক্ষিণাত্যের পথে। স্বাদুফলের আশায় নয়।

ওয়েটিং-রুম থেকে এসে গৃহিণী আমার স্বপ্ন-ভঙ্গ করে বললেন—এই মাঘের শীতে প্লাটফর্মে বসে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ ?

বললাম—অনেক রকম শীতবস্ত্র গায়ে চাপিয়েছি। ঠাণ্ডা লাগবার উপায় রাখি নি। নিরালায় বসে একটু চিন্তা করছি।

উনি বললেন—তীর্থে বেরিয়ে চিন্তা ছেড়ে দাও। মনের পবিত্রতা নিয়ে আনন্দ করে বেড়াবে। চিন্তা নিয়ে তীর্থ হয় না।

কথাটা অতি সত্য। মনে আনন্দ থাকলে তীর্থপথে কিছুই অভাব হয় না। আমার প্রধান সংশয় আমি কি প্রকৃত তীর্থপথে চলেছি ?

বলরাম বাবাজী বলেছিলেন—তিনি একমাত্র একতারা যন্ত্র সম্বল করে ভারতের বহু তীর্থ স্থান ভ্রমণ করে এসেছেন। মনের পবিত্রতা তার ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত তীর্থ যাত্রী।

আর এক তীর্থ যাত্রী দেখেছিলাম মহেন্দ্র মল্লিককে। সারাজীবন কষ্টি-পাথরে সোনা পরীক্ষা করেছেন। হীরের নেকলেসের সঙ্গে কাচের টুকরা চালিয়ে কলকাতা সহরে ডজনখানেক বাড়ী করেছেন। তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম মল্লিক মশায় তীর্থে চলেছেন। পূর্ণ এক বৎসরেও ফিরলেন না। পরে জানলাম তিনি মোরাদাবাদে না জলন্ধরে লাইসেন্স সংগ্রহ করে আবগারী ব্যবসা খুলেছেন।

গৃহিণী বললেন—রাত্রি হয়েছে। কোন দোকানে গিয়ে রাত্রের মত কিছু খেয়ে নাও। ষ্টেশনের নিকটে একটি দোকানে গিয়ে পুরী, মিষ্টান্ন নিয়ে বসলাম। আহার দ্রব্য সম্মুখে রেখে পুনরায় মনে চিন্তা এল—এই যে পুরী, মিষ্টান্ন প্রশমিত করবে আমার লালসাকে। আমি কিসের লোভে চলেছি দেশান্তরে। গৃহিণী আমার অনুগামিনী হয়েছেন পুণ্যের লোভে। জগতে লোভ সকলেরই। কেহ লোভ করেন নারীসঙ্গ। কেহ বা আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থ, ঐশ্বর্য। পর্বত-গুহাবাসী উলঙ্গ সন্ন্যাসীর লোভ ভগবান দর্শন কিংবা স্বর্গবাস। স্বর্গ কোথায় জানি না। ইচ্ছা হয় অন্বেষণ করি তার ঠিকানা।

গৃহিণী আমার ধ্যান ভঙ্গ করে বললেন—আমরা মাদ্রাজ পৌঁছব কবে? কলকাতা থেকেই মাদ্রাজ যাওয়ার সোজা পথ। এখান থেকে মাদ্রাজ যেতে কাকেও কোন দিন দেখি নি।

বললাম—আবার সেই পুরাতন আবৃত্তি আরম্ভ করলে। বাঙ্‌লা থেকে মাদ্রাজ কলকাতা থেকে সুবিধা। বম্বে থেকে মাদ্রাজ যাওয়ার পথ বম্বে-বাঙ্গালোর মেলে বাঙ্গালোর। বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজ। আর দিল্লী-মাদ্রাজ মেলে এদিকের লোক মাদ্রাজ যায়। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যেতে যত সময় লাগে এখান থেকে সেই মত লাগবে হয়তো কিছু বেশী। আজ রাত্রে ট্রেনে উঠলে কাল দিন রাত ট্রেনেই থাকতে হবে। পরশু বেলা এগারটায় মাদ্রাজ হাজির হব।

তিনি বললেন—কোনও জায়গায় গাড়ীর বদল করতে হবে না? একবারে মাদ্রাজে গিয়ে নামব তো?

বললাম—ট্রেনের নাম মাদ্রাজ এক্সপ্রেস। গাড়ী বদল না করেই মাদ্রাজে যাওয়া যাবে। এখান থেকে কলকাতার ট্রেন ভাড়া দিয়ে পুনরায় কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যেতে আমাদের দ্বিগুণ মাশুল দিতে হবে। তারপর সেই ঝান্সির গোপাল ধর্মশালার ম্যানেজার বলেছিলেন—সংসার জেলখানা। একবার সেখানে প্রবেশ করলে রোমন্থন করতে করতে দিন ফুরিয়ে যাবে। সব রকম চিন্তা করেই লম্বা পাড়ি দিতে সঙ্কল্প করেছি।

ট্রেন এসে হাজির হ'ল। মধ্য রাত্রে ট্রেনে উঠে দেখলাম যাত্রীরা নিজ নিজ বার্থে র‍্যাগ কিংবা শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্রে দেহ আবৃত করে নিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন। কনডাক্টর এসে আমাদের বার্থ নম্বর অনুসারে অধিকারের আদেশ দিলেন। আমাদের জন্য ছিল দু'টি সাইড-বার্থ। নিম্নের বার্থ এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক দখল করেছিলেন। কণ্ডাক্টরের সাহায্যে তাঁর শান্তি ভঙ্গ করে আমাদের নির্দিষ্ট বার্থে নিশ্চিন্তে বসলাম। মনে মনে বললাম—জয় মহাপ্রভু জগন্নাথ।

পরক্ষণেই মনে এল কলকাতার স্মৃতি। হাওড়া থেকে মাদ্রাজের পথের ঘাঁটি আগলে আছেন ভুবনেশ্বর আর মহাপ্রভু জগন্নাথ। পুরী

অবশ্য মাদ্রাজ লাইনের উপরে নয়। খুরদা রোড জংশনের পাশ দিয়ে তাঁরই আঙ্গিনা দিয়ে যেতে হয়। এখান থেকে মহাপ্রভু ও ভুবনেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলাম—হে প্রভু, মনে শক্তি দাও, সাহস দাও! দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করে ফেরার পথে যেন তোমাদের দ্বারে হাজিরা দিতে পারি।

ভাবপ্রবণতা ত্যাগ করে গা-ঝাড়া দিয়ে বেডিং খুললাম। নিম্নের বার্থে গৃহিণীর শয্যা রচনা করে উপরের বার্থে কম্বল বিছালাম। মাল-পত্র সুবিধামত স্থানে রেখে নিদ্রার আশায় শয্যা গ্রহণ করলাম।

শারীরিক অবসাদ সত্ত্বেও নিদ্রাকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হলাম না। নানা অলীক চিন্তা মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে লাগল। ক্রমে এলাম বীণা ষ্টেশনে। ভূপাল থেকে গোয়ালীয়র যাওয়ার পথে বীণায় এসেছিলাম মধ্য রাত্রে, এবারও এলাম সেই গভীর রাত্রে।

এরপর আসবে সেই ভূপাল। তারপর ইটারসি। সেবার ইটারসিও অতিক্রম করেছিলাম নিশীথ রাত্রে। সঙ্গে ছিল রেবা ও পবিত্র। ভেবেছিলাম ভ্রমণের শেষ পর্যন্ত এদের সাথী হয়েই থাকব। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে মিলিয়ে গেল পাঁচমারিতে গিয়ে। পথে বেরিয়ে কত রকম সাথীই পেলাম। কয়েক দিন আনন্দ করে কয়েক স্থানে কাটিয়ে বাঁধন গেল কেটে। পেয়েছিলাম নন্দী মশায় ও সখীকে। বেঁধেছিলেন তাঁরা বন্ধুত্বের বন্ধনে। একসাথে বেঁধেছিলাম আশ্রয়। ক্লেশ, আনন্দ সমানে উপভোগ করেছি। তারপর একদিন তাঁদের শেষ হ'ল ভ্রমণ-স্পৃহা। দিয়ে গেলেন আমাদের, তাঁদের ছিন্ন স্মৃতি।

নীচের বার্থে একবার তাকালাম। গৃহিণী বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রায় নিমগ্ন। ভাবলাম ইনিও আমার ভ্রমণ পথের সাথী! সম্পদে আনন্দ, বিপদে প্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। জানি না, আমার কি তাঁর অকস্মাৎ মিটে যাবে ভ্রমণের মোহ। ফিরে যেতে হবে নিজ গৃহে। একজন বুকে নিয়ে ঘুরবে কেবল স্মৃতিটুকু। যার ভ্রমণ এখনও হয় নি শেষ। ভূপালে এসে গেলাম। তখনও পৃথিবীর ঘোলাটেভাব কাটে নি। খানিক পরেই জগৎকে দেখতে পাব উজ্জ্বল সূর্যকিরণে। চা নিয়ে আলোর

আশায় অপেক্ষা করি। কিন্তু উঠতে পারলাম না। এরপর কিভাবে জানি না তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম। ঘোর কাটল এসে ইটারসিতে।

গৃহিণী বললেন - সারারাত্রি খুব নাক ডাকিয়ে ঘুম দিলে। একবার ডাকতে গিয়ে দেখলাম ঘুমে অজ্ঞান হয়ে আছ। বেলা আটটা বাজে। মুখ হাত ধুয়ে চায়ের চেষ্টা দেখ।

চা পানে প্রকৃতিস্থ হলাম। আমাদের সম্মুখের বার্থের দিকে চেয়ে দেখলাম দু'জোড়া বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা। আরও একটি শিশুকে দেখলাম। এ-দিকের ট্রেনে কোন বাঙ্গালীর মুখ দেখা যাবে আশা করি নি। এখন বাঙ্গালীর সংস্পর্শে এসে যেন এলাম এক মোহন পরিবেশে।

সংক্ষেপে এদের পরিচয় জানলাম। একদিকের মধ্য ও নিম্নের বার্থে আছেন কলকাতার বালীগঞ্জ নিবাসী এক প্রৌঢ় দম্পতি মিঃ মখার্জী ও তাঁর সহধর্মিনী। এঁরা কিছুদিন পূর্বে দিল্লী গিয়েছিলেন, কোন এক কার্য উপলক্ষে। আলাপে ও আকৃতি দেখে বিত্তবান মনে হয়। ঠিকাদারী কাজে বালীগঞ্জে বাড়ী ও গাড়ী করেছেন। এখন চলেছেন শ্রীমার জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যে পণ্ডীচেরীতে। অন্য দিকের বার্থে আছেন এক যবক যুবতী ও তাঁদের একটি শিশু সন্তান। যুবকের কর্মস্থল বাঙ্গালোর। এঁর শ্বশুর মহাশয় থাকেন আগ্রার কোন এক সরকারী কর্মে। তিন মাস পূর্বে স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন আগ্রায়, পিত্রালয়ে সন্তান প্রসবের কারণে। এখন শিশুসহ স্ত্রীকে নিয়ে চলেছেন বাঙ্গালোরে। আলাপ পরিচয়ে বুঝলাম বাঙ্গালোর সরকারে তিনি কাজ করেন। বিশেষ উচ্চ-পদের কর্মচারী নন।

মুখার্জী গৃহিণী বললেন—আপনারা সৌভাগ্যক্রমে ভাল সময়ে মাদ্রাজের দিকে চলেছেন। এই সময় শ্রীমার জন্ম উৎসব দেখে যাবেন।

আমি বললাম—শুনেছি উৎসবের সময় নানাস্থান থেকে বহু শিষ্য ও দর্শক আসেন। থাকার ভাল জায়গা পাওয়া সম্ভব হবে কি?

মুখার্জী গৃহিণী বললেন—কোন অসুবিধা হবে না। আমরা ঠিকানা দিয়ে আপনাকে একখানি পত্র দেব। আপনি অনায়াসে আশ্রমে গিয়ে থাকতে পারবেন।

আমি আহ্লাদিত হয়ে মুখার্জী বাবুকে বললাম—বেশ, আপনি দয়া করে আমাকে পত্র দেবেন। যদি ভাগ্যে থাকে পণ্ডীচেরী ঘুরে আসব। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম দেখার ঐকান্তিক ইচ্ছা আছে।

মুখার্জী বাবু বললেন—সেখানে আমার কোন প্রাধান্য নেই। আমি জীবনে একবার গিয়েছিলাম। কাজের চাপে বাইরে যাওয়ার সুবিধা হয় না। এবার গিয়েছিলাম দিল্লী। ওঁর ইচ্ছায় ওদিকে ঘুরে যাব। উনি প্রায় প্রতি বৎসর গিয়ে থাকেন।

মুখার্জী গৃহিণী সলাজ হেসে বললেন—আমিই পত্র দিয়ে দেব।

গৃহিণী আমাকে বললেন—শ্রীঅরবিন্দের নামই শুনেছি। তাঁর আশ্রম কখনও দেখি নি। এবার দেখে যেতে হবে। এঁদের কাছ থেকে মনে করে একখানা পত্র নিয়ে রাখবে।

ট্রেনে মুখার্জী গৃহিণীর নিকট থেকে একখানি পরিচয়-পত্র নিয়েছিলাম। এ-পত্র আমাদের কোন সাহায্যে আসে নি।

নাগপুরে এসে মিল পেলাম। এর পরে এলাম ওয়ার্ধায় বেলা দু'টার পর।

গৃহিণী বললেন—পুরী, ভুবনেশ্বর ছেড়ে এসেছি?

বললাম—সে পথে আসি নি। সুতরাং পুরী, ভুবনেশ্বর, ওয়ালটিয়ার পথের সংস্পর্শে যাব না।

গৃহিণী বললেন—মাদ্রাজের পথে গোদাবরী দেখা যায় সে আর কত দূর?

বললাম—গোদাবরী দেখা যায় শুনেছি রাজামন্দেরী ষ্টেশনের পরে। আমরা সে রাস্তা বাদ দিয়ে চলেছি। মাদ্রাজের পথে মিলবো আরও কিছু দূরে একেবারে বিজওয়াদা জংশনে।

গৃহিণী বললেন—এ-রাস্তায় আবার মানুষে আসে! এ দিকে না আছে ভাল সহর না আছে কোন তীর্থ স্থান।

বললাম—দুঃখের কোন কারণ নেই। ফেরার পথে দেখে যাব।

সন্ধ্যায় এলাম বালহারসাতে।

গৃহিণী বললেন—রাত্রে খাবে কোথায়? এতো দেখছি বেশ বড় ষ্টেশন। এখান থেকে কিছু নিয়ে রাখবে নাকি?

বললাম—রাত্রি ন'টার পরই যাব কাজিপেট জংসনে। রাত্রের খাবার সেখানে নিলেই চলবে।

তিনি বললেন—দেখ আবার কোন পথে যায়। বালহারসাতে ক্যানটিনের লোক এসে আমাদের মিলের অর্ডার নিয়ে গেল। মিল পাওয়া যাবে কাজিপেটে।

কাজিপেটে এসে প্লাটফর্মে দেখলাম মাদ্রাজী খাদ্য সম্বর ভাত কাগজের প্যাকেটে বিক্রয় হচ্ছে। আমরা ক্যানটিনের মিলে পেলাম ব্যবস্থা অনুযায়ী ভাত ও রুটী।

পরদিন প্রাতে আটটায় এলাম নেলোরে। এর এক ঘণ্টা পরে এলাম গদোরে। আমরা এখানে প্রাতরাশ খেয়ে বেডিং বেঁধে মাদ্রাজের অপেক্ষায় বসলাম।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় ট্রেন মাদ্রাজের প্লাটফর্মে হাজির হ'ল। মুখার্জী দম্পতি আমাদের নিকট বিদায় নিয়ে বিশ্রাম কক্ষের দিকে গেলেন। তাঁরা মাদ্রাজ এগমোর ষ্টেশনে গিয়ে পণ্ডীচেরী রওনা হবেন। বাঙ্গালোরের ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গেলেন বাঙ্গালোরগামী ট্রেনের উদ্দেশে।

মাদ্রাজ

মাল-পত্র নিয়ে প্লাটফর্মে নামলাম। ষ্টেশনের বাইরে টাঙ্গা কিংবা কোন যানের উদ্দেশে কুলি ডাকলাম। এক কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতি কুলি এগিয়ে এলেন। আমাদের বাক্স-বেডিং ষ্টেশনের বাইরে স্থানান্তরিত করার জন্য। দাবী করলেন তিন মুদ্রা। অত্যধিক মজুরী অনুমানে অন্য এক কুলির শরণাপন্ন হলাম। তিনি দাবী করলেন চার মুদ্রা। অন্য উপায় না দেখে প্রথম ব্যক্তিরই সাহায্য গ্রহণে তিন টাকা মজুরীতে স্বীকৃত হলাম। আমার সহৃদয় পাঠকগণের উদ্দেশে এই মাদ্রাজ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিতে বাধ্য হলাম।

ভদ্র মহিলা ও বন্ধুগণ, আপনারা যখন দাক্ষিণাত্য দর্শনে মনস্থ করবেন নিজ

নিজ দ্রব্য-সামগ্রী যতদূর সম্ভব লঘু হয় সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট থাকবেন। এই মাদ্রাজ প্রদেশ পরিভ্রমণে কাঁধে ঝোলা, বেডিং বগলে একান্ত আবশ্যক। নচেৎ আপনার পকেটের মোটা অংশ হাল্কা হয়ে যাবে বারবরদারিতে।

ষ্টেশনের বাইরে এসে টাঙ্গার পরিবর্তে দর্শন পেলাম এক অপূর্ব যানের। যা ইতিপূর্বে ভারতের কোন প্রদেশে লক্ষ্য করি নি। বাঙ্‌লার পল্লীগ্রামে ছত্রী আবৃত গো-যান বিশেষ। এর বাহক বলদের পরিবর্তে অশ্ব। জেনেছিলাম এ-যানের নাম ঝটকা। কিছু কিছু টাঙ্গাও পরে দেখেছিলাম।

আমরা একটি ঝটকায় মাল-পত্র তুলে আদেশ করলাম ধর্মশালায় যাওয়ার জন্য। ট্যাক্সি অবশ্য ছিল। কিন্তু আপনারা জানেন ট্যাক্সির ট্যাক্স দেওয়ার মত শক্তি আমার নেই। ঝটকা ঝট্ করে এনে দিল একটি ধর্মশালার দ্বারে। ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক আমাদের দু'জনের জন্য একখানি কামরা দিতে রাজী হলেন না। এরপর এলাম অন্য এক ধর্মশালায়। এই ধর্মশালা ভবনটি দান করেছেন রায় বাহাদুর বংশীলাল আবীর চাঁদ। এবং তাঁরই নামানুসারে ধর্মশালর নাম দেওয়া হয়েছে।

পল্লীর নাম এলিফেন্ট গেট। এই পল্লীতে আর একটি ভাল ধর্মশালা দেখে-ছিলাম, সেটির নাম সীতারামিয়া কেরল ধর্মশালা।

আমাদের ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক এক মারাঠি মহিলা। ভাল হিন্দী জানেন। সে কারণ আমাদেব বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। ধর্মশালার দ্বিতলে একটি কামরা পেলাম। মাল-পত্র তুলে নিশ্চিন্ত হলাম।

ধর্মশালার নিকটবর্ত্তী একটি হোটেলে আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। এখন আমরা একটি বিশেষ অভাব অনুভব করলাম। আমাদের বাঙ্‌লা ভাষা বোঝেন এরূপ স্থানীয় লোক বিরল। ইতিপূর্বে আমরা বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি যতগুলি স্থান পরিভ্রমণ করেছি সে সকল স্থানে আমাদের ভাষা বিনিময়ের কোন অসুবিধা হয় নি। দোকানদার, কুলি, শকট-চালক প্রভৃতির সহিত কথোপকথনে কোন অসুবিধা ছিল না। তাঁরা বলতেন তাঁদের নিজের ভাষা। সেগুলি আমাদের নিকট আদৌ দুর্বোধ্য নয়। অনেকে আধা বাঙ্‌লায়ও ভাষার বিনিময় করে থাকেন।

এ স্থানে দেখলাম স্থানীয় ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এঁরা যে হিন্দী বলেন সেটিও তাঁদের নিজস্ব ভাষা নয়। কসরৎ করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। আমার ভাষাও হিন্দী নয়। কলকাতায় বিহারীদের সাথে মেলামেশায় যতটুকু আয়ত্ত করেছি সে কেবল কাজ চালান হিন্দী। এ-হিন্দী এস্থানে গোঁজামিল দিতে যাওয়া অর্থে উভয় পক্ষই ঘর্মাক্ত কলেবর অবস্থা। সাধারণ লোকের নিকট আমার হিন্দীর সঙ্গে ইঙ্গিতে কোন প্রশ্ন করলে ও-পক্ষ উত্তরের ইঙ্গিতে এমনভাবে শির আন্দোলন করবেন তদ্দ্বারা 'হ্যাঁ' কি 'না' অনুমান করা অসাধ্য। ইংরাজীতে অবশ্য সুবিধা হয় কিন্তু সে কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে।

ভারতের সকল প্রদেশেই কিছু না কিছু বাঙ্গালী অবশ্যই আছেন। বিদেশে বেরিয়ে বড় সহরে কর্মব্যস্ত জনতার মধ্যে এক নিমেষে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে চিনে নেওয়া সম্ভব নয়। বহু চিন্তার পর এই মাদ্রাজ সহরে বাঙ্গালীর সংস্পর্শে যাওয়ার এক সহজ উপায় উদ্ভাবন করলাম। আমার জানা ছিল মাদ্রাজে গৌড়ীয় মঠ আছে। সে-স্থানে বাঙ্গালী অবশ্যই আছেন। অনুসন্ধান করে গৌড়ীয় মঠে যাওয়ার সঙ্কল্প করলাম।

ধর্মশালার কর্ত্রীকে প্রশ্ন করে গৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে কোন সঠিক ঠিকানা পেলাম না। অপরাহ্নে মঠের অনুসন্ধানে ধর্মশালা থেকে এলিফেণ্ট গেটের পথে এলাম। এটি সহরের একটি প্রশস্ত পথ। পথের উভয় পার্শ্বে নানা দ্রব্যের দোকান। আমরা একটি ষ্টেশনারি দোকানে এসে দোকানের মালিককে ইংরাজী শিক্ষিত অনুমানে সে-দিকে গেলাম।

এক আনার নস্য ক্রয় করে কয়েকটি বাক্যালাপের পর আমাদের আবশ্যকীয় গৌড়ীয় মঠের ঠিকানা জানতে ইচ্ছা করলাম। তিনি কোন মতে আমার প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেন না। আমি হতাশ হলাম না। তাঁকে বোঝাবার জন্য নানা কৌশল প্রয়োগ করলাম। বোঝালাম— সে-স্থানে টেম্পল আছে। তার মধ্যে গৌরাঙ্গের মূর্ত্তির অনুকরণ করে দেখলাম তাতেও সুফল না পেয়ে বললাম—সে-স্থানে একটি সন্ন্যাসীদল থাকেন। তাঁদের পরিধানে লাল বস্ত্র। তাঁরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় মৃদঙ্গ ও করতালসহ উপাসনা করেন। আমার মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যের ভঙ্গিমা

দেখে তিনি বললেন—আ-গৌড়ীয় মঠ্ঠম্। ময়লাপুরমে যান। সামনেই বাস পাবেন। ময়লাপুরমে গিয়ে মঠ্ঠমের অনুসন্ধান করবেন।

এখন সহজেই গৌড়ীয় মঠের সন্ধান পেলাম। বাস থেকে নেমে কিছুদূর এসে একটি উদ্যানের ফটক অতিক্রম করে গৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করলাম। সম্মুখে নাট মন্দির। তারই পশ্চাতে মন্দির মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নারায়ণের মূর্ত্তি। মঠে কয়েকজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত হলাম। মঠের এক অংশে গেষ্ট-হাউসও আছে। এ-স্থানে দুই-চারিদিনের জন্য স্থান পাওয়া যায়। আমরা পূর্বাহ্নে ধর্মশালায় আশ্রয় পেয়েছি। মঠ ষ্টেশন থেকে বেশ কিছুদূরে। সে কারণ বাঙ্গালীর সংস্পর্শ সত্ত্বেও মাল-পত্র নিয়ে স্থান পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করলাম না।

এঁদের নিকট মাদ্রাজ প্রদেশের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান ও দর্শনীয় স্থান-গুলির একটি তালিকা নিলাম। আরও জানলাম মাদ্রাজ সহর থেকে কয়েকটি বিশেষ স্থানে যাওয়ার জন্য প্রত্যহ বহু বাস যাতায়াত করে। আমাদের ধর্মশালার নিকটে হাইকোর্টের পাশে বাস ষ্টেশন। আমরা যে কোন দিন বাসে গিয়ে সে স্থানগুলি দর্শন করে আসতে পারি। কাঞ্চি-পুরম্, মহাবলীপুরম্, চিঙ্গলীপুট, তিরুকলি কুন্দ্রম পাহাড়ে পক্ষীতীর্থ। আরও কিছুদূরে আছে তিরুপতি বালাজী। এ-স্থানে যাওয়ার জন্য বাস পাওয়া যায় ট্রেনের সুবিধাও আছে।

তাঁরা বললেন—আজ এদিকে এসেছেন নিকটে দেখবেন মেরীনবীচ। ভারতের বৃহত্তম বীচ দেখে যান। এ-পথে কপালেশ্বরের মন্দিরও দেখে যাবেন।

মঠ থেকে বেরিয়ে গৃহিণী বললেন—ও মেরীন-ফেরীন এখন থাক। কোথায় কপালেশ্বর মন্দির আছে চল দেখে যাই। আমরা এদিকে সোজা পথে অগ্রসর হয়ে মেরীনবীচে এসে হাজির হলাম।

মেরীনের শোভা দেখে গৃহিণী যে সর্বপ্রথম মন্দিরে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন এখন সে কথা বিস্মরণ হয়ে বিস্ময়ে নীল বারিধির দিকে চেয়ে রইলেন। সমুদ্রের শোভা সর্বত্র সমান। কিন্তু এ যেন যৌবনপুষ্ট সুন্দরী কামিনী গজেন্দ্র গমনে চলেছেন। তরঙ্গ আছে কিন্তু উদ্দাম নেই। দিগন্তে নীলাম্বরের সাথে নীলাম্বু একত্রে মিশে গেছে। পশ্চিম গগনের হেলে-

পড়া অরুণ-কিরণে জলরাশির উপর যেন নক্ষত্রমালা ভেসে চলেছে। চক্ষু ফেরান যায় না। বেলাভূমিতে যেন মেলা বসে গেছে। ফল মিষ্টান্ন থেকে শাঁখা, চুড়ী, খেলনার দোকানেও বালক বালিকাদের আনন্দ কোলাহলে স্থানটি মুখরিত হয়ে গেছে। বহু পুরুষ ও মহিলা এসেছেন বেলাভূমিতে পরিভ্রমণে কিংবা বায়ু-সেবনে।

অনুসন্ধান করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এলাম কপালেশ্বর মন্দিরে। দূর থেকে মন্দিরের গোপুরম্ দেখে গৃহিণী বললেন—কি চমৎকার মন্দিরের বাহার। এমন উঁচু মন্দির খুব কম দেখা যায়।

বললাম—সম্মুখে যে বস্তুটি দেখছ ওটি প্রকৃত মন্দির নয়। ওকে বলে গোপুরম্। ঐ গোপুরমের মধ্য দিয়ে মন্দির সীমানায় যেতে হয়। এরূপ গোপুরম্ তুমি অন্যত্র দেখেছ। হয় তো বিস্মরণ হয়ে গেছ। পুষ্করতীর্থ, হৃষীকেশেও দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতির মন্দির আছে। কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে মাগ্নিরাম বাঙ্গুরের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীও দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে দেবালয় ও গোপুরম্ নির্মিত হয়েছে। তবে সেগুলি আকারে ক্ষুদ্র। এ-দেশীয় মন্দিরের অনুকরণ মাত্র।

গৃহিণী বললেন—রামেশ্বর মন্দিরে আর মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরেও গোপুরম্ আছে।

বললাম—সবেমাত্র দক্ষিণ ভারতে পা দিয়েছ। এ-প্রদেশের শিরায় শিরায় মন্দির। আর মন্দির দ্বারে দেখবে এইরূপ গোপুরম্। মোটকথা দাক্ষিণাত্য মন্দির প্রধান দেশ। কেবল মন্দির গোপুরম্ দেখে বিস্মিত হলে চলবে না। দেখবে মন্দিরের পুরোহিতের পরম নিষ্ঠার পূজা-পদ্ধতি। দেখবে জনগণের অগাধ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবভক্তি। দেখতে পাবে মন্দিরে মন্দিরে বেদ পাঠ, শুনতে পাবে সামগান। অনুভব করবে ধূপ-ধূনা, চন্দনের সৌগন্ধে মুখরিত দেবালয়।

গৃহিণী বললেন—আজ সমুদ্রতীরে সময় না কাটিয়ে আগেই মন্দিরে আসা উচিত ছিল।

বললাম—আক্ষেপের কোন কারণ নেই। আমরা একদিনেই মাদ্রাজ ছেড়ে পালাব না। বারান্তরে এসে দেখে গেলেই চলবে।

গৃহিণী বললেন—দেখ গোপুরমের সামনে কি সুন্দর বড় পুকুর। পুকুরের চারিদিকে ঘাটের মত চমৎকার সিঁড়ি। অনেকে ঐ সিঁড়িতে বসে আছেন। পুকুরের মধ্যে একটি ছোট চতুর্দোলার মত মন্দির।

বললাম—আমার মনে হয় উৎসবের সময় নৌকাযোগে পুকুরের মধ্যে ঐ মন্দিরে বিগ্রহ নিয়ে গিয়ে পূজা কিংবা কোন আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা আছে।

আমরা গোপুরম্ অতিক্রম করে মূল মন্দির দ্বারে এলাম। সান্ধ্য-আরতি আরম্ভ হ'ল। মন্দির দ্বারে বেজে উঠল দামামা, কাঁসর-ঘণ্টা। বহু ভক্ত আরতি দর্শনে মন্দির দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। আরতির দীপ-দানির কি সজ্জা! একটি লম্বা দীপ-দানিতে কয়েকশত সলিতার আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। দীপারতি ও অন্যান্য বিধিমত আরতি দর্শনের পর দেখলাম কয়েকজন পুরোহিত সঙ্গীতের সুরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন। এ-সকল দৃষ্টে যেন আপনা হতেই মাথা নুয়ে পড়ে মন্দিরের দ্বারে।

মন্দিরের বাইরে এসে গৃহিণী বললেন—মূল মন্দির গোপুরমের অপেক্ষা ছোট মনে হয়। মন্দির নির্মাণের এ-ব্যবস্থা কেন?

বললাম—সকল মন্দিরের নির্মাণ পদ্ধতি একই রূপ কিনা জানি না। তবে আমি শুনেছি মূল মন্দিরগুলি গোপুরম্ অপেক্ষা আকৃতিতে ছোট। আমার মনে হয় এই দেবালয়গুলি যেন দেব দুর্গ। মূল মন্দিরে আছেন ভগবান আর ঐ গোপুরমে যে সকল দেবতাদের মূর্তি আছে তারা যেন প্রহরায় নিযুক্ত আছেন। কোন দৈত্য কিংবা অসুর প্রভৃতি বাহির শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণ থেকে সতর্ক আছেন যেন মন্দিরের দেবতাদের শান্তি ভঙ্গ না হয়।

গৃহিণী বললেন—এ তোমার মনগড়া কথা। অন্য কোন উদ্দেশ্য বা পুরাণের বিধি আছে।

এরপর আমরা আজকার মত ভ্রমণে নিবৃত্ত হয়ে বাসে ধর্মশালায় ফিরলাম। ধর্মশালায় মারাঠা মহিলার মুখে শুনলাম এ-স্থানে অনুরূপ আর একটি মন্দির আছে। সেটি তিরু বোত্তিরের প্রাচীন শিব মন্দির। আরও কয়েকটি মন্দিরের নাম ও যাওয়ার পথ-ঘাট জেনে নিলাম।

পরদিন সকালে গেলাম বাজারের দিকে কিছু সবজি ক্রয়ের উদ্দেশে। কিছুদূর এসে গৃহিণী লক্ষ্য করলেন এক বৃহৎ মন্দির। বহু পুরুষ ও মহিলাকে সেই দেবালয়ে প্রবেশ করতে দেখলাম। অভ্যন্তরে দেখলাম নারায়ণ মূর্তি। মূল মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি। এ-গুলির নির্মাণ কৌশল অতি সুন্দর। মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে একটি বৃহৎ রথ টিনের আবরণে সংরক্ষিত রয়েছে। মনে হয় রথের সময় কিংবা কোন উৎসবে এই রথের ব্যবহার হয়।

আহারের পর গেলাম আমার ব্যাঙ্কের চেক বুক পকেটে নিয়ে বিশেষ পরিচিত এক মাদ্রাজী বন্ধু সুন্দরমের নিকট। তাঁর নিকট একখানি চেক দিয়ে কিছু নগদ টাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। অফিসে গিয়ে তাঁকে আমার প্রয়োজন জানালাম। তিনি আমার চেকের অঙ্ক অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ কয়েকখানি নোট আমার হাতে দিলেন। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম এই মুহূর্তে টাকার আবশ্যক ছিল না। আমার চেক কলকাতার ব্যাঙ্কে ক্যাস হলে নিয়ে যাব।

তিনি বললেন—আপনার টাকার আবশ্যক জেনেই আপনাকে দিলাম। চেক ক্যাসের জন্য অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। যেদিন টাকার বিশেষ প্রয়োজন হবে আমি হয়তো সেদিন অফিসে অনুপস্থিত থাকতে পারি। যদি আরও কিছু প্রয়োজন বোধ করেন বিনা দ্বিধায় আমাকে বলতে পারেন। আমি এঁর বন্ধু-প্রীতিতে মুগ্ধ হলাম।

আমার গৃহিণী অফিসের দ্বারে অপেক্ষা করছেন শুনে তিনি আমার সাথে বাইরে এলেন। ইনি আমার কলকাতা অফিসের সহকর্মী ছিলেন। সে সময় বাঙ্‌লা ভাষা বিশেষ রপ্ত করেছিলেন। সময় সময় আমাদের আলয়ে এসেছেন। আমার গৃহিণীকেও চিনতেন। প্রথম বাক্যালাপের পর গৃহিণী সুন্দরমকে বললেন—কাল থেকে মাদ্রাজে এসে একটি বাঙ্গালীর মুখ দেখতে পাই নি। বৈকালে গিয়েছিলাম গৌড়ীয় মঠের দিকে। সেখানে কয়েকটি বাঙ্গালী দেখলাম। মাদ্রাজে বোধহয় বাঙ্গালী বেশী থাকে না।

সুন্দরম বললেন—মাদ্রাজে বহু বাঙ্গালীকে দেখতে পাবেন। এইস্থানে

একটু অপেক্ষা করলেই আপনাকে দেখাতে পারি। সেই মুহূর্তে সম্মুখ দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—ঐ যে কয়েকটি বাঙ্গালী মহিলা আসছেন। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

দেখলাম আমাদের অদূরে সম্পূর্ণ আধুনিক রুচি সঙ্গত বেশে তিনটি যুবতী আসছেন। তবে তাঁরা আদৌ বাঙ্গালী নন। এঁদের পরিধানে মাদ্রাজী পদ্ধতির বেশ। তু-নাকে বেসর কিংবা মাদ্রাজী অলংকার। মাথার পুষ্পগুচ্ছ শোভা পাচ্ছে।

তাঁরা নিকটে আগমন মাত্র সুন্দরম্ বললেন—আপনারা মাদ্রাজে বাঙ্গালীর দর্শন পাচ্ছেন না যুবতীদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, এই দেখুন আপনারা আলাপ পরিচয় করতে পারেন।

যুবতীত্রয় সলাজে আমাদের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। গৃহিণী তাঁদের পার্শ্বে ডেকে কিছুক্ষণ আলাপ করে বিদায় দিয়ে বললেন--অবাক কাণ্ড! মাত্র ছ'মাস মাদ্রাজে পা দিয়েছেন। পোষাক না হয় সকলেই বদল করতে পারে কিন্তু মুখের চেহারাও যেন পাল্টে ফেলেছে।

গৃহিণীকে বললাম—ওরা নিশ্চয়ই ছাত্রী কিংবা কোন অফিস-কর্মে নিযক্ত হয়েছেন।

গৃহিণী বললেন—না, ওরা তু'জনে মেডিকেল নার্স। একজন মাত্র কয়েক দিন বোনের কাছে বেড়াতে এসেছেন।

অবান্তর প্রসঙ্গ ত্যাগ করে আমি গৌড়ীয় মঠে প্রাপ্ত তালিকাটি পকেট থেকে বার করে স্নুন্দবম্‌কে বললাম—আমরা কাল গৌড়ীয় মঠে এ-স্থানের দর্শন বস্তু ও মন্দিরের একটি তালিকা পেয়েছি। আরও শুনলাম কিছুদূরে তিনটি তীর্থ ও দর্শনীয় স্থান আছে, সেগুলি সকালের বাসে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসা যায়।

বন্ধু সুন্দরম্ বললেন—তাঁরা ঠিকই বলেছেন। কাঞ্চিপুরমের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী বাস সকল সময় যাতায়াত করে। আজ শনিবার। আপনারা প্রথমতঃ কালই মহাবলীপুরম্ আর পক্ষীতীর্থ দেখে আসুন। প্রতি রবিবারে তুইখানি স্পেশাল-বাস মহাবলীপুরম্ আর পক্ষীতীর্থ যায়। সে স্থানের সমস্ত দর্শনের পর সন্ধ্যার পূর্বেই আপনারা ফিরে আসবেন।

আপনারা এখনই অগ্রিম টিকিট নিয়ে রাখবেন। সীমিত আসন। এই বাসে গেলে আপনাদের বিশেষ সুবিধা হবে। তিরুপতি বালাজী ট্রেনেই যাবেন। প্রাতে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশন থেকে একখানি ট্রেন বাঙ্গালোর যায়। তার নাম বৃন্দাবন-এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনের বিরাম তিনশ' মাইলের মধ্যে মাত্র দু'টি। প্রথম বিরাম কাটপাড়িতে। তারপর জালার পেট্টাই, এরপর একেবারে বাঙ্গালোরে।

আপনারা কাটপাড়ি থেকে সঙ্গে সঙ্গে তিরুপতি ইষ্টের ট্রেন পাবেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তিরুবন্ন মালাই দেখে যাবেন। তিরুবন্ন মালাইয়ের শঙ্কর-মন্দির বিখ্যাত।

গৃহিণী বললেন - ওদিকে আর কি দেখবার আছে ?

সুন্দরম্ বললেন - দক্ষিণভারতে মন্দির দেখতে দেখতে আপনারা পাগল হয়ে যাবেন। এখন বলাজী দর্শন করে ঐদিকে গেলেই নানা মন্দিরের সংবাদ পাবেন। যাওয়ার পূর্বে আমার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করে যাবেন। আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে সম্ভবতঃ আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারব। এখন প্রথম, বাস ষ্টেশনে গিয়ে মহাবলী পুরমের টিকিট নেবেন। এরপর হাইকোর্টের মধ্যে লাইট-হাউস দেখে যান। প্রতিজনের জন্য চার আনা দিয়ে প্রবেশ-পত্র নিতে হবে। উপরে উঠলে দেখতে পাবেন মেরীন বীচ। আর একদিকে সমগ্র মাদ্রাজ সহরের দৃশ্য দেখতে পাবেন।

সুন্দরমের নিকট বিদায় নিয়ে গেলাম বাস ষ্টেশনে। বুকিং অফিসে অনুসন্ধান করে জানলাম মাত্র দু'টি আসন অবশিষ্ট আছে। আমি ইতঃস্তত করে পকেট থেকে টাকা বাহির করার পূর্বেই আমার পশ্চাতে কয়েকজন এই বাসের যাত্রী হাজির হলেন। আমি আর কোনরূপ গড়িমসি না করে দু'খানি টিকিট নিলাম। বলা বাহুল্য আমার পশ্চাতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

টিকিট দু'খানি সযত্নে নিয়ে হাইকোর্ট অভিমুখে অগ্রসর হলাম। গৃহিণী বললেন—এ রাস্তার নাম কি ?

বললাম—মাউণ্ট রোড। বড় বড় সরকারী, বে-সরকারী অফিস ও ব্যাঙ্ক

ভবন গুলির অধিকাংশ এই রাস্তায় দেখতে পাবে।

ক্রমে আমরা এলাম হাইকোর্টের সন্নিকটে। গৃহিণী বললেন—চল না লাইট-হাউসে। উপর থেকে সহরটা কেমন দেখায় একবার দেখে যাই। দেখলাম কয়েকজন ভদ্রলোক ও মহিলা কয়েকটি সন্তানসহ লাইট-হাউসের দিকে চলেছেন।

গৃহিণীর আগ্রহে লাইট-হাউসের দ্বারে এলাম। প্রবেশ-পত্র দেওয়ার জন্য কোন লোককে দেখলাম না। আমাদের অগ্রগামী ভদ্রলোকের পশ্চাৎ অনুসরণ করলাম। সোপান বেয়ে উর্দ্ধপথে আরোহণ করে মধ্য পথে দেখলাম একটি হলে অফিস কক্ষ। এই স্থানেই নিতে হবে প্রবেশ-পত্র। আমরা প্রত্যেকের জন্য চারি আনা মূল্য দিয়ে প্রবেশ-পত্র নিলাম।

এবার আমাদের উঠতে হবে ঘূর্ণায়মান সঙ্কীর্ণ পথে। কয়েক ধাপ অক্লেশে আরোহণের পর নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হ'ল। আমি ইতিপূর্বে কোন মিনারে আরোহণ করি নি। যষ্টি হাতে গিরি আরোহণ করেছি কিন্তু সে সকল আলো-বাতাসপূর্ণ মুক্ত গগন তলের পথ! এ-অন্ধকার সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ মধ্যে সোপান। পর্যাপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাসের অভাব। গৃহিণী আমার অগ্রে চলেছেন। এক একবার পিছন ফিরে দেখছেন। হয়তো আমার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন। দুঃসময়ে ভগবানের নামও স্মরণে আসে না। তবুও কয়েকটি দেবতার নাম নিয়ে বিপদ-মুক্ত হওয়ার জন্য কাতর প্রার্থনা জানালাম। বহু আয়াসে অগ্রসর হয়ে ঊর্ধদিকে দেখতে পেলাম দেবতার আশীর্বাদের মত উজ্জ্বল আলো। আরও কয়েক ধাপ এসে স্পর্শ পেলাম স্নিগ্ধ জীবনের।

রেলিং-ঘেরা বারান্দার পাশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে প্রকৃতিস্থ হলাম। এরপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। পূর্বদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখলাম বঙ্গোপসাগরের অফুরন্ত বারি রাশি। লাইট-হাউসের উপর থেকে মনে হয় মেরীন বীচ যেন অতি নিকটে। উত্তর ও পূর্বে অসংখ্য গগন-ভেদী অট্টালিকা জমাট বেঁধে আছে। দক্ষিণে যেন কয়েকটি ক্ষুদ্র উদ্যান ও

ভবন। তার পরেই সবুজের দেওয়াল।

গৃহিণী বললেন—এ-দিক থেকে মেরীন এত নিকটে, কাল আমরা ময়লা-পুরম্ থেকে মেরীন যেতে অযথা পরিশ্রম করলাম। দেখ মেরীনের পাশে একটা কিসের মিনার। ঐদিকে নানা আকারের বাড়ীগুলি কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমাদের সঙ্গে যে কয়েকটি মহিলা ও ভদ্রলোক ছিলেন তাঁরা পাঞ্জাবের লোক। বাড়ী গুরুদাসপুর। কি কাজ করেন জানি না। কথা-বার্তায় শিক্ষিত বলে মনে হয়। কিছু কিছু বাঙ্‌লাও জানেন। আমার গৃহিণীর ভ্রান্ত অনুমান উপলব্ধি করে হেসে বললেন—মেরীন বীচ ময়লাপুরম্ থেকে নিকটে। তবে এ-দিক থেকেও যাওয়া যায়। দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। ঐ যে স্তম্ভের মত দেখা যাচ্ছে ওটি হ'ল যুদ্ধ স্মৃতি-স্তম্ভ। এর কিছুদূর উত্তরে দেখবেন সেণ্ট-টমাস্ দুর্গ। এর পার্শ্ব দিয়ে হাঁটলে দেখতে পাবেন বহু প্রাচীন ভবন। এই ভবনগুলি দেখলে দ্রাবিড় সভ্যতার নমুনা দেখতে পাবেন। বহু বৎসর পূর্বে একটি ভবনে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। এখন তারই পাশে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ভবন দেখতে পাবেন। এক সময়ে এ-দিকে ছিল কর্ণাটকের নবাবগণের বাস ভবন। বর্তমানে এগুলিতে হয়েছে কয়েকটি সরকারী অফিস। এর পাশেই আছে ষোড়শ শতাব্দী পূর্বের ইতালীর রেণেসাস্ ধরণে তৈরী প্রেসিডেন্সী কলেজ। তারপর দেখবেন একটি সাঁতারের পুকুর। সহরের দক্ষিণ অঞ্চলে যে বাগানটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর। ঐ স্থানে দেখবেন বিখ্যাত প্রাচীন বটগাছ প্রাচ্য বিদ্যা গ্রন্থাগার। আর ভরত নাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যের শিক্ষা-কেন্দ্র। মাদ্রাজে এসেছেন, এগুলি দেখে যাবেন।

বাতিঘর থেকে অবরোহণ কালে স্বচ্ছন্দে নেমেছিলাম। কোটের বাহিরে এসে গৃহিণী বললেন—সুন্দরমের নিকট থেকে যে টাকা নিয়েছ সাবধানে রাখ যেন মাদ্রাজের পথে খোয়া না যায়।

বললাম—ঠিক কথা। চল এখন ধর্মশালায় যাই।

উনি বললেন—ধর্মশালায় কি তোমার আয়রণ চেষ্ট্ আছে গিয়ে রেখে

দেবে? সাবধানে পথ চলবে, সেই কথাই বলছি। এখন মাত্র দু'টো বেজেছে। চল না মেরীনের রাস্তায়। ও-দিকে বহু জিনিস দেখবার আছে।

মাউণ্ট রোড ধরে অফিস ভবনগুলি দেখতে দেখতে চলেছি। ফুটপাথের ধারে এক নস্য বিক্রেতাকে দেখে এক আনার নস্য নিলাম। তাঁর নস্য বিক্রয়ের কসরৎ দেখতে আরও একদিন এখানে নস্য নিতে এসেছিলাম। সম্মুখে কয়েকটি রূপার মত ঝক্‌ঝকে ঘটিতে নস্য নিয়ে বসে আছেন। তাঁর সম্মুখে গিয়ে নস্য চাহিবামাত্র সেই ঘটিগুলির আবরণ উন্মোচন করে ত্রস্ত হয়ে মন্দিরে দেবতার চরণামৃত দেওয়ার মত একটি চামচ নিয়ে এক অদ্ভুত শব্দে ঘটিগুলি বাজিয়ে একটি নস্যের মোড়ক হাতে দেবেন। প্রতিটি মোড়ক করতে অন্ততঃ দু' মিনিট সময় লাগবে। ঘটিগুলি থেকে মোড়কের মধ্যে দশ নয়া পয়সার নস্য উঠবে দু' আনা ওজনের।

এরপর হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলাম যুদ্ধ স্মৃতি-স্তম্ভের সন্নিকটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মিত হয়। এর কিছু দূরে একটি ছোট পার্কের মধ্যে মিসেস্ এ্যানি বেসান্টের মর্মর মূর্ত্তি দেখলাম। ইনি ছিলেন মাদ্রাজের যোগসাধনা সমিতির প্রধান নেতৃস্থানীয়া। একদিন ট্রিপোলিকেন রোডে পার্থসারথি মন্দির দেখতে গিয়ে এঁর তপোবনও দেখেছিলাম।

স্মৃতি-স্তম্ভের নিকটে কোন ফোর্ট দেখতে পেলাম না। সম্মুখে একটি বৃহদায়তন সরকারী অফিস ভবন। অনুসন্ধানে জানলাম সেটি সেণ্ট-জর্জ দুর্গ। র‍্যামপার্টের পার্শ্ব দিয়ে ফটক অতিক্রম করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। একদিকে সৈন্য ব্যারাক, অন্য পার্শ্বে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের বাসভবন। দুর্গ সীমার মধ্যে নানা ভবন তবে সেগুলিতে সাধারণের প্রবেশ অধিকার নেই। এর মধ্যে আছে রাজ্য সরকার দপ্তর ও আইন-সভা ভবন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। কর্ণাটক নবাবগণের প্রাসাদ প্রভৃতি দেখে একটি কফির দোকানে বসলাম।

দোকান মালিকের মুখে শুনলাম নিকটে চার্লস ষ্ট্রিটে লর্ড ক্লাইভের বাসভবন আছে। এই ভবনেই তিনি বিবাহ করেছিলেন। আর চার্লস

ষ্ট্রীটে ওয়েলেস্‌লি হাউস আছে। সেখানে থাকতেন ওয়েলিংটনের প্রথম ডিউক। সেই বিল্ডিংগুলিও দেখতে পাবেন। এখন আমরা অত্যধিক ক্লান্ত হওয়ায় আজ আর ভ্রমণে মনোযোগ দিলাম না।

পরদিন। তখনও মাদ্রাজের রাজপথে আলো বিতরণ করছে বৈদ্যুতিক বাতি। আমরা কোনরূপে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে ধর্মশালা থেকে বেরিয়েছি নেতাজী সুভাষ রোডে। পথে কোন যানবাহনেরও দেখা পেলাম না। সাহসে নির্ভর করে বাস ষ্টেশনে এসে দেখলাম তু'খানি বাস প্রায় যাত্রীপূর্ণ অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে। আশা করেছিলাম বাস ষ্টেশনে এসে চায়ের পাত্রের দর্শন পাব কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম যেন দোকান গুলির চতুর্দিকে দেওয়ালে আবদ্ধ। দ্বারের কোন চিহ্নমাত্র নেই।

টিকিট অনুসারে নির্দিষ্ট বাসে এসে বসলাম। কয়েক মিনিট পরেই বাস যাত্রা শুরু করল। সহর ত্যাগ করে সমুদ্র ফাঁড়ীর একটি ব্রীজ অতিক্রম করে বাস চলেছে তেঁতুল গাছ ও নারিকেল কুঞ্জের পাশ দিয়ে। আমাদের নিকট এ-পথের দৃশ্য নূতন। অদূরে পল্লী-ভবনগুলি দেখতে বেশ ভাল লাগছে। এত আনন্দের মধ্যেও মন ঘুরছে চায়ের পাত্রের সন্ধানে। মাদ্রাজ থেকে মহাবলীপুরম্ ষাট কিঃ মিটার পথ। মধ্য পথে হয়তো চায়ের স্পর্শ পাওয়া যাবে না।

একটি গ্রামে এসে একটি বড় হোটেলের সম্মুখে বাসটি থেমে গেল। সকলেই নেমে হোটেলে প্রবেশ করলেন। আমরাও আনন্দে নামলাম। এ-হোটেলে চা-কফি, ইড্‌লি, ধোসা প্রভৃতি বিক্রয় হয়। আমরা ইড্‌লি ও চা নিলাম। এ-স্থানে দেখলাম আমাদের পার্শ্বে কয়েকটি বাঙ্গালী যুবককে। কোনও কলেজের ছাত্র। এসেছেন দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য-শিল্প দেখার উদ্দেশে। স্থানীয় তু'টি ভদ্রলোক এঁদের দলে মিশে গিয়ে গাইডের কাজ করছেন। আমরা এই বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে পেয়ে বিলক্ষণ উৎসাহিত হলাম।

পুনরায় বাস চলতে শুরু করল। বেশ আনন্দেই চলেছি। কয়েক মাইল অগ্রসর হয়ে বাসটি নিশ্চল হয়ে গেল। বাস-চালক নির্জীব বাহনের হস্ত,

বক্ষ, পৃষ্ঠ, জিহ্বা পরীক্ষা করে হতাশা জ্ঞাপন করলেন। এ-ক্ষেত্রে আমাদের পরিণাম চিন্তা করে আতঙ্কিত হলাম। বাস-চালক আমাদের অভয় দিলেন। মহাবলীপুরমের একটি 'সাধারণ বাসে আমাদের ব্যবস্থা করে দেবেন। টেলিফোনযোগে সংবাদ দিয়ে মাদ্রাজ বাস ষ্টেশন থেকে স্পেশাল বাস এনে মহাবলীপুরমে আমাদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দেবেন।

হরিবোল হরি! এখন বৃক্ষতলে অবস্থান। না, তরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি। দু' মিনিটের মধ্যেই মহাবলীপুরমের একটি সাধারণ বাস এসে গেল। আমরা কোনরূপে তার অভ্যন্তরে স্থান নিলাম।

মহাবলীপুরম্

দশ পনের মিনিট পরেই মহাবলীপুরমের বাস ষ্ট্যাণ্ডে হাজির হলাম। বাস থামা মাত্র অন্যান্য যাত্রিগণ কোন দিকে অদৃশ্য হলেন বুঝতে পারলাম না। এ-স্থানের দর্শনীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বাস ষ্ট্যাণ্ডের অদূরে একটি বৃহৎ গোপুরম্ ও মন্দির দেখে সেই দিকে গেলাম। মন্দিরে পূজা-আরতি দেখলাম। এরই নিকটে আর একটি দেবালয় নির্মিত হচ্ছে। সম্মুখে একটি গোপুরম্ও প্রস্তুত হয়েছে। ভাবলাম এইটি বোধহয় আমাদের দর্শনীয়।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে কয়েকটি মাদ্রাজী হোটেল ও শিশুদের খেলনা প্রভৃতির দোকান। কয়েকটি ফলের দোকানও দেখলাম। এ-স্থানে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলাম। এঁরা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। এঁরা তাঁদের স্থানীয় বন্ধুদের সাহায্যে চলেছেন কৈলাসনাথ মন্দির দেখতে। আমরা এঁদের অনুসরণ করলাম।

আরব সাগরের তীরে এই মন্দির। অপূর্ব কারুকার্য। যুগ-যুগান্তর সমুদ্রের ধাক্কা খেয়ে আজও প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

মন্দির মধ্যে পুরোহিত পূজায় বসেছিলেন। আমরা পূজা-আরতি দেখে মন্দিরটির চতুর্দিক একবার ভালভাবে নিরীক্ষণ করলাম। এই প্রাচীন মন্দিরের আশু সংস্কার প্রয়োজন।

মন্দিরের অনতিদূরে আছে ডাকবাংলো। উদ্যান মধ্যে চমৎকার একটি ভবন। বাবুর্চি, খানসামা সবই আছে। আদেশ করলেই আহারাদি পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গালী সম্প্রদায় প্রায় অভুক্ত ছিলেন। তাঁরা মহাবলীপুরমের পথে হোটেলে কিছুই খান নি। কারণ এ-প্রদেশের খাদ্য ইড্‌লি, বড়া, ধোসা আহারে অনভ্যস্ত। এঁরা এই ডাকবাংলোয় এসে খানসামাদের আহ্বান করলেন।

খানসামার পোষাক পরিহিত ও পাগড়ী মাথায় এক সুদর্শন খানসামা হাজির হয়ে বাঙ্গালী বাবুদের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়ালেন। বাঙ্গালী যুবকগণ পরামর্শ করে তাঁদের স্থানীয় বন্ধুদের দ্বারা এ-দেশীয় ভাষায় বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন এবং নিজেরা বিচিত্র হিন্দীতে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

খানসামা ঈষৎ হাস্যসহকারে পরিস্কার বাঙ্‌লায় বললেন—আহা, আপনারা কোন ভাষায় বলবেন বলুন না। সকল রকম ভাষা আমার কিছু কিছু জানা আছে।

বাবুরা লজ্জায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাঁদের আবশ্যকীয় ওমলেট, টোষ্ট, চা প্রভৃতির আদেশ দিলেন।

এরপর আমরা সদলে গেলাম পঞ্চরথ দেখতে। বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথের ধূলা ভেঙ্গে এলাম পঞ্চরথের পাশে।

শুনলাম এগুলি নির্মিত প্রথম নরসিংহ বর্মনের রাজত্বকালে। এই ধরণের মন্দিরগুলি সে যুগের ভারতের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রথমে গেলাম সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ একটি রথের সন্নিকটে। একটি শিলাখণ্ডের উপরিভাগ থেকে কাটতে সুরু করে মন্দিরটি শেষ হয়েছে। এটি পাঁচতলা মন্দির। অভ্যন্তরে কোন দেবমূর্ত্তি নেই। প্রতিটি মন্দিরের ছাদের গঠনও ভিন্ন প্রকারের। এ-মন্দিরের নাম ধর্মরাজ রথ।

দ্বিতীয়টির নাম ভীমরথ। এটির ছাদ গরুর গাড়ীর ছই-এর মত।

তৃতীয়টি প্রথম রথটির অনুরূপ তবে আকৃতি ছোট। চতুর্থ রথটির নির্মাণ কৌশল অপূর্ব। আমরা বহুক্ষণ এ মন্দিরটি দেখলাম। এ মন্দিরের অভ্যন্তরে এক দেবী মূর্ত্তি দেখলাম। অষ্টভূজা মহিষমর্দিণী দুর্গার মূর্ত্তি। মধ্যভাগে একটি বৃহদাকার হস্তী মূর্ত্তি। এটি পঞ্চম রথ। প্রায় তেরশ' বৎসর পূর্বে পল্লব বংশ প্রবল প্রতাপে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন। এই সকল রথ ও স্থাপত্য শিল্পের নির্মাণ হয় তেরশ' বৎসর পূর্বে। এগুলির নির্মাণ কৌশল এমন সুন্দর এই সুদীর্ঘ কালের পরও সেগুলি কোনরূপ বিকৃত প্রাপ্ত হয় নি।

এরপর ফিরলাম বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে। বাস ষ্ট্যাণ্ডের অনতিদূরে আছে একটি লাইট-হাউস। তারই সন্নিকটে একটি নাতিবৃহৎ পাহাড়ের গাত্রে নির্মিত হয়েছে কয়েকটি হস্তীর আকৃতি। তার উপরিভাগে তপস্যারত অর্জুনের নানা ভঙ্গিমায় বহু-মূর্ত্তি। এর পাশে পাশে অপসরীগণের ও নানাবিধ জীবের মূর্ত্তি। সর্বাপেক্ষা ভাস্কর্যের নিদর্শন সখী-পরিবৃত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির সাহায্যে গোবর্দ্ধন ধারণ। এক হাজার বর্গ ফুটের অধিক স্থান নিয়ে এই মূর্ত্তিগুলি নির্মিত হয়েছে।

আর একটি স্থানে দেখলাম নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ করে সমুদ্র গর্ভ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। ওই বরাহের নামে একটা গুহাও আছে। একটি বেশ বড় কক্ষ আছে ও তার পশ্চাতের দেওয়ালের নিকট একটি কুটীরও আছে। লাইট-হাউসের সম্মুখে আছে সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্ত্তি। আর এক দিকে আছে বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যা মূর্ত্তি। নিকটে একটি গণেশ মন্দিরও দেখলাম। দ্রাবিড় সভ্যতার যুগে এই মহাবলীপুরম্ ছিল পল্লব রাজগণের প্রধান বন্দর। কাঞ্চিপুরম্ ছিল তার রাজধানী। প্রাচীনকালে এই স্থান থেকে বিদেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করে।

এগুলি দেখতে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মাঘের শেষ, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে রবির প্রখরতা কিছুমাত্র কম নয়। তখন বেলা প্রায় বারোটা। সকাল আটটার সময় একটি ইড্‌লি, একখানি বড়া ও এক কাপ চা পান করেছি। যথেষ্ট ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছে। এখন কিছু

আহার ও বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সম্মুখে একটি দোকানে বসলাম। সেটিকে হোটেল বা রেষ্টুরেণ্টও বলা যেতে পারে। কক্ষের বারান্দার সামনে ঝুলছে কয়েক কাঁদি পাকা কলা। এ-দিকে চাঁপা কলার প্রাধান্য অধিক। বারান্দার একদিকে কাচের জারে দেখা যাচ্ছে চিঁড়ে, ডালমুট ও ঐ জাতীয় খাদ্য। কক্ষের মধ্যে কয়েকটি টেবিলে কয়েকজনকে ইড্‌লি, ধোষা ও চা কিংবা কফি খেতে দেখলাম।

গৃহিণী ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন পক্ষীতীর্থ দর্শনের জন্য। এ-দিকে মাদ্রাজ থেকে কোন স্পেশাল বাসেরও দেখা নেই। আমাদের বাসের সহযাত্রীরাও বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কারণ যথাসময়ে তিরুকলি-কুন্দ্রম পাহাড়ে আরোহণ করতে না পারলে পক্ষীর দর্শন দুরাশা।

গৃহিণী বললেন—ও বাসের আশা ছেড়ে দাও। মাদ্রাজ থেকে বাস আসতেও পারে নাও পারে। অন্য কোন বাস এখান থেকে যায় কিনা সংবাদ নাও।

আমাদের বাঙ্গালী যুবক সহযাত্রীগণ সংবাদ আনলেন—মাদ্রাজ থেকে শীঘ্রই বাস আসছে, চিন্তার কারণ নেই।

গৃহিণীকে শান্ত করে সেই দোকানে বসে আমরা একখানি করে ধোষা ও এক কাপ করে কফি খেলাম।

আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হ'ল। বাসের দর্শন নেই। আমাদের সকল সহযাত্রী ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছেন। আমার গৃহিণী অধৈর্য হ'য়ে আমাকে ব্যস্ত করে তুললেন। বাতিঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন আজ কোনরূপেই তিনি পক্ষীতীর্থ দর্শনে যাবেন না। আমাকে প্ররোচিত করলেন মাদ্রাজ যাওয়ার বাসের সংবাদ নিতে।

আরও কিছুক্ষণ পরে সত্যই বহু আকাঙ্খিত বস্তুর দর্শন পেলাম। আমরা বাসে উঠে বসলাম। আনন্দিত হয়ে গৃহিণী বললেন—ঐ দোকানে গিয়ে কিছু কলা নিয়ে এস। দুপুর রোদে জল-পিপাসা পেয়ে গেল।

আমি নিকটবর্ত্তি দোকানে গিয়ে একছড়া কলা কিনে বাসে উঠলাম। আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করে এলেন দু'টি রামভক্ত। সহযাত্রীরা কয়েকটি

কলা তাদের প্রদান করে বিপদমুক্ত হতে পরামর্শ দিলেন। দুর্ভাগ্য, তাঁরা একে একে আমার হস্তস্থিত সমস্ত ফলগুলি আদায় করে নিয়ে আমাকে রেহাই দিয়ে প্রফুল্ল-বদনে চলে গেলেন।

তিরুকলিকুন্দ্রম—পক্ষীতীর্থ

মহাবলীপুরম্ থেকে পক্ষীতীর্থ মাত্র ন'মাইল পথ। আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন একটার সময় তিরুকলিকুন্দ্রম পাহাড়ের সানুদেশে হাজির হলাম। এখন সোপান অতিক্রম করে পাহাড়ে আরোহণ করতে হবে। সোপানের সংখ্যা এখন আমার মনে নেই। মনে হয় দুই শত সোপানের কম নয়। আমার মত বৃদ্ধের পাহাড় আরোহণই অসাধ্য তার উপর দৌড়-ঝাঁপ। বাপরে বাপ! দু' চারটি সিঁড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে।

গৃহিণীকে বললাম—তুমি উপরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি ধীরে-সুস্থে কোনরূপে হাজির হব। তাঁরও প্রতিজ্ঞা আমাকে গাঁটছড়া বেঁধে নিয়ে যাবেন। বক্ষের ফুস্‌ফুসে তখন কামারের যাঁতার কাজ করছে। কোন-রূপে টেনে-হিঁচড়ে উপরে উঠে দেখলাম প্রায় সহস্রাধিক দর্শনেচ্ছুক যাত্রী পাহাড়ের শীর্ষে হাজির হয়েছেন। অনেকে গলায় বায়নাকুলার ঝুলিয়ে ক্যামেরা হাতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। আমরা তাঁদের পার্শ্বে কোনরূপে স্থান সংগ্রহ করে ভগবান বিহঙ্গদেবের দর্শন লাভের প্রত্যাশায় দাঁড়ালাম।

সম্মুখভাগে লক্ষ্য করলাম—এই পাহাড়ের বিশ ত্রিশ ফুট উচ্চ একটি সমতল শৃঙ্গের উপর এক ব্রাহ্মণ পক্ষীর আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন। তাঁর পার্শ্বে একটি তাম্র নির্মিত হাঁড়িতে পক্ষীর আহারের জন্য কি যেন সব রেখেছেন। অন্য একটি পাত্রে কিছু জল। পক্ষীরা নাকি আহারের পর সেই জল পান করবেন কিংবা মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করবেন। এ-দিকে জনতা করেছেন ভারতের সকল প্রদেশের

ভক্তবৃন্দ। কৌতূহল দেখার জন্য বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের আবির্ভাবও কম নয়। আমার পার্শ্বে আর একটি বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী সম্প্রদায়কে দেখলাম। এঁদের মধ্যে দুই তিনজন পুরুষ ও কয়েকটি মহিলা। জানলাম এঁরা রামেশ্বর প্রত্যাগত হয়ে মহাবলীপুরমে আশ্রয় নিয়েছেন। আজ এসেছেন পক্ষীতীর্থ দেখতে।

গৃহিণী আবিষ্কার করলেন এক মধ্য বয়স্কা বাঙ্গালী দম্পতিকে। এঁরা থাকেন মাদ্রাজে। ভদ্রলোক সরকারী কর্মচারী। আজ রবিবার, ছুটির দিন। স্ত্রীর আগ্রহে এসেছেন পক্ষী দেখতে। শুনলাম এঁরা ইতিপূর্বে আরও দু'দিন এসেছিলেন। কিন্তু দর্শন হয় নি। প্রথম দিন এসে শুনলেন তাঁদের পৌঁছনর পূর্বেই পক্ষী দর্শন দিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন। অন্যদিন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন। তাঁদের নিকট আরও শুনলাম পক্ষী প্রত্যহ নিয়মিত আসে না। দর্শন পাওয়া ভাগ্য!

গৃহিণী ভীতি-বিহ্বল নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আজও আসার কোন লক্ষণ দেখছি না।

বললাম—সঠিক আগমণের প্রত্যাশা কারও কাছে করা যায় না। কলের জল, ইলেকট্রিক কারেন্ট, ঠিকে ঝি, ছেলে-মেয়েদের মাষ্টারের আগমণ, জামাই-ষষ্টির দিন জামায়ের, তোমার ভাই ফোঁটার দিন, শালাদের—দুর্গা ঃ দুর্গা ঃ তোমার ভায়েদের যথাদিনে যথাসময়ে আগমণের আশা করা যায় না। জগতে, একমাত্র দেখেছি পঞ্জিকার নির্দেশ মত গ্রহণের দিন যথাসময়ে রাহুর অবির্ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। দেখ, যদি তোমার অদৃষ্টে দর্শন মেলে। আমি নিরস্ত্র অবস্থায় বনে বাঘ দেখতে গেলে, বনের বাঘও অদৃশ্য হয়ে যায়।

দারুণ উৎকণ্ঠায় আরও আধ ঘণ্টা কাটল। এ-সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা ও প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হতে লাগল।

এই পাহাড়ের পুরোভাগে একখানি মাত্র শিলা খণ্ডে নির্মিত এক বিরাট মন্দির। এর নির্মাণ কৌশল ও অধ্যাবসায় দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। আমরা এই মন্দিরটির পাদদেশে পক্ষী দর্শনের অপেক্ষায় ছিলাম। মন্দির

দ্বারে যেতে হলে আরও পঞ্চাশ-ষাটটি সোপান অতিক্রম করে যেতে হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই মন্দিরের শিল্পকলা কিংবা দেবমূর্ত্তি কোন দিকেই প্রায় কাহারও উৎকর্ষণ নেই। মন্দিরের মধ্যে শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠল। গৃহিণী বললেন—মন্দিরের পূজা শেষ হ'ল। এর পরেই মন্দির বন্ধ হবে। তখন আর মন্দিরে দেবমূর্ত্তি দর্শনও ভাগ্যে ঘটবে না! এদিকে পক্ষীরও কোন আশা নেই। চল, মন্দিরে গিয়ে ভগবানের আরতি দেখে আসি। অর্থ ব্যয় করে এতদূর এসেছি দেখ যদি কিছুটা উস্বুল হয়। তাঁর কথা মত সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দির দ্বারে এলাম। গৃহিণী মন্দির মধ্যে গিয়ে নারায়ণ মূর্ত্তির সামনে করযোড়ে দাঁড়ালেন। আমি স্থানটির দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে গেলাম। একদিক স্তরে স্তরে পাহাড়ের ঢেউ অন্যদিকে প্রান্তর। নিকটে কোন গ্রাম বা সহরের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। মন্দিরের শিল্প কৌশল অপূর্ব। অভ্যন্তরে গিয়ে দেখলাম প্রস্তরের সারি সারি স্তম্ভগুলির কি অদ্ভুত কারুকার্য। সম্মুখে সৌম্যমূর্ত্তি বিগ্রহ।

আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু সম্ভব মন্দিরের শোভা দেখে ভগবানের চরণামৃত পান করে আর একবার স্তম্ভগুলি দেখবার ইচ্ছা করলাম। অকস্মাৎ দেখলাম মন্দির মধ্যে যতগুলি ভক্ত ছিলেন তাঁরা দৌড়ে গিয়ে মন্দিরের অলিন্দে কি যেন দেখতে আগ্রহী হলেন। গৃহিণীও সেদিকে গিয়ে আমাকে আহ্বান করে বললেন—শীঘ্র এ-দিকে এস, পাখী এসেছে।

দেখলাম সত্যিই বার্দ্ধক্যে শ্রীহীন অবস্থা প্রাপ্ত একজোড়া চিলের আকারের পক্ষী এসে সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে ঘুরছেন। দর্শকগণ আনন্দে করতালি দিয়ে গগন মুখরিত করছেন। কিন্তু পক্ষীদ্বয়ের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁরা একবার এ-দিকের পাত্রে আর একবার অন্য পাত্রে চঞ্চু দিয়ে কোন বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করলেন কি-না দেখা গেল না। কয়েক সেকেণ্ড পরে তাঁদের গন্তব্যস্থানে উড়ে গেলেন। পক্ষী অদৃশ্য হওয়ার পরেই বিপুল জনতা নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হলেন। এ-দিকে পক্ষীদের আহারদাতা ব্রাহ্মণ তাঁর পাত্রের প্রসাদ এক এক চামচ চার আনা মূল্যে ভক্তদের কাছে বিক্রয় করতে লাগলেন। আমরাও এক চামচ নিলাম। শুনলাম পরমান্ন। কিন্তু এক কণা মুখে দিয়ে দেখলাম এ-বস্তু পক্ষীর খাদ্য বা ভগবানের পূজায়

নির্বিবাদে উৎসর্গ করা যেতে পারে। সাধারণ মানুষের তৃপ্তিদায়ক মোটেই নয়। আমার ক্রীত-প্রসাদ তিল তিল করে বণ্টন করলাম। অনেকে ভক্তিভরে নিলেন। অনেকে দূর থেকে নমস্কার করলেন।

অনেকেই অনেক প্রকার অভিমত প্রকাশ করলেন। বললেন—ঐ পক্ষী এখানেই থাকে। কোন স্থান থেকে উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের এ-স্থানে আনা হয়। ঐ আহার্য বস্তুর সঙ্গে মাদকদ্রব্য মিশ্রিত করে এদের বশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিটি কেবলমাত্র চাতুরী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ভক্তেরা বলেন—ঐ বিহঙ্গদ্বয় লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাঁরা আসেন বারানসী থেকে। এবং এইস্থানে আহার গ্রহণ করেন।

আমি ভক্তও নই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন্তব্যকেও সত্য সিদ্ধান্ত বলে মানতে চাই না। শুধু এইটুকু আমার শ্রদ্ধা-কৌতূহলবশেই হোক আর ভক্তি বিশ্বাসেই হোক যে স্থানের উৎকর্ষণে এতগুলি নর-নারী এই পাহাড়ের শীর্ষে একত্র হয়েছেন, সেই তো পুণ্য তীর্থ। এ রীতি কতদিন প্রবর্তিত হয়েছে তারও কোন হদিস পেলাম না। কেবল দেখলাম শৈল শিখরে একটি মনোরম দেবালয়। আর সেই সীমানায় পক্ষীর আহার গ্রহণ। যেন ঈশ্বরের মহিমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই পক্ষীতীর্থ যে সত্যই পুণ্য তীর্থ এ-বাক্য আমি শ্রদ্ধার সহিত মেনে চলব।

আমরা নিম্নে এসে আমাদের স্পেশাল বাসে উঠলাম। এই বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে দেখলাম অন্যান্য দিন সাধারণের যাতায়াতের জন্য কয়েকখানি বাস বিভিন্ন স্থান থেকে এসে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ফেরার পথে আমাদের বাস মহাবলীপুরম্ না গিয়ে ভিন্ন পথে অগ্রসর হ'ল। অপরাহ্নে একটি বড় হোটেলের সম্মুখে এসে বাস থামল। যাত্রিগণ সকলেই গেলেন সেই হোটেলে আহার গ্রহণে। এখানে অন্নের ব্যবস্থা ছিল। আমরাও চেয়ারে বসে টেবিলের উপর কলাপাতা বিছিয়ে অন্নাহার সমাধা করলাম। মাদ্রাজ বাস ষ্টেশনে ফিরলাম অপরাহ্ণ পাঁচটায়। পরদিন প্রাতে গৃহিণীর আগ্রহে গেলাম তিরুবোত্তিয়ুরের শিব মন্দির দর্শনে। সহরের এক প্রান্তে এই মন্দির। সহর থেকে বাসে, তারপর রেল-লাইন

অতিক্রম করে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পদব্রজে গিয়ে এই মন্দির। অতি প্রাচীন মন্দির। প্রথম দর্শনেই মনে হয় এ যেন কপালেশ্বর মন্দিরের জ্যেষ্ঠ সহোদর। মন্দির সীমানার সম্মুখে বৃহদায়তন গোপুরম্ এবং গোপুরমের পুরোভাগে একটি বৃহৎ সরোবর যেমন দেখেছি কপালেশ্বর মন্দিরে। মন্দিরের অভ্যন্তরে বিগ্রহ এবং বিগ্রহের চতুর্দিকে নানা দেব-দেবীর মন্দির। সমস্তই একই রূপ। একই আকৃতি। গোপুরমের সরোবরটির শোভা নেই, জলও সবুজ বর্ণ। মনে হয় বহুদিন সংস্কার হয় নি। মন্দিরে পূজা দিলাম। যাত্রীর জনতা নেই, মনে হয় সহরের এতদূরে অধিক যাত্রী যাতায়াত করেন না। ধর্মশালায় ফিরলাম মধ্যাহ্ন বারোটায়।

অপরাহ্নে গেলাম ময়লাপুরমে। আর একবার গৌড়ীয় মঠে স্বামিজীদের সঙ্গে সাক্ষাতে। এখানে শুনলাম পার্থ-সারথির মন্দির বিশেষ আকর্ষণীয়। আর এই ময়লাপুরমে আছে সেণ্ট্-টমাস গীর্জা। গীর্জার কারুকার্য ও দেওয়ালের চিত্রাবলী সাধারণের মন আকর্ষণ করে। আরও শুনলাম পর্তুগীজগণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই গীর্জা নির্মাণ করেন। এর বহু পূর্বে সেণ্ট্-টমাস নামে এক ধর্মযাজক এসেছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁর সমাধি হয়। সেই সমাধির উপর এই গীর্জা স্থাপিত হয়। এরপর অনুসন্ধান করে গেলাম ট্রিপলিকেনের পার্থ-সারথি মন্দির দেখতে। এ মন্দির অষ্টম শতাব্দীতে পল্লব রাজগণ প্রতিষ্ঠা করেন। এইস্থানে শুনলাম এরূপ বৃহৎ গীর্জা একটি নয় প্রোটেষ্টাণ্ট্ গীর্জা ও সেণ্ট-মেরীর গীর্জা বিশেষ আকর্ষণীয়।

পরদিন গেলাম প্রাতে জু-গার্ডেন দেখতে। অনুসন্ধান করে জানলাম এলিফেণ্ট গেটের দক্ষিণে একটি ব্রীজ পার হয়ে জু-গার্ডেন। পুলিশ থানার পাশ দিয়ে ব্রীজ অতিক্রম করে এলাম জু-এর প্রাচীরের পার্শ্বে। এখানে জানলাম জু-এর প্রবেশ পথ পূর্বদিকে। অর্থাৎ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগ পরিক্রমা করে যেতে হবে বামভাগে। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল রেল ষ্টেশনের নিকটে। এক ঘণ্টাকাল পরিভ্রমণের পর এলাম জু-এর প্রবেশ দ্বারে। ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমেই দেখলাম নানা জাতীয়

পক্ষাদের পিঞ্জর ভবন। অদূরে একটি টিনের শেডের মধ্যে তিন চারটি হস্তী, একটি হস্তী শাবককেও দেখলাম। গৃহিণীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এল সিংহের একটি ক্ষুদ্র শিশুকে দেখে। জুয়ের কর্মচারীদের চারি আনা পুরস্কার দিয়ে শাবকটিকে একবার ক্রোড়ে নিয়ে তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে অপত্য স্নেহ দেখালেন। আমার নিকটে এসে বললেন—কিছু দিয়ে যদি বাচ্চাটিকে পাওয়া যেত আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে মানুষ করতাম।

বললাম—নিরীহ সিংহ শিশুকে দেখে তোমার স্নেহ যতই উথলে উঠুক কয়েক মাস পরেই তোমাকে পালন-কর্ত্রী বলে শ্রদ্ধা করবে না। নির্বিবাদে তোমার ঘাড়ে কামড় দিয়ে স্নেহের ঋণ পরিশোধ করবে। দুর্দান্ত হিংস্র জানোয়ারের শিশুকে মমতা দিয়ে বশ করা যায় না।

সমস্ত জু-টি পরিভ্রমণ করে ধর্মশালায় ফিরলাম বেলা বারোটায়। আহারের পর গেলাম মিউজিয়াম দেখতে। দ্রাবিড় সভ্যতার চরম নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় এই মিউজিয়মে। একটি উদ্যান সীমানার অন্তর্গত দু'টি ভবনে এই দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি সংরক্ষিত আছে। আমরা প্রথমে প্রবেশ করলাম মৎস্য-বিভাগে। পৃথিবীর যাবতীয় মৎস্য অবিকৃত অবস্থায় এখানে রয়েছে। এর পর কয়েকটি হল পর্যবেক্ষণের পর এলাম দারু-শিল্প কক্ষে। শুনলাম এগুলি সংগ্রহ হয়েছে বহু পুরাতন চোল, পল্লব ও পাণ্ডু বংশের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে। কাঠের দরজা, জানালা, টেবিল, চেয়ার গৃহ-সজ্জার আসবাব প্রভৃতির এমন মনোহর সূক্ষ্ম কাজ আমি ইতিপূর্বে দেখি নি। এলাম অন্য একটি হলে। এ-স্থানে দেখলাম ব্রঞ্জ ও অন্যান্য ধাতু নির্মিত নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি। বিভিন্ন আকৃতির মূর্ত্তিগুলি দেখতে দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে। একটি হলে দেখলাম ধাতু নির্মিত নটরাজের মূর্ত্তি। আট দশ ফুট থেকে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ ধাতু নির্মিত নটরাজের মূর্ত্তি। একটি কৌটার মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে শিল্প কলার বিস্ময়কর নিদর্শন, ছোট্ট একটি চাউলের উপরে নির্মিত অতি সূক্ষ্ম নটরাজ মূর্ত্তি।

এরপর এলাম সে যুগের সেই চোল, পল্লব, পাণ্ডুরাজগণের ব্যবহৃত অস্ত্র

সংরক্ষণ কক্ষে। তীর, ধনু, বর্ষা, তলোয়ার প্রভৃতি নানা আকৃতির অস্ত্র সুসজ্জিত রয়েছে। গৃহিণী বললেন—আজ প্রথমেই এদিকে আসা উচিত ছিল। চার ঘণ্টায় সব দেখে শেষ করতে পারলাম না। আর একদিন এসে দেখে যেতে হবে।

মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে বাসে উঠে গৃহিণী বললেন—এখানে তিনদিন থেকে যাহোক কিছু দেখলাম। এর আশেপাশে কি যেন আছে বাসে গিয়ে দেখে আসতে হবে।

বললাম—কাল কাঞ্চিপুরম্ যেতে পারি। চল, বাস ষ্টেশনে গিয়ে কাঞ্চিপুরম্ যাওয়ার বাসের সংবাদ নিতে হবে।

কাঞ্চিপুরম্ যাওয়ার জন্য বাসের সংবাদ নিলাম। বাসের বুকিং অফিসে পরামর্শ দিলেন সরকারী বাস অতি স্বল্প পরিমাণে কাঞ্চিপুরম্ যায়। আপনারা নিকটে বাস ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে প্রাইভেট বাসে কাঞ্চিপুরম্ যাবেন। প্রাতে ছয়টা থেকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বাস কাঞ্চিপুরম্ যায়। সেই বাসেই আপনাদের যাতায়াতের সুবিধা হবে।

প্রাইভেট বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে জানলাম সকাল থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত কাঞ্চিপুরমের বাস যাতায়াত করে। যে কোন সময় কাঞ্চিপুরম্ যেতে কোন অসুবিধা নেই।

পরদিন প্রাতে কাঞ্চিপুরম্ যাওয়ার উদ্দেশে প্রস্তুত হলাম। ধর্মশালা থেকে দু' ফার্লং দূরে বে-সরকারী বাস ষ্ট্যাণ্ড। আমরা বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছান মাত্র কাঞ্চিপুরমের বাস পেলাম।

বাস সহর ত্যাগ করে চলেছে। ঘন তরু-পল্লবে আচ্ছাদিত সুন্দর পথ। মধ্যে মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র পল্লী। কিছুদূরে এসে দেখতে পেলাম কয়েকটি গোপুরম্‌সহ একটি ছোট সহর। গৃহিণী বললেন—কাঞ্চিপুরম্ এসে গেছি। আমার পাশে বসেছিলেন এক স্থানীয় ভদ্রলোক। তিনি বললেন—কাঞ্চি-পুরম্ আরও কিছু দূরে। এ-স্থানের নাম শ্রীপেরুমবুত্তুর। বৈষ্ণব ধর্মাচার্য শ্রীরামানুজের জন্মস্থান। বড় তীর্থস্থান। দেখে যান শ্রীপেরুমবুত্তুর। গৃহিণী শুনে বললেন—বাস থেকে নেমে চল। রামানুজের জন্মস্থান দেখে যাই।

বললাম—এখন নামা সম্ভব নয়। আমরা কাঞ্চিপুরমের টিকিট নিয়েছি। সম্ভব হলে ফেরার পথে দেখে যাব।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রবেশ করলাম কাঞ্চিপুরমে। প্রধান পথের পার্শ্বেই দেখলাম কয়েকটি দেবালয়। পথের উভয় পার্শ্বের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বাসভবনগুলি টালি-খোলায় আচ্ছাদিত। এগুলি দেখলে মনে হয় বাড়ীগুলি যেন এক পরিবারভুক্ত। কয়েকটি বৃহৎ দেবালয়, বাসভবন, দোকান ও বাজার প্রভৃতি অতিক্রম করে এলাম সহরের পশ্চিম প্রান্তে বাস ষ্ট্যাণ্ডে।

কাঞ্চিপুরম্

বাস থেকে নেমে দেখলাম চতুর্দিকে দীর্ঘ গোপুরম্গুলি শির উন্নত করে এটিকে মন্দির প্রধান নগরী ঘোষণা করছে। পর্যায়ক্রমে পল্লব, চোল ও বিজয়নগরের হিন্দু রাজাগণের রাজধানী ছিল এই কাঞ্চিপুরম্। এই মন্দির নগরী স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের পর্যায়ক্রমিক উন্নতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। শুনেছি ভারতের সাতটি প্রধান তীর্থ স্থানের মধ্যে কাঞ্চিপুরম্ অন্যতম মোক্ষদায়িকা শ্রেষ্ঠ পুরী। পুরাণে উল্লেখ আছে—

“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চিরবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥”

একদা এ-স্থান ছিল একটি প্রাচীন দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানী ও শিক্ষাকেন্দ্র। বহু মণীষী এ-স্থানে অধ্যাপনা ও বসবাস করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন দেশ-বিখ্যাত মণীষীর নাম আমি শুনেছি। তাঁরা হলেন—শঙ্করাচার্য্য, আপ্পার পিরুথেনডর, বিখ্যাত পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধিধর্ম প্রভৃতি। স্থানীয় জনগণের মতে অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা বিখ্যাত চানক্যের জন্ম হয় এই স্বর্ণনগরী কাঞ্চিপুরমে। আজ এসেছি এই পবিত্র তীর্থস্থানে। আনন্দিত মনে

নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলাম।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সম্মুখে কয়েকটি হোটেল। মন্দিরাদি দর্শনের পর আমাদের আহারের আবশ্যকে একটি হোটেলে ব্যবস্থার উদ্দেশে সেদিকে অগ্রসর হওয়ামাত্র গৃহিণী বললেন—ওদিকে কোথায় যাবে?

বললাম—সামনে হোটেল দেখছি। মন্দিরগুলি দেখতে বিলম্ব হতে পারে। তখন হয়তো ভাগ্যে কিছুই জুটবে না। সে কারণে কিছু অগ্রিম দিয়ে ব্যবস্থা করে যাই।

গৃহিণী বললেন—তুমি হোটেলে খেতে পার। আমার কিছু খাওয়া চলবে না। আজ শ্রীপঞ্চমী। কিছু ফল, মিষ্টান্ন নিলেই হবে।

এত আনন্দ ও আগ্রহ সত্বেও যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। মনে পড়ল দেশের কথা। স্মরণে এল বাঙ্‌লার স্মৃতি। বাঙ্‌লার শ্রীপঞ্চমীর মত উৎসব সারা ভারতের আর কোনও স্থানে হয় না। শিশু, নারী ও পুরুষ সারাদিন কর্মব্যস্ত। সন্ধ্যার পর পূজামণ্ডপে ও নানাস্থানে সঙ্গীতের আসর। পথে-ঘাটে ক্লাব-বিদ্যালয় আনন্দ মুখরিত। সেই বাঙ্‌লার অধম সন্তান আমি আজ বেরিয়েছি তীর্থ পথে। গৃহিণীকে বললাম—পথে বেরিয়ে সবই বিস্মৃত হয়েছি। আহার ব্যবস্থা ফল, মিষ্টান্ন হবে। চল মন্দিরের দিকে যাই।

কাঞ্চিপুরমের পশ্চিম প্রান্তে বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে লিঙ্গমূর্ত্তির প্রাধান্য থাকায় এ-দিকটি শিবকাঞ্চি নামে খ্যাত। মধ্যে কামাক্ষী দেবীর মন্দির এবং পূর্ব প্রান্তে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি অবস্থিত থাকায় এ-প্রান্ত বিষ্ণুকাঞ্চি নামে প্রসিদ্ধ। আমরা প্রথমে একটি দেবালয়ের দিকে গেলাম। মন্দির সীমানার সম্মুখে বিশালকায় আটতলা গোপুরমটি দেখলাম। এর উচ্চতা প্রায় দুই শত ফিট। গোপুরমটি কিছুক্ষণ দেখার পর মূল মন্দির দ্বারে এলাম। এ-বিগ্রহের নাম একম্বর নাথ। বহু স্তম্ভবিশিষ্ট নাট মন্দির। বিপুল আকারের এই পৃথ্বিলিঙ্গটি অতি প্রাচীন। শুনলাম পৃথ্বিলিঙ্গটি দক্ষিণ ভারতের পঞ্চ লিঙ্গমের অন্যতম। অন্য চারটি—তিরুবন্নমালাইএর জ্যোতির্লিঙ্গম্, জম্বুকেশ্বরের অপ্পুলিঙ্গম, কালহস্তীর বায়ুলিঙ্গম্ এবং চিদম্বরমের আকাশলিঙ্গম্।

এরপর দ্বিতীয় মন্দিরে এলাম। এ-বিগ্রহের নাম ভরদ্বাজ স্বামী। মন্দির সম্মুখে ঘোড়সওয়ার আকৃতির নানা কারুকার্যপূর্ণ এক সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট নাট মন্দির। মন্দির মধ্যে বিগ্রহের অঙ্গে নানা মণিমাণিক্যের জন্য বিখ্যাত। শুনলাম রথযাত্রা ও গরুড় উৎসব বেশ জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে থাকে।

এই স্থানে আর একটি মন্দিরে এলাম। এ-মন্দিরের বিগ্রহের নাম কৈলাসনাথ। মন্দিরের পুরোহিত একটি বিশ ফুট দীর্ঘ যষ্টিতে একটি মশাল প্রজ্বলিত করে আমাদের বিগ্রহ দেখালেন। এমন বিরাট মূর্ত্তি ইতিপূর্বে দেখি নি। যেন একটি পাথর খোদাই করে মন্দির ও বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। বিগ্রহের ললাটে শোভিত হীরকরাজি মশালের আলোকে ঝলমল করে উঠল।

সহরের মধ্যভাগে এলাম কামাক্ষী দেবীর মন্দির দর্শনে। মন্দির সীমানার পুরোভাগে বিরাট গোপুরম্। গোপুরম্ অতিক্রম করে মন্দির প্রাঙ্গণে এলাম। প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র সরোবর। তন্মধ্যে নানাজাতীয় মৎস্য বিচরণ করতে দেখলাম। এরপর ধীরে ধীরে গেলাম মূল মন্দিরের দ্বারে। মন্দির মধ্যে কামাক্ষী দেবীর মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে গেলাম। যেমন ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি তেমনই নানা রত্ন আভরণে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। মূল মন্দিরের সম্মুখে কি বিচিত্র কারুকার্যপূর্ণ নাট মন্দির। তদোপরি মূল মন্দিরের চতুস্পার্শ্বে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলির অবর্ণনীয় শিল্প প্রতিভায় উদ্ভাসিত। এ সকল এক নিমেষে দর্শনের বস্তু নয়। ধীরভাবে প্রতিটি দেব-দেবীর মূর্ত্তি, নাট মন্দিরের শিল্পকলা সর্বোপরি দেবী মূর্ত্তি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে দেখতে হয়।

কথিত আছে এই কামাক্ষী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে তর্কে পরাস্ত করে হিন্দুধর্মের পুনরুদ্দীপনা জাগিয়েছিলেন। মন্দিরে পূজাদির পর সেই মন্দির প্রাঙ্গণের একমুষ্টি ধূলি মস্তকে দিলাম।

বলা বাহুল্য, প্রতি মন্দিরে গেলাম কিছু পুষ্প ও পূজার উপকরণ

নিয়ে। উপকরণের বস্তু একটি নারিকেল, দুই চারিটি কলা, কর্পূর ও ধূপ। কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে উপকরণগুলির সঙ্গে ছিল অধিকন্তু একটি ঘৃতের প্রদীপ।

গৃহিণী বললেন—ধর্মশালার বুড়ি বলেছে একদিকে আছে শিব কাঞ্চি আর একদিকে আছে বিষ্ণু কাঞ্চি। এদিকে শিব কাঞ্চি দেখলাম। বিষ্ণু কাঞ্চির দিকে চল।

একটি ঝটকাওয়ালাকে ডেকে বিষ্ণু কাঞ্চি যাওয়ার প্রস্তাব করলাম। তিনি দাবী করলেন যাতায়াত তিন টাকা। এক স্থানীয় ভদ্রলোকের পরামর্শে বাসে গেলাম। ভাড়া লেগেছিল প্রতিজনের জন্য ন' পয়সা অর্থাৎ দু'জনের যাতায়াত মোট ছয় আনা।

বাসে উঠে গৃহিণী বললেন—এই সামান্য পথের জন্য বাসও আবশ্যক ছিল না। অনায়াসে হেঁটে চলে আসতাম। পথের দু'পাশে 'কাঞ্চিপুরম্' শাড়ীর দোকান, সেগুলিও দেখতে পেতাম। খাস কাঞ্চিপুরমের শাড়ী দু'একখানা নিতেই হবে।

বললাম—কলকাতায় কিছুরই অভাব নেই। রামকানাই যামিনীরঞ্জন পালের দোকানে যথেষ্ট ষ্টক আছে। এখান থেকে মালের ওজন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই।

গৃহিণী বললেন—ওদের দোকানে ধনেখালি, শান্তিপুর থেকে বেনারসী, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী সবই পাওয়া যায় জানি। তা বলে কাঞ্চিপুরমে এসে শুধু হাতে যাব না।

আমরা বিষ্ণু কাঞ্চিতে এসে হাজির হলাম। বাস থেকে নামা মাত্র এক মধ্য বয়স্ক পাণ্ডা আমাদের সাহায্যার্থে এসে হাজির হলেন। আমরা তাঁকে সঙ্গে নিতে অস্বীকৃত হলাম না। কারণ আমাদের একজন গাইড আবশ্যক ছিল।

পাণ্ডা বা গাইডের সঙ্গে যথাবিধি পূজার উপকরণ ও পুষ্প হাতে নিয়ে দেবালয়ের ফটকে এলাম। এ মন্দিরে তিনটি প্রাচীন বিগ্রহ থাকায় পৃথক পৃথক তিনটি পূজার ডালি নিলাম। বিশাল গোপুরম্ অতিক্রম করে এলাম নৃসিংহ মন্দিরের দ্বারে। তারপর এলাম চতুর্ভুজ নারায়ণ

মন্দিরে। এ-স্থানে লক্ষ্মী ও নারায়ণের স্বতন্ত্র মন্দির।

সম্মুখে নারায়ণ মূর্ত্তি দেখে তন্ময় হয়ে গেলাম। নানাবিধ রত্নালঙ্কার ও হীরকশোভিত মুকুট আভরণে কাল অঙ্গের কি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। এ-স্থানে পূজা সমাধা করে এলাম লক্ষ্মী মন্দিরে। লক্ষ্মী দেবীর মন্দির দ্বারে এসে দেবী মূর্ত্তি ও তাঁর অঙ্গের হীরক-খচিত রত্নালঙ্কার দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ মন্দির দ্বার থেকে দেবীর দিকে স্তব্ধ হয়ে নিরীক্ষণ করলাম। তারপর পূজাদি সমাধা করে বাইরে এলাম।

মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গৃহিণী বললেন—মা লক্ষ্মীর হীরের নাক ছাবিটি দেখলে? যেন নক্ষত্র জ্বলছে। আর আমাদের এ-প্রদেশের লোকের নিকট ভাষার ব্যবধানে অনেক সময় সাহায্য পাওয়া যায় না। রেল্ল-কুলি, ট্যাক্সি-চালক বা শকট-চালক পর্যন্ত অনেক স্থানে বাঙলা দূরে থাক হিন্দিতেও বাক্যালাপে অক্ষম। কিন্তু সেই স্থানেই মন্দিরের পুরোহিত কিংবা পাণ্ডাকে দেখেছি সকল রকম ভাষা কিছু কিছু আয়ত্তে রেখেছেন। এই স্থানে আমাদের সাহায্যকারী পাণ্ডা মশায় কিছু কিছু বাঙলা ভাষা আয়ত্ত করেছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি সেদিকে খেয়াল করি নি। হঠাৎ দেখলাম গৃহিণী তাঁর নিকট অনুসন্ধান নিচ্ছেন কোন দোকানে ভাল ও সুবিধা দরে শাড়ী পাওয়া যায়।

পাণ্ডা মশায় বললেন—এখানে সব দোকানেই শাড়ী পাবেন। তবে আমার মতে আপনারা মাদ্রাজের বাজারে শাড়ীর সন্ধান নেবেন। সকল প্রকার শাড়ীর ষ্টক মাদ্রাজেই দেখতে পাবেন। দামও সুবিধা।

আমি আনন্দিত হয়ে আমার উপকারী বন্ধু বা পাণ্ডাকে নগদ এক মুদ্রা পারিশ্রমিক দিয়ে নমস্কার করলাম।

বাসেই ফিরলাম শিব কাঞ্চিতে। বেলা তখন বারোটা উত্তীর্ণ প্রায়। ফল, মিষ্টান্ন মধ্যাহ্নের আহার হবে। ফলের মধ্যে পূজার প্রসাদ কলা আমাদের সঙ্গে ছিল কয়েকটি লেবু ও আপেল নিলাম। এরপর গেলাম মিষ্টান্নের সন্ধানে। যেদিকে তাকাই মিষ্টান্ন শূন্য জগৎ দেখি। প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল পথ অনুসন্ধানের পর একটি দোকানে সন্ধান পেলাম প্রিয়

বস্তু শোন-পাপড়ী দেখে দু'জনের জন্য এক টাকায় দু'শোগ্রাম কিনে ফেললাম।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের পাশে একটি বেঞ্চে নিশ্চিন্তে বসলাম। গৃহিণী ফলগুলি কেটে আমাকে দিলেন ও নিজে কিছু নিলেন। তারপর আমার আনীত শোন-পাপড়ী মিষ্টান্ন গৃহিণী মুখে দিয়ে বললেন—হ্যাঁ-গো, এ কি কাঠের তৈরী? এ-বস্তু খাওয়া আমার দ্বারা হবে না।

আমি বিলক্ষণ জানি ক্ষুধার সময় গৃহিণী সামান্য কারণেই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েন। আমার আনীত দ্রব্য তাঁর মনোমত না হওয়ায় হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। অনুমান করেছেন সস্তায় অখাদ্য এনে তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করেছি। সেই অনুমানে আমি পরীক্ষার জন্য শোন-পাপড়ীতে কামড় দিলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমার কৃত্রিম দন্ত পরাস্ত মানলেন। এ-বস্তুটির কিছুটা মুখ-গহ্বরে দিয়ে সকল প্রকার চেষ্টা করেও মিষ্টতার কোন হদিস পেলাম না।

গৃহিণী বললেন—নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থেকো না। কি যেন সহরটির নাম সেখানে ঠাকুর রামানুজ আছেন, সেই মন্দির দেখতেই হবে। কোন বাস যাবে জেনে নাও।

বললাম—কাঞ্চিপুরম্ মাদ্রাজের পথেই পড়ে পেরুমবুদুর জানবার কি আছে?

উনি বললেন—কোন বাস কোন দিকে যাবে তুমি কি সব জান? যে কোন বাসে উঠে শেষে কোন দিকে গিয়ে হাজির হবে।

অনাবশ্যক সাবধানতার আদেশে বিরক্ত মনে বাসের দিকে গেলাম। কয়েকখানি বাস, ষ্ট্যাণ্ডে ছিল। সেই বাসের ড্রাইভার, কন্ডাক্টরদের প্রশ্ন করতে পেরুমবুদুরের কোন ঠিকানা পেলাম না। তাঁরা যেন এরূপ কোন স্থানের নাম পর্যন্ত জানেন না। অগত্যা বাস অফিসে গিয়ে অফিসের বাবুদের নিকট পেরুমবুদুর যাওয়ার জন্য বাসের সংবাদ নিতে গেলাম। এ-স্থানেও একই অবস্থা। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর তাঁরা আমার গন্তব্য স্থানের বিষয় অবগত হয়ে বললেন—আঃ! শ্রীপেরুমবুদুর। আধ ঘণ্টা পরে বাস মিলবে। আমার পেরুমবুদুরের প্রথমে "শ্রী" বাক্যটি

ব্যবহার না করায় এই সমস্যা ঘটেছিল। আরও দেখলাম এঁরা শ্রীপেরু-মবুত্থুর বাক্যটির উচ্চারণ করছেন যা আমার কর্ণে আসছে শ্রীপেরুমুন্দুর। আমি বললাম—ষ্ট্যাণ্ডে কয়েকখানি বাস আছে। শুনলাম সেগুলি মাদ্রাজ যাবে। ঐ বাসেই তো আমরা শ্রীপেরুমবুত্থুর যেতে পারি।

তাঁরা বললেন—ও বাস মাদ্রাজ যাবে কিন্তু ভিন্ন পথে। শ্রীপেরুমবুত্থুরের বাস কিছুক্ষণের মধ্যেই পাবেন।

এখন গৃহিণীর সতর্কতার জন্য তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। নিজের নিবুদ্ধিতা প্রকাশ না করে গৃহিণীকে বললাম—তুমি অতি ব্যস্ত কর। বলছি মাদ্রাজের বাসের কিছু বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে তুমি জরদা দিয়ে গোটা দুই পান খেয়ে এস।

শ্রীপেরুমবুত্থুর

কিছুক্ষণ পরে বাস পেলাম। শ্রীপেরুমবুত্থুর বাক্যটি স্পষ্ট উচ্চারণ করাতে বাসের টিকিট ক্রয়ে আর কোন অসুবিধা হয় নি। এখন দেখলাম বাস পথের পার্শ্বে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে যে সকল দেবালয় আছে ওই গ্রাম্য প্রাচীন দেবালয়ের সহিত ছোট বড় গোপুরম্ দেখা যাচ্ছে। বেলা প্রায় আড়াইটায় শ্রীপেরুমবুত্থুর নামলাম।

বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে গোপুরমগুলি স্পষ্ট দেখা গেলেও মন্দির দ্বারে যেতে হয় অনেকখানি পথ ঘুরে। মন্দির সীমানার ফটকে এসে দেখলাম ফটকের পার্শ্বে দুই-চারিখানি পূজার উপকরণের ও ফুলের দোকান। ফটকের অনতিদূরে কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক একটি তক্তপোষের উপর বসে রাজনীতি চর্চ্চা করছিলেন। আমি তাঁদের ভাষা না জানা সত্ত্বেও তাঁদের বাক্যের মর্ম অনুধাবন করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করলাম না। এঁদের নিকট জ্ঞাত হলাম, মধ্যাহ্নে মন্দির দ্বার রুদ্ধ হয়েছে পুনরায় দ্বার উন্মোচন হবে বেলা চারটায়। প্রায় সকল দেবালয়ের ইহাই নিয়ম। বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রদেশের মন্দিরগুলির কড়া আইন।

অগত্যা আমরা দেবালয়ের ফটকের পার্শ্বে একটি দোকানে এসে বসলাম। দোকানদার দু'টি যুবতী মহিলা। মনে হয় দোকান মালিক মধ্যাহ্নে স্নান আহারের জন্য গৃহে গেছেন এবং বাটীর মেয়ে দু'টিকে পাঠিয়েছেন দোকান তত্ত্বাবধানের জন্য। গৃহিণী বাঙ্গলা ভাষায় কি যেন তাঁদের প্রশ্ন করলেন। তাঁরা যে কি ভাষায় উত্তর দিলেন আমাদের আদৌ বোধগম্য হ'ল না। ক্ষণপরে জানতে পারলাম তাঁরা শিক্ষিত। বোধহয় কলেজের ছাত্রী কিংবা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। এরপর এঁদের সঙ্গে ইংরাজীতে বাক্যালাপে কোন অসুবিধা হয় নি। তাঁদেরই একজন আমাদের উপকারার্থে পুরোহিতকে সংবাদ দিয়ে এলেন। আমরা যতক্ষণ মন্দির সীমানায় ছিলাম তিনি আমাদের গাইড্ রূপে কাজ করেছিলেন।

সুবৃহৎ গোপুরম্ অতিক্রম করে নাট মন্দিরে এলাম। নানা কারুকার্যপূর্ণ রজত-নির্মিত বৃহৎ মন্দির দ্বার। সেই রজত দ্বারের সঙ্গে আবদ্ধ শত শত রৌপ্য-নির্মিত ঘণ্টা-দ্বার খোলামাত্র ঘণ্টাগুলি এক বিচিত্র ধ্বনিতে মন্দির দ্বার উন্মোচন জ্ঞাপন করে দিলে। আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলাম। অতি শীতল মন্দির অভ্যন্তর। একটি বৃহৎ ঘৃতের প্রদীপ মন্দির আলোকিত করেছে। সম্মুখে দেখলাম পরম বৈষ্ণব রামানুজের মূর্ত্তি। পার্শ্বে নারায়ণ শিলা, লক্ষ্মী ও আরও নাম না জানা বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখলাম। পুরোহিত আমাদের নিকট থেকে পূজার উপকরণ ও পুষ্প মাল্য নিয়ে পূজায় বসলেন। পূজার উপকরণ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে প্রায় একই প্রকার। অর্থাৎ একটি নারিকেল, কয়েকটি কলা, কর্পূর, এবং ধূপ ও কোন কোন স্থানে থাকে ঘৃতের প্রদীপ ও সিঁদূর।

পূজার পর সকলে মন্দিরের বাইরে এলাম। যুবতী গাইডটি আমাদের নিয়ে এলেন একটি সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট নাট মন্দিরে। এই পবিত্র স্থানটি ঠাকুর রামানন্দের জন্মস্থান। এই কারণে তাঁর জন্ম উৎসবে এই স্থানে পূজা, হোম ও সঙ্গীতাদি হয়ে থাকে। সে সময় বহু লোক সমাগম হয়ে থাকে। আমরা বিশ্রামের ইচ্ছায় নাট মন্দিরের এক প্রান্তে বসলাম। গাইড মহিলা মন্দির সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী আমাদের শোনালেন। কোন সময় কোন রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বহু ধন-রত্নসহ এ-স্থানে এসে মন্দিরে দান

করেছেন। এক রাণী এই মন্দিরে এসে পুত্র কামনা করেছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ায় কয়েক মণ স্বর্ণ দান করে গেছেন।
এই সময় আমাদের দৃষ্টি পড়ল একটি নিদ্রিতা মহিলার উপর। নাট-মন্দিরের একদিকে একটি তোয়ালে বিস্তার করে একটি ছোট ব্যাগ মস্তকের উপাধান করে নিদ্রামগ্না। নিদ্রিতা মহিলার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে আমাদের গাইড বললেন—উনি একজন মন্দিরের যাত্রী। আজ প্রাতে এসেছেন। পূজার পর এখানে বিশ্রাম করছেন। মনে হয় ভদ্র-মহিলা বম্বেওয়ালী।
আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে ভদ্রমহিলা এস্ত হয়ে উঠে বসলেন। আমাদের প্রশ্ন করলেন—আপনারা কি বাঙ্গালী ?
গৃহিণীকে বললাম—মনে হয় ভদ্রমহিলা অসুস্থ। নিকটে গিয়ে সংবাদ নাও তো।
গৃহিণী তাঁর নিকটে যাওয়ার পূর্বেই তিনি তোয়ালের ধূলা ঝেড়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে আমাদের নিকটে এলেন।
আমি তাঁকে বললাম—আপনাকে দেখে ও কথা শুনে বাঙ্গালী বলে মনে হয়। অপনি কি অসুস্থ ?
মহিলা হেসে বললেন না না, আমি বেশ সুস্থ দেহেই আছি। সকালে মাদ্রাজ থেকে রামানুজ মন্দির দেখতে এসেছিলাম। বড় রৌদ্র। এ জায়গাটি বেশ ঠাণ্ডা দেখে শুয়ে পড়লাম। আপনারা বোধহয় মাদ্রাজ যাবেন ? চলুন, আমিও মাদ্রাজ যাব।
আমাদের গাইড, মহিলাকে বম্বেওয়ালী অনুমান করেছিলেন। অনুমান অন্যায় নয়। আকৃতি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব। তনু ক্ষীণ, কিন্তু কৃশাঙ্গী নয়। গায়ের বর্ণ চম্পক কুসুম সদৃশ। মস্তকে ভ্রমর-কৃষ্ণ কুন্তলভার। সহসা দেখলে বম্বের পার্শী মহিলা ভ্রম হয়। গাইডকে বিদায় দিয়ে সকলে এলাম বাস ষ্ট্যাণ্ডে। বাসের বিলম্ব দেখে সকলে একটি চায়ের দোকানে বসলাম। এ-স্থানে দোকানে দেখলাম প্যাড়া জাতীয় মিষ্টান্ন আলমারিতে সজ্জিত রয়েছে। দোকানদারের নিকট জানলাম তিনি গুজরাটি ব্রাহ্মণ। আলমারীর বস্তুগুলি তাঁর নিজ হস্তে প্রস্তুত মিষ্টান্ন। প্রতারিত হবার

ভয়ে এক টুকরা নমুনা মুখে দিয়ে দেখলাম, অখাদ্য নয়। দেড়-টাকার মিষ্টান্ন ও তিন কাপ চায়ের আদেশ করলাম।

গৃহিণী ও মহিলাটি দোকানের একটি বেঞ্চে গিয়ে বসলেন। আমি কিছু দূরে একটি স্বতন্ত্র চেয়ারে বসে চা ও মিষ্টান্ন খেলাম।

হাত মুখ ধুয়ে দোকানের মিষ্টান্ন ও চায়ের মূল্য দিতে গিয়ে অপ্রস্তুত হলাম। দোকানদার বললেন—মাইজী দাম মিটিয়ে দিয়েছেন।

গৃহিণী আমার নিকটে এসে বললেন—দোকানের দাম মিটিয়ে দাও।

বললাম—আমি দিতে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে ভদ্রমহিলা আমাদের সকলের দাম মিটিয়ে দিয়েছেন।

উনি বললেন—আমাদের পয়সা হিসেব করে ওঁর হাতে দিয়ে দাও।

বললাম—অভদ্রতা হয়। ওঁকে অপমান করা হয়।

মাদ্রাজগামী বাস এসে হাজির হ'ল। সকলে বাসে উঠলাম। আমরা উভয়ে বাসের সামনের দু'টি খালি সীটে বসলাম। ভদ্রমহিলা এ-দিকে স্থান না পাওয়ায় পিছনের দিকে গিয়ে বসলেন। বাস কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কনডাকটর আমাদের নিকটে এসে দু'খানি ভাড়ার রসিদ আমাদের হাতে দিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করলাম—মাদ্রাজের ভাড়া কত?

কনডাকটর ইংরাজীতে বললেন—এক টাকা ত্রিশ পয়সা। আপনার মেয়ে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন।

গৃহিণী অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণে আতঙ্কিত হয়ে বললেন—ভাড়ার পয়সা, চা-মিষ্টির দাম হিসেব করে দিয়ে দাও। তীর্থে এসে কারও পয়সা নিতে নেই।

বললাম—বাস থেকে নেমে দিয়ে দিলেই হবে।

উনি বললেন-ও সহজ মেয়ে নয়। উজ্জয়িনী রেবার উপরে যায়। আমি ওর সব খবর জেনেছি।

বললাম—নাম-ধাম সব জেনে ফেলেছ?

গৃহিণী বললেন—নামটা এখনও জানি না। এসেছে কলকাতা থেকে। কোথায় যাবে তারও কোন স্থিরতা নেই। ওর স্বামী দু'বছর আগে কোদাই কানাল বেড়াতে আসে। তারপর সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় ঘুরছে

কোন ঠিকানা নেই। ও নাকি এসেছে তারই সন্ধানে। কার সন্ধানে এসেছে ওই জানে। ও-সব মেয়ে কি সত্যি কিছু বলবে?
মাদ্রাজ বাস ষ্টেশনে পৌঁছলাম। এটি ছিল রাজ্য সরকারের বাস। আমরা সকলেই নামলাম। মহিলা প্রশ্ন করলেন—আপনারা কোথায় রয়েছেন?

আমি ধর্মশালার নাম ও রাস্তার ঠিকানা বললাম। মহিলাকে প্রশ্ন করলাম—আপনি এখানে কোথায় উঠেছেন?
তিনি বললেন—আমি এসেছি নেতাজী সুভাষ রোডে। বলেই ত্রস্তপদে অগ্রসর হলেন।
গৃহিণী মহিলার শাড়ীর অঞ্চল টেনে ধরে বললেন··আমাদের জন্য চায়ের দোকানে আর বাস ভাড়া যা লেগেছে সেটা নিয়ে যাও। তীর্থে এসে কারও পয়সা নিতে নেই।
মহিলা গৃহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্য বদনে বললেন—নিশ্চয়, আমি সব হিসেব করে নেব। এখানে নয়, আপনাদের ধর্মশালায় গিয়ে। কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা ক্ষিপ্র গতিতে অন্তর্ধান হলেন।
গৃহিণী বললেন—আপদ, চেংড়া বয়সে স্বামী খুঁজতে বেরিয়েছেন। কলকাতায় কি জোটে নি?
বললাম—তুমি সঠিক সমস্ত না জেনে এমন বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ কর কেন? একটা ভুল হয়ে গেল মেয়েটি কোথায় থাকে জানা গেল না তো? গৃহিণী রুষ্ট হয়ে বললেন—পিছনে পিছনে গিয়ে দেখে এলেই পারতে। তাড়াতাড়ি চল, কাপড়-চোপড় ছেড়ে সরস্বতীর ভোগ রাঁধতে হবে।
বললাম—সরস্বতীর ভোগ কিসে হবে?
বললেন—একটু খিচুড়ী রেধে মায়ের ভোগ দিতে হবে। তুমি কালকের জন্য একটু দই আনবে। চিঁড়ে সঙ্গে আছে। কাল আমার গরম কিছু খাওয়া চলবে না।
ধর্মশালায় এসে যতদূর সম্ভব পবিত্রতা রক্ষা করে ভোগের ব্যবস্থা হতে লাগল। বেগুন ভাজা ও কপির তরকারী করে ডেকচিতে জল চাপিয়ে আদেশ করলেন·আমি একবার নীচে থেকে আসি। তুমি

আধ গ্লাস চাল, আর আধ গ্লাস ডাল ধুয়ে ডেকচিতে দাও। নিদ্রা দিও না যেন। আমি এখনই আসছি।

কিছুক্ষণ পরে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। গ্লাসটি হাতে নিয়ে চাল ও ডাল মাপ করে দিলাম। মনে মনে হিসাব করলাম, আধ গ্লাস চাল ও আধ গ্লাস ডালে একজনের হওয়াই সম্ভব নয়, ডাল গলে জল হয়ে যাবে। কেবলমাত্র চালের সারাংশ যা থাকবে তাতে দু'জনের ক্ষুধা নিবৃত্তি কোনরূপেই সম্ভব নয়। সারাদিন প্রায় অভুক্ত। এখন রন্ধন করেও সেই অবস্থা হবে। আমি আরও এক গ্লাস চাল আর এক গ্লাস ডাল ধুয়ে ডেকচিতে দিয়ে সমস্যার সমাধান করলাম।

কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী এসে ডেকচির অন্ন পরীক্ষা করতে গিয়ে বললেন—কত ডাল-চাল দিয়েছ ?

বললাম—যা বলে গিয়েছিলে ঠিক তাই দিয়েছি।

তিনি বললেন—বেশ করেছ। আমার কথা মনে ছিল না, কিংবা মনে ধরে নি। আমার জন্য রেখে যা থাকবে তোমাকে খেতে হবে।

হঠাৎ দ্বারে খটাখট শব্দ পেলাম। গৃহিণী বললেন—দেখ তো কে এসেছে ? দ্বার খুলে দেখলাম পেরুমবুদুরের সেই যুবতী। সদ্যস্নান করে আলুলায়িত কুন্তল পৃষ্ঠদেশে বিস্তার করে একখানি বাসন্তী রঙের রেশমী বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাসতে হাসতে সামনে দাঁড়ালেন।

গৃহিণী হেসে বললেন—এ যে মা সরস্বতী এলেন !

দেখলাম গৃহিণীর সম্ভাষণের যুক্তি আছে। যুবতীর আকৃতি, তনুশ্রী ও বেশভূষায় যেন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা।

যুবতী সহাস্য বদনে গৃহিণীর পাশে বসে বললেন—কাকীমা, আজ খিচুড়ী করছেন ? আমিও খাব।

আমি বললাম—কৃপা করে মা সরস্বতী এসেছেন আমাদের ঘরে। আমি যে মনে মনে তাঁকে আহ্বান করেছি।

মহিলা বললেন—আমাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বিদায় করতে পারবেন না।

গৃহিণী বললেন—না-না, তোমাকে অভুক্ত রেখে আমরা কি মুখে দিতে পারি ? তুমি যে আজকের দিনে এসেছ আমাদের আনন্দময়ী মা হয়ে।

আমরা সকলে এক সঙ্গেই আহারে বসলাম।

গৃহিণী বললেন—আমরা নানাস্থানে ঘুরে এখানে এসেছি। থালা, গ্লাস, তৈজস পত্র আমাদের সঙ্গে মোটেই নেই। কলার পাতে দিলাম। তোমার খেতে অসুবিধা হবে।

মহিলা বললেন—আমার সৌভাগ্য আজ শুভ মুহূর্তে আপনাদের কাছে এসেছি! দেখুন আমার কি অন্যায় আবদার। আপনাদের দু'জনের মত খাবারে আমি এসে জুলুম করে বসে গেলুম।

গৃহিণী হেসে বললেন—ভগবান জেনেছিলেন তুমি আসবে। সেইজন্যই উনি ভুল করে অনেক বেশী চাল-ডাল চাপিয়েছেন। আমি সে সময় বাথরুমে গিয়েছিলাম। আমাকে বললেন—জেলির শিশিটা এদিকে দাও তো।

আমি বললাম—আপনাকে কি নামে আমরা ডাকব?

তিনি বললেন—কাকাবাবু, আপনি আমাকে পরের মত 'আপনি' 'আজ্ঞে' করছেন কেন? লোকে শুনলে মনে করবে আমি আপনাদের আপনজন নই। আমাকে তুমিও নয়, একেবারে মন খুলে তুই বলবেন।

বললাম—আচ্ছা তাই হবে। কি নামে ডাকব?

এবার তিনি হাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে গম্ভীর হয়ে বললেন—আমার নাম বিশ্রী। যেমন বলতে তেমনি লিখতে। সে নাম স্কুল কলেজের খাতায় আছে। আমার আসল নাম ঘেঁটু। আমি নাকি জন্মেছিলাম ফাল্গুন সংক্রান্তিতে। তাই ঘেঁটু নাম পেয়েছি। পোষাকি নাম শঙ্কর সীমন্তিনী।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে নানা কথায় ওঁর বাড়ীর সংবাদ পেলাম। পিত্রালয় বারাসত। শৈশবে মাতৃহারা। পিতাও কয়েক বৎসর পূর্বে মারা যান। ভবানীপুরেব কোন সদাশয় এটর্ণীর গৃহে মহিলার পিতা কাজ করতেন। তাঁদের আলয়েই কন্যাসহ তিনি থাকতেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে স্কুল কলেজের লেখা-পড়ার সুযোগ হয়। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর এটর্ণি ভদ্রলোক তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ

দিয়ে মেয়েটিকে নিজ গৃহে স্থায়ীভাবে নিতে মনস্থ করেন। ছেলেটি এম, এ পরীক্ষা দিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আসেন। কয়েকস্থানে পরিভ্রমণের পর যায় ধনুষ্কোডি দেখতে। তারপর দৈব-দুর্বিপাকে ধনুষ্কোডি হয় ধ্বংশ। কিন্তু সে ছেলের পরিণাম যে কি হয় তা আজও অজ্ঞাত। মহিলার ধারণা তিনি এই প্রদেশে সন্ন্যাস-ধর্ম নিয়ে কোন স্থানে আত্মগোপন করে আছেন। এখন উদ্দেশ্য তাঁর ভাবী স্বামীকে অনুসন্ধান করা।

ঘেঁটুর বিবরণ শুনে বললাম—তুমি এখন কি এখানেই থাকবে, না আর কোন স্থানে যাবে ?

সে বললে—কিছুই বুঝতে পারছি না। একবার রামেশ্বর যাব। আমার হাতে এখনও কিছু টাকা আছে। সেটা শেষ হলে বাধ্য হয়ে ফিরতেই হবে। বললাম—তারপর কি কলকাতায় ফিরবে ? তোমার শ্বশুরবাড়ী ফেরাই উচিত। নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে কোন সুবিধা হবে না। তোমার কলকাতার ঠিকানা কি ?

বললে—আমার কাছে ওঁদের ঠিকানার কার্ড আছে আপনাকে দেব। ভবানীপুরে ডাক্তার নলিনী সেনের বাড়ী জানেন ? আর একটু দক্ষিণে আমাদের বাড়ী।

গৃহিণী আমাকে বললেন—বেশ নিশ্চিন্তে বসে আছ। যাও না একটু দই এনে রাখ। বেশী রাতে হয় তো পাওয়া যাবে না।

বললাম—দেখি কোথায় আবার দই পাওয়া যায়। যত বাজে বায়নাক্কা।

ঘেঁটু বললে—আমি জানি এই গলি থেকে গিয়ে সুভাষ রোডে মোড়ের মাথায় গুজরাটীদের খাবারের দোকান। দই, মিষ্টি, পুরী সব সেখানে পাওয়া যায়। চলুন, আমি ঐদিকে যাব। আপনাকে দোকান দেখিয়ে দিই।

গৃহিণী বললেন—ঘরে তালা দাও। আমিও একটু ঘুরে দেখে আসি।

ঘেঁটু বললে—রাত্রে আবার দই কি হবে কাকীমা ?

গৃহিণী বললেন—কাল যে ষষ্ঠী। শীতল ষষ্ঠী বলে না ? কাল বাঙ্‌লা দেশের সন্তানের মায়েদের রান্না করে গরম কোন জিনিস খেতে নেই।

আমি কাল চিঁড়ে-দই খাব।

ঘেঁটু বললে—আমিও খাব।

গৃহিণী বললেন—তোমার বিয়ে হোক, সন্তানের মা হও। তখন খেয়ো।

ঘেঁটু বললে—আমি যদি আপনার পাতের প্রসাদ খাই, ক্ষতি আছে ?

গৃহিণী বললেন—আচ্ছা সে দেখা যাবে।

আমরা গলির মোড়ে এসে দেখলাম পথের দু'পাশে বেশ জনতা। মধ্য স্থলে বেশ যন্ত্রবাদ্যসহ কিসের যেন শোভা যাত্রা মনে হ'ল।

গৃহিণী বললেন—আজ বিয়ের দিন আছে। বর যাচ্ছে মনে হয়।

ঘেঁটু লক্ষ্য করে বললে—না কাকীমা, বিয়ের প্রশেসন নয়। ঘোড়ার নাচ। একপাশে এসে দাঁড়ান। কোন একটা উৎসব হলেই এখানে ঘোড়ার নাচ বেরোয়। আজ শ্রী-পঞ্চমী। সেই জন্যই বোধহয় ঘোড়া নাচাতে এসেছে।

আমি বললাম—কারা এই নাচের আয়োজন করেছে ?

ঘেঁটু বললে—আমি ঠিক জানি না। বোধহয় এই পাশে একটা দেবালয় আছে সেই স্থান থেকেই আসছে।

আমাদের পাশে এক স্থানীয় ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমাদের আলোচনা শুনে বললেন—এই নৃত্য-সম্প্রদায় কারও আহ্বান আয়োজনের অপেক্ষা রাখে না। উৎসব হলেই এরা সাধারণকে নৃত্য দেখিয়ে কিছু উপার্জন করে।

দেখলাম পয়সা ব্যয় করে এ নৃত্য দেখার সার্থকতা আছে। একটি কৃত্রিম কাঠের অশ্ব প্রস্তুত করেছে। তার উপরের আবরণ ব্যতীত আর কিছুই নেই। সেই অশ্ব-আবরণের মধ্যে একজন বক্ষস্থলের দিকে অন্য একজন উদরের দিকে সারা অঙ্গ গোপন করে এমন একটি আকৃতিতে পরিণত হয়েছে যেন একটি সজীব অশ্ব বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করছে। কৃত্রিম এই অশ্বমধ্যে যারা নৃত্য পরিচালনা করছে আসলে তারাই নৃত্যরত। কতকটা আমাদের দেশে পুতুল-নাচের মত। তবে এ নৃত্য পরিচালনায় যথেষ্ট পরিশ্রম ও কসরৎ দরকার। এক একটি সম্প্রদায়ে দু'টি কিংবা তিনটি অশ্ব থাকে। একে আরও আকর্ষণীয় করেছে এ-দেশের সানাই

ও বাদ্য-যন্ত্র সঙ্গতে।

দক্ষিণ প্রদেশে সঙ্গীতের ধারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উড়িষ্যা থেকেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত পদ্ধতি অন্যান্য প্রদেশের সাধারণ লোকেদের বোধগম্য তো হবেই না, শ্রুতি-সুখকরও নয়। কিন্তু এঁদের সানাই এবং বাদ্য-যন্ত্রের সুর ও কসরৎ সত্যই মনোরম।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ ঘোড়ার নাচ দেখলাম। এরপরে হাজির হলো ময়ূর-নৃত্য। এর রূপ-সজ্জা আরও জমকাল। প্রতিটি ময়ূরের নৃত্য পরিচালনা করছে একজন লোকে। বাদ্য পদ্ধতি একই প্রকার। ময়ূর-নৃত্য একটি ময়ূরে হওয়া সম্ভব নয়। একটি ময়ূর মধ্যস্থলে নৃত্য করবে অন্যটি তার চারিপাশে পরিক্রমা করে আনন্দ উল্লাস দেখাবে।

ঘেঁটু কানে কানে বললে—বেশী ভীড়ে থাকবেন না। মাদ্রাজে অনেক পকেটমার আছে। এইটে হাতে নিন।

দেখলাম, ঘেঁটু ইতিমধ্যে দোকান থেকে দই ও একটি মিষ্টির প্যাকেট এনেছে। তাকে বললাম—তুমি এর মধ্যে কখন গেলে? দোকান কোথায়?

সে বললে—ঐ তো আপনাদের সামনেই দোকান।

আমাদের অলক্ষ্যে তার এই কার্যতৎপরতায় গৃহিণী আর এক দফা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন—আজ আমাদের জন্য অনেক অপব্যয় করেছ। কাল হিসেব করে সব চুকিয়ে নেবে।

সে বললে—আমি আপনাদের জন্য কিছু ব্যয় করি নি। আপনাদের কাছে জমা রেখে গেলাম। কাল এসে খাব। এখন চললাম্। এই কথা বলেই সে দ্রুত-পদক্ষেপে প্রস্থানে উদ্যত হ'ল।

গৃহিণী বললেন—কাল কখন আসবে? ক'টার সময়?

যখন ক্ষিধে পাবে তখনই আসব। দূর থেকে এই কথা বলতে বলতে জনতার মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন সকালে বাজার থেকে এসে গতকালের ব্যয়ের হিসাব ও আজকের বাজারের হিসাব মিলাতে বসেছি। এমন সময় কালকে রূপথেপাওয়া

সেই মেয়ে এসে হাজির হ'ল। গৃহিণী তাকে দেখে বললেন—তোমার এখনই ক্ষিধে পেয়েছে কিন্তু আমার যে এখনো রান্নাই হয় নি।

ঘেঁটু বললে—আপনারা বিলম্বে খান বোধহয়? আমার খাওয়া হয়ে গেছে। কাল যাওয়ার সময় প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছিলাম তাই এখন এলাম। এই কথা বলে আমাদের পা স্পর্শ করে মাথায় দিলে।

গৃহিণী বললেন—তুমি যে কাল রাত্রে বলে গেলে আজ আমাদের এখানে এসে খাবে। রাত্রে দই দিয়ে বলে গেলে, দই জমা রইল কাল এসে খাব।

ঘেঁটু বললে—আমার সে কথা স্মরণ ছিল না। আমি যখন বলেছি এখানে খাব, নিশ্চয়ই খাব। আপনি রান্না করুন। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নি। এই বলে গৃহিণীর শয্যায় গা এলিয়ে দিলে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার নাসিকাধ্বনি শুরু হ'ল।

গৃহিণী বললেন—আমি আগেই বলেছি মেয়েটার মাথার ঠিক নেই। বাড়ীতে আপনজনও কেউ নেই যে আগলবাঁধ করে রাখবে।

বললাম—কেন, স্বামী না হয় নেই, শ্বশুরবাড়ীর আর তো সবাই আছেন।

গৃহিণী বললেন—শুনছ ওর বিয়েই হয় নি তার শ্বশুরবাড়ী। তুমিও যেমন। তারা বিয়ে দিতে রাজী ছিল। বিয়ের ব্যাপার এক কথায় হয় না। তারা বড়লোক। ছেলে রাজী ছিল কি-না তারও কিছু ঠিক নেই। মরুক গে, পরের কথা নিয়ে মাথা ব্যাথার দবকার নেই।

মধ্যাহ্নে বারোটার পর গৃহিণী আমাদের ভাত দিয়ে নিজে চিঁড়ে-দই, নিয়ে বসলেন। আহারের আয়োজন বিশেষ কিছুই ছিল না। মুগের ডাল, লাউ-ঘণ্ট, বেসম দিয়ে ফুলকপি ভাজা আর টমেটোর চাটনি। কালকের ঘেঁটুর প্রদত্ত দই-মিষ্টি তো আছেই।

কয়েক গ্রাস আহারের পর ঘেঁটু বললে—এ কিসের ডাল কাকীমা?

গৃহিণী বললেন—মুগের ডাল। কাল রাত্রে যে ডালের খিচুড়ী খেয়েছ।

ঘেঁটু বললে—কাকীমা আপনি মাদ্রাজী ডাল খেয়েছেন? এই মাদ্রাজের হোটেলে কোনদিন খেয়েছেন?

গৃহিণী বললেন - দু'দিন খেয়েছি। প্রথম যেদিন মাদ্রাজে এসেছি সেদিন এক হোটেলে খেয়েছি। তারপর গত রবিবারে পক্ষীতীর্থ থেকে ফেরার

পথে এক হোটেলে খেলাম। অখণ্ড কলার পাতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর যত্ন করে দেয়।

ঘেঁটু বললে—সে কথা বলছি না। হোটেলের ডাল খেয়েছেন? একেবারে তাকের ডাল তাকেই থাকে আর বাবুদের খাওয়া হয়ে যায়।

গৃহিণী বললেন—সে আবার কি?

ঘেঁটু বললে—সে একটা গল্প। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে বিহারী রাঁধুনী ছিল। একদিন বাবুদের খাওয়ার পর গৃহিণীরা খেতে এসে কুক্‌কে বললেন—এ মহারাজ, ডাল বিলকুল পানি! এ ক্যায়সা ডাল বানায়া? কুক্ এসে ডাল পরীক্ষা করে বললে—মাইজী, থোড়া ভুল হোগিয়া। ডালমে পানি, মশলা সব কুছ দিয়া লেকিন ডাল তাকমে রহগিয়া।

আমি বললাম—মহারাজ ডাল তাকে রেখে হাঁড়িতে দিতে ভুলে গেল। বাবুরা কোন প্রতিবাদ না করে চাঁদ মুখে খেয়ে গেলেন।

গৃহিণী বললেন—তোমার মত হুসিয়াব বাবুরা। ঘেঁটুর দিকে চেয়ে বললেন, একি সেই রকম ডাল হয়েছে?

ঘেঁটু মা কালীর মত জিভ কেটে বললে—এ ডাল সে-রকম হবে কেন? মাদ্রাজী ডালের কথা বলছি। এরকম তোয়াজে দিনকতক খেলে মাদ্রাজ হোটেলের অন্ন মুখে করতে হবে না। আপনারা কবে রামেশ্বর যাবেন, আমাকে সঙ্গে নেবেন?

বললাম—দক্ষিণ ভারতে এসেছি এদিকের কিছু কিছু দেখে যাব ইচ্ছা আছে। আমরা কাল কিংবা পরশু তিরুপতি বালাজী যাব।

ঘেঁটু বললে—সে কোথায়?

বলালম—এখান থেকে অধিক দূর নয়। বাসেও যাওয়া যায়। আমরা রেলপথে যাব। মাদ্রাজ সেণ্টার ষ্টেশন থেকে যাব কাটপাড়ি। তারপর একটি শাখা লাইনে কিছুদূর গেলেই তিরুপতি ষ্টেশন।

ঘেঁটু বললে—সেখানে মন্দির আছে?

গৃহিণী বললেন—বালাজী। বালাজী নাম শোন নি? ভীষণ জাগ্রত দেবতা। এ-দেশের লোক বালাজীকে জাগ্রত দেবতা বলে মানে।

আমাদের খাওয়া শেষ হোতেই ঘেঁটু আমাদের সকলের উচ্ছিষ্ট পাতা

পরিষ্কার করে হাত মুখ ধুয়ে এসে বললে · সেখানে ক'দিন থাকবেন ?

গৃহিণী বললেন—কতদিন আর থাকব ? দু'একদিন থেকে দেখে যাব। সকলে বলে জাগ্রত দেবতা। যে যা কামনা করে তার সেই বাসনা পূর্ণ করেন।

ঘেঁটু বললে—কি বললেন, মনের বাসনা পূর্ণ হয় ? সত্য বলছেন ? আমার যদি মনের কোন বাসনা থাকে পূর্ণ হবে ?

গৃহিণী বললেন—সেই কথাই শুনেছি। তোমার বাসনাই বা অপূর্ণ থাকবে কেন ? তবে তাঁকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে।

ঘেঁটু বললে—আপনি, আপনারা বিশ্বাস করেন ঐ সব কথা ?

গৃহিণী বললেন—ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁর উপর বিশ্বাস থাকলে তাঁর আশীর্বাদের উপরও বিশ্বাস রাখতে হবে।

ঘেঁটু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। দেখলাম তার মুখের আকৃতিরও অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন। বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললে—মিথ্যে কথা। ও-সব প্রতারক ভণ্ডদের কারসাজি। সাধারণ লোককে প্রতারণা করে উপায়ের ফন্দি। ও-সব কিছু নয়। কেবল মেণ্ট্যাল উইকনেস্, ডিপ্রেভ্‌ড সাইকোলজি। মানুষ আর্থিক, দৈহিক ও মানসিক দুর্বল হয়ে পেতে চায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ। অন্বেষণ করে ভগবানের।

আমি বললাম—অনেক সময় মনে হয় কেবলমাত্র মানসিক দুর্বলতা। ঈশ্বরের অনুভূতি পেয়েছে এমন লোক পৃথিবীতে বিরল নয়। তুমি আমি কতটুকু তাঁকে জানতে চেষ্টা করেছি ? দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে জানতে চেষ্টা কর। যেতে হবে সাধন মার্গে। দেখবে তোমার কামনা তিনি পূর্ণ করবেন। তাঁকে চিনতে হলে, শান্তি পেতে হলে চাই সেবা ধর্ম, চাই সাধনা।

ঘেঁটু কেঁদে উঠে বললে—না না, মানতে পারব না। মিথ্যাকে মনে জমিয়ে রাখতে চাই না। আমি মানতে চাই না, মানতে চাই না ! এ-কথা বলতে বলতে দমকা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার এই অশান্ত মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

গৃহিণী বললেন—দেখলে আমি আগেই বলেছি ওর মাথার কিছু ঠিক নেই।

বললাম—তাই মনে হয়! হয়তো সংসার জীবনের প্রারম্ভে নিদারুণ ধাক্কা খেয়েছে।

সেদিন আমাদের নিদ্রা দিয়েই দিন অতিবাহিত হ'ল। পরদিনও প্রায় সারাদিন ধর্মশালায় বসে ঘেঁটুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় রইলাম। অপরাহ্নে গৃহিণীর ইচ্ছায় সহরের পথে বেরুলাম। বন্ধু সুন্দরমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর তার পরামর্শে গেলাম জর্জটাউন রোডের দিকে।

গৃহিণী বললেন—এদিকে আমাদের একদিনও আসা হয় নি। কি বড় বড় দোকানের বাহার। এ রাস্তার নাম কি?

বললাম—জর্জটাউন। এদিকে বন্দর ও বড় বড় শিল্পপতিদের বাসভবন। এদিক থেকে ঘুরতে ঘুরতে এলাম সন্ধ্যা বাজারে। এটি যেন কলিকাতার নিউ মার্কেটের ছোট সংস্করণ। এখানে এসে তিনি বাইশ টাকা ব্যয় করে একখানা কাঞ্চিপুরম্ শাড়ী ক্রয় করলেন। কাল থেকে তাঁর মনের অবস্থা ভাল ছিল না, সে কারণে তাঁকে বাধা দিলাম না।

ধর্মশালায় গিয়ে গৃহিণী বললেন—ও পোড়ারমুখি আর আসবে না। আমাদেরও এখানে আর ভাল লাগছে না। চলো কাল তিরুপতি যাই। ও যে কোন চুলোয় থাকে তাও জানা নেই। মরুক গে!

বললাম—আজ রাত্রের মত এই পর্যন্ত থাক। কাল যদি তিরুপতি যাওয়া স্থির হয় ভোর পাঁচটায় উঠে বৃন্দাবন এক্সপ্রেস ধরতে হবে। তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ঠিক করে রাখ।

গৃহিণী বললেন—এখন আর পারব না। কাল যা হয় করা যাবে।

বুঝলাম কালও মাদ্রাজ ত্যাগ করে যাওয়া সম্ভব হবে না। অল্পে অল্পে গৃহিণীর গলায় মায়ার ফাঁস আটকে ধরেছে। স্নেহের জালে মনের মধ্যে তার মায়া বেশ বাসা বেঁধেছে। কতটুকুই বা তার সংস্পর্শ পেয়েছে। হয়তো জীবনে আর সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। প্রবাসে তীর্থপথে ভ্রমণে কত লোকেরই মিলন ঘটেছে। কত অপরিচিতদের নিয়ে পরমাত্মীয় জ্ঞানে কয়েকদিন কতই না আনন্দে কেটেছে। দু'দিন পরেই মন থেকে মুছে গেছে তাঁদের সকল স্মৃতি। এখন চেষ্টা করেও তাঁদের নাম পর্যন্ত স্মরণে আনতে পারি না। অনুমান করলাম আরও একটা দিন মাদ্রাজেই কাটবে।

পরদিন প্রাতে গেলাম মাদ্রাজের রেল ষ্টেশনগুলিতে। সম্ভব অসম্ভব অনেক স্থানেই অনুসন্ধান হ'ল। নেতাজী সুভাষ রোডে অনাবশ্যক ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

গৃহিণীকে বললাম—মনকে সান্ত্বনা দাও, পথের দেখা যাত্রী পথেই মিলিয়ে গেছে।

তিরুমাল্লাই—তিরুপতি বালাজী

পরদিন প্রাতে সাতটা ত্রিশের ট্রেনে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশনে গিয়ে বৃন্দাবন এক্সপ্রেস ধরলাম। চমৎকার ট্রেন। এ ট্রেন মাদ্রাজ ত্যাগ করে যায় বাঙ্গালোর। দূরত্ব প্রায় তিন শ' কিলোমিটারের অধিক। মধ্যে বিরাম স্থান দু'টি। প্রথম এক শ' ত্রিশ কিলোমিটারের পর কাটপাড়ি জংশন। দ্বিতীয়টি জালার পেট্রাই জংশন। তার পরেই বাঙ্গালোর। একই প্রকারের একখানি ট্রেন আছে দিল্লী আগ্রা লাইনে। তাজ এক্সপ্রেস। এ ট্রেনের বিরাম স্থান প্রায় দেড় শ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে একমাত্র মথুরা জংশনে। তার পরেই আগ্রা।

আমাদের এখন গন্তব্য স্থান তিরুপতি। সেখান থেকে বাসে যাব পাহাড় পথে তিরুমাল্লাইয়ে বালাজী দর্শনে। মাদ্রাজ থেকে সোজা তিরুমাল্লাই যাওয়া যায়। আমার গৃহিণী বাসে যেতে রাজী হলেন না। আমাদের নামতে হবে এই ট্রেনের প্রথম বিরাম স্থান কাটপাড়ি জংশনে। তারপর মিটার গেজ লাইনে প্রায় একশত মাইল পরে তিরুপতি ইষ্ট জংশনে নেমে যেতে হবে বাসে। পথ সামান্য। ঝামেলা যথেষ্ট। বাসে সুবিধা ছিল কিন্তু মালের মোটা শুল্ক দিতে হবে।

ট্রেন মাদ্রাজ ত্যাগ করে ছোট বড় অনেকগুলি ষ্টেশনকে অগ্রাহ্য করে একবারে এসে থামলেন কাটপাড়িতে। বেশ বড় জংশন ষ্টেশন। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত মাদ্রাজ বাঙ্গালোর মেন লাইন। পূর্ব পশ্চিমে একটি শাখা লাইন।

বাঙ্গালোর লাইনের বুকের উপর দিয়ে গিয়ে পূর্বে তিরুপতি ইষ্ট। পশ্চিম দিকে ভিল্লিপুরম্। এই পথে আছে এক বিশেষ তীর্থস্থান তিরুবন্নমালাই। কাটপাড়িতে নামলাম ন'টার কিছু পরে। তিরুপতির ট্রেন সওয়া দশটায়। মাল-পত্র নিয়ে মিটার গেজের প্লাটফর্মে এলাম এবং যথা সময়ে তিরুপতি-গামী ট্রেনে উঠে বসলাম।

ট্রেন তিরুপতি অভিমুখে রওনা হ'ল। উভয় পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র এবং অদূরে পর্বতশ্রেণী। আমার পার্শ্বে এক শিক্ষিত সহযাত্রী ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন—এইবার মাদ্রাজ সীমানা অতিক্রম করে আমাদের ট্রেন অন্ধ্র-প্রদেশে প্রবেশ করেছে। রাজ্য সরকার এই প্রদেশে কৃষি ও অন্যান্য বৃক্ষের উন্নতি সাধনে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। দেখলাম রেল-পথের পার্শ্বের জমিতে শীর্ণকায় আম ও লিচুর গাছ আকাশের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমরাও ষ্টেশনে এলেই কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছি কিছু খাদ্যের অনুসন্ধানে। মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়ে চা ব্যতীত আজ আর অদৃষ্টে কিছু জোটে নি। এদিকে ষ্টেশনগুলিও মরুভূমি। একমাত্র ডালমুট ও খাড়ি (চিনাবাদাম) ব্যতীত কিছুই দেখছি না। বেলা প্রায় দু'টোয় এলাম পাকালা জংশনে। এ-স্থানে এসে দেখলাম ইড্‌লি, বড়া, ধোষা, নানা প্রকার ফল। এমন কি সংবাদ পত্রের প্যাকেটে সম্বর ভাত দেখলাম। কিছুফল ও ইড্‌লি, ধোষা নিয়ে শান্তভাবে বসলাম।

অপরাহ্ণ তিনটায় তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশনে হাজির হলাম। এর পরের ষ্টেশন রেনিগুণ্ডা। এটি এ লাইনের শেষ ষ্টেশন। তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশনে নেমে কুলির মাথায় মাল-পত্র দিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এলাম। এ-স্থানে বাসের টিকিট সংগ্রহে এক নূতন অভিজ্ঞতা যা আজ পর্যন্ত ভারতের কোন প্রদেশে কোন বাস ষ্টেশনে দেখি নি।

এ বড় বিষম ঠাঁই। প্রায় তিন চার শ' যাত্রী বাসের জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। প্রতি পনর মিনিটে পঞ্চাশ জন যাত্রী নিয়ে এক একখানি বাস বালাজীর চরণ সমীপে চলেছে। হিসাব করে দেখলাম, এই পর্যায়ে নিয়মানুসারে আমাদের ভাগ্যে বাসের টিকিট মিলবে ন্যূনপক্ষে তিন চার

ঘণ্টা পরে। অর্থাৎ আজ দিবাভাগে আমাদের বাসে স্থান লাভের আশা নেই। অবশেষে বিদেশে সাহায্যকারী বন্ধু কুলির মুখের দিকে তাকালাম। প্রবাসে রেল পথে কিংবা বাস পথে এই কুলিগণ যাত্রীদের পরমবন্ধু, একমাত্র সহায়। এদের উপর বিশ্বাস রাখতেই হবে। প্রথমেই মজুরী হ্রাসের চেষ্টায় বিরাগ-ভাজন হবেন না। মজুরীর উপর বখ্‌শিসের প্রতি-শ্রুতি দিলে সন্তোষজনক কাজ পাবেন। কাজের পর মিনতি করে নিষ্পত্তি করবেন। অসুবিধা বিশেষ হবে না। তীর্থপথে এ-অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি। মাল-পত্র তদারক, রেলের টিকিটের ব্যবস্থা, বার্থ রিজার্ভেশন, ধর্মশালা বা লজের ব্যবস্থা এদের উপর ভার অর্পণ করলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। যাঁরা একত্রে সংখ্যায় অধিক, মাল-পত্রের ঝামেলা নেই তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

এভাবে কুলির সাহায্যে টিকিট প্রাপ্তির সুযোগ না নিলে আমাদের হয়তো আজ তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশনের ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করতে হতো। তিরুপতি ষ্টেশনের সন্নিকট একটি ভাল ধর্মশালা আছে। আমি যদি নিজের চেষ্টায় তিরুমাল্লাই যাওয়ার ব্যবস্থা করতাম আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো বাস ষ্টেশনে।

বাস ষ্টেশনে একটি বৃহৎ শেডের নীচে পাঁচ-ছয়টি খাটালের আকারে বিশ্রামাগার আছে। এক একখানি বাসে যতগুলি আসন আছে ঠিক ততগুলি আসন আছে এক একটি বিশ্রামাগারে বা খাটালে। যাত্রীরা সেই স্থানে আসন দখল করে অপেক্ষা করবেন টিকিটের আশায়। বাস কণ্ডাক্টর সময় মত এসে যাত্রীদের হাতে টিকিট দেবেন। এইখানেই দুর্ভোগের শেষ নয়। আরও অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না অন্য কণ্ডাক্টর এসে টিকিটের পৃষ্ঠায় বাসের নম্বর লিখে দেন।

তারপর সেই টিকিট হাতে যেতে হবে মালের ওজন-বাবুর কাছে। নিজের সময় ও সুবিধামত বিনা টিকিটে মালের ওজন লওয়া ওঁদের আইন সঙ্গত নয়। এ-তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তিরুমাল্লাই থেকে প্রত্যাবর্তন-কালে। সে-স্থানেও এইরূপ টিকিটের এজেন্ট ছিল, তাঁর দাবী প্রতি টিকিটে এক মুদ্রা সেলামী। আমি নিজে টিকিটের জন্য গিয়ে তিন ঘণ্টা

দুর্ভোগের পর এই অভিজ্ঞতা নিয়ে বাসে স্থান নিতে সমর্থ হই।

অপরাহ্ণ পাঁচটায় তিরুমাল্লাইয়ে পৌঁছলাম ; এ-স্থানটি একটি শৈলনিবাস। তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশন থেকে বাস ছাড়ে। মাইলখানেক এসেই বাস পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করে। চমৎকার পথ। মনোরম দৃশ্য। তিরুমাল্লাইয়ে এসে বাস থেকে অবতরণের পর মাল-পত্র নামিয়ে গৃহিণীকে তদারকের ভার দিয়ে বাসস্থানের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এখানে একটি সরকারী রেষ্ট-হাউস আছে। বিরাট বিল্ডিং। শতাধিক পরিবারকে স্থান দেওয়া হয়। এক একটি কক্ষে সাত-আটজন যাত্রীর স্বচ্ছন্দে স্থান সঙ্কুলান হয়। প্রতি কামরায় শৌচাগার, স্নানাগার, রন্ধনগৃহ ও বিজলী বাতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল সময়ে অত্যধিক যাত্রীর চাপে সকলকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না। পূর্বাহ্ণে পত্র দিয়ে স্থানের ব্যবস্থা করলে স্থানের জন্য বিশেষ ক্লেশ পেতে হয় না। আমার সে ধারণা ছিল না।

বাস থেকে নেমে একটি কুলিকে সঙ্গে নিয়ে রেষ্ট-হাউসের ম্যানেজারের নিকট কামরার জন্য আবেদন করলাম। তিনি বিনয়ের সুরে উত্তর দিলেন—সরি, নো রুম। নানাভাবে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। বিদেশী লোক, এ-স্থানের কিছুই জ্ঞাত নই। কামরা ব্যতীত সঙ্গের মহিলা ও মাল-পত্র নিয়ে আমাদের বিশেষ বিপদে পড়তে হবে।

ম্যানেজার বললেন—কামরা না দেওয়ার কোন কারণ নেই কিন্তু কোন রুমই খালি নেই। তিনি আমার হাতে একখানি ফর্ম দিয়ে সেটিতে নাম-ধাম লিখে ভর্তি করে দিতে বললেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন, কাল প্রাতে আপনি নিশ্চিত কামরা পাবেন।

তাঁর হাতে আবেদন-পত্র দিয়ে, কুলিকে বললাম—অদ্যকার মত এখানে স্থান পাওয়া সম্ভব নয়, এখন উপায় ?

—মাড়োয়ারী ধর্মশালা আছে, চলুন ব্যবস্থা করা যাবে। অগত্যা ফিরলাম। গৃহিণীকে সব বৃত্তান্ত জ্ঞাত করে ধর্মশালার উদ্দেশ্যে চললাম। মন্দিরের পাশ দিয়ে কিছুদূর এসে একটি পরিস্কার বাটীর দ্বারে হাজির হলাম। কুলি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ম্যানেজারের অনুসন্ধান করল, কিন্তু তিনি অনুপস্থিত। দশ মিনিট অপেক্ষার পরও তাঁর দর্শন পাওয়া গেল না।

এদিকে দিবা অবসান প্রায়। কুলিকে বললাম—আর কোনও স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

—হ্যাঁ, ভাড়া বাড়ী আছে চলুন। এ-স্থানের সকল কুলি হিন্দী জানে না। এ-বস্তুটি আমি ভাগ্যক্রমে পেয়েছি। এ কিছু হিন্দী জানে। নাম—নারায়ণ স্বামী। যাইহোক, এখন নারায়ণকে আশ্রয় করে ভাড়া কামরার আশায় চললাম। কুলি একটি জীর্ণ বাটীর দ্বারে এসে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে মাদ্রাজী ভাষায় আমার জন্য আবেদন করল।

বৃদ্ধ অবিলম্বে একটি ঘর আমাকে দেখালেন। লম্বায় তিন হাত পরিমাণ, চওড়ায় বোধহয় আড়াই হাত। ভাড়া চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পাঁচ মুদ্রা।

এ-কামরায় রাত্রিযাপন সম্ভব নয়। সুতরাং নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় মাড়োয়ারী ধর্মশালায় এলাম। ভাগ্যক্রমে ম্যানেজারের দর্শন লাভ ঘটল, কিন্তু বাঙ্গালীকে কামরা দিতে তিনি নারাজ। বহু আরাধনার পর এক রাত্রির জন্য চারি মুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে কামরা পেলাম।

বাস ষ্টেশন থেকে গৃহিণী সমেত মাল-পত্র এনে ঘরে তুললাম। ভাল ঘর। বিজলী বাতি, জল ও শৌচাগরের ব্যবস্থা ভাল। কুলিদের মজুরী দিতে গেলে তারা আমার বাসের মাসুলের রসিদ দেখতে চাইলে। কি সর্বনাশ! বাসের রসিদ কুলিদের কি প্রয়োজন ?

আমাকে জানালে বাসের মাশুল যত হয়েছে, এ-স্থানে তার অর্দ্ধেক কুলি-ভাড়া দিতে হবে, কোন বিতণ্ডা চলবে না। বাসের রসিদ তার হাতে দিলাম। মাশুল দেওয়া ছিল চারি টাকার কিছু অধিক। আমার নিকট কুলি দু'টাকা ভাড়া আদায় করে নিলে। এরপর নারায়ণ আমায় সাহায্য করেছেন তাঁকেও ষোল আনা পূজা দিয়ে এখনকার মত নিশ্চিন্ত হলাম।

বুড়োরা বড় বেশী বকে, অপরাধ নেবেন না। আমি হয়তো অনাবশ্যক লিখছি; তবে ঠিক একেবারে অনাবশ্যক নয়। যাঁরা এ-স্থানে যাবেন, মালের লঘুতা সম্বন্ধে সতর্ক হবেন। আরও সজাগ হবেন পূর্বাহ্ণে স্থান ঠিক রাখা। নচেৎ আমার মত অযথা দুর্ভোগ ও অপব্যয়ে পড়বেন। মাদ্রাজে দ্রব্যাদি রেখে সামান্য বস্ত্রাদি ও ছোট বেডিংসহ অনেকে এসে বালাজী দর্শন করে যান। আমার বাসনা ছিল পুনরায় মাদ্রাজে না গিয়ে এই পথেই

কয়েকটি প্রধান তীর্থস্থান ঘুরে রামেশ্বর যাওয়া। সুতরাং মাল-পত্র সঙ্গে রাখতেই হবে।

মাড়োয়ারী ধর্মশালায় মাল-পত্র রেখে বাজারের দিকে গেলাম। বালাজীর মন্দিরের নিকট রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাদ্রব্যের দোকান। জনাকীর্ণ পথ। পূর্বেই জেনেছিলান স্থানটি শৈলনিবাস; তবে শৈত্যের তীব্রতা নেই। গরম বস্ত্র আবশ্যক হয়। কয়েকদিনে অনুভব করেছিলাম তিরুমাল্লাই স্থানটি মনোরম হিম-শীতল নগর। কোন ঋতুতেই বৈদ্যুতিক পাখার আবশ্যক হয় না। স্নানে উষ্ণ-জল আবশ্যক হয়। কয়েকটি ভাল হোটেলও দেখলাম। আমরা একটি দোকানে গিয়ে গরম কচুরীসহ চা পান করে পরিতৃপ্ত হলাম।

বালাজী মন্দিরের দ্বারে এলাম। উদ্দেশ্য ছিল সান্ধ্য-আরতি দেখে পুণ্য সঞ্চয় করব। ফটক অতিক্রম করে প্রাঙ্গণে এলাম কিন্তু আরতি কিংবা দেব দর্শন সম্ভব হ'ল না। শুনলাম মন্দিরের বাম দিক থেকে লাইন ধরে কিছুদূর গিয়ে বিগ্রহের দর্শন পাওয়া যাবে। সময় লাগবে কয়েক ঘণ্টা। হতাশ হয়ে আজকের মত দর্শনে নিরস্ত হলাম।

মন্দিরের দক্ষিণ দিকে বহু স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটি নাট মন্দির। সেখানে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের আসর বসেছে। বহু শ্রোতা সমবেত হয়েছেন। এ-দেশীয় ভাষা বা সঙ্গীত পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করার সামর্থ আমাদের নেই। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সহজেই অনুমান করলাম। কিছুক্ষণ উপবেশনের পর মন্দিরের বাহিরে এসে বিনা উদ্দেশ্যে একটি প্রশস্ত পথে চলতে লাগলাম। দু'খানি যাত্রী বোঝাই বাস আমাদের সম্মুখ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুনলাম ঐ সকল বাস চলেছে পাপনাশিনী তলাবে।

জনৈক ভদ্রলোকের নিকট জানলাম—এ-স্থান থেকে তিন মাইল দূরে একটি পাহাড়ের নিম্নভাগে আছে একটি সুন্দর সরোবর। তীর্থযাত্রীরা সেই সরোবরে স্নান করে বালাজীর দর্শনে যান। এই পাপনাশিনী সরোবর তীরে এক বিশেষ বিধি দেখা যায়। এ-প্রদেশের প্রায় সকল তীর্থযাত্রী বালাজী দর্শনের পূর্বে পাপনাশিনীর তীরে মস্তক মুণ্ডন করে স্নানের পর পবিত্র মনে মন্দিরে যান। স্ত্রী-পুরুষ, সধবা-বিধবা সকলেই এক বিধি মেনে চলেন।

শুনলাম এই স্থানে মস্তক মুণ্ডনে যে কেশ, সংগৃহীত হয় সেগুলি বিদেশে রপ্তানী করে কয়েক কোটি বিদেশী মুদ্রা প্রতি বৎসরে পাওয়া যায়। আগামীকাল প্রাতে যাঁরা মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনে যাবেন তাঁরা আজ রাত্রি থেকেই মস্তক মুণ্ডন ও স্নানাদি করে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসই ভক্তদের কামনা সিদ্ধ করে।

বাজার, দোকান পশ্চাতে রেখে আমরা পাপনাশিনীর পথের ধারে একটি পাহাড়ের টিলার উপর এসে দাঁড়ালাম। পথের দিকে চেয়ে নানা প্রদেশের তীর্থযাত্রীদের কৌতূহল নেত্রে দেখছি। একটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে এসে বললেন—এই যে আপনারা বালাজী তীর্থ দর্শনে এসেছেন ?

চেয়ে দেখলাম একটি অল্পবয়স্ক গৌরবর্ণ, রুক্ষকেশ, পরিধানে মলিন গৈরিক বসন, নগ্ন গাত্র, মুখে আনন্দের হাসি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। পরিষ্কার বাঙ্গলা ভাষায় কর্ণ-কূহর শীতল হয়ে গেল। আমরা উভয়ে প্রশ্ন করলাম—আপনাকে বাঙ্গালী দেখছি। আপনিও বালাজী দর্শনে এসেছেন ?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, প্রভুর কৃপায় এসেছি। আমি একা নই, আমাদের দলে দশ-বার জন সন্ন্যাসী আছেন। বাঙ্গালী একমাত্র আমি।

গৃহিণী বাঙ্‌লা ভাষা শুনে এবং বাঙ্গালী পেয়ে আনন্দিত হলেন। সন্ন্যাসীকে নানা প্রশ্নে অস্থির করে তুললেন। তাঁর দেশ কোথায় ? বাড়ীতে মা, বাবা আছেন কি-না ? ভাই বোন কয়টি ইত্যাদি।

সন্ন্যাসীর উত্তরে জানলাম—তাঁর দেশ মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালের সন্নিকটে। পিতৃ-মাতৃহীন। ভগ্নী নেই। একটি কনিষ্ঠ ভাই দেশেই আছেন।

আমি প্রশ্ন করলাম—এখন কোথায় যাবেন ?

তিনি বললেন—পাপনাশিনীতে স্নানে যাচ্ছি। আমাদের দলের সকলেই চলেছেন। তাঁরা কিছু দূরেই বিশ্রাম করছেন।

বললাম—এই শীতের রাত্রে তিন মাইল পাহাড়ী-পথ ভেঙ্গে স্নানে যাবেন ?

উত্তর দিলেন—আমাদের কোন ক্লেশ হবে না। পথে আলোর সুব্যবস্থা আছে।

বললাম—আলোর সুব্যবস্থা লক্ষ্য করছি, কিন্তু স্নানের পর শীতে কষ্ট পাবেন যে !

সন্ন্যাসী সহাস্যে বললেন—এ সামান্য শীতে আমাদের কোন কষ্ট নেই। সঙ্গে কম্বল আছে। স্নানের পর কাপড় ছেড়ে ফেললেই আর শীত থাকবে না। আর একখানি কাপড় সঙ্গে নিয়েছি। এই বলে তাঁর হস্তের ক্ষুদ্র পুলিন্দাটি দেখালেন।

বললাম—আজ সন্ধ্যায় না গিয়ে কাল প্রাতে যেতে পারতেন।

তিনি বললেন—তা হলে কাল আর বালাজী দর্শন হবে না! ভোর থেকে লাইন দিতে না পারলে দর্শন করতে বিলম্ব হবে।

বললাম—এই সন্ধ্যায় না গিয়ে আজ সকালে কিংবা মধ্যাহ্নে যেতে পারতেন।

তিনি বললেন—আজ সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই এখানে এসেছি। কাল ছিলাম তিরুপতি ষ্টেশনে। সেখানে এক শেঠের বাড়ীতে খাওয়া সেরে সকলে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করি। বেশ ভাল রাস্তা, উঠতে কোন কষ্ট নেই।

সন্ন্যাসীর এই কথা শুনে গৃহিণী চম্‌কে উঠলেন। —এ পাহাড় হেঁটে এসেছেন ?

সন্ন্যাসী বললেন—হ্যাঁ মা, হেঁটেই এসেছি। পাপনাশিনী হেঁটেই যাবো। আমাদের বাস ভাড়ার পয়সা কোথায় ? রেল-ভাড়া আমাদের লাগে না। যেমন করে হোক চলে আসি। পাহাড়ে চড়তে কিংবা বাসের রাস্তায় আমাদের পায়ে হাঁটা ভিন্ন উপায় নেই। আপনারা কি আর আমাদের মত কষ্ট সহ্য করে হেঁটে যাওয়া-আসা করতে পারেন। জয় বাবা বালাজী ! কাল আবার সাক্ষাৎ হবে। এই বলে সন্ন্যাসী হাসিমুখে অগ্রসর হলেন।

এই সকল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় অনেক তীর্থস্থানে দেখা যায়। গয়া, কাশী, হরিদ্বার, জয়পুর, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে। এবার দক্ষিণ ভারতেও অনেক স্থানে দেখলাম। এঁরা গাড়োয়াল প্রদেশের সাধুবাবা শ্রেণীর নয়। মঠের বা মিশনের শিক্ষিত স্বামিজী সম্প্রদায়েরও নয়। এঁরা বাউল-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক। সকল প্রদেশের এই বাউল বাবাজীদের সঙ্গে একত্র থাকেন। সকলে মিলে বহু প্রকার সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করে দিন

কাটান। এইরূপ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসীদেরও দেখা যায়। তীর্থস্থানে তীর্থস্থানে বিচরণ করেন। দুর্গম পাহাড় পথে প্রদব্রজে যাতায়াত করেন। বিশ্রামের জন্য ধর্মশালায় কামরা পান না। ধর্মশালার প্রাঙ্গণে কম্বল বিছিয়ে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করেন। সময়ে আবার পথের পার্শ্বে অর্দ্ধভগ্ন চটি কিংবা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দুই একদিন অভুক্ত থেকেও সাধারণ লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন না। কোনস্থানে কোন শেঠ ধনী ব্যক্তি দাতার সংবাদ পেলেই সেখানে গিয়ে হাজির হন। আটা, ছাতু, কিংবা সামান্য অর্থ, বস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি ভিক্ষা বস্তু নিয়ে আনন্দে ভগবানের নাম নিয়ে দিনপাত করেন। সাধারণ গৃহস্থ শ্রদ্ধা করে কিছু দান করলে তা আনন্দে গ্রহণ করেন। ভিখারীর বেশে সাধারণ লোককে কিংবা তীর্থযাত্রীদের বিরক্ত করেন না। বিভিন্ন প্রদেশের নানা তীর্থস্থানের সংবাদ, যাতায়াতের সুবিধার সকল সংবাদ চমৎকার বিবৃতিতে দিতে পারেন। মন্দিরের স্থাপত্য শিল্পের বিষয় কিংবা পথের সৌন্দর্যের বিষয় কিছু বলতে সক্ষম হন না। দারিদ্র্য দুঃখে জর্জরিত হয়ে এই সকল বাউল, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেছেন। ভুলে গেছেন পার্থিব জগতের সকল সুখ-শান্তি, দৈহিক আরাম বিস্মরণ হয়েছেন কিংবা হয়তো পরমার্থ চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন।

এর পর সাক্ষাৎ পেলাম অন্য এক বাঙ্গালীর। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী নয়। বিলাতী পোষাকে সুকান্তি এক যুবকের। আমাদের নিকট এসে বললেন —আপনারা কবে এসেছেন?

বললাম—আজই সন্ধ্যার পূর্বে, আপনি?

তিনি বললেন—আমি কাল এসেছি, একা নই। সঙ্গে আছেন মা, স্ত্রী আর একটি শিশুপুত্র। আজ প্রাতে বালাজী দর্শন করেছি। আমরা ইতিপূর্বে আরও দু'বার এসেছি। দেখে যাবেন একেবারে সাক্ষাৎ দেবতা। আমি কোন বাসনা করেছিলাম, তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয়েছে। পূজা দিতে এসেছি, এ-দেবতার নিকট মানস করলে সিদ্ধ হবেই।

বললাম—সে কথা পূর্বেই শুনেছি। আমরা কাল প্রাতে বালাজী দর্শন করবো।

তিনি বললেন—ইচ্ছা করলেই দর্শন সম্ভব নয়। আজ রাত্রে প্রতিজনের জন্যে সাড়ে সাত টাকার টিকিট করবেন। কাল প্রাতে সহজেই দর্শন পাবেন, নচেৎ দুর্ভোগ হবে।

বললাম—প্রতিজনের দর্শনের জন্য সাড়ে সাত টাকার টিকিট! এ যে ক্রিকেট টেষ্ট-ম্যাচের টিকিট রে বাবা।

ভদ্রলোক বললেন—তা হবে না? একি সাধারণ দেবতা? পনের টাকা ব্যয় করতে কাতর হচ্ছেন, কত লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা এখানে দেবতার উদ্দেশ্যে দান করছে।

বললাম—তা করছে ঠিকই। কোটি কোটি টাকা বালাজীর কৃপায় ব্ল্যাক মার্কেটে পেয়েছেন, মোটামুটি কিছু দান করে ইন্‌কাম ট্যাক্সের সুবিধা পাবেন এর আর আশ্চর্য কি? আপনি কোথা থেকে এখানে এসেছেন?

বললেন—বম্বে থেকে এসেছি। আমি বম্বেতেই থাকি। কালই চলে যেতে হবে, ছুটী বড়ই কম। আপনারা যখন এতদূর এসেছেন দর্শন করে যাবেন। সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা। এইকথা বলেই দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন।

গৃহিণী বললেন—কি গো, আজ টিকিট করে রাখবে নাকি? ভয়ে কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

এরপর সেখান থেকে সোজা একটি দোকানে এসে পুরী ও গরম দুধ পানকরে মাড়োয়ারী ধর্মশালায় ফিরলাম। পরদিন প্রত্যুষে গেলাম রেষ্ট-হাউসের ম্যানেজারের অফিসে। আমি যাওয়ামাত্র আমার হাতে একটি চাবি দিয়ে তিনি কামরার নম্বর বলে দিলেন। আমি সত্বর আমাদের পরিচিত নারায়ণ স্বামী কুলিকে নিয়ে ধর্মশালা থেকে মাল-পত্র নিয়ে রেষ্ট-হাউসে এলাম। এখন মজুরী দিলাম মাত্র আট আনা। বেশ সন্তুষ্ট চিত্তেই গ্রহণ করলে। যাওয়ার দিন তার অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করে গেল।

কামরার দ্বার খুলে দেখলাম একটি বড় পরিবারের বাসোপযুক্ত সর্বপ্রকার সুবিধা এই কক্ষ মধ্যেই আছে। কক্ষের সম্মুখভাগে ছয় সাত জন স্ত্রী-পুরুষের স্বচ্ছন্দে শয়নের স্থান। পশ্চাৎভাগে একদিকে বড় রন্ধনগৃহ, অন্যদিকে শৌচাগার ও স্নানাগার। দু'তিনটি আলমারী আসবাবপত্র ও বিজলী বাতি প্রভৃতি আবশ্যকীয় সকল সুবিধাই আছে। এরূপ ধর্মশালা

আমরা ইতিপূর্বে দেখি নি। মাল-পত্রের ব্যবস্থা করে গেলাম পাপনাশিনী সরোবরে স্নানের উদ্দেশ্যে।

ইচ্ছা ছিল সকালের শীতে গায়ে রৌদ্র লাগিয়ে পাপনাশিনী সরোবরে যাব। গৃহিণী রাজী হলেন না, তিন মাইল পথ যাতায়াতে ও স্নানে অত্যধিক বিলম্ব হবে। মন্দিরে পূজায় যাওয়া হয়তো আজ সম্ভব হবে না; সুতরাং বাসেই উঠলাম। অতি সামান্য পথ। চমৎকার এই পথের দৃশ্য। মনে মনে ভাবলাম একসময় পদব্রজে এদিকে এসে ভালভাবে দেখে যাবো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাপনাশিনী সরোবরের তীরে হাজির হলাম।

শুনেছি তিব্বতে মানস সরোবরের দৃশ্য অতুলনীয়! এ-সরোবরের যে দৃশ্য দেখলাম তা কোনদিন কল্পনা করি নি। নাতিবৃহৎ পাহাড়ের সান্নুদেশে উপর থেকে আকাশ যেন নীচে নেমে এসেছে। জল এত স্বচ্ছ হতে পারে জীবনে প্রথম দেখলাম। এখন উপলব্ধি করলাম কাল রাত্রে শুক্লাপক্ষ দ্বাদশীতে এদিকে এসে পাপনাশিনীর শোভা দর্শন করা উচিত ছিল। এ-দেশীয় বহু স্ত্রী পুরুষ মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থায় কি সব পূজা পদ্ধতির কাজে ব্যস্ত হয়েছেন। আমরা স্নান সেরে বাসে উঠলাম।

রেষ্ট-হাউসে ফিরে শুদ্ধ বস্ত্র পরে নগ্নপদে মন্দির অভিমুখে গেলাম। মন্দির দ্বারে একটি দোকানে পূজার পুষ্প ও ডালি নিলাম। ডালিতে দ্রব্য ছিল একটি নারিকেল, চারিটি কলা, কপূর, ধূপ, একটি ঘৃতের প্রদীপ ও সিন্দুর। ফটক অতিক্রম করে মন্দিব প্রাঙ্গণে এলাম। ফটকের নিকট থেকে যে মন্দির দেখা যায় সেটি বালাজী মন্দির নয়, গণেশ মন্দির। এর পর পশ্চাতভাগে খাজাঞ্চিখানা দেবস্থানের কার্যালয় প্রভৃতি। এরপর শেষ প্রান্তে ভগবান্ বালাজীর মন্দির। সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, যাওয়া সম্ভবও নয়। মন্দিরের বামভাগে বিশ ফুট প্রস্থ এবং আধ ফার্লং দীর্ঘ বারান্দা আছে। সেই বারান্দায় টিউব-লাইন বা সুড়ঙ্গ পথের লাইন দিয়ে যেতে হবে দেব দর্শনে।

এটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ-পথ নয়! বারান্দার উপর ছাদ, রৌদ্র ক্লেশ বা বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না। বারান্দার উপর সুদৃঢ় লৌহ জালে আবৃত এক এক-

জনের যাওয়ার মত সঙ্কীর্ণ পথে লাইন ধরে যেতে হবে। আমরা মন্দিরে যাওয়ার জন্য সেই পথে লাইন দিলাম। কোথায় যেতে হবে তখনও আমাদের কিছুই জানা নেই। প্রায় পনের মিনিট এইভাবে অবস্থানের পর আমরা প্রায় এক গজ অগ্রসর হলাম। ক্রমে এ-পথের সকল অবস্থা বুঝে নিলাম। আমাদের প্রথম লাইন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়ে শেষ প্রান্তে মন্দির সীমানার প্রাচীর পর্যন্ত গিয়ে সেই স্থান থেকে বিপরীত মুখে ঘুরে পুনরায় আসতে হবে এদিকে শেষ সীমা পর্যন্ত। তারপর এদিক থেকে বিপরীত মুখে পুনরায় যেতে হবে সেই প্রাচীর পর্যন্ত। পুনরায় আসতে হবে এই দ্বারের সীমানায়। এইরূপ চারবার পরিক্রমার পর মন্দির পাশে উপনীত হওয়া যাবে। তারপর পাওয়া যাবে মূল মন্দিরের বারান্দা। অবস্থা বুঝে আতঙ্কিত হয়ে লাইনের যাত্রীদের দিকে তাকালাম। দেখলাম যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, শিশু কোলে জননী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছেন। কতক্ষণে বা কিভাবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবেন তার কোন হিসাব নেই। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় লাইনে প্রবেশ করলে পশ্চাৎ অপসরণের উপায় নেই। যতটুকু দেখলাম, এই শীতল স্থানে মহিলাদের গাত্রের আবৃত শাড়ীর অঞ্চল ঘর্মে আর্দ্র হয়ে গেছে। পশ্চাতে ফিরে গৃহিণীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম মস্তকের স্বেদে ও সিন্দূরে তার মুখমণ্ডল এক অদ্ভুত বর্ণে রঞ্জিত হয়েছে। গাত্রের ব্লাউজও ঘর্ম-সিক্ত।

আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে গৃহিণীকে নিয়ে লাইনের বাইরে এলাম। বাহিরের স্নিগ্ধ বাতাসে সুস্থ হয়ে গৃহিণী মৃদুস্বরে বললেন—লাইন ছেড়ে এলে মন্দিরে যাবে না?

বললাম—এভাবে দেব দর্শন আমাদের মত ক্ষীণ বাঙ্গালী বাবুদের সাধ্য নয়। যদি একান্ত দর্শন করতে হয়, আজ পনের মুদ্রা জমা দিয়ে কাল প্রাতে দর্শন করা যাবে।

গৃহিণী বললেন—পূজার ফুল-ডালি কিনলাম, এর গতি কি হবে?

কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হলাম না। উদাস দৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে চেয়ে রইলাম।

মন্দির প্রাঙ্গণ জন-বিরল। কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। যে বাম পার্শ্বের

লাইনের মধ্যে সহস্র যাত্রীদের দেব দর্শনের ব্যাকুল প্রচেষ্টা।

আমাদের তখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। এমন সময় এক যুবক আমার নিকট এসে প্রশ্ন করলেন—আপনারা বালাজী দর্শনে যাবেন?

বললাম—সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি।

যুবক বললেন—আপনারা দু'জন আছেন নির্বিঘ্নে নিয়ে যাব। সাত টাকা লাগবে।

অকূলে কূল দেখতে পেলাম, কিন্তু মনের আবেগ গোপন করে বললাম—সাত টাকা অধিক দাবী করেছ, আমি পাঁচ টাকা দিতে পারি। শেষে ছয় টাকায় রফা করে তার পশ্চাৎ অনুসরণ করলাম।

বাহাদুর ছেলে বটে। এক একটি জংশসন অতিক্রম করতে তাকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। এক স্থানে মন্দির প্রহরীদের সঙ্গে হাতাহাতি কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু পরাস্ত মানলে না। সে-স্থানেও জয়ী হয়ে আমাদের নিয়ে এসে পৌঁছে দিলে একেবারে মন্দিরের বারান্দায়। জয় বাবা বালাজী —আমাদের মত হীন দরিদ্রের দর্শনের সাহায্যে তুমিই হয়তো একে পাঠিয়েছিলে। আমাদের প্রথম কামনা সিদ্ধ হ'ল। কোন যাত্রীকেই মন্দির মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। এখন আমরা ধীর গতিতে বিনাক্লেশে মন্দির দ্বারে ভগবান বালাজীর সম্মুখে হাজির হলাম। আমরা যেন বিহ্বল, স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গেছি। মনে ভাবছি, সত্যিই কি আমরা দুর্লভ বালাজী বিগ্রহের সম্মুখে এসেছি? এই কি ভুবনমোহন বালাজী মূর্ত্তি? আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত যেন আনন্দে হৃদয়ের স্পন্দন রুদ্ধ হয়ে আসছে। প্রণাম করতে ভুলে গেছি। সম্মুখে দাঁড়িয়ে মনের কামনা জানাতে বিস্মরণ হয়ে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছি মহিমাময় মূর্ত্তির পানে।

অধিকক্ষণ সময়ক্ষেপ করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে মূর্ত্তির দিকে চেয়ে অগ্রসর হচ্ছি। দ্বারের এ প্রান্তে এসে আর একবার দেখলাম বালাজীর মোহনরূপ।

ক্রমে দ্বার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলাম মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে। এবার মন্দিরের দিকে তাকালাম। বৃহৎ মন্দির, বৃহৎ গম্বুজ। মন্দিরের নিম্নভাগে ছয় ফুট পরিমাণ মর্মরে অতি সূক্ষ্ম শিল্প কারুকার্য। উপরিভাগে সমগ্র

গম্বুজ স্বর্ণপাতে আবৃত। সূর্য-কিরণ প্রতিফলিত হয়ে নয়ন ঝল্‌সে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আমাদের সাহায্যকারী দেবদূত আমাদের নিকট উপস্থিত মাত্র তার হাতে ছয়টি মুদ্রা দিলাম।

গৃহিণী তখনও পূজার ডালি, ফুল, মালা হাতে নিয়ে আছেন। আমাকে বললেন · আমরা যে মন্দিরে পূজা দিতেই ভুলে গেছি এখন উপায়?

যুবকটি বললেন—মন্দিরে কোন যাত্রীর পূজা লওয়া হয় না। আপনারা ভুল করেন নি, আমার সঙ্গে আসুন পূজার স্থানে নিয়ে যাই।

মন্দিরের সম্মুখে একটি উচ্চ নাট মন্দির। তারই নিম্নভাগে প্রজ্জ্বলিত হোম-কুণ্ড। এক সৌম্য মূর্ত্তি পুরোহিত পূজায় রয়েছেন, বহু ঘৃতের প্রদীপও প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় দেখলাম।

যুবক বললেন—এই স্থানে পূজার ডালি পুরোহিতের হাতে দিন। ডালিতে প্রদীপ জ্বেলে দিন আর ফুল, পুষ্পমাল্য আপনি স্বহস্তে হোম-কুণ্ডের পাশে নিক্ষেপ করুন। আপনার মনের বাসনা ভগবান্ বালাজীর নিকট জ্ঞাপন করুন।

পূজা সমাপনান্তে অর্দ্ধখণ্ড নারিকেল-প্রসাদ, একটি কদলী ও হোম-কুণ্ডের বিভূতি আর অন্তরে অপার আনন্দ নিয়ে রেষ্ট-হাউসে ফিরলাম।

আহারের পর গৃহিণী বললেন—কি সুন্দর এই ধর্মশালার ব্যবস্থা। একখানি ঘরের মধ্যে একটি ছোট পরিবারের সমস্ত ব্যবস্থা করা আছে। কলকাতায় এমন একটা ঘর পেলে লোকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে শয়নঘর, খাওয়ার ঘর, বসবার ঘর সব ব্যবস্থা করে নিত। কল-পায়খানা, ভাল রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর তো আছেই।

বললাম—ব্যবস্থা ভালই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু এক দিনের বেশী থাকার নিয়ম নেই। হয়তো আবেদন করলে কৃপা পরবশ হয়ে আরও এক দিন থাকার অনুমতি পাওয়া যেতে পারে।

গৃহিণী বললেন—বিনা আবশ্যকে থাকার দারকারই বা কি?

বললাম—ঠিক কথা। সেই জন্যই বলছি, এখন বিশ্রাম না করে, এ পাহাড়ে যা দেখার আছে চলো দেখে আসি।

গৃহিণী বললেন—যা দেখবার তা দেখেছি। পাপনাশিনী দেখেছি ভালভাবে।

বালাজী দর্শন হয়েছে। কালকের দিন বিশ্রাম নিয়ে পরশু চলে গেলেই হবে। এখন একটু শুয়ে পড়। সন্ধ্যার পূর্বে মন্দিরের পাশে বাজারের দিকে গিয়ে দু'টি টুপি কিনতে হবে। দোকানে দেখে এসেছি কি সুন্দর টুপি। মুন্টুর একটা, লালটুর একটা টুপি নিয়ে যাব।

বললাম—দু'দিন এখানে এসেছি। বাজারেও কয়েকবার ঘুরেছি, কিন্তু এমন দুর্লভ বস্তু তো আমার নজরে পড়ে নি। হয়তো নানা ঝামেলায় চোখে অন্ধকার দেখেছি। তবে চলো দেখে আসি তোমার টুপির দোকান।

গৃহিণী বললেন—সে দু'ঘণ্টা বাদে গেলেই হবে। এখন একটু বিশ্রাম কর।

বললাম – বিশ্রাম রাত্রে করা যাবে। সকালে পাপনাশিনী যাওয়ার পথে একস্থানে বিশেষ কিছু দেখবার জিনিস আছে জেনেছি। চলো এখন সেদিকে ঘুরে দেখে আসি।

গৃহিণী দিবা নিদ্রায় বাধা পেয়ে অনিচ্ছায় আয়না-চিরুনী নিয়ে বসলেন। এ রেষ্ট-হাউস থেকে বেরিয়ে গৃহিণীর সন্তোষ বিধানার্থে গেলাম বাজারের দিকে। টুপির দোকানে গিয়ে দেখলাম নানা বর্ণের লোমযুক্ত উচ্চ ধরণের পেশোয়ারী টুপি। এখানে যে ভক্তরা এসে মস্তক মুণ্ডন করেন তাঁদের মধ্যে নব্য-সভ্য যুবক বা সৌখীন সম্প্রদায়ের বাবুরা কেশহীন মস্তক নিয়ে লোক সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা পান। তাঁরা সত্বর এই টুপিতে মস্তক আবৃত করে লজ্জা ও অসভ্যতা ঢেকে ফেলেন। এক একটির মূল্য সাত টাকা থেকে বারো-চৌদ্দ টাকা। দুঃখের বিষয় কিংবা সুখের বিষয় সমস্ত দোকনগুলি অনুসন্ধান করে শিশুদের মস্তকের উপযুক্ত টুপি পেলাম না। এক ভদ্রলোক আশা দিলেন কাল অপরাহ্নে আনিয়ে রাখবেন। পরদিন সন্ধ্যায় তাঁর দোকানে গিয়েছিলাম কিন্তু বালাজীর কৃপায় তিনি আমাদের ইপ্সিত দ্রব্য দিতে অপারগ হওয়ায় অন্ততঃ আমার দশটি টাকা লোকসানের হাত থেকে অব্যাহতি পেল।

টুপির দোকান ছেড়ে কয়েকটি দোকান ঘুরে গৃহিণী একটি ছবির দোকানে প্রবেশ করে বিভিন্ন আকারের কয়েকখানি ভগবান বালাজীর মূর্ত্তির চিত্রপট ক্রয় করলেন। দোকানে বেশ বড় আকারের চিত্রপটও দেখলাম। আমি দক্ষিণ ভারতে প্রতি দোকানে ও গৃহস্থের বাড়ীতে এই বালাজীর আলেক্ষ্য

সজ্জিত দেখেছি। দোকানে দোকানে গণেশ মূর্ত্তির মত শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন তাতে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করতে দেখেছি।

এগুলি সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলাম পাপনাশিনী সরোবর যাওয়ার পথে। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম পথের পার্শ্বে একসারি ভিক্ষুক ভিক্ষার আশায় পাত্র নিয়ে বসে আছে। কয়েকখানি চা-কফি ও পান সিগারেটের দোকান। এই দোকানদারদের নিকট জানলাম দক্ষিণভাগে কিছুদূর গেলে দেখবেন একটি ঝরণা ও তার সন্নিকটে একটি গুহা। এই গুহার নাম পাণ্ডব-গুহা, কুন্তী দেবীসহ পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি গুহায় দেখতে পাবেন।

পাণ্ডব-গুহা দর্শনে গেলাম। অসমতল পাহাড় পথ। স্থানে স্থানে পথের পার্শ্বে জঙ্গল। আমাদের মত আরও অনেকে চলেছেন। গৃহিণীর এ-পথে যাওয়ার আদৌ ইচ্ছা নয়। কারণ অসমতল পথে পতনের সম্ভবনা। পাশের জঙ্গল থেকে হিংস্র জন্তুর আবির্ভাবও অসম্ভব নয়। তাঁর পুণঃ পুণঃ নিষেধ সত্ত্বেও একপ্রকার জিদের বসেই চলেছি।

সাবধানে পদক্ষেপ সত্ত্বেও অকস্মাৎ আমার পতন ঘটল। সামান্য লঘু পতন। আঘাতও কিছু অনুভব করলাম না। কিন্তু পেলাম গৃহিণীর তীব্র তিরস্কার। এরূপ একটা বিপদ ঘটবেই গৃহিণী নাকি পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন।

তিনি বললেন—অদৃষ্টে যা ছিল তা লাভ করেছ। এখন দুঃসাহসিক কাজে নিবৃত্ত হয়ে রেষ্ট-হাউসে ফিরে চল।

গায়ের ধুলা ঝেড়ে পুনরায় চলতে শুরু করলাম। কিছুদূর এসে দেখতে পেলাম সম্মুখে একটি পাহাড় ও একটি ঝরণা। মনে হয় সেই পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে অজানা পথে চলেছে। এর পর আমরা সেই পাহাড়ের নিম্নে একটি প্রশস্ত স্থানে এসে হাজির হলাম। এখানে দেখলাম আর একটি ঝরণা পর্বত-গাত্র থেকে আছাড় খেয়ে একটি বৃহৎ গুহার সম্মুখ দিয়ে কল-কল শব্দে চলেছে। এই গুহাটি সেই পাণ্ডব-গুহা।

প্রথমে দেখলাম সেই গুহার অনতিদূরে একটি কুটীরে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে। প্রথম দর্শনেই বেশ উপলব্ধি করলাম ইনি ভিক্ষা-উপজীবী সাধারণ সন্ন্যাসী নন। আমরা তাঁর সন্নিকটে এসে দাঁড়ালাম। কয়েকজন

ভক্তকে তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট দেখলাম। গৌরবর্ণ, বিশাল বক্ষ, স্বাস্থ্যবান্, সর্বাঙ্গে বিভূতি মণ্ডিত। দৃষ্টি স্থির। আমরা কয়েক মিনিট তাঁর কুটীরের দ্বারে অপেক্ষা করে কোন আহ্বান পেলাম না। যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন তাঁরাও নীরবে সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে আছেন।

গুহার দিকে এলাম। এ-স্থানে কয়েকজন অনুরূপ সন্ন্যাসীকে দেখলাম। তাঁরা সম্মুখে উপবিষ্ট কতিপয় ভক্তকে ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছেন। আমরা সে-স্থানে অপেক্ষা করতেই জনৈক সন্ন্যাসী এসে আমাদের গুহার নিকটে নিয়ে গেলেন। গুহা সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় দিলেন। ত্রেতায় ধৃতরাষ্ট্রের তাড়নায় ভীত হয়ে পঞ্চ-পাণ্ডব কুন্তী দেবীসহ এই গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। দেখলাম কয়টি প্রস্তর মূর্ত্তি সে-স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। এগুলি পূজা হয়েছে তারও নিদর্শন পেলাম। মূর্ত্তিগুলি পুষ্প ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত। সন্ন্যাসীর নিকট আরও শুনলাম—একদা কুন্তী দেবী পিপাসায় কাতর হওয়ায় ভীম সেন গদার আঘাতে পর্বত-গাত্রে জল নিষ্কাষণ করে কুন্তী দেবীর পিপাসা নিবৃত্ত করেন। গুহার পার্শ্বে দেখলাম সেই জলধারা। গুহার সম্মুখভাগেও প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

গৃহিণী সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলেন—ঐ কুটীরে যে সন্ন্যাসী রয়েছেন উনি কে?

সন্ন্যাসী বললেন—উনি ভগবান সোহং মহারাজ। সকল সময় এখানে থাকেন না, মধ্যে মধ্যে আসেন।

গৃহিণী বললেন—কোথা থেকে আসেন?

সন্ন্যাসী বললেন—কিছু ঠিকানা নেই। ওঁর ডেরারও পাত্তা নেই। এখন এখানে আছেন। এরপর কোথায় যাবেন তারও কোন ঠিকানা নেই। সাধারণ লোকের সঙ্গে বাতও করেন না। বহুত ভারী ভারী আদমী দর্শন করার জন্য আসে। মহারাজ কুছ বাত বলেন না।

অকস্মাৎ গৃহিণী আমাকে কি যেন দেখার জন্য ইঙ্গিত করলেন। দেখলাম একটি উচ্চ শৈলখণ্ডের উপর আমাদের পরিচিত ঘেঁটু পদ্মাসন হয়ে চক্ষু মুদে রামকৃষ্ণের মত ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। বেশ কিছুক্ষণ তাঁর ধ্যানস্থ ভাব দেখলাম। সত্যই যেন কুমারী গিরিকুমারী উমা শিলাখণ্ডের উপর যোগাসনে বসে মহাযোগী মহেশ্বরের ধ্যানে মগ্না। নিস্পন্দ নির্বিকার ভাব।

সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়েটি কতক্ষণ এসেছে ?

সন্নাসী বললেন—ও মাইজীকে চার রোজ ইধার দেখছি। রোজ বিকালমে আসে, তিন চার ঘড়ি থাকে। মহারাজকা পাশ কুছ বাতচিত বলে, খুসি হলে চলিয়ে যায়। বড়া ঘর কা ঔরৎ মালুম হয়। ভারি পড়া লিখা জানা ঔরৎ, বহু দয়া ভক্তি। ভগবান মহারাজ কা ওয়াস্তে বহুৎ ফল, মিঠাই লে আসে। মহারাজ কভি কুছ লেতা, কভি লেতাভি নেই, হামলোগ্ খাতা হ্যায়। এক রোজ হামলোগ্‌কো ধোতি, কম্বল দিয়া থা। ও মাইজী আসলীভগবতী আছে।

নবীন তপস্বিনীর যোগ ভঙ্গ না করে সন্ন্যাসীদের কিছু প্রণামী দিয়ে কুটীরস্থ সাধু মহারাজের কুটীর-দ্বারে এলাম। এখনও মহারাজকে এক-ভাবেই দেখলাম। কুটীরের সম্মুখে এসে দেখলাম কয়েকজন ভাস্কর ছেনী-হাতুড়ী নিয়ে বসে আছে। যাত্রী দেখলেই এই পথের উপর সমতল পাথরে তাঁদের নাম খোদাই করে কিছু অর্থ উপার্জনের আশায় অপেক্ষা করছে। লক্ষ্য করলাম পথের উপর বেশ কিছু স্থানে নানা ভাষায় নাম খোদাই করা আছে। তারা এসে আমাদেরও নাম খোদাইয়ের জন্য অনুরোধ করলে। মজুরী যে কোন ভাষায় অক্ষর প্রতি এক আনা কিংবা পাঁচ নয়া পয়সা।

ঘেঁটুর গলা পেলাম। সে ধ্যানে ভঙ্গ দিয়ে, শিলা থেকে নেমে আমাদের নিকটে এসে বললে—কাকীমা, আপনারা কবে এলেন ? কোথায় আছেন ? আমি বললাম—আমরা কাল বিকেলে এসেছি। রেষ্ট-হাউসে আছি। তুমি কবে এলে ?

সে বললে—আমি চার-পাঁচদিন এসেছি। রেষ্ট-হাউসে ছ'এক দিনের বেশী থাকতে দেয় না। আমি রেষ্ট-হাউসের কাছে একটি বাড়ীতে আছি। হায়দ্রাবাদের এক ভদ্রলোক একখানি বাড়ী নিয়েছেন মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায়। তাঁরা চেঞ্জে এসেছেন। কিছুদিন থাকবেন। বাড়ীতে তিনখানি ঘর আছে, আমি তাঁদের একখানি ঘর নিয়েছি।

গৃহিণী বললেন—সে কথা পরে হবে। এখন তপস্যায় ভঙ্গ দিয়ে চলে এলি কেন ?

ঘেঁটু বললে—আপনাদের দেখে চলে এলাম। বেশীক্ষণ ভাল লাগে না।

আমি বললাম—আমরা মুগ্ধ হয়েছি তোমার ধ্যানমগ্ন অবস্থা দেখে। এ-পথ তোমারই উপযুক্ত। একজন উপযুক্ত গুরুর সংস্পর্শ ও কৃপা আবশ্যক! তাঁর পরিচালনায় তুমি এ-পথে অগ্রসর হতে পারবে।

ঘেঁটু বললে—আমার প্রথম গুরু আপনি। আপনি আমাকে বলেছিলেন সাধনার পথে শান্তি পাওয়া যায়, ভগবানকে জানা যায়। তারপর এখানে এসে ঐ বাবা সাধুমহারাজকে পেয়েছি। আমার ইচ্ছা ওঁকে জানিয়েছি। উনি বললেন—এখনও তোমার সময় হয় নি। আরও কিছুদিন পরে আসবে তখন তোমাকে দেখতে হবে। তারপর হবে তোমার দীক্ষা। তবে উনি আমাকে প্রাথমিক যোগ অভ্যাসের কিছু ক্রিয়া দিয়েছেন। আমি চেষ্টা করছি সেগুলি অভ্যাস করতে। চলুন, এখন আপনাদের সঙ্গেই যাব। একটু অপেক্ষা করুন।

এই কথা বলে সে সেই সাধুমহারাজের কুটীরে গিয়ে তাঁর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

এখন সাধুর কণ্ঠস্বর শুনলাম। তিনি ঊর্ধ্বদিকে বাহু তুলে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—সোহং।

তারপর আমরা সকলে রেষ্ট-হাউসের দিকে এলাম।

গেলাম ঘেঁটুর ঘর দেখতে। রেষ্ট-হাউসের পশ্চিম দিকে কয়েকখানি একতলা ভবন। এগুলি সবই নূতন প্রস্তুত হয়েছে। এইগুলির মধ্যে একটি বাড়ীর এক কক্ষে ঘেঁটু স্থান নিয়েছে। এ বাটীর আসল ভাড়াটিয়ার সঙ্গে আলাপ করলাম। ভদ্রলোক হলেন পাঞ্জাবী, নাম পান্নালাল। তাঁর পিতার আমল থেকে হায়দ্রাবাদে আফজলগঞ্জে তাঁদের কারবার। যতি-বাজারেও কাপড়ের দোকান। ভদ্রলোক স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্রকে নিয়ে এখানে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীকেও দেখলাম, নাম চন্দু। ভাল বুঝতে পারলাম না। মনে হয় চন্দ্র কি চন্দ্রিমার অপভ্রংশ অবস্থায় চন্দু হয়েছে। এর না-কি স্বাস্থ্য ভাল নয়, সেজন্য এখানে কিছুদিন থাকবেন, স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য। মহিলাকে দেখে তাঁর পরিপুষ্ট দেহে অস্বাস্থ্যের কোন চিহ্নই দেখলাম না। তারপর বালাজীর স্থানে এসে পাপনাশিনীতে কেশ বর্জন

করে যেন ডানলপ টায়ারের বিজ্ঞাপনের ছবির মত দেখাচ্ছে। ভগবান বালাজীর নিকট তাঁর স্বাস্থ্যের নিরাময় কামনা করলাম। পান্নালালবাবু আমাদের চা-বিস্কুট ও পাঁপড় খাওয়ালেন। ভদ্রলোক তাঁর হায়দ্রাবাদের ঠিকানা দিয়ে তাঁর বাটীতে আমাদের যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন। পরদিন প্রাতে সর্বাগ্রে গেলাম রেষ্ট-হাউসের ম্যানেজারের নিকটে। আমাদের দরখাস্তে এক দিনের অবস্থানের জন্য মঞ্জুর আছে। সেটিকে পরিবর্ত্তন করে আজকের জন্য সময় বৃদ্ধি করার আবশ্যক ছিল। হাসিমুখেই তিনি আবেদন মঞ্জুর করলেন। পরে জেনেছিলাম আইন যতই কড়া হোক যাত্রীরা এইভাবেই অবস্থানের মেয়াদ বাড়িয়ে নেন। শুনলাম অনেকে সপ্তাহকালও কাটিয়ে দেন।

ঘরে এসে দেখলাম ঘেঁটু স্নান করে মন্দিরে পূজো দিয়ে ভগবান বালাজীর প্রসাদ নিয়ে আমাদের দিতে এসেছে।

বললাম—তুমি কি আজ মন্দিরে গিয়ে বালাজী দর্শন করে এলে ?

ঘেঁটু বললে—আমি আর একদিন দেখেছি আজও দেখতে গেলাম।

গৃহিণী বললেন—ঘেঁটু দু'দিনই টিকিট নিয়ে দেখে এসেছে। ওর কোন কষ্ট হয় নি, আমাদের দর্শনের কথা এতক্ষণ ঘেঁটুকে বলছিলাম।

বললাম—লাইন দিয়েই হোক আর টিকিট করেই হোক ভগবানের দর্শন পেলেই আনন্দ।

ঘেঁটু বললে—আমি তো দু'দিন তাঁর দ্বারে গিয়ে দেখে এলাম। তিনি তো আমার পানে চেয়ে দেখলেন না। কথাটি বলেই যেন তার চোখ জলে ভরে গেল।

কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপর না বুঝেই বললাম—ভগবান বিশ্বের সকলকেই দেখছেন, তোমাকে বাদ দেবেন কেন ?

ঘেঁটু বললে—না, না কাকাবাবু, তিনি কি যেন চন্দন না কি দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছেন।

এখন তার বক্তব্য অনুধাবন করে বললাম—যা দেখবার উনি চোখ ঢেকেও দেখতে পান। সবই দেখেন। তবে তুমি যে তাঁকে উপঢৌকন দিয়ে, লোভ দেখিয়ে কাজ হাসিল করে আসবে তাঁর কাছে তা হবে না। তুমি

হয়তো দেখেছ পুরীর মহাপ্রভু জগন্নাথ বিগ্রহকে, তাঁর হাত নেই। তিনি তোমায় আমায় সকলের কাছে জানাচ্ছেন তোমার ভাগ্যই সব। সেই ললাটের লেখা মোছবার হাত আমার নেই। ভগবান বালাজীও হয়তো তাই বলছেন—তোমার ভাগ্যই সামর্থ, এর অধিক কিছু দেখার প্রয়োজন আমার নেই।

গৃহিণী বললেন -- ও-সব তত্ত্বকথা এখন রেখে দাও। ঘেঁটু নারকেল প্রসাদ এনেছে। দোকানে গিয়ে কিছু মুড়ি আর মিষ্টি যা পাও নিয়ে এসো। ঘেঁটুর আবার আজ খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে হয়েছে। মুড়ি-চা খেয়ে একবার বাজারে যেতে হবে।

গৃহিণীর রন্ধন সমাধা হতে সকলে আহারে বসলাম।

ঘেঁটু বললে—কাকীমা, সেদিনের মাদ্রাজের অপেক্ষা আজ আরও ভাল হয়েছে। আবার যে কবে আপনার হাতের রান্না খাব জানি না।

গৃহিণী বললেন--কাল আমাদের সঙ্গে চল্। আমরা যেখানে রান্না করে খাব তুইও খাবি।

ঘেঁটু বললে—আপনারা কালই চলে যাবেন ? কোথায় যাবেন, রামেশ্বর ?

আমি বললাম—এদিকে এসে শুনেছি কাছাকাছি অনেকগুলি দেখবার মত স্থান ও দেবালয় আছে, যতগুলি সম্ভব হয় দেখে যাব রামেশ্বরে।

ঘেঁটু বললে—কোদাই কানাল হয়ে যাবেন ?

বললাম—না। প্রথমে যাব ভেল্লোর তিরুবন্নমাল্লাই। তারপর চিদম্বরম, কুম্ভকোনম্ আরও কি যেন আছে সেগুলি দেখবার ইচ্ছা আছে।

গৃহিণী বললেন—পণ্ডিচেরী কোথায় আছে এদিকে, সেখানেও যাব। এই সময় শ্রীমার জন্মোৎসব। দেশ-দেশান্তর থেকে বহুলোক আসে। আমাদের সঙ্গে চল্ না দেখবি। যদি ভগবানের কৃপা হয় তুইও একদিন শ্রীমা হয়ে যেতে পারিস !

ঘেঁটু বললে—দেখি যদি গুরু সোহং মহারাজের আদেশ পাই। ইনি তাঁর পাশে কিছুদিন আমাকে থাকতে আদেশ করেছেন।

আহার শেষ করে ঘেঁটু বললে—আজ আপনারা যাবেন পাণ্ডব-গুহার দিকে ?

গৃহিণী বললেন—এখন আর যেতে পারব না। কাল আবার আমাদের চলে যেতে হবে। জিনিষ-পত্র গোছগাছ করে রাখতে হবে। তাড়াতাড়ি না গেলে ট্রেন ধরতে পারব না।

ঘেঁটু বললে—কাল সকালে এসে আপনাদের বাসে তুলে দেব। এখন চললাম।

পরদিন প্রত্যুষে মাল-পত্র নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম। ছয়টা থেকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে। টিকিট করা ও মাল ওজন করাতে যথেষ্ট সময় যাবে।

ঘেঁটু এসে বললে—বাস স্ট্যাণ্ডে একটা চায়ের দোকানে বাসের টিকিট পাওয়া যায়। প্রতি টিকিটের জন্য এক টাকা বেশী দিতে হবে।

আমি রাজি হলাম না। নিজের চেষ্টায় টিকিট করতে যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছি তা পূর্বেই বলেছি। প্রায় তিন ঘণ্টা ত্বর্ভোগের পর টিকিট নিয়ে মাল ওজন দিয়ে বাসে বসলাম। সাড়ে আটটায় বাস ছাড়ল। আমরা তিরুপতি ষ্টেশনে এসে পৌঁছিলাম সাড়ে ন'টায়। ষ্টেশনের ক্যানটিনে ভাত খেলাম, দাম নিলে প্রতিজনের এক টাকা চার আনা। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। খরিদ্দারের প্রতিও বিশেষ যত্ন নেয়।

ভেল্লোর তিরুবন্নমালাই

সাড়ে দশটার ট্রেনে কাটপাড়ি অভিমুখে রওনা হলাম। ট্রেনে বিশেষ যাত্রী ছিল না। সে কারণ আমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় নি কিন্তু নানা চিন্তায় মানসিক শান্তি ছিল না। প্রধান কারণ আমরা কাটপাড়িতে যাব প্রায় তিনটায়। তারপর সেখানে প্রায় পাঁচটার ট্রেনে উঠে যেতে হবে তিরুবন্ন-মালাইয়ে—নামব প্রায় রাত্রি আটটায়। নূতন স্থান। ধর্মশালা আছে কি-না জানি না। লজ-হোটেলও অজ্ঞাত।

চিত্তুর ষ্টেশনে আমাদের কামরায় উঠলেন এক ভদ্রলোক। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। জ্ঞাত হলাম তিনি স্কুল শিক্ষক।

নাম নটরাজন। থাকেন ভেল্লোরে। এঁর পিতা রেলওয়েতে কাজ করতেন। বাল্যকালে ছিলেন বাঙ্গলা দেশে আসানসোলে। সে কারণ বাংলা ভালই জানেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেলাম কাটপাড়ি ষ্টেশনে। আমি মাল-পত্র নামাবার জন্য কুলি ডাকতে তৎপর হলাম।

নটরাজন বললেন—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই ট্রেনই আপনাদের গন্তব্যস্থান তিরুবন্নমালাইয়ের উপর দিয়ে যাবে ভিলিপুরম্। আপনি এই কামরায় নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন। পুনরায় ট্রেন ছাড়বে দু'ঘণ্টা পরে, বেলা প্রায় পাঁচটায়।

গৃহিণী শুনে বললেন—দু'ঘণ্টা আমাদের এখানে বসে থাকতে হবে এই ট্রেনে? এর পূর্বে আর কোনও ট্রেন নেই?

নটরাজন বললেন—এ পথে ট্রেনের সংখ্যা অতি অল্প। তবে বাস পাওয়া যায় কিন্তু ট্রেনের আগে পৌঁছতে পারবেন না। আপনাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

আমি বললাম—অপেক্ষা করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে দিনের আলোয় নূতন স্থানে হাজির হলেই আমাদের সুবিধা।

নটরাজন বললেন—সেরূপ সুবিধা দেখছি না। এক ব্যবস্থা হতে পারে আজ ভেল্লোরে নেমে সহরটা দেখে যান। কাল প্রাতে ন'টায় কিংবা সন্ধ্যার ট্রেনে তিরুবন্নমালাইয়ে যাবেন। লজ-হোটেলের সব সুবিধা আছে। আমার বাড়ীতেও দু'একদিনের জন্য থাকার অসুবিধা হবে না। ভেল্লোর হসপিটালের একজন ডাক্তার আছেন—মিঃ মুখার্জী। বাঙ্গালী। কলকাতার লোক। আবশ্যক হলে সেখানেও থাকতে পারবেন। আমার বিশেষ পরিচিত। বেশ পপুলার লোক।

গৃহিণী আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললেন—জিজ্ঞাসা কর না সেখানে কি কি দেখবার আছে?

গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারে নটরাজনকে প্রশ্ন করলাম—মাষ্টার মশাই, ভেল্লোরে দেখবার কি আছে?

তিনি বললেন—ভেল্লোরের প্রধান আকর্ষণ এ-স্থানের প্রাচীন দুর্গ। চোল ও বিজয় নগরের রাজাগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এইস্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন।

ভেল্লোর ছিল তাঁদের রাজধানী। পরে মারাঠাগণ ভেল্লোরের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। মনে হয় মারাঠাগণ এই দুর্গ মধ্যে শঙ্কর মন্দির নির্মাণ করেন। এই দুর্গ আর দুর্গ মধ্যে শঙ্কর মন্দিরের স্থাপত্য শিল্প বিশেষ আকর্ষণীয়।

এখানে অতি অল্পদিনেই কৃষির উন্নতির চেষ্টা বিশেষ ভাবে সাফল্য দেখিয়েছে। এ সময় গেলে দেখতে পাবেন মার্কেটে স্তূপাকার সব্‌জি। মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি সহর থেকে ব্যাপারীরা এসে এখান থেকে পণ্য রপ্তানি করে। মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনাও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। বিদেশেও এর যথেষ্ট সরবরাহ হয়ে থাকে। আর আছে এ-স্থানের বিখ্যাত হসপিটাল। মাদ্রাজের পার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থান থেকে রোগীরা আসেন চিকিৎসার জন্য। চক্ষু চিকিৎসার জন্য এ-স্থানের বিশেষ খ্যাতি আছে।

গৃহিণী বললেন—ফোর্ট কি পাহাড়ের উপর? ভেল্লোর ষ্টেশন থেকে ফোর্ট দেখতে কতদূর যেতে হবে?

নটরাজন বললেন—এ দুর্গ পাহাড়ের উপর নয়। ভেল্লোর টাউন ষ্টেশনের সামন্য দূরে ফোর্ট দেখতে পাবেন, রেল লাইনের পাশেই। তবে এর প্রবেশ পথ টাউন ষ্টেশন থেকে যেতে প্রায় এক মাইল পথ। ট্রেন থেকেই আপনারা ফোর্ট আর শঙ্কর মন্দির দেখতে পাবেন। বেশ বড় ফোর্ট। টাউন ষ্টেশন থেকে ভেল্লোর ক্যান্টনমেণ্ট পর্যন্ত দীর্ঘ ফোর্টের পরিধি।

গৃহিণী আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি গো, ভেল্লোরে নামবে না কি?

বললাম—নামতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু দর্শনীয় একমাত্র দুর্গ আর শঙ্কর মন্দির দেখতে বেশ কিছু ব্যয় হবে। বিশেষ দেবস্থান নয়, ধর্মশালা আছে কি-না জানি না। লজ্‌-হোটেলে থাকতে অযথা চার্জ দিতে হবে। তারপর কুলি, গাড়ীভাড়া তো আছেই। সামান্য সখ মেটাতে পরের গলগ্রহ হতে ইচ্ছা করি না।

গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—এত বড় একটা সেকালের দুর্গের পাশ দিয়ে যাব আর সামান্য পয়সা খরচের ভয়ে নেমে দেখলে না। ভাল মহাদেব মন্দিরও আছে শুনলাম।

নটরাজন হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট

পনের বিলম্ব আছে, যদি ভেল্লোরে আমার আলয়ে একদিন থাকার ইচ্ছা করেন আমাকে নিঃসঙ্কোচে জানালে আনন্দিত হব। আপনারা মন স্থির করে বলবেন, আমি এখনই আসছি বলে তিনি ট্রেন থেকে নেমে গেলেন।

গৃহিণী বললেন—গাড়ীখানা যদি এই কাটপাড়ি ষ্টেশনে এতক্ষণ না থেমে ভেল্লোরে গিয়ে ছু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতো, আমরা অনায়াসে নেমে একটা গাড়ী নিয়ে ফোর্টটা দেখে আসতে পারতাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে নটরাজন ছু'কাপ কফি ও মাদ্রাজী বড়া এনে আমার হাতে দিলেন।

ট্রেন ছাড়ল। আমি নটরাজনকে বললাম—আপনার মত সদাশয় লোক পেয়েও এ-যাত্রায় আমাদের ভেল্লোর দেখার সুবিধা হ'ল না। যদি সম্ভব হয় এদিকে এলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। আপনার ঠিকানা ডাইরীতে লিখে দিন।

ঠিকানা লিখে ডাইরীটি আমার হাতে দিয়ে বললেন—যদি কোন দিন আসেন, ভেল্লোর টাউনে নামবেন না। আমার বাড়ী ভেল্লোরের পশ্চিম প্রান্তে। ভেল্লোর ক্যান্টনমেণ্টে নামলে আমার বাড়ী পাঁচ মিনিটের পথ। ট্রেন থেকে আমার বাড়ী দেখা যায়। ট্রেন ভেল্লোর ষ্টেশনে হাজির হ'ল। নটরাজন বললেন—এই দেখুন ভেল্লোর সহর। এদিকে সকল লোকে ভেল্লোরকে ভেলুর বলে।

দেখলাম বেশ জমকাল সহর। ষ্টেশনের নিকটে কয়েকখানি বাস ও ঝটকা দেখলাম। আর দেখলাম ছেলেদের ঠেলা পেরামবুলেটারের মত সাইকেল রিক্সা।

গৃহিণী বললেন—সাইকেলের সঙ্গে ছেলেদের এমন ঠেলাগাড়ী কলকাতায় পাওয়া যায় না। নামতে পারলে কোনখানে দোকান জেনে নিয়ে লালটুর জন্য একটা নিলে হতো।

নটরাজন শুনে বললেন—ওগুলি ভেলুরের রিক্সা। এ সাইজের ছোট রিক্সা আপনি আর কোন স্থানেই দেখবেন না। একজনের অধিক লোক এতে লওয়া হয় না। পাহাড়ে রাস্তা, সে কারণেই এই ব্যবস্থা।

ট্রেন ষ্টেশন ত্যাগ করে চলতে শুরু করল। ষ্টেশনের সন্নিকটে দেখলাম বহু লোকজন জমায়েত হয়ে কলরবে মুখরিত হয়েছে।

গৃহিণী লক্ষ্য করে বললেন—বোধহয় কোন গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে এখানে, তাই অনেক লোক জমা হয়েছে।

নটরাজন বললেন—ঐ সব্‌জি মারকেট। এদিকের পার্শ্ববর্ত্তি স্থানের ব্যাপারিরা এসে এ-স্থানে সব্‌জি নিয়ে যায়। ঐ দেখুন, বস্তাবন্দি আলুর স্তূপ। এগুলি আপনাদের দেশের নাইনিতাল জাতীয় আলু নয়। এক প্রকার মিষ্টি আলু।

গৃহিণী বললেন—মনে হয় শকরকন্দ আলু। এত শকরকন্দ আলু এখানে কি হয়?

নটরাজন বললেন—আপনারা যে পটেটো চিপ খান না, এ-স্থানে তারই বিরাট ফ্যাক্টরী ও আড়ৎ। দু'একদিন থাকলে আপনাদের প্রিয় বস্তু প্রচুর মাছ দেখতে ও খেতে পারতেন। এখানে ফিসারীর উন্নয়ন পরিকল্পনা বেশ কার্যকরী হয়েছে। ঐ দেখুন, ঐ যে জলের ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে ওই ট্যাঙ্কের নিকটেই ভেলুর হসপিটাল। এইবার এখান থেকে ফোর্ট আরম্ভ হ'ল।

দেখলাম বৃহৎ দুর্গ প্রাচীর। ট্রেন থেকে দুর্গ অভ্যন্তর স্পষ্ট দেখা যায়। দুর্গ মধ্যে সেনা নিবাস, দরবার হল্ ও প্রাসাদের কক্ষগুলি দেখলাম। দুর্গ প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে নানা ফল ও পুষ্প বৃক্ষের আধুনিক উদ্যান দেখা যাচ্ছে। তারপর দেখলাম সেই বহুখ্যাত প্রাচীন শঙ্কর মন্দির। ট্রেন থেকেও মন্দিরের কারুকার্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তারপরই এলাম ভেল্লোর ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে।

আমাদের পথের বন্ধু নটরাজনকে বিদায় দিয়ে মনটা অনেকখানি দমে গেল। মানসিক দুর্বলতা লঘু করার উদ্দেশ্যে গলা ঝেড়ে গৃহিণীকে বললাম—তোমার ভেলুরে নেমে আর বেশী কি দেখতাম? ট্রেনে বসেই তো সব দেখা গেল।

গৃহিণী বললেন—সিনেমার হলে বসে কতবার বিলেত ঘুরে এসেছি। সেদিনও কি যেন একটা হিন্দী বইয়ে এক হাজার তীর্থ দেখালে। পাঁচ সিকে খরচ করে তীর্থ দেখে এলেই পারতে। এত কষ্ট করে পয়সা

ব্যয় করার দরকার হোত না।

মূকের মত নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম।

ট্রেন এসে হাজির হ'ল আরনি রোড ষ্টেশনে।

গৃহিণী বললেন—এখানেই তো সন্ধ্যে হ'ল, আর কত ষ্টেশন আছে কে জানে?

তাঁর মনে সাহস দেওয়ার অভিপ্রায়ে বললাম—এসে পড়েছি। মনে হয় আর দু'একটা ষ্টেশনের পরেই তিরুবন্নমালাই।

আমাদের নিকটে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। আমাদের বাঙ্‌লা কথাবার্ত্তার মর্ম বুঝে বললেন—কাটপাড়ি থেকে তিরুবন্নমালাইয়ের অর্দ্ধেক পথ এসেছি, এখনও দু'ঘণ্টার পথ বাকী।

এ ভদ্রলোক কোন ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে চলেছেন ভেলুপুরম্। এঁর নিকটে তিরুবন্নমালাই সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছা করলাম। আমার অভিপ্রেত ধর্মশালা কিংবা অবস্থানের সংবাদ বিশেষ কিছু দিতে পারলেন না। তবে সাহস দিলেন সর্ব প্রকারে। তিরুবন্নমালাই একটি বিশিষ্ট তীর্থ স্থান। কার্ত্তিক উৎসবে নানা প্রদেশের বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কয়েকদিনের জন্য বাসস্থানের অভাব হবে না।

আমরা তিরুবন্নমালাই ষ্টেশনে হাজির হলাম। ইতিপূর্বে দু'খানি ট্রেন এসে ষ্টেশনের দু'দিকের প্লাটফর্ম দখল করে আছে। আমাদের ট্রেনটি থামল দু'দিকের প্লাটফর্মের মধ্যে একটি লাইনে। কুলি ডেকে কারও সাড়া পাওয়া গেল না। মাল-পত্র নিয়ে বিভ্রাটে পড়লাম। এই সময় ভদ্রলোক আমাদের অদ্ভুতরূপে সাহায্য করে উদ্ধার করেছিলেন। প্রথমে তিনি আমাদের মাল-পত্র লাইনের ধারে একপাশে নামালেন। তারপর আমাদের দ্রব্যাদির তদারকে রেখে বহু চেষ্টা করে কুলি ও ঝটকা এনে প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আমাদের ব্যবস্থা করে, ট্রেন ছাড়তেই তিনি উঠে পড়লেন। তাঁর এই উপকারে আমরা এমন মুগ্ধ হয়ে গেলাম, যে বিদায়কালে তাঁকে একটা ধন্যবাদ দেওয়ার মত সৌজন্য বোধও ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র কৃতজ্ঞ নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

গৃহিণী সকল সময় সাবধান করেন যেন রাত্রে কোন নূতন স্থানে পদার্পণ

না করি। সকল প্রকার সাবধানতা সত্ত্বেও রাত্রেই এ-স্থানে নামতে বাধ্য হলাম। প্রধান কারণ তিরুপতি থেকে এমন কোন ট্রেন নেই যে দিবালোকে তিরুবন্নমালাই পৌঁছতে পারি। সুযোগ অবশ্য পেয়েছিলাম। যদি মাষ্টার মশায় নটরাজনের অনুরোধে ভেল্লোরে তাঁর আলয়ে থাকতাম। এখন অনুভব করলাম আমার নির্বুদ্ধিতাই এই দুর্ভোগের কারণ।

ভাগ্যক্রমে হিন্দী জানা ঝটকা-চালক পেয়েছিলাম। তাকে বললাম—একটি ভাল ধর্মশালায় কিংবা ভাল বাড়ীতে আমাদের নিয়ে চলো।

ঝটকা-চালক বললে ভাল ধর্মশালা মিলবে না। মন্দিরের পাশে বহুৎ আচ্ছা যাত্রীনিবাস আছে। আপনারা আরামসে থাকতে পারবেন।

বললাম—তোমার জয় হোক, আজকের মত আমাদের উদ্ধার কর।

অল্পক্ষণের মধ্যে একটি বাটীর দ্বারে তার রথ থামিয়ে বললে—আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে আসুন, পছন্দমত কামরা দেখে নিন।

বাটীর অভ্যন্তরে গিয়ে দেখলাম, বাটী তাদৃশ বড় না হলেও বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণের একদিকে একটি তুলসীমঞ্চ, প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে আট-দশটি কামরা। একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা আমাকে কয়েকটি কামরা দেখালেন। বাড়ীতে বিজলী বাতির ব্যবস্থা নেই, কক্ষগুলি গবাক্ষহীন। ভাড়া দৈনিক এক টাকা।

শকট-চালককে বললাম—এখানে বিজলী বাতি নেই, কামরাও ভাল নয়। তুমি অন্য কোন স্থানে নিয়ে চলো।

শকট-চালক বললে—এ মোকানে আপনার সুবিধে হত। ষ্টেশন, মন্দির, বাজার সবই নিকটে। আপনার যখন দিল লাগছে না, অন্য মোকানে নিয়ে যাই।

এরপর আরও দু'টি বাড়ী অনুসন্ধানের পর হাজির করলে একটি ধর্মশালার দ্বারে। এটি অপেক্ষাকৃত বড়, দ্বিতল ভবন। অভ্যন্তরে গিয়ে ম্যানেজারের নিকট কামরার আবেদন করলাম।

তিনি বললেন—'ইল্লা'।

দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় অর্থ হ'ল 'নেই'। আমি কয়েকখানি কক্ষ খালি দেখে দ্বিতীয়বার তাঁকে অনুরোধ করতে উত্তর দিলেন—ও কামরা সাধীর

জন্য ভাড়া দেওয়া আছে।

বাইরে এসে সে কথা ঝটকা-চালককে জানালাম।

সে বললে—একটু দূরে ভাল কামরা পাওয়া যেতে পারে। মন্দির আর বাজার থেকে দূরে হবে।

এই সময় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন—আপনারা কি অনুসন্ধান করছেন?

আমার প্রয়োজন তাঁকে জানালাম।

আমাদের কোথা থেকে আগমন, সঙ্গে কয়জন জানতে চাইলেন।

আমি আমাদের লোকসংখ্যা ও কলকাতা থেকে এসেছি জানালাম।

এবার তিনি শকট-চালককে তাঁর দেশীয় ভাষায় কি যেন পরামর্শ দিলেন। আমাকে বললেন—আমি গাড়ীওয়ালাকে বলে দিয়েছি, আপনাদের আশ্রমে পৌঁছে দেবে।

ঝটকা পুনরায় চলতে শুরু করল। গৃহিণীও স্বর ধরলেন—আমার কথা না শুনে রাত্রে এসে নামলে নূতন জায়গায়। আনাড়ী গাড়োয়ান আজ সারারাত্রি ঘুরে শেষে ষ্টেশনে গিয়ে রাত কাটাতে হবে। টাকাকড়ি সাবধানে রাখ। কোন বদলোকের আড্ডায় না নিয়ে গিয়ে হাজির করে। হট্ হট্ করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? এদিকে তো বাড়ী ঘরও দেখছি না, শুধু বনালয়। পথে বুড়োটা ওকে কি মতলবে কোথায় পাঠাচ্ছে কে জানে?

ঝটকা এসে থামল একটি উদ্যানের সম্মুখে। রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। ঝটকা-চালক আমাকে সঙ্গে নিয়ে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করলে। ফটকের পার্শ্বে একটি কামরায় হাঁক-ডাক করাতে একটি প্রহরী বা কর্মচারী অপরাধীর মত এসে আমাদের সম্মুখে হাজির হ'ল। ঝটকা-চালক তাকে কি আদেশ করলে জানি না। প্রহরীটি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল একটি অফিস কক্ষে।

একটি বিশ-বাইশ বৎসরের যুবক কি যেন কাজে ব্যস্ত ছিল। আমাদের দেখে ত্রস্ত হয়ে উঠে এলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে আমাদের আগমণের কারণ জানতে চাইলেন। আমাদের সব কথা তাঁকে বললাম।

তিনি একটি ফাইল নিয়ে পূর্বাহ্ণে প্রেরিত আমার কোন পত্রাদি আছে কিনা অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

তাঁকে বললাম—এ-স্থান আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, পূর্বে কোন পত্র আমি পাঠাই নি। যদি সম্ভব হয় আমাদের আশ্রয় দিলে বাধিত হব।

এরপর আর কিছুই বলার প্রয়োজন হ'ল না। দেওয়ালে বিলম্বিত 'কী-বোর্ড' থেকে একটি চাবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের অনুসরণ করতে বললেন।

উদ্যানের শেষ প্রান্তে কয়েকটি কামরা। একটি কামরা খুলে বললেন—আপনাদের দু'জনের পক্ষে বোধহয় এতে সঙ্কুলান হবে।

দেখলাম কক্ষ মধ্যে মশারি বিলম্বিত, দুই পার্শ্বে দু'খানি সশয্যা খাট, মাথার উপর বিজলী পাখা, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিলও রয়েছে। শ্বশুর বাড়ীতেও এমন সুব্যবস্থা হয় না। তিনি কক্ষের পার্শ্বে দেখালেন স্যানিটারী শৌচাগার ও স্নানাগার। প্রত্যুষে স্নানের জল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তিনি তাঁদের প্রহরীর দ্বারা মাল-পত্র কক্ষে পৌঁছে দিলেন। ঝটকা-চালককে ভাড়া দিয়ে বিদায় দিলাম।

যুবকটি আমাদের রাত্রের আহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। এঁদের গলগ্রহ হয়ে আহারের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এত রাত্রে এদিকে আহার্য কিছু মিলবে কি-না সন্দিহান হয়ে বললাম—না।

এই কথা বলা মাত্র যুবকটি কক্ষে তালাবন্ধ করে তাঁর সঙ্গে যেতে আহ্বান করলেন।

এই উদ্যানের অপর অংশে দেখলাম একটি বিরাট মন্দির এবং মন্দিরের পশ্চাতে একটি কক্ষে আমাদের সঙ্গে এনে আসন দিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন। আসনের সম্মুখে পড়ল অখণ্ড কলাপাতা, জলের গ্লাস, তারপর গরম অন্ন, ডাল, তরকারী, পাঁপড়, চাটনি ও ঘোল। আমরা যথেষ্ট ক্ষুধার্ত ছিলাম, নিঃশব্দে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে যেন প্রকৃতস্থ হলাম।

আহারের পর একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আমাদের হাতে দিয়ে যুবকটি বললেন—এতে এই আশ্রমের নিয়মাবলী লেখা আছে পড়ে দেখবেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পুস্তিকাটি পড়লাম। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম

লাইনটি দেখে নিজের ভাগ্যের উপর গর্ব অনুভব করলাম। দেখলাম এটি মহর্ষি রমন আশ্রম। শুনেছিলাম এ-স্থানে মহর্ষি রমনের সমাধি আছে, এখন ভাগ্যক্রমে তাঁর আশ্রমে স্থানলাভ করায় পুলকিত হলাম। পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় আশ্রমের নিয়মাবলী ও ব্যবস্থা লেখা আছে। প্রাতে দুগ্ধ বিতরণ থেকে রাত্রি সাড়ে সাতটায় নৈশভোজন পর্যন্ত সময় সঙ্কেত ও তালিকা দেওয়া। বিশেষ বিশেষ দিনে প্রতি শুক্রবার, পূর্ণিমা এবং তামিল-মাসের প্রথম অপরাহ্ণ পাঁচটায় শ্রীচক্র পূজা প্রভৃতি। আহারের ব্যবস্থা সকল সময় দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতির। পরদিন প্রাতে প্রভাতের আলোকে আশ্রমের উদ্যানটি ভালভাবে দেখলাম। এটিকে একটি উদ্যান বলা চলে। ফটকের পার্শ্বে প্রকাণ্ড ভবন বা গেষ্ট-হাউস। যাঁরা একত্রে বা এক পরিবারের ও লোকসংখ্যায় অধিক থাকেন তাঁদের এই সকল গেষ্ট-হাউসে স্থান দেওয়া হয়। আমাদের শয্যা ত্যাগমাত্র উদ্যানের মালী এসে বাথরুমে আমাদের আবশ্যকীয় জল দিয়ে গেল। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে আশ্রমে গেলাম প্রাতঃরাশের উদ্দেশ্যে। সাড়ে ছ'টায় দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা আছে, আমরা কোনদিন এ-সময়ে ইচ্ছাকৃত হাজির হই নি। যে কয়দিন আশ্রমে ছিলাম প্রাতে প্রাতঃভোজন, মধ্যাহ্নভোজন আর রাত্রে নৈশভোজন ব্যতীত কোনদিন যাই নি। অপরাহ্নে চা বা কফি পানের জন্যও নয়।

প্রাতে সাড়ে সাতটায় প্রাতঃরাশের ঘণ্টাধ্বনি হ'ল। আমরা গত রাত্র যে কক্ষটিতে আহার করেছিলাম সে কক্ষে প্রবেশ করে দেখলাম এটি বহু মনীষীর চিত্র বিলম্বিত একশত লোকের উপবেশনের স্থান হতে পারে এরূপ একটি বিরাট হল। কয়েকজন ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। অনেকে নিঃশব্দে এসে আসন নিলেন। একবার চতুর্দিকে চেয়ে দেখলাম গৈরিক-ধারী সন্ন্যাসী থেকে বিলাতী সাহেব, 'মেমও আসন গ্রহণ করেছেন। আমরাও একপার্শ্বে বসলাম। পেলাম দু'খানি ইড্‌লি ও দু'গ্লাস কফি, এ খাদ্যে আমরা অভ্যস্ত। আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে হলের বাইরে এলাম।

এ-স্থানে অপেক্ষা করে লক্ষ্য করলাম সাহেবদের পরিধানে মাদ্রাজী লুঙ্গি, গাত্রে হাফ হাতা :পাঞ্জাবী। এঁদের কয়েকজনকে হাফপ্যাণ্ট ও সার্ট ব্যবহার করতে দেখলাম। মেমদের অঙ্গে ঢিলে গাউন। আহারের পর

সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন।

গৈরিক লুঙ্গি পরিধানে ও গৈরিক পাঞ্জাবী গায়ে এক বয়স্ক বিলাতি ভদ্রলোককে কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি কতদিন এ-স্থানে আছেন?

সহাস্যে উত্তর দিলেন—প্রায় বিশ বৎসর। আমি আনন্দিত ও আশ্চর্য-বোধ করলাম। তাঁর সাথে আলাপে প্রবৃত্ত হলাম। এঁর নাম মিঃ অস্‌বর্ণ। পুর্বে কোন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, বর্তমানে এই আশ্রমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এইস্থানে থাকেন।

আমি তাঁর বাসস্থান ও আহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন—আমি আশ্রমেই থাকি এবং এইস্থানেই আহার করি। দক্ষিণ ভারতীয় আহারে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তিনি আমাকে তাঁর বাংলোয় যেতে অনুরোধ করলেন। আমি তাঁর বাসস্থান দেখার আগ্রহে তাঁর সঙ্গে গেলাম। পাশে গৃহিণী ছিলেন তিনিও আমার সঙ্গে চললেন। আশ্রম সীমানার মধ্যে কয়েকখানি বাঁশের উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া এবং উপরে একপ্রকার পত্রের আচ্ছাদন বিশিষ্ট কয়েকখানি কুটীর। তিনি তন্মধ্যে একটি কুটীরের দিকে সঙ্কেত করে দেখালেন, ঐ তাঁর বাংলো। আশ্চর্য হলাম। এক বিলাতি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের বাসস্থান ঐ জীর্ণ কুটীরে।

ভদ্রলোক দ্বার খুলে আমাদের ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করলেন। গৃহমধ্যে এসে দেখলাম বহির্ভাগ থেকে কুটীরটি যত ক্ষুদ্র অনুমান করে-ছিলাম আসলে তা নয়। কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে পুস্তকপূর্ণ মেহগ্‌নি কাঠের আলমারী। কয়েকখানি মূল্যবান্, চেয়ার, টেবিল, সুন্দর গালিচায় গৃহতল আচ্ছাদিত। একদিকে একটি বৃহৎ টেবিলের সম্মুখে তিনি বসলেন। আলমারীগুলির দিকে সঙ্কেত করে বললেন—আমি এঁদের নিয়েই দিন যাপন করি।

সে দিকে দৃষ্টিপাত করে বললাম—আপনার ধৈর্য ও পাঠানুরাগে আমি মুগ্ধ হয়েছি। জীবনের শেষ পর্যন্ত কি এই স্থানেই অতিবাহিত করবেন মনস্থ করেছেন?

উত্তর দিলেন—ভগবানের যেরূপ ইচ্ছা।

টেবিলের উপর রাখা একখানি ঝক্‌ঝকে পুস্তক হাতে নিয়ে দেখছি।

ভদ্রলোক বললেন—এ একটি মাসিক পত্রিকা। আমি সম্পাদনা করি। এর নাম দিয়েছি 'পাহাড় পথ'। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে লেখা আছে পাহাড় পথ। প্রচ্ছদ পটটিও পত্রিকার নাম উপযোগী হয়েছে। 'একটি পাহাড়ের নিম্নে সঙ্কীর্ণ পথ। এক ক্লান্ত বৃদ্ধ সেই পথের পথিক, পাহাড়ের পশ্চাৎভাগে সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্ছেন।'

তাঁর আলমারী থেকে কয়েকখানি পুস্তক এনে আমাকে দেখালেন। সে গুলির হৃষ্টপুষ্ট কলেবর, বিচিত্র অঙ্গসজ্জা কিন্তু স্পর্শ করি কোন দুঃসাহসে। তত্রাচ সাহস ভরে একখানি পুস্তক খুলে সম্মুখে ধরলাম। অক্ষর ইংরাজী কিন্তু ভাষা বোধগম্য হ'ল না। তারপর একখানি পুস্তক খুলে দেখলাম স্থানে স্থানে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত শ্লোক, নিম্নে ইংরাজী টীকা কিংবা সমালোচনা। দুর্মতি হ'ল পুস্তকখানি হাতে নিয়ে, যেন প্রিয় বস্তুর দর্শন লাভ করেছি। এই অর্থে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দেখে যেতে লাগলাম। এই সকল পুস্তক পাঠে আমাকে অনুরাগী বিবেচনা করে সাহেব বললেন—ইচ্ছা হলে আপনি এখানে যে কোন সময় এসে পড়বেন। প্রাতে সাতটার পূর্বে আমার সাক্ষাৎ পাবেন না। আমি সানন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

এরপর সাহেবের কক্ষ্য ত্যাগ করে এলাম মন্দিরের দিকে। প্রথমে মন্দিরের চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে দেখলাম। মন্দিরের সম্মুখে বৃক্ষাদি শোভিত প্রাঙ্গণ। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে প্রশস্ত বারান্দা। মন্দির মধ্যে সম্মুখভাগে শালগ্রামশিলা। পশ্চাৎভাগে একটি রৌপ্য-নির্মিত কলস। তার এক পার্শ্বে মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি ও ঠাকুর রমনের প্রতিকৃতি বিরাজমান। দ্বারে লিখিত নির্দেশ দেওয়া আছে—"নিস্তব্ধতা রক্ষার জন্য সবিশেষ অনুরোধ।" সাধারণ মন্দিরের মত এর অভ্যন্তর অপ্রশস্ত নয়। বিজলী বাতি ও পাখাসহ বিস্তৃত কক্ষ। মন্দিরের অপরাংশে ঠাকুর রমনের শয্যা ও তাঁর তৈলচিত্র। মেঝেয় কয়েকটি আসন বিছান আছে, ভক্তদের এই কক্ষে বসে উপাসনার জন্য। অন্য এক অংশে ঠাকুর রমনের ও বহু সাধকের তৈলচিত্র দেওয়াল

গাত্রে শোভিত। এটিও উপাসনা গৃহ। ভক্ত বা শিষ্যবৃন্দ তাঁদের সময়মত এ-স্থানে উপাসনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন। মন্দিরের বামভাগে মহর্ষি রমন ও শ্রীমার সমাধি মন্দির। তার পরেই আশ্রমের কার্যালয়।

মন্দিরের বিপরীত দিকে কয়েকটি কক্ষ। একটিতে প্রধান পুরোহিতের বাসস্থান। অন্যগুলি মহর্ষির বিশ্রাম স্থান ছিল। এই কক্ষগুলির অদূরে আশ্রমের ভাণ্ডার গৃহ ও রন্ধনশালা।

মন্দির সীমানার পূর্ব প্রান্তে একটি সরোবর ও ফল-পুষ্পের উদ্যান। আশ্রমের সম্মুখের রাস্তাটি সহরের প্রধান পথ। এই পথের পূর্বদিকে মন্দির ও রেলষ্টেশন। সবার উপর আকর্ষণীয় বিষয়, এই নগরের উত্তর-দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে পর্বত শ্রেণী উন্নত মস্তকে তিরুবন্নমালাই নগরী যেন পাহারা দিচ্ছে। দুই দিকের পাহাড় শ্রেণীর নিম্নে এই নগর গড়ে উঠেছে। আমরা কিছুক্ষণ পাহাড় শ্রেণীর দৃশ্য অবলোকন করে গেষ্ট-হাউসে ফিরলাম।

সাড়ে এগারটায় মন্দিরে মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা পড়বে। সে কারণে স্নানাদি সেরে মন্দিরের বারান্দায় বসলাম। শুনলাম আজ কোন এক ধনী শিষ্য আশ্রমে এসেছেন। তিনি আজ মন্দিরে বিশেষ পূজা ভোগ এবং অতিথিদের ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন। সেজন্য আজ সাধারণ অতিথি ব্যতীত কিছু সংখ্যক মাননীয় নিমন্ত্রিত অতিথি এসেছেন। লক্ষ্য করলাম, মন্দিরে যে সব শিষ্য, ভক্ত বা দর্শক আসেন তাঁরা মন্দিরের বারান্দার নিম্নে পাদুকা ত্যাগ করে আসেন। সেজন্য যষ্টি হস্তে একজন ভৃত্য জুতার প্রহরীরূপে নিযুক্ত আছেন। কারণ কতিপয় রামানুচর মন্দির প্রাঙ্গণের বৃক্ষে বিশ্রাম করছেন, সুযোগ পেলেই তাঁরা পাদুকা সংগ্রহ করে বৃক্ষমূলে বসে আনন্দ উপভোগ করবেন।

সহসা মোলায়েম বাঙ্গলা-স্বর কানে এল। শোনালেন এক গৌরবর্ণ নধরকান্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পরিধানে গৈরিকবর্ণের লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী। আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সহাস্য বদনে বললেন—আপনারা কাল রাত্রে এসেছেন, সংবাদ পেয়েছি। প্রাতেই আমার আসা উচিত ছিল কিন্তু একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারি নি। আশ্রমের পরিচয়

বোধহয় কলকাতা থেকে পেয়েছেন ?

বললাম—কাল রাত্রিতে এসেছি। এ-স্থানে মহর্ষির আশ্রম আছে জানতাম। এতদ্ব্যতীত আমাদের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না, সৌভাগ্যক্রমে আশ্রয় পেয়েছি। আপনি কি কোন কর্মসূত্রে এখানে এসেছেন ?

বললেন—কর্মসূত্র আমি ছিন্ন করেই এসেছি। আমার পৈতৃক বাস শালকিয়ায়। জেসপের অফিসে কর্ম করতাম। বর্তমানে আশ্রমে দীক্ষা নিয়ে এ-স্থানে একটি কুটীর নির্মাণ করে সস্ত্রীক দিন কাটাচ্ছি। আমার একমাত্র কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করে সাংসারিক সকল আকর্ষণ ছিন্ন করেছি।

বললাম—কতদিন এ-স্থানে আছেন ?

তিনি বললেন—বেশী দিন নয়, মাত্র বছর সাতেক হবে। স্থানটি আমার ভাল লাগল। ঢুকে পড়লাম আশ্রমে। ম্যানেজারের কৃপায় একটু স্থান সংগ্রহ করে কুঁড়ে বাঁধলাম। দেশের আত্মীয়বর্গ বিরূপ। তাঁরা বলেন—দেশ ত্যাগ করে এতদূরে আসা উচিত নয়।

বললাম—আপনারা বোধহয় প্রত্যহ আশ্রমে আসেন ?

তিনি বললেন—প্রায় প্রতিদিনই আসি, তবে এ সময়ে নয়। আজ আশ্রমে এক ধনী শিষ্য এসে ভোগের ব্যবস্থা করেছেন। আমিও নিমন্ত্রণ পেয়েছি। সেই কারণেই অসময়ে হাজির হয়েছি। এইসব ব্যাপারে বা উৎসবের দিনে ভগবানের প্রসাদ পেয়ে থাকি। কেবল আমরা নই অনেক শিষ্য-শিষ্যারা উৎসবের দিনে এখানে সমবেত হন।

বললাম—আপনার সাক্ষাৎ পেলাম, আপনার উনি এলেন না ?

বললেন—তিনি আসবেন না। তিনি আতপচালের অন্ন আহার করলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভগবান তাঁকে অন্ন-প্রসাদে বঞ্চিত করেছেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা গেল। কক্ষে প্রবেশ করে দেখলাম আজ জনপূর্ণগৃহ। সাহেব-মেমরা একদিকে বসেছেন, বাকী পুরুষ মহিলা গৈরিকধারী সন্ন্যাসী সকলে এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করেছেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির নাম জানলাম এস্, পি, মুখার্জী। সকলে তাঁকে মুখার্জী বাবু

বলে সম্বোধন করতে দেখলাম। আমরা মুখার্জী বাবুর পাশেই আসন নিলাম।

পরমান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহুপ্রকার আয়োজন হয়েছিল। আমাদের পঙ্‌ক্তিতে একটি মধ্যবয়স্কা তন্বীকে লক্ষ্য করে মুখার্জী বাবু বাঙ্গলায় বললেন—এই কুমু, এঁরা কাল কলকাতা থেকে এসেছেন, তোমার মঠে এক সময় নিয়ে যাব। মহিলা আমাদের দিকে চেয়ে ইষৎ হেসে নমস্কার করলেন।

আমি বললাম—উনি কে?

মুখার্জী বাবু বললেন—উনি বাঙ্গালী মেয়ে, নাম কুমুদিনী। অবিবাহিতা। এই আশ্রমের শিষ্যা। এঁর জন্ম বালি-উত্তরপাড়ায়। পিতা কর্মোপলক্ষ্যে এখানে এসেছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীনা হয়ে দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করে এখানে একটি মঠের মত করে বাস করছে।

আহার সমাধা হলে মহিলা আমাদের নিকটে এলেন। একজন বাঙ্গালী মহিলা পেয়ে গৃহিণী তাঁর সঙ্গে আনন্দে ব্যাকালাপে মগ্ন হলেন।

লক্ষ্য করলাম, মহিলা বাঙলা ভাষার মাধুর্য হারিয়ে ফেলেছেন। বাঙলা বুঝতে তাঁর কোন অসুবিধা নেই। তিনি যাওয়ার সময় তাঁর মঠে আমাদের যাওয়ার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করে গেলেন। আমরা দিনকয়েক এ-স্থানে ছিলাম। কুমুদিনীর মঠে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখার্জী বাবুকে কয়েকবার অনুরোধ করলাম কিন্তু তিনি সেদিকে যাওয়ায় মনোযোগ করলেন না।

মুখার্জী বাবু আমাদের সঙ্গে আমাদের গেষ্ট-হাউসের দ্বারে এসে তাঁর বাংলোটি দূর থেকে দেখালেন। তিনটার সময় তাঁর বাংলোয় গিয়ে চা পানের জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গেলাম মুখার্জী বাবুর বাংলোর দিকে।

সহরের প্রধান রাস্তার অনতিদূরে পাহাড়ের সানুদেশে মুখার্জী বাবুর বাংলো। বাংলোর সম্মুখে সামান্য জমিতে একটি ছোট রকমের ফল ও পুষ্পের উদ্যান। উদ্যান ফটক অতিক্রম করে দেখলাম মূল্যবান নানা আসবাবপূর্ণ সুসজ্জিত একতল বাংলোবাটী। আমরা বারান্দায় একটি সোফায় বসলাম।

মুখার্জী বাবু বললেন—আশ্রম থেকে ফিরে দেখলাম আমার কনিষ্ঠা শ্যালিকা এসেছেন। এঁরা থাকেন ভেল্লোরে। এঁর স্বামী হসপিটালের হাউস-সার্জন। ক্ষণপরে এক প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গে এক সুন্দরী তন্বী এসে আমাদের নমস্কার জানালেন। বুঝলাম প্রৌঢ়া মুখার্জী গৃহিণী, অপরা তাঁর কনিষ্ঠা ভাগ্নী।

এঁদের নমস্কারান্তে তন্বী মহিলাকে বললাম—আমরা গতকাল ভেল্লোরের উপর দিয়ে এলাম। ট্রেন থেকেই দেখলাম হসপিটাল ও কোর্ট।

তিনি বললেন—হসপিটালের মধ্যেই আমাদের কোয়ার্টার। আপনারা হয়তো জানতেন না ডাক্তারবাবু আপনাদের সাক্ষাৎ পেলে খুব আনন্দিত হতেন ; সহজে ছাড়তেন না।

বললাম—আমরা ভেল্লোরের এক স্কুল-মাষ্টারের মুখে আপনাদের পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনিও তাঁর বাড়ীতে দু'একদিন থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ আপনাদের অযথা ব্যস্ত করতে ইচ্ছা করলাম না।

ডাক্তার গৃহিণী বললেন—এখন আমি এসেছি আপনাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাব ; একটু পরেই আমাদের জীপ আসবে। আপনাদের মাল-পত্র এখানে যেমন আছে থাক। আমার সঙ্গে চলুন আমাদের কোয়ার্টারে। মাছ-মাংস, দুধ, ঘি কিছুরই অভাব হবে না সেখানে। দু'দিন পরে আবার চলে আসবেন।

মুখার্জী বাবু বললেন—ভেলুরে খাদ্যদ্রব্য সবই পাওয়া যায়। উনি প্রায়ই এখানে আসেন আর নিজে হাতে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে নিয়ে আসেন, তার নমুনা দেখাচ্ছি। ক্ষণপরে মুখার্জী গৃহিণী চমচম্ ও সন্দেশের ডিস সম্মুখে রাখলেন, তাঁর ভাগ্নী আনলেন চায়ের পাত্র !

চা ও মিষ্টান্ন খেয়ে এঁদের বাংলোটি ভালভাবে দেখার জন্য ভিতরে গেলাম। কক্ষ ও আসবাবাদি দেখার পর একটি বস্তুর উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বস্তুটি এক ফুট উচ্চ একটি গোলাকার শিলাখণ্ড। তার মধ্যভাগে একটি চার ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত্ত। সেই গর্ত্তের মধ্যে এক ফুটের কিছু অধিক দীর্ঘ এবং স্থূলকায় একটি নোড়া বিশেষ বস্তু সেই শিলাখণ্ডের গর্ত্তের মধ্যে

শিবলিঙ্গের মত বিরাজ করছে। অনুমান করলাম এ বস্তুটি বোধহয় এদেশীয় মশলা-পেষণ যন্ত্র। মুখার্জী বাবুকে উপহাস ছলে বললাম— আপনাদের এ প্রদেশে থাকা সার্থক! বাঙ্গলা দেশে থাকলে এই মশলা-পেষণ যন্ত্র আপনারা স্পর্শ করতে সাহস পেতেন না। মাদ্রাজের স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ায় আপনাদের দৈহিক শক্তির উন্নতি হয়েছে। এই শিলাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মুখার্জী বাবু হেসে বললেন—ও বস্তুটি মশলা-পেষাই যন্ত্র নয়। আমরাও কোনদিন এ যন্ত্র চালাতে সাহস করি না। গৃহের বারান্দায় উপবিষ্ট খর্বকায়া কৃষ্ণবর্ণা কৃষাঙ্গী পরিচারিকার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বললেন—এ যন্ত্র চালনা করেন ঐ মেয়েটি। এতে পেষাই ডালের উৎকৃষ্ট বড়ি হয়। এটি প্রধাণতঃ ব্যবহার হয় অন্য কাজে। আপনারা নিশ্চয়ই ইড্‌লি-ধোসা খেয়েছেন, এ তারই উপাদান অর্থাৎ চাল, ডাল অতি মিহি পেষাই করে ইড্‌লি-ধোসা প্রস্তুত করতে হয়। এর ব্যবহারে শরীরে শক্তির প্রয়োজন। সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের মেয়েরা এর কাছে যেতে সাহস করবে না। বছর দুই আগে আমার কন্যা ও জামাই বাবাজী এখানে এসে এই যন্ত্র দেখে পরম উৎসাহে একটি খরিদ করে নিয়ে গেলেন। কয়েকমাস পূর্বে দৌহিত্রের অন্নপ্রাশনে কন্যার বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম, তাঁদের এখান থেকে সযত্নে নিয়ে যাওয়া আদরের বস্তুটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রন্ধনশালার নীচে উপুর হয়ে পড়ে আছে। একে কার্যকরী করা বাঙলার মেয়েদের সামর্থ নেই।

এখন আপনারা হয়তো বলবেন তীর্থ-ভ্রমণের কথা বলতে গিয়ে বুড়ো আবার যত বাজে বকছে। কে শুনতে চাইছে তোমার মুখার্জী বাবুর গল্প? হ্যাঁ, কিছুটা অবান্তর কথা বলছি অস্বীকার করব না। এখানে আমার এক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাবেন। মুখার্জী বাবুর বাড়ীর যন্ত্রটি দেখে আমার সেই কথাটি আজ স্মরণপথে এল।

মুখার্জী বাবুর বাংলোতে প্রস্তর যন্ত্রটি দেখে ও তার কার্যকারীতার বিবরণ শুনে আমার বহুদিনের এক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মাদ্রাজ প্রদেশের এই ইড্‌লি বস্তুটি আমাদের বাড়ীর সকলের বিশেষ প্রিয়। মধ্যে মধ্যে

মাদ্রাজী হোটেল থেকে ইড্‌লি এনে থাকি। সেবার গেলাম চিত্তরঞ্জনে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। তাঁর এক প্রতিবেশী মাদ্রাজী। তাঁরা একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করে স্বহস্তে ইড্‌লি প্রস্তুত করে খাওয়ালেন। আমার গৃহিণী তাঁদের ইড্‌লি প্রস্তুত প্রণালী ও নির্মাণ পাত্রটি দেখে কলকাতা এসে ইড্‌লি প্রস্তুত করে সকলকে খাওয়াবার ইচ্ছায় ওঁদের নিকট থোক একটি ইড্‌লি নির্মাণ-পাত্র নিয়ে এলেন। মাদ্রাজী মহিলারা এর উপাদান বলে দিলেন। এককিলো পরিমাণ আলোচালের সঙ্গে আড়াইশ' গ্রাম পরিমাণ উরুৎডাল একত্রে পেষাই করে প্রস্তুত করতে হয়। নির্মাণ পাত্রটি পরম যত্নে কলকাতায় এনে বিধিমত চাল-ডাল শিলে পেষাই করে গৃহিণী ইড্‌লি তৈরী করতে বসলেন। বাড়ীতে সেদিন আনন্দের সীমা নেই। ছেলে-মেয়েরা থালা-গ্লাস নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ইড্‌লি প্রস্তুত হ'ল কিন্তু সে যে কি বস্তু তা অনুমান করতে পারলাম না। আমি মুখে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম যেমন বিস্বাদ, তেমনি কঠিন।

গৃহিণী বললেন—সোডা দিতে ভুল হয়েছে। একটু সোডা দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। সোডা দিয়ে কিছু পরিবর্ত্তন হ'ল; বিস্বাদ ও কাঠিন্য তখনো সমভাবেই আছে অধিকন্তু পেলাম একটা দুর্গন্ধ। তারপর একদিন কলাই ডাল পরিবর্ত্তন করে দেওয়া হ'ল ছোলার ডাল। তারপর মুগডাল। ক্রমে মুসুরি, খেঁসাড়ী, অড়হর প্রভৃতি অনেক কিছু ব্যবস্থা হ'ল কিন্তু ইড্‌লির তাতে কোন উন্নতি হ'ল না।

পথে ঘাটে মাদ্রাজী পুরুষ-মহিলা দেখলেই ইড্‌লি প্রস্তুত প্রণালী ও উপাদান সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে সকলের একই উত্তর। পরিশেষে পরাজয় মেনে পাত্রটিকে অশ্রদ্ধায় পরিত্যক্ত করা হ'ল।

আজ আমাদের সেই সমস্যার সমাধান হ'ল। আমরা ইড্‌লি প্রস্তুতের পাত্র সংগ্রহ করেছিলাম কিন্তু প্রধান যন্ত্রটির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। এ সম্বন্ধে যাঁদের প্রশ্ন করেছি তাঁরা চাল-ডাল, লবণের পরিমাণ যথাযথ বিবরণ দিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল প্রস্তর বক্ষে মন্থন দণ্ডের সাহায্যে যে দ্রব্য প্রস্তুত করতে হয় এ-জ্ঞান সকলেরই আছে। এর জন্য স্বতন্ত্র উপদেশ দেওয়া নিস্প্রয়োজন।

মুখার্জ্জী বাবুর ফটকের সামনে ভেল্লোরের ডাক্তার বাবুর জীপ এসে হাজির হ'ল। তাঁরা সকলে আমাদের ভেল্লোর যাওয়ার জন্য আর এক দফা অনুরোধ করলেন। আমরা পুনরায় ভেল্লোর যেতে স্বীকৃত হলাম না। আমরা এঁদের নিকট বিদায় নিয়ে ফটকের বাইরে এসে দেখলাম মুখার্জ্জী বাবু তাঁর সুন্দর বাংলোর নাম দিয়েছেন 'উপাসনা'। এর পর আমরা ধীরে ধীরে আশ্রমে এসে মন্দিরের বারান্দায় বসলাম। সূর্য্যাস্তের তখনও বিলম্ব ছিল, এ-স্থানে প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেকেই আসেন। মন্দির থেকে আশ্রমের সম্মুখে সহরের প্রধান রাস্তাটি বেশ দেখবার। মধ্যে মধ্যে ঝটকা ও বাস চলেছে। এদিকে তাদৃশ লোকালয় না থাকায় জন কোলাহলও নেই। ফেরিওয়ালাদের চিৎকার শোনা যায় না। আশ্রম প্রাঙ্গণের বৃক্ষ-শাখায় রাম অনুচরেরা আহার অন্বেষণে বৃক্ষ পরিবর্তন ও শাখায় শাখায় নির্বিবাদে পরিভ্রমণ করছে। কয়েকটি আশ্রমের ময়ূর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করছে। বেশ লাগে এগুলিকে দেখতে।

এমন সময় আশ্রমে একটি ঝটকা প্রবেশ করতে দেখলাম। আশ্রম প্রাঙ্গণে ঝটকাওয়ালা গাড়ী থামিয়ে একটি বেডিং ও একটি স্যুটকেশ নামিয়ে মন্দিরের বারান্দার একপাশে রেখে দিলে। ঝটকার পশ্চাৎ দিক থেকে অবতরণ করলেন একটি যুবতী। মস্তকে তার বাবরী চুল, পরিধানে হাল্কা গ্রীন রঙের রেশমি সাড়ী, পায়ে হাই-হিলের জুতা। ঝটকাওয়ালাকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে মন্দির অভিমুখে এসে বারান্দার নিম্নে পাদুকা রেখে আমাদের সম্মুখ দিয়ে ত্র্যস্তভাবে আশ্রমের অফিসের দিকে চলে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরেও ফিরলেন না; আমাদের পার্শ্বে তাঁর স্যুটকেশ, বেডিং অরক্ষিত অবস্থায় সেই স্থানেই মালিকের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

গৃহিণীকে বললাম—তুমি এ-স্থানে অপেক্ষা কর। আমি এই সময় একবার সম্পাদক সাহেবের বাংলো থেকে ঘুরে আসি।

'গুড ইভনিং' বলে সাহেবের কুটীরে প্রবেশ করলাম। সাহেবও মস্তক ঈষৎ নমিত করে অভিবাদন করলেন। দেখলাম তাঁর টেবিলের সম্মুখে দু'জন ভদ্রলোক কি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত রয়েছেন। আমি এ সময় অযথা আলাপে ইতস্ততঃ করে প্রত্যাগমণের উদ্যোগ করতেই তিনি তাঁর

আলমারীর চাবি আমার হাতে দিয়ে বললেন—পুস্তকগুলির মধ্যে ইচ্ছামত যে কোন পুস্তক নিয়ে দেখুন। এ সকল আপনাদের জন্যই সংগ্রহ করে রাখা।

আমি গাম্ভীর্য সহকারে একটি আলমারি খুলে পুস্তক পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলাম। পুস্তকগুলি ওজনে কোনটি লঘু নয়। বাঁধাই বেশ উচ্চ স্তরের কিন্তু পুস্তকের মুদ্রিত বস্তুর এক লাইনও হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলাম না। আধ ঘণ্টা বৃথা পরিশ্রম করে পুস্তকগুলি যথাস্থানে রেখে সাহেবকে চাবি প্রত্যর্পণ করলাম।

সাহেব বললেন—বড়ই দুঃখিত, আজ আপনার সঙ্গে কোন বিষয় আলোচনা করতে পারলাম না। কাল প্রাতে এলে খুশী হব। আমি সেদিনের মত সাহেবের কুটীর ত্যাগ করে এই সিদ্ধান্ত করলাম যে এই মহাজ্ঞানী পণ্ডিত সাহেবকে অযথা বিরক্ত করা কিংবা তাঁর কাজের ক্ষতি করা অন্যায়। এ সকল লোক সাধারণ লোকের বহু উর্দ্ধে। আমার মত লোকের এ-স্থানে আড্ডা দিতে আসা অর্থ এঁদের সময় নষ্ট ও কাজের ক্ষতি করা! এতখানি জ্ঞান লাভের পর দু'দিন তার কুটীরের দিকে পদার্পণ করি নি।

গৃহিণীর নিকট ফিরে গিয়ে দেখলাম সেই ভদ্রমহিলার সুটকেশ, বেডিং একইভাবে বারান্দায় পড়ে আছে। সন্ধ্যা সমাগত। মন্দিরে বেদ-পাঠ শুরু হয়েছে। তারপর হবে সান্ধ্য-আরতি। কিছু পরেই নৈশ-ভোজনের ঘণ্টাধ্বনি হবে, এখন আর রেষ্ট-হাউসে না ফিরে গিয়ে মন্দিরে বেদ-পাঠ শুনতে মনোনিবেশ করলাম। বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত হতেই নৈশ-ভোজনের ঘণ্টা হ'ল। আহার কক্ষে প্রবেশ করে দেখলাম সেই নবগতা মহিলাটি মেমসাহেবদের পাশে আহারে বসেছেন।

গৃহিণী বললেন—দেখ, মেমসাহেবকে সাড়ী পরে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

বললাম—মস্তকে ভ্রমর কৃষ্ণ কেশদাম দেখে বিলাতি মেম বলে মনে হয় না। বম্বের পার্শী মহিলা হতে পারে।

গৃহিণী বললেন—বোম্বাইয়ের সেই পার্শী জাতের মেয়ে এখানে এসে ঢুকেছে? তিনি একবার অন্ন পাত্রের, পরক্ষণে যুবতীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন—মেম সাহেবরা একদিকে বসেছে বস্তুক, আবার পার্শী এলো? যতসব···

বললাম—মেম সাহেবরা অপবিত্র হ'ল না, পার্শী এসেই সেই পবিত্রতা নষ্ট হ'ল ?

গৃহিণী একগ্রাস অন্ন মুখে তুলে বললেন—ওদের কাণ্ডই আলাদা। দেখলে না, সেবার বম্বেতে একটা শবদেহ এনে চিল-শকুনের খাদ্য হবে বলে গড়ের মধ্যে ফেলে দিলে। ও তো সেই জাত!

বললাম—কোন জাত সঠিক অনুমান করা শক্ত। তবে এর বর্ণ উজ্জ্বল হলেও নাকের গড়ন অন্যরূপ। অ্যাংলোও হতে পারে। আহারের পর গেষ্ট-হাউসে ফিরছি। দেখলাম আমাদের পশ্চাতে একটি মজুরের মাথায় সুটকেশ ও বেডিং চাপিয়ে আসছেন গেষ্ট-হাউসের এক ভদ্রলোক ও সেই মহিলা। আমাদের কক্ষের সন্নিকট এসে ভদ্রলোক বললেন—এই মহিলা আপনাদের পাশের কক্ষে থাকবেন। আমি খুশীর ভাব দেখালাম।

গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বললেন—কি বিপদ! ওকে আবার আমাদের পাশে ঢোকালে। আরও অনেক বাড়ী রয়েছে সেখানে দিলেই তো ভাল হ'ত।

আমাদের কক্ষের পাশে একটি সিঙ্গল-বেডরুম তাঁকে দেওয়া হ'ল। এ কক্ষের জন্য স্বতন্ত্র বাথরুমও আছে। মহিলাকে সমস্ত দেখিয়ে দিয়ে আশ্রমের ভদ্রলোকটি বিদায় নিলেন।

মহিলা তাঁর সুটকেশ, বেডিং কক্ষে রেখে আমাদের কক্ষে এসে গৃহিণীকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন—আপনারা কি এখন শয্যা গ্রহণ করবেন ?

উত্তরে আমি বললাম—সন্ধ্যায় আমরা নিদ্রায় অভ্যস্ত নই, আমরা সাধারণতঃ নৈশ-ভোজন করি রাত্রি নয়টার পর। শয্যা গ্রহণ করি দশটারও পরে।

মহিলা বললেন—আমাদেরও সেই অভ্যাস। তারপর গৃহিণীকে বললেন, আপত্তি না থাকলে আমার রুমে আসুন দু'জনে আলাপ করব।

আমি বললাম—কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু উনি ইংরাজী আদৌ জানেন না।

মহিলা বললেন—আমি হিন্দী ভালই জানি, হিন্দীতেই আলাপ করব।

বললাম—হিন্দী আমাদের মাতৃভাষা নয়, তবে উনি হিন্দী সামান্য কিছু জানেন।

মহিলা বললেন—বুঝেছি, আপনারা বেঙ্গলের লোক। বেঙ্গলী আমি কিছু কিছু বলতে পারি, বুঝতে পারি ভাল। বম্বেতে আমাদের বাড়ীর পাশে কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার থাকেন তাঁদের কাছে কিছু শিখেছি। আচ্ছা, এখন বিরক্ত করব না, আপনি বিশ্রাম করুন। আমার কয়েকখানি জরুরী-পত্র লেখবার আছে সেটি সেরে রাখি।

গৃহিণী বললেন—বিদায় হয়েছে, বাঁচা গেল! কি বলছিল?

বললাম—ভদ্র মহিলা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, তাই তোমাকে তাঁর ঘরে যেতে বলছিলেন।

গৃহিণী সুরের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে বললেন—হেসে হেসে কথা বলে ও মেয়ে সোজা নয়। আমি কোন জবাব দিলাম না। হাতের কাছেই টাইম্ টেব্‌লটা ছিল, সেইটেই ওল্টাতে লাগলাম।

গৃহিণী অন্য কাজে মন দিলেন। একটা মশা নাকি কাল রাত্রে মশারির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সারারাত্রি শোণিত শোষণ করেছে, আজ প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাকে নিপাত করবেন। ঘর নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর মশক হত্যার কারণে হাতের তালির শব্দ। পাশের কক্ষ থেকে সুটকেশ খোলা ও বন্ধ করা পুনরায় সুটকেশ থেকে দ্রব্যাদি নিক্ষেপের শব্দ ক্রমাগত শুনে যচ্ছি। গৃহিণীকে বললাম—দেখ তো মেয়েটা কি করছে?

গৃহিণী দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার দরদ হয় দেখে এস। আমার গরজ নেই।

আমি সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে একটু ঘুরে আরামে বসলাম। এরপর একটা জোর শব্দ হতেই গৃহিণী বাইরের দিকে গেলেন। মিনিট দুই পরে কক্ষে প্রবেশ করে বললেন—ঘর বন্ধ। জানলা দিয়ে দেখলাম একদিকে বেডিং গড়াগড়ি যাচ্ছে আর একদিকে সুটকেশটা হাঁ করে আছে। সমস্ত ঘরটায় জিনিষ-পত্র ছড়িয়ে গালে হাত দিয়ে মেয়েটা বসে আছে।

অনুমান করলাম সুটকেশে রক্ষিত মানিব্যাগ কিংবা কোন মূল্যবান্ দ্রব্য হয়তো অপহৃত হয়েছে। মহিলা নিশ্চয় বিপদগ্রস্ত, একবার সংবাদ লওয়া প্রয়োজন।

বাইরে গিয়ে মহিলার কক্ষের দ্বারে শব্দ করে বললাম—আপনাকে বিশেষ

ব্যস্ত মনে হচ্ছে, আমরা কোন সাহায্য করতে পারি ?

মহিলা দ্বার খুলে আমাকে কক্ষে আসতে অনুরোধ করলেন। দেখলাম গৃহিণী সংবাদ দিয়েছেন যথার্থ।

আমি বললাম—কোন রকম অসুবিধা, কি ভয় হয়েছে ?

মহিলা বললেন—আমি বম্বের মেয়ে। ভয় আমার কিছু নেই। গতকাল আমি মাদ্রাজ লজে ছিলাম। আমার পাশের কক্ষে এক ভদ্রলোক আমার নিকট তাঁর পেনের জন্য আমার কালির দোয়াতটি নিয়েছিলেন কিন্তু প্রত্যার্পণ করেন নি, আমিও বিস্মরণ ছিলাম। এখন দেখছি আমার পেনটির কালি শেষ হয়েছে। আমার কয়েকখানি জরুরী-পত্র লিখবার ছিল। কাল প্রাতে কালি না আনলে আর লেখা সম্ভব নয়।

বললাম—আপনি কোন কালি ব্যবহার করেন ?

তিনি বললেন—পার্কার।

বললাম—আমার নিকট পেনের কালি আছে, কিন্তু দেশী কালি 'সুলেখা'। আপনার ব্যবহার উপযোগী বিবেচনা করলে নিতে পারেন।

মহিলা 'গুড্ গড্' বলে উৎসাহে আমার দিকে চেয়ে বললেন—ও কালি আমিও ব্যবহার করে থাকি। বম্বে মার্কেটে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। সুলেখা পার্কার অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়। ভারতের সকল প্রদেশেই সাদরে ব্যবহার করতে দেখেছি। দয়া করে আমাকে সামান্য দিন।

বললাম—আমি সানন্দেই দেব, ব্যবহার করলে খুশী হব। আপনি সুস্থ চিত্তে আপনার দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করে আমাদের রুমে আসুন।

আমি ঘরে এসে বসলাম। গৃহিণী এতক্ষণ আমার পাশেই ছিলেন, আমাদের কথাবার্তা ইংরাজীতে হলেও কিছু কিছু বুঝেছেন। এখন আমার মুখে সব কথা শুনে, বললেন—যত সব ঢং, কালির দোয়াত হারিয়ে সেই থেকে ঘরটাকে তোলপাড় করছে। বম্বেওয়ালী কিনা বাহাদুরী দেখাচ্ছে।

দ্রব্যগুলির অদৃষ্টে কি হ'ল জানি না। মহিলা দু'মিনিটের মধ্যে পেন হাতে আমাদের কক্ষে এলেন। আমার কালির দোয়াতটি টেবিলের উপর রেখেছিলাম, মহিলার হাতে দিলাম। সযত্নে পেনে কালি ভরে পেনটি

হাতে নিয়ে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

গৃহিণী আধা হিন্দী, আধা বাঙ্গলায় আলাপ শুরু করলেন। বললেন—পত্র কাকে দেবে? মাকে না বাবাকে?

মহিলা বললেন—যাদের ফার্মে কাজ করি সেই অফিসে। বাবা নেই, মা আছেন।

গৃহিণী বললেন—ভাই বোন?

মহিলা বললেন—বোন আমার নেই। ভাই আছে, বম্বের বাইরে একটা ফ্যাক্টরীর ফোরম্যান।

গৃহিণী এবার বললেন—তোমরা কোন জাত? ফার্শী না খিরিষ্টান?

মহিলা হেসে বললেন—আমরা পার্শী নই, ক্রিশ্চানও নই। বাবা-মা বর্মা থেকে এসেছিলেন। বাবা বর্মার পোর্ট অফিসে কাজ করতেন, রিটায়ার হওয়ার পুর্বেই মারা যান। আমরা বর্মি বুদ্ধিষ্ট।

গৃহিণী তাঁর সম্মুখে বসেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—বুদ্ধুরা তো ভাল জাত, না?

বললাম—ওঁরা এক সম্প্রদায়ের লোক। তুমি তো অনেক বুদ্ধমন্দির দেখেছ? গয়ায়, সারনাথে, সাঁচিতে, নেপালে। সেই ভগবান বুদ্ধ যে ধর্মপ্রচার করেন, সেই ধর্মের লোকই বৌদ্ধ, যাদের ইংরাজীতে বলে বুদ্ধিষ্ট। তুমি তো জান বুদ্ধ হিন্দুদের এক অবতার।

গৃহিণী এবার চেয়ার টেনে তাঁর নিকটে এসে বসলেন। মহিলাকে প্রশ্ন করলেন—কি কাজ কর তুমি?

মহিলা বললেন—ভাল কাজ আমি পাই নি। বম্বের এক অফিসে স্টেনোর কাজ পেয়েছিলাম ভাই রাজী হয় নি। বর্ত্তমানে আমি এক পেণ্ট কালার কোম্পানীর ক্যানভাসিং এর কাজ নিয়ে আছি। পয়সা ভালই দেয় কিন্তু অধিকাংশ দিন বম্বের বাইরে থাকতে হয়। এখন মাদ্রাজ হয়ে এখানে এসেছি, এরপর যাব বাঙ্গালোরে।

গৃহিণী বললেন—মা কি তোমার ভায়ের কাছে থাকেন?

মহিলা বললেন—না, মা বম্বেতেই থাকেন। ভাল গান জানেন। বাড়ীতে গানের স্কুল করেন। বম্বের অনেক মেয়ে মায়ের স্কুলে গান শিখতে আসে।

গৃহিণী বললেন—তুমি মার কাছে গান শেখনি কেন ?

মহিলা বললেন—গানে আমার সেরূপ পারকতা ছিল না, সেজন্য ভাল শিখতে পারি নি। কিছু কিছু শিখেছি, শুনবেন ?

সম্মতি দেওয়ার পূর্বেই সে সঙ্গীত শুরু করলে। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। ভাষা আদৌ বোধগম্য হ'ল না। ভারতীয় সুর বলেও মনে হয় না। একখানি গান শেষ হতেই বিনা অনুরোধে আর একখানি আরম্ভ হ'ল। এটিও ঐ একই শ্রেণীর সঙ্গীত।

গৃহিণী মৃদুস্বরে বললেন—থামলে বাঁচি !

সঙ্গীত শেষে মহিলা বললেন—বোধহয় বিরক্ত লাগছিল। মা বলেন আমার মুখে এই গানই নাকি ভাল হয়, এ হচ্ছে 'বর্মি সঙ'। বুদ্ধের ভজন। বাঙলা 'টেগোর সঙ' ও আমি জানি বলেই আরম্ভ করলে "জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে"! সুর এক প্রকার আয়ত্ত করেছে, তবে উচ্চারণের দোষ যথেষ্ট। গান শেষ হতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গুড নাইট।' কাল সকালে আবার সাক্ষাৎ হবে।

আমি বললাম—দোয়াতটি তোমার কাছে রাখ কাজ শেষ হলে আমাকে দিও। তোমাকে কি বলে ডাকব ?

আমার নাম ডলি-ডলি বলেই আমাকে ডাকবেন। বলেই দোয়াত হাতে নিয়ে 'থ্যাঙ্কস্' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তিরুবন্নমালাইয়ের প্রধান আকর্ষণ এ-স্থানের শঙ্কর মন্দির। দাক্ষিণাত্যের তীর্থক্ষেত্রগুলির মধ্যে এটিও অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। এই তীর্থের আকর্ষণে সকল প্রদেশের হিন্দু তীর্থযাত্রীগণ এ-স্থানে এসে থাকেন। গৃহিণী এ বিষয়ে আমার ঔদাসিন্যে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি ক্রমাগত অনুযোগ করছেন এই বিখ্যাত তীর্থস্থানে এসে মন্দিরে যাওয়ার আগ্রহ নেই, শঙ্কর বিগ্রহ দর্শনের স্পৃহা নেই, আশ্রমে বিনামূল্যে আহার আর পাহাড়ের ধারে কিংবা পথে পথে বিহার। যার ধর্মে মতি নেই, তার তীর্থপথে পা বাড়ান উচিত নয়।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে শঙ্কর মন্দিরে যাওয়াই স্থির করলাম। দু'দিন সত্যই বৃথা সময় কাটিয়েছি। আজ স্নান সেরে গৃহিণীর তুষ্টি সাধনে

মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। গৃহিণীর ইচ্ছায় আশ্রমের প্রাতঃরাশেও মন দিলাম না। ভগবানের পূজার পূর্বে আহার শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। আশ্রম থেকে মন্দির এক মাইলের অধিক দূর। বেশ কিছুদূর এসে দেখতে পেলাম সম্মুখে এক পাহাড় পথরোধ করে দণ্ডায়মান। পাহাড়ের বামভাগে দেখলাম কতিপয় গোপুরমের চূড়া। আমরা পাহাড়ের পাশ দিয়ে গোপুরমের দিকে গেলাম।

দেখলাম মন্দির সীমানার সম্মুখে বিরাট গোরপুরম। গোপুরমের বিরাট বাজার, নানাপ্রকার ফল ও পুষ্পের দোকান, পূজার ডালি, তারপর ট্রাঙ্ক, জামা, নকল রেশমী বস্ত্র, সাংসারিক দ্রব্য ও লোহার নানাবিধ তৈজসপত্র ও ছেলেদের খেলনা-ছুরি প্রভৃতির দোকান। আমরা কিছু ফুল ও পূজার ডালি নিয়ে গোপুরম অতিক্রম করে মন্দির প্রাঙ্গণে এলাম। মন্দির সীমানার চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের উপর আট-দশ ফুট অন্তর বেশ বড় আকারের গোমাতার মুর্ত্তি। প্রাঙ্গণের মধ্যে চার পাঁচটি রথের আকারে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উচ্চ বাতিদান। শুনলাম কার্ত্তিক মাসে ঐ সকল বাতিদানে এবং মন্দিরে আলোক-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

মন্দির প্রাঙ্গণের সম্মুখভাগে দরবার হলের মত সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট বিরাট নাট-মন্দির, খিলানের ছাদ। এমন কারুকার্যপূর্ণ প্রস্তর স্তম্ভ ইতিপূর্বে দেখি নি। এর বৈশিষ্ট্য স্তম্ভের আকৃতি ও কারুকার্যগুলিতে। দেখলে এগুলি ভাস্করের ছেনী-হাতুড়ীতে নির্মিত বলে মনে হয় না। সমস্ত স্তম্ভগুলি যেন এক ছাঁদে নির্মিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকতে হয়।

প্রথম মহল অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করলাম। মন্দির প্রহরী আমাদের গতিরোধ করে বললেন—বিনা টিকিটে মন্দিরে যাওয়ার অধিকার নেই।

বললাম—সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস কিংবা খেলার মাঠে প্রবেশ করতে হলে টিকিট প্রয়োজন। কিন্তু পূজার মন্দিরে যাওয়ার জন্য টিকিট ক্রয় করতে হয় জানতাম না।

প্রহরী বললেন—এখানে পূজা দিতে হলে টিকিট করতেই হবে। মন্দিরে

বিগ্রহ দর্শনের জন্য টিকিট আবশ্যক হয় না।

অগত্যা এক টাকায় দু'খানি টিকিট ক্রয় করে মন্দির দ্বারে এলাম। নানাকারুকার্যপূর্ণ বিরাট মন্দির। মন্দির মধ্যে এক একটি কক্ষে বিভিন্ন বিগ্রহ। শঙ্কর, পার্ব্বতী, গণপতি, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি। পুরোহিত আমাদের নাম-গোত্রসহ পূজার ডালি ও পুষ্প নিয়ে মন্দিরে পূজা দিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে কোন মন্দিরেই সাধারণ যাত্রীকে বিগ্রহ স্পর্শ করে পূজার অনুমতি দেওয়া হয় না।

পূজার পর মন্দির ত্যাগ করে মন্দির সম্মুখে বাজারের দিকে এলাম। গৃহিণী এসে প্রবেশ করলেন পিতল-তাম্র-নির্মিত তৈজসপত্রের দোকানে। তাঁর বিশেষ আগ্রহ এ দেশীয় সৌখীন তাম্র ও পিতলের নির্মিত কিছু তৈজস্ খরিদ করা। পিতল তাম্রের তৈজসের দোকানের পাশে একটি লৌহ নির্মিত তৈজসের দোকানে এসে কয়েকটি দ্রব্য পছন্দ মত বেছে স্বতন্ত্র রাখলেন। দেখলাম সেগুলি সত্যই ক্রয় করে আনার মত বস্তু, সাংসারিক ব্যবহারের অতি আবশ্যকীয় দ্রব্য। গৃহিণীকে সবিনয়ে বোঝালাম এই ভারবাহী দ্রব্য নিয়ে নানাস্থানে পরিভ্রমণ সম্ভব নয়। তবে যদি এইস্থান থেকেই কলকাতা প্রত্যাগমণে মত হয় আমার আপত্তি নেই।

গৃহিণী আমার উপর বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। আক্ষেপের সুরে বললেন—আমি জানি এমন একটা তীর্থস্থান থেকে দু'একটা স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে যাব তাও ভাগ্যে ঘটবে না। তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য একটি ছবির দোকান থেকে কয়েকটি স্থানীয় দেব-দেবীর চিত্রপট খরিদ করলাম। তারপর একটি ফলের দোকান থেকে কয়েকটি আপেল, কমলালেবু ও পাতিলেবু নিলাম। এ-বস্তুটি এ প্রদেশের সকল স্থানে সহজপ্রাপ্য নয়।

মন্দিরের পার্শ্ব দিয়ে প্রধান পথের অভিমুখে অগ্রসর হলাম। রাস্তার দক্ষিণে সেই পর্বতশ্রেণী আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাহাড়ের দিকে কৌতূহল নেত্রে চেয়ে দেখলাম যেন শঙ্কর প্রচ্ছন্নভাবে এই পাহাড়ে বিরাজ করছেন। কিছুক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে সেইদিকে চেয়ে রইলাম। মনে হ'ল একবার ছুটে যাই ঐ পাহাড়ের শীর্ষে।

এই সময় জনৈক ভদ্রলোক আমাদের বললেন—আরও এগিয়ে যান,

সম্মুখে যে পাহাড় দেখছেন ঐটি কৈলাশনাথ পাহাড়। যদি ক্লেশ স্বীকার করে পদব্রজে কৈলাশনাথকে পরিক্রমা করতে পারেন, অনুধাবন করতে পারবেন ভগবান মহেশ্বরের মহিমা। পাহাড়টি পরিক্রমা করতে দীর্ঘ আট মাইল পথ ভ্রমণ করতে হবে। প্রত্যূষে পাঁচটার সময় পরিক্রমা আরম্ভ করবেন আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে পরিক্রমা শেষ করতে পারবেন। এই পাহাড়ের উপর থেকে মহর্ষি রমণ সিদ্ধিলাভ করেছিলাম।

গৃহিণী বললেন—চল না, কাল ভোরে কৈলাশনাথ পরিক্রমা করি। মুখুজ্যেবাবুর গিন্নীও কাল সেই কথাই বললেন। পায়ে হেঁটে সকলে যায় না, একটা ঝটকা নিয়ে গেলেই হবে। এঁরা বললেন ঝটকা ভাড়া আট টাকা দিলেই হবে।

বললাম—ঈশ্বরকে পরিক্রমা করতে বেচারা অশ্বিনীকুমারকে পরিক্রমা করালে পুণ্যটা তারই হবে। ঝটকাওয়ালা অবশ্য আনন্দ লাভ করবে আর আমাদের ভাগ্যে আসবে অর্থনাশের পরিতাপ। তবে যদি পদব্রজে কৈলাশনাথকে পরিক্রমায় ইচ্ছা কর আমি সানন্দে সম্মত আছি।

গৃহিণী বললেন—বুঝেছি, ধর্মে-কর্মে পয়সা ব্যয় করতে গেলেই তোমার বুকে বাজে। এখন পা চালিয়ে চল, আশ্রমের খাবার ঘণ্টা বেজে যাবে।…

ফিরলাম বেলা দশটার কিছু পরে। পার্শ্বের কক্ষের দিকে চেয়ে দেখলাম ডলির কক্ষ তখনও রুদ্ধ। গৃহিণীকে বললাম—মেয়েটির ঘর এখনও বন্ধ দেখছি।

গৃহিণী বললেন—নিদ্রা দিচ্ছে। কাল সারারাত শোয় নি। রাত দেড়টার সময় বাইরে এসে দেখলাম ঘরে আলো জ্বলছে ও একমনে খস্ খস্ করে কি সব লিখছে।

বললাম—ডেকে দাও স্নান করুক। কিছুক্ষণ পরেই ডলির কক্ষদ্বারে গিয়ে গৃহিণী ধাক্কা দিলেন, আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম।

ডলি দ্বার খুলতে দেখলাম তার অদ্ভুত অবস্থা—একটা বস্ত্র পাক দিয়ে রজ্জুকরে দৃঢ়ভাবে মস্তকে বেঁধেছে, চক্ষু রক্তবর্ণ, সহজভাবে দাঁড়াতেও অক্ষম।

বললাম—কি হয়েছে তোমার?

উত্তর দিলে—অতিশয় মাথার যন্ত্রণা, দাঁড়াতে পারছি না।

বললাম—সকালে কিছু খেয়েছিলে?

বললে—না, কিছুই খাই নি। আশ্রম থেকে কফি পাঠিয়েছিল, আমি খাই নি।

আমি সকল সময় কয়েক প্রকার এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কাছে রাখি। কক্ষে গিয়ে অনুমান মত কয়েকটি ট্যাবলেট এনে তাকে খেতে অনুরোধ করলাম।

সে কাতর স্বরে বললে—বমি হয়ে যাবে, কিছু দরকার হবে না, অমনি ভাল হয়ে যাবে। ঘুম আসছে না, ঘুমলেই সেরে যাবে।

গৃহিণী বললেন—পরের মেয়ে। তুমি হাতুড়ে ডাক্তারী করতে যেও না, বরং আশ্রমে খবর দাও।

আমি হাল ছাড়লাম না। স্নেহসূচক ভর্ৎসনা করে একপ্রকার জুলুম ক'রে তাকে দু'টি ট্যাবলেট খাওয়ালাম।

কপালে হাত দিয়ে গৃহিণী বললেন—বেশ উত্তাপ রয়েছে, জ্বর হয়েছে দেখছি। তিনি মস্তকের বন্ধন খুলে জলপটীর ব্যবস্থা করলেন। আমাদের কক্ষে একটি টেবিল-ফ্যান ছিল সেটি তার ঘরে রেখে মস্তকে হাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

ঔষধের ক্রিয়াতে কিংবা হাওয়ার ব্যবস্থায় অল্পক্ষণের মধ্যেই সে নিদ্রিত হ'ল। আমরা সন্তর্পণে তার গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে আশ্রমের দিকে গেলাম।

আহারের পর আশ্রম থেকে বেরিয়ে গৃহিণী বললেন—চল একবার মুখার্জীবাবুর বাড়ী যাই। আশ্রমে দুধ ছাড়া পথ্যের ব্যবস্থা হয়তো হবে না, দেখি যদি ওঁদের বাড়ীতে সাবু পাওয়া যায়।

মুখার্জীবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের সকল কথা জানাতে মুখার্জী গৃহিণী বললেন—সাবু নেই, মধ্যে মধ্যে বার্লি খাওয়া আমার অভ্যাস, বার্লি আমার ঘরে আছে।

গৃহিণী তাদের নিকট কিছু বার্লি নিয়ে বললেন—এতে কাজ ভালই হবে।

গেষ্ট-হাউসে এসে ডলির কক্ষের জানলা থেকে দেখলাম সে বেশ নিদ্রামগ্ন। তাই নিঃশব্দে আমাদের কক্ষে এসে শুয়ে পড়লাম।

গৃহিণীকে দেখলাম ষ্টোভ জ্বেলে বার্লি প্রস্তুত করতে বসলেন। আরও ঘণ্টাখানেক পরে গৃহিণী তার কক্ষে গিয়ে সংবাদ নিয়ে এসে বললেন—ডলি জেগেছে, জল খেতে চাইছে। এখন কোনও ওষুধ দেবে ?

শয্যা ত্যাগ করে উঠে আর একপ্রকার ট্যাবলেট নিয়ে গিয়ে তাকে খাওয়ালাম। গৃহিণী একখণ্ড পাতিলেবু ও বার্লির গ্লাস হাতে করে ডলির শয্যা পার্শ্বে এসে বসলেন।

ডলি গৃহিণীর হাতে গ্লাস দেখে বললে—ও কি ?

গৃহিণী বললেন—ভাল জিনিষ বার্লি। খেয়ে নাও সুস্থ বোধ করবে।

ডলি কোনরূপেই এ দ্রব্য পান করতে রাজী নয়, ক্রমাগত বলে—খেলে বমি হবে।

আমি তাকে অনেক অনুরোধ করলাম কিন্তু তার এক কথা, কিছু খেলেই আমাব বমি হবে। শেষ পর্যন্ত গৃহিণীর অনুরোধে অর্দ্ধেক পরিমাণ খেতে রাজী হ'ল। গ্লাস হাতে নিয়ে একবার মুখের নিকট নিয়ে যায় আর বলে বমি হবে।' গৃহিণীর তাড়নায় গ্লাসে চুমুক দিয়ে অর্দ্ধেক পরিমাণ পান করে 'কি চমৎকার' বলে একবার গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাল তারপর আর কিছু বলার প্রয়োজন হ'ল না। তৃপ্তি পুর্বক সবটুকু পান করে পুণরায় গৃহিণীর মুখের পানে চেয়ে হাসলে।

আমি বললাম—এখন আর বিরক্ত করব না, সন্ধ্যার পর আর একটি ট্যাবলেট দেব, কাল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।

গৃহিণী তাকে বললেন—রাত্রে আর এক কাপ বার্লি খেতে হবে। এখন চুপ করে শুয়ে থাক, টেবিলে একটা আপেল ও লেবু রেখে দিলাম বিশেষ খিদে বুঝলে যতটুকু ভাল লাগে খাবে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আশ্রমে গিয়ে মন্দিরের বারান্দায় বসলাম। কিছু পরেই বেদ-অধ্যায়ন আরম্ভ হ'ল। গৃহিণী এর কণামাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও কেবলমাত্র ভক্তির আবেগে পাঠকের সম্মুখে গিয়ে শাড়ীর অঞ্চল গলায় দিয়ে বসলেন। আমি বারান্দায় বসে কপিকুলের খাদ্য আহরণ দেখতে লাগলাম। হঠাৎ মনে উদয় হ'ল দু'দিন অসুবর্ণ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নি। গৃহিণী এখানে বেদপাঠ শ্রবণে

তন্ময় হয়ে আছেন এই অবসরে একবার সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ করে আসি।

'গুড-ইভনিং' বলে সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি একখানি স্থূলকায় পুস্তক খুলে নিবিষ্ট মনে বসেছিলেন। আমার প্রবেশমাত্র আনন্দিত হয়ে আমাকে তাঁর সম্মুখে বসতে অনুরোধ করলেন। আমি বিনয়ের ভাব দেখিয়ে বললাম—আমি এ সময়ে এসে আপনার পাঠের বিঘ্ন সৃষ্টি করলাম।

সাহেব পুস্তকপাঠ বন্ধ করে আমার দিকে চেয়ে বললেন—না না আমি পাঠে মগ্ন ছিলাম না, পুস্তক খুলে বসেছিলাম মাত্র। আপনার আগমনে বেশ আনন্দিত হলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে আপনাকে দেখেছিলাম আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মন্দিরে গেলেন।

বললাম—হ্যাঁ, আমরা মন্দিরেই ছিলাম। এখন মন্দিরে বেদ আলোচনা আরম্ভ হয়েছে আমার স্ত্রী সেখানে বসে আছেন।

সাহেব বললেন—বেদপাঠ ও আলোচনা শুনতে আমিও মধ্যে মধ্যে মন্দিরে গিয়ে বসি। বেদ এক অদ্ভুত সৃষ্টি। স্রষ্টার কোন সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না।

আমার পাণ্ডিত্য জাহির করতে উদ্যত হলাম। বললাম—মহামুণি ব্যাসদেব সৃষ্টি করেছেন বেদ। সেই কারণে তাঁর এক নাম বেদব্যাস।

সাহেব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উচ্চহাস্যে ঘর মুখরিত করে বললেন—না না, ব্যাসদেব বেদ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করে এক ধর্মপুস্তক আকারে চার অংশে বিভক্ত করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর অবদান অতুলনীয়। লক্ষ্য করলাম সাহেবের পরিবর্ত্তন গলার স্বর কম্পিত, সম্মুখে আমি একমাত্র শ্রোতা কিন্তু তাঁর উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর সমস্ত কক্ষে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তিনি দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি রেখে বলতে আরম্ভ করলেন—বেদ ব্রহ্মতেজ। তপস্যার দ্বারা যে শক্তি লাভ হয় তাই বেদ কিংবা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত মহামন্ত্র। এর ব্যাখ্যা করার শক্তি আধুনিক যুগে কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। একে সহজ সরল করার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব চার অংশে বিভাগ করেন। সেই আদি যুগের মুনি-ঋষি, পণ্ডিত মণ্ডলী এই মহামন্ত্র

বেদ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। সে শক্তি, সে শিক্ষা, জ্ঞান বর্ত্তমান সভ্যযুগে কাহারও আছে কিনা জানি না। এ-বস্তুর স্বাদ সেই যুগের জ্ঞানীগণ পেয়েছেন। আমি কেবল শুনি আর তন্ময় হয়ে যাই।

কয়েকটি বেদের শ্লোক আবৃত্তি করলেন। সংস্কৃতের কি চমৎকার উচ্চারণ ভঙ্গি। ইংরাজী ভাষায় সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা আমি মুগ্ধ হয়ে শুনলাম মাত্র, অন্তরে কিছুই প্রবেশ করল না! কারণ সংস্কৃতে আমি মহেশ ন্যায়রত্ন আর ইংরাজীতে ডব্লু. সি. ব্যানার্জী! সাহেব বিরামহীন সুদীর্ঘ ভাষণ দিচ্ছেন, কখনও দাঁড়াচ্ছেন, কখনও বসছেন, প্রায় এক ঘণ্টাকাল এইভাবে তাঁর মুখে বেদের মহিমা কীর্ত্তন শুনলাম। এরপর আশ্রমের নৈশভোজের ঘণ্টাধ্বনি হতে তিনি শান্ত অবস্থায় চেয়ারে বসে বললেন—চলুন আশ্রমে নৈশভোজের আহ্বান শোনা যাচ্ছে।

আমি নিষ্কৃতি লাভ করে গৃহিণীকে সঙ্গে নিয়ে আহার কক্ষে গেলাম। এরপর আর কোন সময়ে সাহেবের ত্রি-সীমানায় পদার্পণ করি নি।

আহারের পর আশ্রম থেকে ফিরে ডলির কক্ষে গেলাম, এখন সে বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও কেশবিন্যাস করে স্থিরভাবে শয্যায় বসে বিশ্রাম করছে। গৃহিণী তাকে কোন প্রশ্ন না করে কপালে, গায়ে হাত দিয়ে বললেন—এখনও সামান্য উত্তাপ রয়েছে মনে হচ্ছে। দিনকাল ভাল নয়। মা-শীতলা রক্ষা করবেন।

এরপর তার আর এক-দফা ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করা হ'ল, এখন আর কোনরূপ আপত্তি করলে না। গৃহিণী কয়েকখানি বিস্কুট তার হতে দিয়ে রাত্রে ক্ষুধা অনুভব করলে এই বিস্কুট আহারের ব্যবস্থা করলেন।

আজ মহর্ষি রমন আশ্রম পরিবর্ত্তন করে শ্রীমার দর্শনে পণ্ডিচেরীতে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাব ছিল কিন্তু গৃহিণী ডলিকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে অদ্যকার মত যাওয়া স্থগিত রেখে আগামীকাল যাওয়া স্থির করলেন। প্রাতে আশ্রমের প্রাতঃরাশে গিয়ে ডলির জন্য কফি এনে আমাদের সংগৃহীত বিস্কুট সহযোগে প্রাতে ডলির লঘু-পথ্যের ব্যবস্থা হ'ল। মধ্যাহ্নের জন্য আশ্রমে দুধের বন্দোবস্ত করা হ'ল।

স্নানের পর পুনরায় গেলাম শঙ্কর মন্দিরের সম্মুখে বাজারের দিকে। গৃহিণী

আজ পুনরায় গেলেন মন্দিরে। আমি বাহিরের নাট মন্দিরের কারুকার্য দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরলেন দেবতার নির্মাল্য নিয়ে। মন্দির সম্মুখে বাজারে গিয়ে ক্রয় করলেন একখানি পাঁউরুটী।

গেষ্ট-হাউসে এসে গৃহিণী প্রথমে ডলির কাছে গিয়ে দেবতার নির্মাল্য তার মস্তকে ও দেহে স্পর্শ করিয়ে দিলেন। গতকল্যকার তার প্রসাদ মুখে দিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। তারপর আশ্রম থেকে দুধ এনে ষ্টোভে পাঁউরুটী গরম করে ডলির পথ্যের সুব্যবস্থা করা হ'ল।

আজ ডলির জ্বর সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়ায় আমরা মনে কিছুটা শান্তি পেলাম। মধ্যাহ্ন আহারের পর লম্বা বিশ্রাম করে সন্ধ্যায় ডলির কক্ষে গল্প করে দিন কাটান হ'ল। আগামীকাল পণ্ডিচেরী যাওয়ার জন্য দ্রব্যাদি গোছগাছ করা হ'ল।

পরদিন প্রভাতে ডলির সংবাদ নিয়ে গৃহিণী নিশ্চিন্ত হলেন। বেলা দশটায় ট্রেন। আমরা আশ্রমে গিয়ে প্রাতঃরাশ খেয়ে একটি ঝটকা ডেকে মাল-পত্র তুললাম। এখন একবার ডলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক বিবেচনায় তার কক্ষের দিকে এসে নিদ্রিত দেখে আর বিরক্ত করলাম না। শঙ্কর মহাদেবকে ও ঠাকুর রমনের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ঝটকায় উঠে বসলাম।

গেষ্ট-হাউস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আমরা প্রায় আধ ফার্লং পথ অগ্রসর হয়েছি এমন সময় দেখলাম ডলি দৌড়ে আমাদের দিকে আসছে। গৃহিণী বললেন—ঐ গো, রোগাটা দৌড়চ্ছে। আসবার সময় আমাদের বলে আসা উচিত ছিল;

ঝটকা থামিয়ে আমরা নেমে দাঁড়ালাম। ডলি আমাদের সঙ্গে কোন কথা না বলে একেবারে আমাদের সম্মুখে পথের উপর নতজানু হয়ে আমাদের পাদুকা স্পর্শ করে মাথা নীচু করে বসে পড়ল। হাত ধরে তুললাম। দেখলাম তার নয়ন অশ্রুসিক্ত। ভুলে গেলাম সে বিদেশিনী। ভুলে গেলাম সে যুবতী, হাত ধরে টেনে তার শির চেপে ধরলাম আমার বুকে, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। তখন মুখে কোন ভাষা ছিল না।

এরপর অশ্রুসিক্ত নয়নে গৃহিণী টেনে নিলেন তাকে নিজের বুকে। অঞ্চলে

মোছালেন তার অশ্রুসিক্ত মুখ। নিজের নয়নাশ্রু কপাল বেয়ে ঝরে পড়ল তার মস্তকে। কিছুক্ষণ এইভাবে থেকে গৃহিণী প্রশ্ন করলেন—এখন শরীর কেমন আছে?

উত্তর দিলে—ভাল, আজ আশ্রমে মিল খাব।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহিণীকে সময়ের অজুহাতে তাগিদ দিয়ে ঝটকায় বসলাম। পথে আমাদের উভয়ের কোন বাক্য বলার সামর্থ্য যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। তিরুবন্নমালাই ষ্টেশনে এসে গৃহিণী বললেন—মেয়েটার কাল সকালেও জ্বর ছিল, আজই ভাত খাবে! যা করে করুগ গে!

পণ্ডিচেরী

আমরা চলেছি কাটপাড়ি ভিলিপুরম লাইনে। এই লাইনের মধ্যপথে তিরুবন্নমালাই। আমরা তিরুপতি ষ্টেশন থেকে এসেছিলাম এই লাইনে। তিরুবন্নমালাই থেকে ভিলিপুরম প্রায় সত্তর কিলোমিটার পথ। ভিলিপুরমে এলাম দ্বিপ্রহর বেলা বারোটায়।

ভিলিপুরম থেকে একটি শাখা লাইন গেছে পণ্ডিচেরী। দূরত্ব মাত্র আটত্রিশ কিলোমিটার। সময় লাগে দেড় ঘণ্টা। ট্রেন ছাড়বে বেলা প্রায় দু'টোয়। আমরা পণ্ডিচেরীতে হাজির হব বেলা প্রায় সাড়ে তিনটায়।

ষ্টেশনের ক্যানটিনে আহার করে ট্রেনে এসে বসলাম। পুরাতন জীর্ণ কামরা কোনরূপে ধূলা ঝেড়ে বসলাম। ট্রেন ছাড়ল। নয়ন তৃপ্তিকর সবুজের মেলা যেন শেষ হয়েছে, পাহাড় শ্রেণীও অদৃশ্য হয়েছে, রেলপথের উভয় পার্শ্বে শুষ্ক প্রান্তর। তিরুবন্নমালাইয়ের পরই যেন মমতাময়ী বসুন্ধরা অকস্মাৎ নিস্মমরূপ ধারণ করেছে। অতি নিকটেই নয়নাভিরাম বঙ্গোপসাগর সারা অঙ্গে তরঙ্গ তুলে চলেছে আরবকে গরব দেখাতে। তার পাশেই নীরস প্রান্তর যেন প্রদীপের নীচে অন্ধকার!

জীর্ণতনু ট্রেন অলস মন্থর গতিতে এসে থামল প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরী ষ্টেশনে। ষ্টেশনের পাশেই সাক্ষ্য দিচ্ছে সে যুগের ফরাসী প্রভাবের নিদর্শন এক গগনভেদা উচ্চচূড়া বিশিষ্ট গীর্জা। তার পাশ দিয়ে সহর প্রবেশের প্রধান পথ। ট্রেন থেকে নেমে একখানি সাইকেল

রিক্সা-চালককে ডেকে আমাদের কয়েকদিনের অবস্থান জন্য একটি সুবিধামত স্থানের ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব করলাম।

রিক্সা-চালক ছোকরা বেশ চতুর, আমাদের অভয় দিয়ে বললে—আপনাদের সুব্যবস্থার ভার আমার। কোন চিন্তা করবেন না। মাল-পত্র আপনার প্রচুর, আর একখানি রিক্সা-আবশ্যক।

অগত্যা আমি স্বীকৃত হলাম।

রিক্সা-চালক তৎক্ষণাৎ তার এক জুড়ীদার ভায়াকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের মাল-পত্র তুলে নিলে।

পণ্ডিচেরী অধুনা মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত। বাঙ্গালী অধিবাসী এ-স্থানে প্রচুর। ঋষি অরবিন্দের আশ্রমের সংস্পর্শে বহু বাঙ্গালী এখানে যাতায়াত করেন। মনে হয় সেই কারণে রিক্সা-চালক, ট্যাক্সি-ড্রাইভার, হোটেল মালিক প্রভৃতি বাঙ্‌লা ভাষা বলতে অভ্যস্ত। আমাদের রিক্সা-চালক পরিস্কার বাঙ্‌লায় কথা বললে।

আমাদের পরামর্শ দিয়ে বললে—চলুন প্রথমে আশ্রমের অফিসে যাই, আশ্রমের বাবুরা আপনাদের সুব্যবস্থা করে দেবেন।

রিক্সা-চালক একটি বাটীর দ্বারে রিক্সা থামিয়ে আমাদের বললে—ভিতরে গিয়ে আপনাদের অভিপ্রায় জানান।

বাটীর বাহিরে একটি ছোট কক্ষে আশ্রমের অফিস। কয়েকটি ভদ্রলোক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের অভিপ্রায় তাঁদের নিকট জ্ঞাপন করলাম। তাঁরা বললেন—আপনাদের আশ্রমে অবস্থানের কোন বাধা নেই, তবে সেক্রেটারী বাবুর অনুমতি আবশ্যক।

রিক্সা-চালক আশ্রমের সেক্রেটারী বাবুর ভবনে আমাদের নিয়ে গেল। তিনি আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে বিনা আপত্তিতে সাত দিনের জন্য অনুমতি-পত্র দিলেন।

পুনরায় এলাম সেই আশ্রমের অফিসে। তাঁরা দু'খানি মুদ্রিত কার্ডে আমাদের পরিচয়-পত্র দিয়ে অবস্থানের জন্য ব্যবস্তা-পত্র দিলেন। সহজে ঋষি অরবিন্দের আশ্রমে আশ্রয়ের অনুমতি-পত্র হাতে পেয়ে মনে হ'ল যেন হাতে চাঁদ পেলাম।

সমুদ্রতটে একটি বৃহৎ ভবনের দ্বারে রিক্সা থামিয়ে রিক্সা-চালক আমাদের ভিতরে গিয়ে অনুসন্ধান করতে বললে। শুনলাম এটি নাকি আশ্রমের শাখাভবন। দ্বারের নিকটে এসে একটি কক্ষে কয়েকজন প্রবীন ভদ্রলোককে দেখলাম। অনুমান করলাম এই কক্ষটি আশ্রমের কার্যালয়। তাঁদের নিকট গিয়ে আমাদের পরিচয়-পত্র দাখিল করলাম। তাঁরা আমাদের কার্ডগুলি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন—স্থান নেই। একখানি কামরা খালি আছে সেখানি চার সিটের কামরা। আপনারা যদি সেই কামরা নিতে চান প্রতিদিনে আহার সমেত আপনাদের দিতে হবে চব্বিশ টাকা।

উর্ধপানে চেয়ে বললাম—"হে ঋষি অরবিন্দ, এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না কাকে কি বলছে!"

কাতরভাবে বললাম- এত টাকা ব্যয়ে আমরা অসমর্থ।

অফিস অধ্যক্ষ বললেন—আজ আর কোন কামরা খালি নেই। কাল প্রাতে একখানি দু'সিটের কামরা দিতে পারব, তার জন্য আপনাদের দু'জনের আহার সমেত দিতে হবে প্রতিদিনের জন্য ষোল টাকা।

বললাম—এর পরে আর কোন ব্যবস্থা হয় না?

বললেন—প্যাণ্ডেল আছে দেখে আসুন, যদি আপনাদের মত হয়। ব্যয় কম, আট টাকায় দু'টি সিট পাবেন।

কিছু ভরষা পেলাম। গৃহিণীকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে গেলাম আট টাকার ব্যবস্থা। একটি বৃহৎ সামিয়ানার তলায় মশারী আবৃত শ্রেণীবদ্ধ খাটিয়া। আর তারই নীচে দ্রব্যাদি রাখার সুব্যবস্থা।

এ-স্থান গৃহিণীর মনঃপূত হ'ল না।

না হওয়ারই কথা। কোন ভদ্রমহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সকল সময় এত যাত্রী সমাগম হয় না। এ সমাগম কেবল শ্রীমার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে। নানা প্রদেশ থেকে শিষ্য বা ভক্তবৃন্দ উৎসবে যোগদান করেছেন। উৎসব কয়েকদিন হ'ল শেষ হয়েছে, যাত্রীরা এখনও স্থান ত্যাগ করেন নি।

রিক্সা-চালককে জানালাম এ-স্থানে আমাদের সুবিধা হবে না। কোন লজ

কিংবা হোটেলে আমাদের ব্যবস্থা কর।

এবার তারা আমাদের একটি লজে এনে হাজির করলে। প্রধান রাস্তার উপর একটি ত্রিতল ভবন। একখানি সুসজ্জিত কামরায় ভাড়া দৈনিক চার টাকা; কামরা সংলগ্ন বাথরুম। আমরা বিনাদ্বিধায় ত্রিতলের একটি কামরায় মাল-পত্র তুললাম। দু'খানি রিক্সার ভাড়া দিলাম ছ'টাকা। পূর্বেই বলেছি দক্ষিণ প্রদেশে ঝটকা-কুলির মজুরী অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। কোন নূতন আগন্তুককে ধরতে পারলে দ্বিগুণ মজুরী আদায় করে। আমরা পণ্ডিচেরী থেকে প্রত্যাগমনের দিন একখানি রিক্সায় মাল-পত্র তুলে সেই রিক্সায় আরোহণ করে ষ্টেশনে এসে দিয়েছিলাম মাত্র দেড় টাকা। সে হাসিমুখেই সেলাম করে। সকল সময় মনে রাখবেন এ প্রদেশে তীর্থভ্রমণে বাসস্থান, আহার, পূজা প্রভৃতি যে সকল ব্যয় হয় তন্মধ্যে—"সবার উপরে কুলি শ্রেষ্ঠ, তাহার উপরে নাই।"

এই লজের নিম্নে ভাল হোটেল। একবেলার মিলের মূল্য পঁচাত্তর পয়সা। সমস্ত হিসাব করে দেখলাম বিজলী বাতি, পাখা সুসজ্জিত ত্রিতলের কামরার ভাড়া দু'বেলা আহার, চা প্রভৃতি সমস্ত ব্যয় হয় প্রতিজনের চার টাকা। স্থান সংগ্রহে দু'ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হ'ল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে লজে এসে নিশ্চিন্ত হলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হাত মুখ ধুয়ে নীচের হোটেলে আহারে গেলাম। মিহিচালের অন্ন, ঘি, দু'প্রকার নিরামিষ তরকারী, ডাল, পাঁপড়, চাটনি ও ঘোল। আমরা দু'দিন এই হোটেলেই অন্ন আহার ও চা পান করেছিলাম। ব্যয় অধিক নয়। ব্যবহারও বেশ সৌজন্যপূর্ণ।

পরদিন প্রভাতে গৃহিণী লজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললেন—এখানেও অনেক মন্দির গোপুরম দেখছি। চল মন্দিরগুলি দেখে আসি।

গৃহিণীর আগ্রহে মন্দির কয়টি দেখতে গেলাম। লজের এক ফার্লং দূরে একটি গোপুরম দেখে সেইদিকে গেলাম, মন্দিরদ্বারে পূজার ডালি ও ফুলের দোকান। গোপুরম অতিক্রম করে মন্দিরদ্বারে এসে দেখলাম সম্মুখে বালাজীর মূর্ত্তি, পার্শ্বে গণেশ ও শঙ্কর-পার্বতী। এর কিছুদূরে আর একটি মন্দিরে গিয়ে সেখানেও দেখলাম শঙ্কর-পার্বতী। ক্রমে আরও কয়েকটি মন্দির দর্শনের পর এলাম সমুদ্রের দিকে। পথিমধ্যে দেখলাম

এক প্রাসাদতুল্য বৃহৎ অট্টালিকা। তার লৌহ-ফটক অতিক্রম করে দেখলাম একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান। উদ্যানের পশ্চাতে প্রশস্ত বারান্দাযুক্ত একটি হল্। বয়-বাবুর্চির মত কয়েকজন কর্মব্যস্ত লোককে ইতস্ততঃ যাতায়াত করতে দেখলাম। আট্টালিকার সম্মুখভাগে ও পার্শ্বের দেওয়াল গাত্রে বড় বড় হরফে লেখা অরবিন্দ-আশ্রম। সম্মুখের হল্‌টির বামপার্শ্বে অন্য একটি হলে বেশ কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা লাইনে দাঁড়িয়ে কয়েকখণ্ড পাঁউরুটী আর গ্লাসে কি যেন নিচ্ছেন। কৌতুহল বশে একজন লোকের নিকট জানলাম আশ্রমে যে সকল অতিথি এসেছেন তাদের প্রাতঃরাশের জন্য মাখন-রুটী ও কফি দেওয়া হচ্ছে।

ভদ্রলোককে বললাম—এইটি কি ঋষি অরবিন্দের আশ্রম ?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, এইটি এক নম্বর বা প্রধান আশ্রম। কিছুদূরে সমুদ্রতীরে আরও দু'টি আশ্রম ভবন আছে। উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রমের শিষ্য বা অতিথি এলে সেখানে স্থান দেওয়া হয়। কয়েকদিন পূর্বে শ্রীমার জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। এ বৎসর বহু শিষ্য ও অতিথির সমাগমে স্থান সঙ্কুলান হয় নি। সে কারণ আশ্রমের সম্মুখে একটি প্যাণ্ডেলে বহু অতিথিদের স্থান দেওয়া হয়। এই এক নম্বর আশ্রম বাটীতে মাননীয় শিষ্যদের জন্য স্থান দেওয়া হয়। সাধারণ যাত্রীদের জন্য সমুদ্রতীরে দুই, তিন নম্বর ভবনে স্থানের ব্যবস্থা আছে।

ভদ্রলোককে বললাম—অরবিন্দ কি এই আশ্রমে থাকতেন ?

তিনি বললেন—আমি কয়েকদিন এ-স্থানে শ্রীমার জন্মোৎসব দেখতে এসেছি, বিশেষ কিছুই জানি না। শুনেছি এখান থেকে কয়েকমাইল দূরে আছে অরবিন্দের আদি আশ্রম ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় গোশালা, আশ্রমের নিত্য-প্রয়োজনে রুটীর কারখানা। কিছু সব্‌জি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শস্যক্ষেত্রও আছে। সেগুলি দেখতে হলে আশ্রম থেকে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দেয়। প্রতিজনের জন্য যাতায়াতে দশ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয়।

বললাম—শ্রীমা নিশ্চয়ই এখানে থাকেন। এখন তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব ?

তিনি বললেন—এ সময় তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না, অপরাহ্ণে এলে সাক্ষাৎ পাবেন।

পাশের হল্ থেকে দু'টি মহিলা বেরিয়ে এসে ভদ্রলোককে বললেন—তোমার কফি খাওয়া হয়ে গেছে? যদি না হয়ে থাকে এখন আমাদের সঙ্গে এস, ঘর ফাঁকা আছে।

ভদ্রলোক মহিলাদের সঙ্গে কফি পানে গেলেন। আমরা আশ্রম থেকে বেরিয়ে সমুদ্র উপকূলের দিকে গেলাম।

আশ্রমের পর পণ্ডিচেরী রাজভবন ও লাইট-হাউসের পাশ দিয়ে সমুদ্র-কূলে হাজির হলাম। এমন চমৎকার মেরিন-বীচ ইতিপূর্বে দেখি নি। একদিকে গগনচুম্বী উচ্চভবন, আর একদিকে উদ্দাম তরঙ্গমালা সহ প্রবাহমানা বঙ্গোপসাগর। তারই মধ্যভাগে সুদীর্ঘ প্রস্তর নির্মিত মেরিন-বীচ। বেলাভূমির সৌন্দর্য দর্শনের কিংবা উপকূলে বায়ু সেবনের জন্য প্রতি দশ গজ অন্তর চারিটি সিটের প্রস্তর ও সিমেণ্টে নির্মিত এক একটি বেঞ্চ। মেরিন পথটি সমুদ্র কিনারা থেকে অন্ততঃ দশ ফুট উচ্চ এবং সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত। এ সত্ত্বেও তরঙ্গের নির্মম আঘাতে মেরিন বক্ষের কয়েকস্থানের অস্থি-পঞ্জর ভগ্ন হয়েছে।

মেরিন-বীচে একটি আসনে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমাদের নিকটে আহ্বান করে তাঁর পার্শ্বে বসতে অনুরোধ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ভদ্রলোকের সকল পরিচয় জ্ঞাত হলাম। এঁর নাম নির্ম্মল ঘোষ দস্তিদার। পূর্বে ফরাসী সরকারের অধীনে উচ্চপদে কর্ম করতেন। বর্তমানে অবসর গ্রহণ করে এই স্থানেই স্থায়ীভাবে আছেন। ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্র কোনও কলেজের অধ্যাপনা করেন। ভদ্রলোক আমাদের প্রশ্ন করলেন—আপনারা কি শ্রীমার উৎসবে এসেছেন?

আমি বললাম—এই সময় তাঁর জন্মোৎসব আমরা জানতাম।

আমরা দক্ষিণ ভারতের দিকে এসেছি এ-প্রদেশের কিছু কিছু দেখার উদ্দেশ্যে। গৃহিণীর আগ্রহে তীর্থপথে চলেছি এ-কথাও বলতে পারেন। মাদ্রাজ থেকে এদিকের কয়েকটি তীর্থস্থান পরিভ্রমণের পর গতকাল শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম দেখতে পণ্ডিচেরী এসেছি।

ভদ্রলোক বললেন—আর কয়েকদিন পূর্বে আসতে পারলে উৎসবের রূপ দেখতে পেতেন।
আমার গৃহিণী বললেন—আমাদের সেই ইচ্ছা ছিল, পথে কয়েকদিন বিলম্ব হয়ে গেল। শ্রীমা কি অরবিন্দের স্ত্রী?
ভদ্রলোক হেসে বললেন—উনি শ্রী অরবিন্দের কোন আত্মীয়া নন, ভারতবাসী হিন্দু-নারীও নন্। ইনি ফরাসী দেশের মেয়ে শ্রী অরবিন্দকে গুরু বলে মেনে নেন। আশ্রম সংগঠন, সকল প্রকার উন্নতি সাধন ও বহু জন-হিতকর কাজ এই শ্রীমার প্রচেষ্টায়।
গৃহিণী বললেন—অরবিন্দের জন্ম হয় শুনেছি বিলেতে। মা বোধহয় বিলাতি—মেমসাহেব।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—আপনারা তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না দেখছি। তাঁর জন্ম হয় বঙ্গদেশের কলকাতায়। তাঁর মা ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। তাঁর নাম ছিল স্বর্ণলতা দেবী! অরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীনের জন্ম হয় বিলাতে। শ্রী অরবিন্দের পিতা হলেন ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ, ইনি পুরোদস্তুর সাহেবীভাবাপন্ন ছিলেন। পুত্র অরবিন্দের শৈশবে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন দার্জিলিং-এ লরেটো কনভেন্ট স্কুলে। কিছুদিন পরেই তাঁকে পাঠান বিলেতে। তিনি আশৈশব পাঠ্যাবস্থা বিলাতে কাটিয়েছিলেন। কেবল ইংরাজীতে নয়, তিনি ল্যাটিন, গ্রীক্ ও ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষায় সুপণ্ডিত হন। বিলাতের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি বরোদার গায়কোয়াড় ষ্টেটে সেক্রেটারীর পদে কিছুদিন ছিলেন।
গৃহিণী বললেন—উনি বোধহয় স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ছিলেন?
ভদ্রলোক বললেন—না। বরোদায় বাসকালে যশোর নিবাসী ভূপাল চন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা মৃনালিণী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বরোদায় কার্য্যকাল থেকে তিনি দেশের কাজে মন দেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে বিপ্লবী নেতা জ্ঞানে কারারুদ্ধ করে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। সেই সময় মাণিকতলার বোমার মামলায় কনিষ্ঠ ভাই বারীন

আরও অনেকে গ্রেপ্তার হন। মামলা চলে এক বৎসর, অনেকে গেলেন কারাগারে অনেকের হয় দ্বীপান্তর। শ্রী অরবিন্দ সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন। তারপর তিনি নেমেছিলেন এ যুগের চরম আধ্যাত্মিক অভিযানে। সাধনা করতে করতে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি এমন এক দর্শনতত্ব আর যোগ পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, যা পরম নিষ্ঠাবান সাধক মাত্রকেই যথোচিত আলোকদানে সমর্থ হবে, এই পথেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

গৃহিণী বললেন—পণ্ডিচেরীতে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে আনেন নি ?

ভদ্রলোক বললেন—তিনি সাধন-মার্গের সাধকরূপে একাই এসেছিলেন পণ্ডিচেরীতে। মনে হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রী অরবিন্দ সহধর্মিনী মৃনালিণী দেবীকে পণ্ডিচেরী আসার অনুমতি দিলেন কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাঁর জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়লো। পণ্ডিচেরীর পথে কলকাতায় এসে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে জীবনের অবসান ঘটে।

গৃহিণী বললেন—শ্রীমা কি অরবিন্দের আশ্রমে থাকতেন ?

ভদ্রলোক বললেন—শ্রী অরবিন্দ একান্ত নির্জনে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সে সময় কারো দেখা সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। শ্রীমার নাম ছিল শ্রীমতী মীরা রিশার। তিনি ভারতের ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে থাকতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মা-বাবার সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যান। পুনরায় পণ্ডিচেরীতে এলেন যুদ্ধের পর। তখন থেকে শ্রীমতী মীরা রিশার অর্থাৎ শ্রীমা, শ্রী অরবিন্দের কাছেই থাকেন। সেই সময় থেকেই তিনি শাড়ী পরতে আরম্ভ করলেন। চালচলনে তিনি খাঁটী ভারতীয় পদ্ধতি মেনে চলতে লাগলেন। তখন থেকে গৃহস্থালী ব্যাপারের সব দায়িত্বই গ্রহণ করলেন। সিদ্ধিলাভের পর শ্রী অরবিন্দ লোকচক্ষুর একেবারে অন্তরালে চলে গেলেন। এই সময় শ্রীমা শ্রী অরবিন্দের গৃহস্থালীর সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তারপর তিনি ক্রমে ক্রমে এক সুবৃহৎ আশ্রম গড়ে তুললেন। সেই আশ্রমের নাম দেওয়া হ'ল শ্রী অরবিন্দ আশ্রম। এদিকে এসেছেন আশ্রম ও শ্রীমাকে দেখে যাবেন। যাঁরা এখানে এসে আশ্রমে আশ্রয়

নেই, তাঁদের চা-কফি ও দু'বেলা আহার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, অবশ্য মূল্য দিতে হয়।

বললাম—সকালে আশ্রমের দিকে গিয়েছিলাম। আশ্রমের অতিথিদের কফি সরবরাহ দেখে এলাম।

ভদ্রলোক বললেন—এ-স্থানটিও ক'লকাতায় দক্ষিণেশ্বরের মতই তীর্থস্থান। শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রীমার প্রচেষ্টায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে পণ্ডীচেরীর বাইরে কিছুদূরে গিয়ে সেগুলি একদিন দেখে আসবেন।

এর পর আমরা সকলে সমুদ্রতীর ত্যাগ করে আশ্রমের সম্মুখে এলাম। দস্তিদার মশায় অপরাহ্নে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলেন। এঁকে বিদায় দিয়ে আমরা লজে ফিরলাম।

অপরাহ্নে লজ থেকে বেরিয়ে প্রধান রাস্তাগুলি ঘুরলাম। বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলারা নানা কাজে চলেছেন। বালক বালিকাদের বিদ্যালয় থেকে গৃহাভিমুখে যেতে দেখলাম। পথিমধ্যে একটি বাঙ্গালী বালক কোন এক প্রকার ফলের বিচির সাহায্যে তৈরী ভ্যানিটি ব্যাগ বিক্রয় করছে। এ দ্রব্য লওয়ার ইচ্ছা আমাদের ছিল না কিন্তু বালকটির কাতর অনুরোধে গৃহিণীকে আট আনা মূল্যে একটি ক্রয় করতে বাধ্য করলেন।

এরপর পুনরায় এলাম শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমের দিকে। ফটক পার হয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি থেকে সমস্ত আশ্রম ভবনটির কোন স্থানে ময়লা কিংবা অপরিষ্কার দেখলাম না। দ্বিতলের একটি কক্ষে বহু শিষ্য ও ভক্ত পরিবৃত শ্রীমাকে দেখলাম। গৃহিণী কক্ষমধ্যে গিয়ে বসলেন। আমি আশ্রমের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে দেখে বেড়ালাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গৃহিণী কক্ষ ত্যাগ করে এসে বললেন—শ্রীমাকে দেখলাম আমাদেরই মত সাদা শাড়ী পরে আছেন।

বললাম—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কোন শিষ্যকেই গৈরিক ধারণ করতে বলেন নি। শুনেছি তিনিও গৈরিকধারী ছিলেন না। তাঁর আশ্রমের নিয়ম ও সাধন-পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

নীচে নেমে এসে দেখলাম আশ্রমের অতিথিগণ নৈশ ভোজে বসেছেন। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ভোজন ব্যবস্থা আশ্রমের নিয়ম। ভোজন-পাত্রে

আহার্য দ্রব্য দেখার অভিপ্রায়ে আহার কক্ষে এলাম। দেখলাম একসঙ্গে প্রায় শতাধিক লোক আহারে বসেছেন। কক্ষের মেঝেয় ম্যাটিং বিস্তৃত প্রত্যেকের সমক্ষে এক ফুট উচ্চ একটি ডেস্কের আকারে একটি কাঠের চৌকী, সেই চৌকীর উপর আহারের থালা। পাত্রে অনেকগুলি স্লাইস কাটা ব্রাউন পাঁউরুটী, একটি বাটিতে ফিকে সাদা রঙের তরলবস্তু দেখলাম। পরিবেশনকারীদের জনৈক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে জানলাম, পদার্থটি কাউ-মিল্ক। এর পর আরও কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। আমরা কক্ষ ত্যাগ করে লজে ফিরলাম।

পরদিন প্রাতে ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের বাটীতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, গৃহিণী আরও কয়েকটি মন্দির দর্শনে সময় অতিবাহিত হওয়ায় যাওয়া সম্ভব হ'ল না। আমরা ঐদিনই আহারাদির পর আশ্রমের দিকে প্রণাম জানিয়ে পণ্ডীচেরী ত্যাগ করলাম।

চিদাম্বরম্

তিরুবন্নমালাই থেকে পণ্ডীচেরী আসার পথে ভিলিপুরমের সন্নিকটে আরও একটি তীর্থস্থান আছে, সেটির নাম তিরুকুলার। তিরুবন্নমালাই থেকে বাস-পথেও যাওয়া যায়। এ সংবাদ আমাদের পূর্বে জানা ছিল না। পণ্ডীচেরী আসার দিন তিরুকুলারে শঙ্কর মন্দিরের বৃহৎ গোপুরম ট্রেন থেকেই দেখলাম।

পণ্ডীচেরী থেকে ট্রেনে উঠে গৃহিণী বললেন—সেদিন তিরুকুলারের শঙ্কর মন্দির তোমার অজ্ঞতার জন্যই দেখা হয় নি। ট্রেন থেকে দেখতে পেলাম কি চমৎকার সহর, বিরাট গোপুরম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল নেমে দেখে যাই। এবার সর্তক থাকবে আর যেন কোন বড় তীর্থস্থান বাদ পড়ে না যায়।

বললাম—দক্ষিণ ভারতের যতগুলি তীর্থস্থান আছে দেখতে হলে তোমাকে পদব্রজে যেতে হবে। প্রতি মাইল অন্তর এক একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। বিশেষ ভিলিপুরম থেকে রেলপথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য গোপুরম দেখতে

পাবে। সেগুলি দেখে শেষ পর্যন্ত রামেশ্বরে পৌঁছানোর পূর্বে দেহ ও মন ভেঙ্গে পড়বে। তখন আর প্রধান তীর্থগুলিও দেখার শক্তি থাকবে না।

ভিলিপুরম ষ্টেশনে হাজির হলাম। এ-স্থান থেকে আমরা চিদাম্বরম যাওয়া মনস্থ করেছিলাম। কুলিদের মুখে শুনলাম চিদাম্বরমের ট্রেনের বিলম্ব নেই। সত্বর বুকিং অফিসে গিয়ে টিকিট নিলাম। কিছুপরেই আমরা আনন্দে ট্রেনে উঠে বসলাম।

মাল-পত্র মিলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দেখলাম আমাদের নিকটে এক গুজরাটি সহযাত্রী রয়েছেন। তিনি আমাদের বললেন—আপনারা কি দক্ষিণভারতের তীর্থপথে বেরিয়েছেন ?

বললাম—এসেছি দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু দেখতে। গৃহিণীর আগ্রহে প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিও দেখে যাচ্ছি। আপনি কি সূত্রে এদিকে এসেছেন ?

ভদ্রলোক বললেন—আমার বাদাম তেলের কারবার, এদিকে সরবরাহ করে থাকি সে কারণ মধ্যে মধ্যে আসতে হয়। আপনারা বোধহয় বৃদ্ধাচলম্ থেকে আসছেন ?

বললাম—না, আমরা আসছি পণ্ডীচেরী থেকে। এখন যাব চিদাম্বরম্। ভদ্রলোক বললেন—আজ ভিলিপুরম থেকে বৃদ্ধাচলম গিয়ে বুড়ো শিব-মন্দির দেখে কাল কিংবা দু'একদিন পরে চিদাম্বরম্ যেতে পারতেন। ভিলিপুরম থেকে বৃদ্ধাচলম মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ।

গৃহিণী আমার দিকে ফিরে বললেন—তুমি এদিকের কিছুই জান না। কারও কাছে খোঁজও নেবে না। সেদিন তিরুকুলার শঙ্কর মন্দির তোমার জন্যই দেখা হ'ল না, আজ এখানে এসে আবার এক শিবমন্দির দেখা হ'ল না। ভদ্রলোক বললেন—অপনারা ভিলিপুরম থেকে না গেলেও সামনে কুদ্দালোর জংশনে নেমে যেতে পারেন। কুদ্দালোর থেকে বৃদ্ধাচলমের দূরত্ব প্রায় একই। ভিলিপুরম থেকে একবারে বৃদ্ধাচলম টাউনে নামতে পারতেন। কুদ্দালোরে থেকে গেলে টাউনে যেতে আপনাকে বাসে কিংবা ঝটকায় যেতে হবে।

গৃহিণী বললেন—উনি বলছেন এই লাইনে কুদ্দালোর ষ্টেশন থেকেও যাওয়া যায়। চল আমরা ঐ ষ্টেশনে নেমে যাই।

বললাম—কুদ্দালোরে নামলেই বৃদ্ধাচলমের বুড়ো শিব মন্দির দেখতে পাব না। কুদ্দালোর থেকে অন্য ট্রেনে যেতে হবে পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ। এদিকে এখন আমরা চিদাম্বরমের টিকিট নিয়েছি, কুদ্দালোরে নামলে কুদ্দালোর থেকে চিদাম্বরমের ভাড়া গচ্চা যাবে। মোট কথা এখন বৃদ্ধাচলম যেতে আরও পনের টাকা দিতে হবে। তারপর আবার বৃদ্ধাচলম থেকে চিদাম্বরমের ভাড়া স্বতন্ত্র দিতেই হবে। এইপথে তাঞ্জোরে সর্বাপেক্ষা বড় শঙ্কর মন্দির আছে। আমরা তাঞ্জোরে গিয়ে বড় শঙ্করের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। যদি সম্ভব হয় ফেরার পথে দেখে গেলেই হবে।

গৃহিণী মুখ গোমড়া করে ফিরে বসলেন।

গুজরাটী সহযাত্রী বললেন—এর পরের ষ্টেশন কুদ্দালোর জংশন। আমি কুদ্দালোরে নামব। যদি আপনাদের মত হয় আজ এখানে নেমে বৃদ্ধাচলম দেখে যেতে পারেন।

বললাম—আমরা চিদাম্বরমের টিকিট নিয়েছি, সে কারণ এখন কুদ্দালোরে নামলে কিছু অর্থ লোকসান দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা ফেরার পথে দেখে যাব।

কয়েক মিনিট পরেই কুদ্দালোর জংশনে এসে গেলাম। ভদ্রলোক আমাদের নমস্কার করে নেমে পড়লেন। আমি কামরার অলিন্দে মাথা গলিয়ে একবার বৃদ্ধাচলমের গোপুরম দেখার চেষ্টা করলাম। দেখলাম অদূরে বোধহয় কুদ্দালোর সহরে কয়েকটি জীর্ণ গোপুরমের চূড়া দেখে গৃহিণীকে বললাম—এদিকে এস, বৃদ্ধাচলমের গোপুরম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এইখানে দেখে প্রণাম করে নাও।

গৃহিণী পিছন ফিরেই বললেন—মহাদেবের পরম ভক্ত নন্দী তুমি। তাই তিনি গোপুরম তুলে ধরে পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে দেখাচ্ছেন।

কুদ্দালোর ছেড়ে ট্রেন চলতে শুরু করল। এ দেশীয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এ প্রদেশীয় সমাজ ও স্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে চলেছি। একস্থানে ট্রেন থামতে তিনি বললেন—এই কিলি ষ্টেশন এর পরেই চিদাম্বরম্। ট্রেন ছাড়লেই দেখতে পাবেন ও প্রদেশের বিখ্যাত আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়।

ট্রেন ছাড়ার কিছু পরেই দেখলাম শ্রেণীবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ভবনগুলি।

গৃহিণীকে বললাম—এই দেখ বিখ্যাত আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়।

তিনি পুরাতন সুরেই বললেন—তুমি ভাল করে দেখে প্রণাম কর। পরজন্মে যদি কিছু জ্ঞান লাভ করতে পার।

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনশ্রেণীর শেষ প্রান্তে চিদাম্বরম ষ্টেশনে এসে ট্রেন হাজির হ'ল। একটি ঝটকায় মাল-পত্র তুলে এলাম নটরাজ মন্দিরের গোপুরমের পাদদেশে। ঝটকাওয়ালা একটি একতল বাটীর দ্বারে ঝটকা থামিয়ে আমাদের বললেন—এইটি ভাল ধর্মশালা। ভিতরে গিয়ে দেখে আসুন। বাটীর মধ্যে গিয়ে দেখলাম ছয় সাতখানি কামরা বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বাটী। তিন চারখানি কামরা খালি। বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি কূপ, কক্ষগুলি বাসোপযোগী। বিজলী-বাতির ব্যবস্থা আছে। বাটীর ম্যানেজারের সাক্ষাৎ পেলাম না।

ঝটকাওয়ালা এ বাটীর বিপরীত ভাগে অন্য একটি ভবনে ম্যানেজারের নিকট নিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলে। দেখলাম এক সুপুরুষ প্রৌঢ় গুজরাটী ভদ্রলোক এই বাটীর মালিক। এটি ধর্মশালা নয়। ভাড়াটে যাত্রী নিবাস। বাটীর ম্যানেজার বা মালিকের নিকট শুনলাম প্রতিদিনের জন্য ভাড়া দু' টাকা। ধর্মশালাই হোক বা যাত্রী-নিবাস হোক কোনরূপে দু' দিন অবস্থান আমাদের আবশ্যক। তাঁর নিকট দু' টাকা ভাড়ায় স্বীকৃত হয়ে কক্ষে মাল-পত্র তুললাম। এই সকল তীর্থস্থানে ধর্মশালা কিংবা যাত্রী-নিবাসে অগ্রিম কিছু নিয়ে থাকেন কিন্তু এঁর সেরূপ কোন দাবী দেখলাম না। কোন অসুবিধা হলে সংবাদ দিতে বললেন। আগম ও নিগম দুইবার ব্যতীত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন হয় নি।

বাটীর দ্বারে এক বৃদ্ধ মাদ্রাজীকে দেখলাম। তিনি বাড়ীর মালিকের নিযুক্ত এ বাটীর প্রহরীরূপে সকল সময় থাকতেন। রাত্রে দ্বার বন্ধ করে বারান্দায় শয়ন করে পাহারা কিংবা নিদ্রা দিতেন। তামিল ব্যতীত অন্য কোন ভাষার সংস্পর্শে কোনদিনই তিনি যান নি। কিছু বললে একটু হাসেন।

যাত্রী-নিবাসে প্রবেশমাত্র পেলাম, বর্ণ ও আকৃতিতে গৌরাঙ্গের মত দশ বারো বৎসরের একটি কিশোর বালককে। আমরা যে কয়দিন চিদাম্বরমে

ছিলাম, সে প্রায় সকল সময়ে আমাদের কক্ষে থাকতো।

এমন বিনয়ী পরোপকারী বালক ক্বচিৎ দেখেছি। তামিল ব্যতীত অন্য ভাষার জ্ঞান বিশেষ তার ছিল না। ইংরাজী ও হিন্দীর কয়েকটি শব্দ তার জানা ছিল। অতি বুদ্ধিমান বালক। এই সামান্য ইংরাজী ও হিন্দীর সাহায্যে ও ইঙ্গিত-ইশারায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্বিবাদে আমার গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতো। তার নাম অমরেশ।

আমরা প্রথমে অনুমান করেছিলাম বালকটি বোধহয় যাত্রী-নিবাসের মালিকের সন্তান কিংবা আত্মীয়। পরে জেনেছিলাম, এ বাটীর মালিকের সঙ্গে অমরেশের কোন সম্বন্ধই নেই।

অমরেশ প্রথমে আমাদের উপদেশ দিলে—ইঁদারার জল পান করা নিষিদ্ধ। পানীয় জল পাওয়া যাবে রাস্তার কলে। প্রাতে ছয়টা থেকে দশটা এবং অপরাহ্নে তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত।

কোন দোকানের খাদ্য ভাল, কোন দোকানদার ক্রেতাকে বঞ্চনা করে অসংগত মূল্য নেয় প্রভৃতি নানা হিতোপদেশ আমাদের দান করতো। বেশ ভাল লাগত তার গুরুত্বপূর্ণ উপদেশগুলি।

সন্ধ্যার পর অমরেশ আমাদের সঙ্গে নিয়ে নটরাজ মন্দিরে আরতি দেখাতে নিয়ে গেল। যাত্রী-নিবাসে আমাদের কক্ষ থেকে গোপুরমটি সম্যক্ দেখা যায়। আমরা যাত্রী-নিবাসের বাইরে এসে গোপুরমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণের চেষ্টা করলাম। গোপুরমের উচ্চতা এত অধিক যে শুক্লপক্ষের চন্দ্রালোক ও বিজলী-বাতির সাহায্যেও উচ্চস্তরের প্রস্তর মূর্তিগুলি ও শিল্পকলা স্পষ্ট দেখা সম্ভব হ'ল না।

গোপুরম অতিক্রম করে দেখলাম প্রথমেই গণেশ মন্দির। অন্যদিকে শিব-কালী দেবীর মন্দির। এই দু'টি মন্দিরের পশ্চাতে শিবগঙ্গা পুকুর। এ প্রদেশে প্রায় সকল দেবালয়ের সঙ্গে একটি বড় পুকুর আছে। কোন কোন দেবালয়ে মন্দির সীমানার মধ্যে, আবার কোন স্থানে সীমানার বাইরে।

এই সকল পুকুরগুলি আয়তনে বৃহৎ। চতুর্দিকে তার স্নানের ঘাট। প্রতি সরোবরের মধ্যভাগে একটি নহবৎখানার মত কারুকার্যপূর্ণ মঞ্চ। বিশেষ

উৎসবে কিংবা পর্ব অনুষ্ঠানে মন্দিরের বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয় ঐ মঞ্চে। এরূপ সরোবর আমরা মাদ্রাজের কপালেশ্বর মন্দিরে দেখেছি। পুকুরের এক পার্শ্বে বহু স্তম্ভ বিশিষ্ট দরবার কক্ষের মত একটি প্রশস্ত হল্। এ সমস্ত মন্দির সীমানার প্রথম মহলে। মন্দির সীমানার শেষ প্রান্তে আর একটি সমউচ্চ ও কারুকার্যপূর্ণ গোপুরম। মন্দির সীমানার এ দিকের গোপুরম থেকে ও প্রান্তের গোপুরম যেতে হলে অর্দ্ধ মাইল পথ যেতে হবে।

আজ আমরা প্রথম মহল দর্শন করেই ক্ষান্ত দিলাম। গণেশ মন্দির ও শিব-কালী মন্দিরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম না। শিবগঙ্গার তীরে কিছুক্ষণ বসলাম। বিজলী-বাতির সাহায্যে চমৎকার দেখতে লাগছিল পুকুরের শোভা। অমরেশ পরদিন তার স্কুলের ছুটীর পর আমাদের নিকট হাজিরা দেওয়ার অঙ্গীকার করে প্রস্থান করলে।

পরদিন ছিল মাঘী পূর্ণিমা। স্নানের পর গেলাম মন্দির অভিমুখে নটরাজ ও পার্বতীর পূজার বাসনায়। পূজার দ্রব্য ক্রয়ের ইচ্ছায় দেবালয় পার হয়ে অপর প্রান্তের গোপুরম অতিক্রম করে এলাম সহরের বাজারের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য দেব দর্শন বিস্মরণ হয়ে দেখতে লাগলাম বাজারের শোভা। গোপুরমের সম্মুখে সহরের প্রধান রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্যের পসারী। সকলের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোলদারী মূদীর দোকানগুলি। দোকানের সম্মুখভাগে সজ্জিত রয়েছে চাল-ডাল, নানাবিধ মশলা, তৈল, চিনি। কলকাতার মত এ-স্থানে চিনি নিয়ন্ত্রিত নয়। সামান্য দূরে সব্জি বাজার। শাক-সব্জি প্রভৃতি নানাবিধ ফলে বেশ জমকালো বাজার।

আমরা গোপুরমের নিকট মন্দির দ্বারে একটি দোকানে পূজার ডালি ও কিছু ফুল নিলাম। নটরাজ মন্দিরে ও পার্বতীর মন্দিরে পূজার জন্য পৃথক পৃথক দুই প্রস্থ পূজার দ্রব্য লওয়া বিধি।

ও-প্রান্তের দেবালয় প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মূল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত মাত্র মন্দির প্রহরী আদেশ করলেন, মন্দিরের টিকিট ক্রয় করতে। তিরুবন্নমালাইয়ে এ পদ্ধতি দেখেছি। পূজার উপকরণের সঙ্গে মন্দিরের টিকিটও উপকরণের একটি অঙ্গ। এ-স্থানে মূল মন্দির একটি নয়

নটরাজ ও পার্বতী। সেই অনুপাতে টিকিট ক্রয় করতে হবে দু'টি মন্দিরের জন্য দুই প্রস্থ। টিকিট হস্তে মন্দির দ্বারে উপনীত হলাম।

আমাদের সম্মুখভাগে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা পূজার্থী পূজার দ্রব্য হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। পুরোহিত প্রথমে তাঁদের পূজার দ্রব্য গ্রহণ করে দক্ষিণার দাবী করলেন। পূজার উপকরণের ও পুষ্পের সঙ্গে দক্ষিণা অগ্রিম দিতে হবে, এ-স্থানের এইরূপ কানুন। এ দেশীয় ভাষায় বহু বাক-বিতণ্ডার পর কয়েকখানি এক টাকার নোট কাঞ্চনমূল্য হিসাবে দক্ষিণা প্রদান করলেন। এরপর হিন্দীতে আমাদের নিকট দক্ষিণার প্রস্তাব করলেন।

আমি সবিনয়ে বললাম—মন্দির দ্বারে টিকিট নিয়ে পূজার অনুমতি পেয়েছি। পূজার পর দক্ষিণা দেওয়া বিধি। আমাদের সাধ্যমত নিশ্চয় দেব, আপনি পূজা সমাধা করুন।

পুরোহিত রুষ্ট হয়ে বললেন—দক্ষিণা পূজার শেষে নয়, পূর্বেই দিতে হবে। তিন টাকা দক্ষিণার কমে পূজা লওয়া হয় না।

এই তো সেদিন তিরুবন্নমালাইয়ে পূজা দিয়ে এলাম। মন্দির দ্বারে টিকিটেই পূজার অনুমতি পেয়েছিলাম। এ-স্থানে নূতন বিপদে পড়লাম। কাতরভাবে নিবেদন করলাম—আমরা সুদূর বাঙ্গলা থেকে এসেছি। সাধারণ গৃহস্থ লোক। এক মুদ্রা দক্ষিণায় কৃপা করে পূজা করুন।

পুরোহিত আমাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না। আমাদের সঙ্গের যাত্রীদের মন্দির বারান্দায় যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ভাবলাম এঁদের পূজার পর কৃপা পরবশে আমাদেরও মন্দির দ্বারে যাওয়ার অনুমতি দেবেন।

আমাদের সঙ্গের যাত্রীরা তাঁদের পূজার পর পূজার প্রসাদ নির্মাল্য ও চরণামৃত গ্রহণ করে বারান্দা থেকে নেমে অন্যদিকে প্রস্থান করলেন। এখন পূজারী মহাশয় আমাদের লক্ষ্য করে বললেন—তোমাদের পূজার দ্রব্য ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বিনা দক্ষিণায় পূজা হয় না। পুনরায় আর এক দফা পুরোহিতের স্তব-স্তুতির পর দুই মুদ্রা দক্ষিণায় স্বীকৃত হয়ে মন্দিরের বারান্দায় যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। নাম-গোত্র নিয়ে নটরাজের সম্মুখে

কি বললেন জানি না। সে দিকে আমার মনোযোগ ছিল না। আমি মূর্ত্তির দিকে চেয়ে আনন্দে বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে গেলাম—যেন সাক্ষাৎ মহাকাল সেজেছেন নটরাজ বেশে। যেন বিশ্বভুবন ছড়িয়ে গেছে তাঁর আলুলায়িত জটাজালে। নিমেষের মধ্যে হবে তাঁর দেহের স্পন্দন। এক হস্তে জ্বলে উঠবে হুতাসন অন্য হস্তে ডমরু উঠবে ধ্বনিত হয়ে। সেই ডমরুর তালে তালে নেচে উঠবেন নটরাজ। শুরু হবে তাঁর তাণ্ডব নৃত্য। শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলাম তার সেই প্রলয় নৃত্য দেখার আশায়। গৃহিণী ধাক্কা দিয়ে বললেন—পূজা হয়ে গেছে, চরণামৃত নাও। পার্শ্বেই পাবতী মন্দির। সে দিকে পূজার কোন জুলুম ছিল না। পার্বতী মন্দিরে পূজার পর আরও কয়েকটি দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখে প্রাঙ্গণে এলাম। একটি উচ্চ বেদীর চতুর্দিকে পিতলের রেলিংয়ে ঘেরা নবগ্রহের মূর্ত্তি। এ বেদীতে একজন পুরোহিত সামান্য দক্ষিণা গ্রহণ করে ঘৃতের প্রদীপ দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন। আমরা দশ পয়সার একটি ঘৃতের প্রদীপ নিয়ে বেদীর উপর নবগ্রহের সম্মুখে রাখলাম।

নাটমন্দির থেকে চমৎকার খিলানের ছাদ ও দুই পার্শ্বে কারুকার্য স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি রাস্তা। বাহির মহলের সহস্র স্তম্ভ হলে এসে মিশেছে। এটিরও স্তম্ভের কারুকার্য ও ছাদের খিলান বিস্ময় নেত্রে দেখতে হয়। এক স্থানের কিয়দংশ ভগ্ন হয়েছে। মনে হয় সেটির সংস্কারের জন্য অনেকগুলি প্রস্তর এনে রাখা হয়েছে। এক একটি এইরূপ কারুকার্যপূর্ণ স্তম্ভ নির্মাণ করে এর সংস্কার কার্য সামাধা করতে কতদিন লাগবে অনুমান করা কঠিন। তারপর সেই দরবার হলের স্তম্ভের দিকে লক্ষ্য করলাম। স্তম্ভগুলি আকারে ছোট নয়। এক একটি স্তম্ভের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে এর নির্মাণ কৌশল দেখতে হয়।

এলাম গোপুরমের পাদদেশে। অন্যান্য গোপুরমের কিয়দংশ সাধারণভাবে নির্মিত কয়েক ফুট উচ্চ থেকে নানাবিধ শিল্পকলা ও দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে সজ্জিত। চিদাম্বরমের গোপুরমের বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। এ গোপুরমের নিম্ন থেকে কারুকার্য আরম্ভ হয়েছে। এগুলি দেব-দেবীর মূর্ত্তি নয়। ভারত নাট্যমের নৃত্য ভঙ্গিমার অপরূপ প্রস্তর মূর্ত্তি। এই নৃত্যরত

মূর্তিগুলি আকারে বেশ বড়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোপুরমের কারুকার্য দেখলেও মনের আশা অতৃপ্ত থাকে। মন্দির সীমানার চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর। এ প্রদেশের অন্যান্য দেবালয়ের প্রাচীরের মত উপরিভাগে দশ গজ অন্তর গোমাতার মূর্তি।

দক্ষিণ ভারতের গোপুরমগুলির নির্মাণ কৌশল প্রায় একই প্রকার। কোন স্থানে বিশাল, কোন স্থানে আকারে বেশ কিছু ছোট। গোপুরমের চূড়ার নিম্নে চীনের ড্রাগনের মত ভীষণ দর্শন একটি মুখের আকৃতি। বিশাল বদনের দুই পার্শ্বে দু'টি দীর্ঘ দন্ত। এই মুখাবয়বের নিম্ন থেকে কয়েক স্তরে নানা দেব-দেবীর মূর্তি। মূর্তিগুলি পৌরাণিক আখ্যানের দেব-দেবীর চিত্র। দেবাসুরে মিলিত হয়ে সমুদ্র-মন্থন, দেবাসুরের যুদ্ধ। নারায়ণের অনন্ত শয্যা, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, রাম-রাবণের বিবিধ মূর্তি। শঙ্কর-পার্বতীর নানাভাবে নানা মূর্তি। এ সকল গোপুরম গাত্রে অঙ্কিত চিত্র নয়। রীতিমত সুদৃঢ় প্রস্তর মূর্তি। এগুলি সময় সময় বর্ণ সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকটি বিল্ববৃক্ষ দেখলাম। এই বিল্ববৃক্ষের শাখায় আম-লিচুর মত এক একটি গুচ্ছে দশ-বারোটি শ্রীফল একত্রে দুলছে। এমন বিচিত্র শ্রীফলের গুচ্ছ আর কুত্রাপি দেখি নি।

এই মন্দিব, গোপুরম ও নাটমন্দিরের কারুকার্য একদিন দেখেই ক্ষান্ত হতে পারি নি। মন্দিরের অতি নিকটে ছিল আমাদের যাত্রী-নিবাস। যখনই সুযোগ ও সময় পেয়েছি মন্দিরের শোভা-সৌন্দর্য মুগ্ধ নেত্রে দেখেছি। গৃহিণীর আগ্রহে আসতাম মন্দির প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণদের বেদপাঠ শুনতে। নানা প্রদেশের যাত্রীদের সমাগম দেখতে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় আরতি দেখাব ইচ্ছায়। মন্দিরে পূজা ব্যতীত যে কোন সময় প্রবেশে বা দর্শনে কোন ব্যয় নেই।

মন্দির থেকে ফিরলাম বেলা দশটার পর। যাত্রী-নিবাসে প্রবেশমাত্র আমাদের ভক্ত অমরেশের আবির্ভাব হ'ল। আমরা পূজার প্রসাদ খেলাম, তাকেও কিছু দিলাম। প্রথমে সে অস্বীকৃত হ'ল পরে ভগবানের প্রসাদ জ্ঞানে কিছু নিয়েছিল। আমরা অনুমান করেছিলাম দরিদ্র গৃহস্থ সন্তান। আমাদের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় আমাদের সাহায্যে তৎপর।

পরে তার ব্যবহারে দেখেছিলাম এমন নির্লোভ, সংযত বালক সচরাচর দেখা যায় না। তার নিত্যকর্ম ছিল প্রতিদিন অপরাহ্নে সহর, বাজার ভ্রমণে সাহায্য করা।

একদিন তাকে দু'টি লেবু দিলাম। সে কোনরূপেই গ্রহণ করলে না। বললে—মা জানলে অসন্তুষ্ট হবেন।

একদিন কৌতূহল বশে তাকে কিছু পয়সা দিলাম। বললাম—ভগবানের পূজার পর কিছু দান কর্তব্য।

সে তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে এনে বললে—আমার পয়সা একে দিন।

আমরা নির্বাক হয়ে তার আচরণ দেখলাম! একদিন গৃহিণী অমরেশের বাড়ীতে গিয়ে তার মার হাতে কিছু ফল মিষ্টান্ন দিয়ে এলেন।

চিদাম্বর ত্যাগের দিন গৃহিণী অমরেশের বাড়ী গিয়ে তাদের নিকট বিদায় নিতে গিয়ে এক বিভ্রাটের সৃষ্টি করলেন। আমরা ঝটকায় উঠলাম। অমরেশের মা কিছু ডালমুট আমাদের উপহার দিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিলেন। তাঁদের এ দৃশ্য আমাদের ভুলতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

কুম্বকোনম্

আমরা জানতাম চিদাম্বরমের পর এ পথে একটি বড় তীর্থস্থান আছে কুম্বকোনম্। ট্রেন প্রায় এগারটা নাগাদ। আমরা চিদাম্বরমের যাত্রী-নিবাসে আহারাদি সেরে ষ্টেশনে এলাম। যথেষ্ট সময় ছিল। কুম্বকোনমের টিকিট নিয়ে ধীরে সুস্থে ট্রেনে উঠে বসলাম।

গৃহিণী ট্রেনে বসে বললেন—আমাদের নামতে হবে কখন?

বললাম—বেলা আড়াইটায়। এখান থেকে মাত্র সত্তর কিলোমিটার পথ।

নিশ্চিন্তে ট্রেনে বসতে পারলে বেশ কিছুদূর যাওয়া গৃহিণীর বাঞ্ছনীয়। ভয় তাঁর কোনও স্থানে রাত্রে নেমে স্থান সংগ্রহ করা। রাত্রে নামতে

হবে না সে জন্য নিশ্চিন্ত হলেন। মাত্র সত্তর কিলোমিটার গিয়ে অবতরণ তাঁর যেন মনঃপুত হ'ল না।

তিনি বললেন—এদিকের রেলপথের ছ'দিকে দেখতে বেশ ভাল লাগে। চমৎকার গ্রামের শোভা। সবুজ গাছে ঘেরা গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট গোপুরম। মাঝে মাঝে পাহাড় ও নদীগুলি বেশ দেখতে লাগে। এদিকে দেখ কি সুন্দর একটি গোপুরম। নিশ্চয়ই কোন বড় দেবালয় আছে।

আমাদের কামরায় এ দেশীয় এক ভদ্রলোক আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তিনি বললেন—মনে হয় আপনারা এ দেশের দেবস্থান দেখতে এসেছেন। এখন কোথায় যাবেন ?

বললাম—এখন আমাদের গন্তব্য স্থান কুম্বকোনম্। আমরা এ প্রদেশের কিছুই জানি না। কুম্বকোনমে থাকার মত ভাল স্থান পাওয়া যাবে ?

তিনি বললেন—সমগ্র দাক্ষিণাত্যের দেবস্থানে অবস্থানের কোন অভাব হবে না। আপনারা আজ কুম্বকোনমের কিছু আগে ময়ূরম দেখে গেলেন না কেন ?

বললাম—ময়ূরম কতদূর ?

ভদ্রলোক বললেন—কুম্বকোনমের কিছু আগে চিদাম্বরম থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। ময়ূরম অতি সুন্দর সহর ; বিরাট দেবালয়। এ দেবালয়ের কারুকার্য অতি সুন্দর। ময়ূরম দেখে যান।

আমাদের কথাবার্তা ইংরাজীতে হলেও গৃহিণী এর মর্ম অনুধাবন করে বললেন—হ্যাঁ গো, উনি কি বলছেন ?

বুঝলাম দাম্পত্য কলহের সূচনা এসেছে। কিছুটা গোপন করে বললাম—ওদিকে ময়ূরম নামে একটি সহর আছে। বেশ বড় সহর, অনেকে দেখতে আসেন।

গৃহিণী বললেন—কেবল ভাল সহর নয়। বড় মন্দির, আরও অনেক কিছু আছে। কাছেই সে সহর। চল আমরা দেখে যাই।

বললাম—এদিকে গ্রামে গ্রামে পথে ঘাটে দেবালয়ের ছড়াছড়ি। সকলগুলি দেখার মত আমার ধৈর্য ও সামর্থ্যের অভাব। যেগুলি প্রধান তীর্থস্থান সেইগুলি দেখলেই যথেষ্ট।

গৃহিণী বললেন—বুঝেছি, সেই রকম চুক্তি করেই তীর্থ পথে বেরিয়েছ। দেহে ও ট্যাকের সামর্থ্য যখন নেই, এ পথে না এলেই পারতে। সে কালেই বলেছিলাম, কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন পরে সব জেনে শুনে এলেই পারতে। সেই অর্থ ব্যয় হবে, আর দৃষ্টি-কৃপণতা করে, ভাল জায়গাগুলো ছেড়ে যাবে।

কোনও যুক্তিসঙ্গত সদুত্তর খুঁজে পেলাম না। পাশের সহযাত্রীর উপর অশ্রদ্ধা এসে গেল। ইংরেজীতে সব কথা একরকম বলছিল আবার বাহাদুরী করে হিন্দী মিশিয়ে বিভ্রাটের সৃষ্টি করলে। কিছুক্ষণ পরেই এলাম ময়ূরম্ জংশনে। আমার অপ্রিয় বন্ধু নেমে গেলেন। কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। ময়ূরম জংশন ষ্টেশনের শোভা দেখে চমকে গেলাম। বিরাট প্লাটফর্ম। ষ্টেশনের অদূরে লোকো শেড্। সহরের পথে জন-জনতা, ঝটকা, সাইকেল, ট্যাক্সি চতুর্দিকে ছুটাছুটি করছে। ষ্টেশনের সম্মুখে সহরের প্রধান পথের দু' পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি চলে আধুনিক ধরণের ভবনগুলি দেখে বুঝলাম অন্ততঃ একদিনের জন্য এ-স্থানে অবস্থান করে দেখে যাওয়া উচিত ছিল।

ট্রেন প্রায় পনের মিনিট বিশ্রাম নিয়ে চলতে শুরু করল। ট্রেন ষ্টেশন ত্যাগ করতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। এদিকে দেখলাম গৃহিণী রুদ্ধশ্বাসে ট্রেন থেকেই সহরের দর্শনীয় কিছু কিছু উপভোগ করে নিচ্ছেন।

কয়েক মিনিট পরেই ট্রেন এসে থামল অনুরূপ এক ষ্টেশনে। প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে দেখলাম ষ্টেশনের নাম ময়ূরম। কি বিপদ, এই তো ময়ূরমকে পাশ কাটিয়ে এলাম আবার পড়লাম সেইখানে! পাশের এক সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ময়ূরমের দেবালয়ে যাওয়া এই স্থান থেকেই সুবিধা। আগের ষ্টেশনটি জংশন। 'এটি হ'ল ময়ূরম টাউন।

মনে করলাম চোখটা বুঁজেই থাকি। কিন্তু পারলাম না; ট্রেন ছাড়বারও নাম নেই। কামরা যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল। অধিকাংশই তীর্থযাত্রী। গৃহিণী একবার যাত্রীদের দেখেন একবার গবাক্ষে গলা বাড়িয়ে ময়ূরম সহরের দিকে দেখার চেষ্টা করেন, আর একবার আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করেন।

আমার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে এসেছিল। দু' পেয়ালা স্পেশাল কফি কিনে ফেললাম। আমার বিতৃষ্ণা এল ট্রেনটার উপর, জংশনে পনের মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার দু' কিলোমিটার পথ এসেই নির্জীব হয়ে পড়ল। হে ময়ূরমের দেবতা, ট্রেনটাকে কলউষণ করে চুরমার করে দাও। না না, হয়তো আমাদের হাত-পা ভেঙ্গে ষ্ট্রেচারে শুয়ে হসপিটালে যেতে হবে তারচেয়ে ধরিত্রী গ্রাস করে নাও সারা ট্রেনটাকে।

এবার আমার আন্তরিক অশুভ কামনায় ঘটাং ঘটাং শব্দে ট্রেনের আন্দোলন অনুভব করলাম। আমার অভিশাপান্তে কোন বিপদ হয় নি। কোনরূপে হেলে-দুলে ঘণ্টা খানেক পরে আমাদের এনে দিলে কুম্বকোনম ষ্টেশনে।

কুম্বকোনম ষ্টেশনে নেমে প্রথমে ধর্মশালার খোঁজ নিলাম। বুঝলাম, এ-পথে সুফলের আশা নেই। কুলিরা পরামর্শ দিলে ষ্টেশনের নিকট ভাল লজ আছে। ভাড়া সুবিধা। মাল-পত্র নিয়ে লজে এলাম। লজের নাম-উদিয়া লজ। নীচেয় একটি কামরা নিলাম। ভাড়া দৈনিক তিন টাকা।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সহরের দিকে গেলাম। ফাল্গুনের মাঝামাঝি। অপরাহ্ণেও রৌদ্রের প্রখরতা প্রবল। প্রায় অর্ধ মাইল পথ এসে হাজির হলাম সহরের মধ্যভাগে। ষ্টেশনের রাস্তাটি এ-স্থানে এসে ত্রিধারা হয়েছে, সকল রাস্তার উভয় পার্শ্বে যেন বাজার বসেছে। আমরা একটি দোকানে চা ও বেগুনি খেয়ে আরও কিছু দূরে এসে দেখলাম, বন্দরে জাহাজের মাস্তুলের মত চতুর্দিকে গগনচুম্বী গোপুরম। নিকটবর্ত্তী একটি গোপুরম লক্ষ্য করে এলাম একটি দেবালয়ের দ্বারে। গোপুরমের মধ্য দিয়ে এলাম মূল মন্দিরের দ্বারে। মন্দির মধ্যে দেখলাম শঙ্কর পার্বতী ও নটরাজের মূর্ত্তি। গোপুরমের রূপও একই। যেমন দেখে এলাম মাদ্রাজ, তিরুপতিতে, তিরুবন্নমালাইয়ে। স্তরে স্তরে ব্রহ্মলোক, সূর্য্যলোক, বৈকুণ্ঠ, অমরাবতী প্রভৃতি। গোপুরমের মূর্তিগুলি কিছুদিন পূর্বে বর্ণ-সংস্কারে আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

এরপর এলাম নাগেশ্বর মন্দিরে। মন্দির মধ্যে দেবমূর্ত্তি দেখে মনে হ'ল চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। তারপর এলাম এ-স্থানের সর্বাপেক্ষা জমকাল মন্দির শ্রীসারঙ্গপাণি মন্দির দ্বারে। গোপুরম অতিক্রম করে দেখলাম

মূল মন্দিরে যাওয়ার একটি আধ ফার্লং দীর্ঘ পথ। সেই পথের দুই পার্শ্বে প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চ বারান্দা ও নানা কারুকার্যপূর্ণ প্রস্তর স্তম্ভ। সেই বারান্দার উপর নানাবিধ দ্রব্যের দোকানগুলি যাত্রীদের মন বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ছেলেদের নানাবিধ খেলনা, কাঠের ও লোহার নানাবিধ তৈজস, শয্যাদ্রব্য, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, রেডিও আর একটি ফটো স্টুডিও দেখলাম।

এ সকল বিপণির শোভা মহিলা যাত্রীদের মন আকর্ষণ করে। গৃহিণী কয়েক পা অগ্রসর হন আর স্থানে স্থানে নিশ্চল হয়ে পড়েন। আমার দিকে ফিরে আবার সেই পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন—এমন চাটু, কড়াই কলকাতায় পাবে না। কিছুদূর এসে বললেন, ভেলভেটের ব্লাউজ-পিসগুলিতে কি সুন্দর জরীর কাজ। আগে আগ্রায় এ রকম পাওয়া যেত এবার তেমন নজরে পড়ল না। এর পর তিনি আর এক অদ্ভুত প্রসঙ্গের উত্থাপন করে বললেন, এই মন্দিরের সামনে তোমার আমার একখানা ফটো তুললে হয় না?

দোকানের আকর্ষণ কাটিয়ে মূল মন্দিরে উপস্থিত হলাম। দেখলাম লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে তেত্রিশ কোটি না হোক অন্ততঃ এক কোটি দেব-দেবী বিরাজ করছেন। মন্দিরের চতুর্দিক পরিক্রমা করে আজ রাত্রের মত লজে ফিরলাম।

পরদিন প্রাতে সর্বাগ্রে গেলাম শঙ্কর মন্দিরে। মন্দির সম্মুখে একটি বৃহৎ সরোবর। যেমন এ প্রদেশের অন্যান্য মন্দিরগুলিতে দেখেছি। সরোবরটির চতুর্দিকে নানা দেব-দেবীর মন্দির। সেগুলি পরিদর্শন করে এলাম রামস্বামী মন্দিরে। শুনলাম হরিদ্বার কিংবা প্রয়াগের মত এই মন্দির সীমানায় কুম্ভমেলা হয়ে থাকে। সে সময় এখানে বিশেষ উৎসবে হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। সে উৎসবকে স্থানীয় লোকে বলেন 'মহামখম' উৎসব। মন্দির সীমানায় মেলা প্রাঙ্গণটিও দেখলাম। এ-স্থানেও একটি সহস্র স্তম্ভের নাটমন্দির দেখলাম। স্তম্ভগুলি নির্মাণে যেন স্থাপত্য শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছে।

লজে ফিরে আহারাদির পর সহরতলির মন্দিরগুলির একটি সংক্ষিপ্ত

তালিকা প্রস্তুত করে সেগুলি দেখার জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রথমে গেলাম সূর্যানার কোইল ও নাচিয়ার কোইল দেখতে আর একটি বিচিত্র মন্দির তিরুভাদামুরুত্থুর মন্দির। এ মন্দিরের যেমন শোভা তেমনি পথের দৃশ্য।

পরদিন আবার সেই মন্দির, সেই গোপুরম অন্বেষণ করে ঘুরলাম, এর মধ্যে স্বামীমালই, দারাসুরম, পচিম্বরম প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির দেখে ফিরলাম। এ সকল মন্দিরের শোভা অপূর্ব কিন্তু দর্শন আগ্রহ স্তিমিত হয়েছে। মন্দির শোভা দর্শন অপেক্ষা যেন পথের শোভাই মনকে আকৃষ্ট করে। পথের ধারে ক্ষুদ্র পল্লী। ক্ষুদ্র নদী কিংবা তাল-নারিকেল কুঞ্জগুলির শোভা দেখলেই সেইস্থানে বিশ্রাম নিতে বাসনা হয়। আমাদের মত যাত্রী দু' চারদিন এসে এ সকল দর্শনে তৃপ্ত হতে পারেন না। এগুলি সুস্থ চিত্তে দেখতে বাসনা হলে অন্ততঃ দু' সপ্তাহ প্রয়োজন।

এ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে যতগুলি তীর্থস্থান দেখেছি একমাত্র কাঞ্চীপুরম ব্যতীত এত মন্দিরবহুল নগরী আর একটিও দেখি নি। তৎপরতায় মন্দির-গুলি দেখে কোথায় কিভাবে দেখলাম কিছুই স্মরণ থাকে না। এই কুম্ভকোনমের এক একটি মন্দির তৎসংলগ্ন গোপুরম বহু কারুকার্যপূর্ণ স্তম্ভ বিশিষ্ট নাটমন্দিরের সৌন্দর্য সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। একঘণ্টা পূর্বে মন্দিরে কি বিগ্রহ দেখলাম তাও যেন বিস্মরণ হয়ে যাই।

কোন অতীত যুগে সৃষ্টি হয়েছিল এই মন্দির গোষ্ঠী। ইতিহাস ঘেঁটে যতটুকু জানা যায় এ সকল চোল-পল্লব, পাণ্ডু-রাজ বংশের অবদান। সে ওদের হাজার বৎসর পূর্বেকার ইতিহাস। যান্ত্রিক সভ্যতা তখন বহু দূরে। পরিবহন ব্যবস্থা একমাত্র নৌকা বা গো-যান। বিপুল অর্থব্যয়ে কোন সুদূর পাহাড় থেকে অঙ্গচ্ছেদ করে সংগ্রহ করতে হয়েছে এই সকল প্রস্তর। সুদক্ষ ভাস্কর বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম, অশেষ ধৈর্য ও অধ্যবসায়ে কেবলমাত্র ছেনি-হাতুড়ীর সাহায্যে কঠিন প্রস্তর বক্ষে রচনা করেছে বিবিধ প্রাণীর রূপ, পুষ্পতরু, প্রস্ফুটিত কুসুম, পীনোন্নত পয়োধরা যুবতীর বদনে ফুটিয়েছে মধুর হাসি যা যুগ-যুগান্তরে সে শোভার লেশমাত্র ম্লান হয় নি।

সে যুগে চোল-পল্লব বংশের রাজন্যবর্গ বিপুল অর্থব্যয়ে যে সকল মন্দির নির্মাণ করেছেন অধুনা এরূপ একটি মন্দির নির্মাণের বাসনা হলে আলাদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের সাহায্য আবশ্যক। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই সকল কীর্ত্তির আজও যে নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি সেগুলি বিধর্মী নির্মম লুণ্ঠনকারীর হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে। প্রবল পরাক্রান্ত চোল-পল্লব শক্তির প্রভাবে। দেড় সহস্র বৎসর পূর্বে চোলবংশ প্রবল হয়। নানা সৎকার্যের অনুশীলন করেন; তারই নিদর্শন এ সকল মন্দির। পরে পল্লবগণ দাক্ষিণাত্য অধিকার করেন। এই সময় মহেন্দ্র বর্মণ, নরসিংহ বর্মণ পল্লব বংশের প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। পাণ্ড্য ও মারাঠা কিছুকাল দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার করেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই সকল রাজন্যবর্গ কেহই বিধর্মী ছিলেন না। কেহ বিষ্ণুর উপাসক, কেহ বা শৈব। রাজ্য-বিস্তার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয় ঘটলেও মন্দির ধ্বংসের দুর্মতি কাহারও ছিল না। লুণ্ঠনকারী সুলতান মামুদও, এ সকল ধ্বংসের সুযোগ গ্রহণ করেন নি। সে কারণ আজও কীর্তির নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। পরিশেষে ইংরাজ শাসনাধিকারে এলেও এ সকল শিল্পকলা, সংস্কৃতি ক্ষুন্ন হয় নি। ইংরাজ আর যাইহোক ধর্মমন্দির ও সংস্কৃতির উচ্ছেদে বিরত ছিল।

পরদিন প্রাতে গৃহিণী বললেন—আজ আর দূরে কোথাও মন্দির দেখতে যেতে হবে না; সহরেই মন্দির আর বাজারে ঘুরবো। এখানে মন্দির দেখতে দেখতে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, কয়দিন বাসে বাসে ঘুরে মন্দির দেখতে গিয়ে হোটেলে খাওয়া হয়েছে তেঁতুলের জল আর ভাত, মুখে সাতজন্মের অরুচি ধরে গেছে। আজ চল একবার বাজারের দিকে যাই। লজ থেকে বেরিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে গৃহিণী দেবতার আকর্ষণে কিংবা মন্দির সীমানার দোকানগুলির আকর্ষণেই হোক পুনরায় এলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে।

তাঁকে বললাম—বাজারের উদ্দেশ্যে এসে আবার কেন মন্দিরে এলে?

তিনি বললেন—এ জাগ্রত দেবতা, আসল নারায়ণ।

তিনি কিছু ফুল ও মালা নিয়ে মন্দির দ্বারে গেলেন। আমি বারান্দাতেই

তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। পার্শ্বের মন্দিরে নটরাজ মন্দিরের দিকে তাকালাম। দেখলাম এক অতিবৃদ্ধা মহিলা মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন আর মন্দির দ্বারে এসে দন্তহীন কুঞ্চিত কপোলে পটাপট চাপড় মারছেন। এরূপ ভক্তি প্রদর্শন এ দেশীয় একটা রীতি। সবই ভক্তির ব্যাপার। আমরা কয়েকটি মন্দির দেখেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মস্তকে উদ্ভট চিন্তা জমাট বাঁধল। যে ভগবান অনলে, অনিলে, সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, যাঁর প্রভাবে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় ঘটছে। সেই ভগবান আজ বদ্ধ মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তিতে বিরাজ করছেন কেন? ঐ যে নটরাজ মূর্তি, ভক্তবৃন্দ যাঁর সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান। ঐ প্রস্তর মূর্ত্তিতেই কি সেই ঈশ্বরের প্রাণশক্তি বিদ্যমান? এমন সহস্র মূর্তি মাদ্রাজ মিউজিয়ামে দেখেছি, কাহাকেও তাঁদের সম্মুখে শুষ্ক প্রণাম জানাতেও দেখি নি।

ঐ যে মন্দির দ্বারে গোপুরম গাত্রে এক কোটি দেব-দেবী বৃষ্টিতে ভিজে, রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে যুগ-যুগান্তর প্রদর্শনী হয়ে অনাহারে কাল কাটাচ্ছেন তাঁদের বিষয় চিন্তা করতে কাকেও দেখি নি। চাই না দেখতে ভক্তগণের এই পক্ষপাতিত্য। চাই না দেখতে আড়ম্বরপূর্ণ গোপুরম। চাই না ডালি ধরতে মন্দিরের বিগ্রহ মূর্তির সম্মুখে। প্রভু তুমি নিয়ে চল আমাকে মন্দিরহীন, লোকালয়হীন প্রান্তরে, শীতল তরুছায়াতলে কিংবা নিয়ে যাও নিরালা নদীতীরে—অনুভব করতে চেষ্টা করি তোমার রূপ, তোমার মহিমা, শান্তি হোক তোমার করুণা কণাস্পর্শে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে গৃহিণী থামলেন পথের পার্শ্বে একটি মৃন্ময় পাত্রের দোকানে। এই পথের উভয় পার্শ্বে কয়েকটি মৃন্ময় তৈজসপত্রের দোকান। গৃহিণী কয়দিন এ পথে এলে কিছুক্ষণের জন্য একটি দোকানের সম্মুখে বসে কয়েক প্রকার পাত্রের দর-দাম করতেন। বিক্রেতা একটি প্রৌঢ়া। গৃহিণী কোন দিনই কিছু ক্রয় করতেন না তত্রাচ দর জানতে ছাড়তেন না। প্রৌঢ়া বিরক্ত না হয়ে তাঁর দ্রব্যাদির দাম বলতেন—আতা পয়সা, উরুৎ পয়সা। গৃহিণী বুঝতেন না কিছুই, কেবল শুনেই সন্তুষ্ট হতেন।

এরপর এলাম পাথরের কারখানায়। এ-স্থানে প্রস্তুত হয় সেই ইডলি প্রস্তুতের যন্ত্র যা দেখেছি তিরুবন্নমালাইয়ে মুখার্জী বাবুর বাংলোয়। ক্ষুদ্র

বৃহৎ অনেক প্রকার পেষণ-যন্ত্র পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, বহু অবান্তর প্রশ্নে কারখানার লোকদের অযথা সময় নষ্ট করতে লাগলেন। একটি ছোট পেষণ-যন্ত্র পার্শ্বেলে পাঠান সম্ভব কিনা জেনে নিলেন।

এবার এলাম একটি কারখানায়। এ-স্থানে বিদ্যুত-চালিত যন্ত্রে চাল, ডাল, পেষাই ক'রে টিন টিন তরল পদার্থ সরবরাহ হচ্ছে হোটেলে, বাজারে কিংবা গৃহস্থের বাটীতে। যে বস্তুতে প্রস্তুত হয় ইডলি, দোষা প্রভৃতি। গৃহিণী আগ্রহ সহকারে কারখানার কাজ দেখলেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে বাজারে কিছু সব্‌জি ও দই নিয়ে লজে ফিরলাম। রন্ধন ও আহারাদির পর আজ পূণ বিশ্রাম নিলাম।

পরদিন তখনও প্রভাতের আলো প্রকাশ পায় নি। গৃহিণী শয়ন অবস্থাতেই বললেন—এখানে চারদিন হ'ল, বারো টাকা লজ ভাড়া দিতে হবে, দিন তিন টাকা ভাড়া হলে, মাসে কত হবে ?

বললাম · নব্বই টাকা।

তিনি পুনরায় বললেন—এই কি মাসে নব্বই টাকার ঘর ? এ ঘরের ভাড়া বড় জোর কুড়ি টাকা আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। এমন দেশ কোথাও একটা ভাল ধর্মশালা দেখলাম না। মোটা ভাড়া দিয়ে লজ হোটেলে থাকতে পার থাক, না পার মন্দির দেখেই চলে যাও।

বললাম—আজ প্রভাতের সঙ্গে আমাদের ভাড়ার বারো টাকা মিটার উঠবে। এ ব্যয় খুব বেশী নয়, হয়তো অনেক স্থানে দৈনিক আট-দশ টাকা দিতে হবে।

গৃহিণী বললেন—এদেশে ভাল ধর্মশালা নেই, সামান্য কিছু ব্যয়ে ভাল ধর্মশালা পেলে গরীব যাত্রীদের কত সুবিধা হয়।

বললাম—রাজস্থানে, উত্তর ভারতে প্রচুর ধর্মশালা পাওয়া যায়, এতে সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। কোন ধর্মশালায় স্থান পেলে তোমার অবস্থানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তোমাকে ধর্মশালার ম্যানেজার সজাগ ক'রে দেবেন। তোমার দেখার আগ্রহ হবে বিনষ্ট। এরূপ কম ভাড়ার লজে উঠলে ইচ্ছামত থাকা যায়।

মাদ্রাজ প্রদেশে বহু ধন-কুবের আছেন, তাঁরা এ সকল বিষয়ে সুচতুর।

ধর্মশালা নির্মানে অযথা অর্থের অপব্যয় করতে নারাজ। অধুনা এসকল প্রদেশে যাত্রী সমাগম দেখে বহু ব্যক্তি লজ বা হোটেল-ব্যবসায় আগ্রহী হয়েছেন। কোনরূপে ষ্টেশনের পাশে কিংবা মন্দিরের নিকটে একটি বাড়ী নির্মাণ করতে পারলেই আয়ের পথ প্রশস্ত হয়। তার সঙ্গে হোটেল-ব্যবসা যোগ করলে সোনায় সোহাগা। কয়েকটি তীর্থস্থানে মাদ্রাজ সরকার রেষ্ট-হাউস ক'রে কিছুটা উপকার করেছেন। এগুলির দৈনিক ভাড়া সামান্য, অবস্থানের নির্দিষ্ট কাল মাত্র তিন দিন।

গৃহিণী বললেন –এরপর কোন দিকে যাওয়া হবে ?

বললাম –তাঞ্জোর যাওয়ার ইচ্ছা আছে, যদি আজ যাওয়া মত হয় রান্নার ব্যবস্থা কর। সাড়ে এগারটায় ট্রেন ধরতে হবে। বেলা দেড়টা আন্দাজ পৌছান যাবে।

আমরা আহারাদির পর তাঞ্জোর যাওয়ার অভিপ্রায়ে বাক্স, বেডিং বেঁধে ষ্টেশনে এলাম। ষ্টেশনে এসে গৃহিণী একটি দশ নয়া পয়সায় একটি আলপনা দেওয়ার যন্ত্র কিনলেন, একটি টিনের খোলে কিছু চালের গুঁড়া এর মধ্য দিয়ে গৃহ-প্রাঙ্গণে কিংবা সমতল ভূমিতে গড়িয়ে দিলেই বিনা আয়াসে বিচিত্র আলপনা হয়ে যাবে। গৃহিণী আগ্রহে এটি সংগ্রহ করলেন কিন্তু ব্যবহার করতে কোনদিন দেখি নি, এখন নিরাপদে বস্তুটি আছে কিনা তাও জানি না।

তাঞ্জোর

যথাসময়ে ট্রেনে উঠে আমরা তাঞ্জোর অভিমুখে রওনা হলাম। দু' তিনটি ষ্টেশনের পর এলাম পাপনাশন ষ্টেশনে। এদিকে প্রায় প্রতি ষ্টেশনের প্লাটফর্মে লিখিত নির্দেশে দেখি "এখানে নেমে শঙ্কর মন্দির, নারায়ণ মন্দির কিংবা ঐ প্রদেশীয় ভাষায় লেখা কোন দেবতার মন্দির দেখে যান। এটি এক মহাতীর্থস্থান।" পাপনাশন ষ্টেশনেও একটি বোর্ডে বড় বড় হরফে ঐরূপ নির্দেশ দেখে গৃহিণীকে বললাম—এই ষ্টেশনের নাম পাপনাশন, এখানে বিখ্যাত মন্দির আছে তোমার ইচ্ছা হয় তো নেমে পড়ি।

গৃহিণী তখন পান-দোক্তা গালে নিয়ে বেডিং-এ হেলান দিয়ে চক্ষু মুদে বসেছিলেন। একবার গলা বাড়িয়ে ষ্টেশনের দিকে তাকিয়ে বললেন—ও সব আজে বাজে মন্দির, ও দিকের ভাল ভাল দেব মন্দির ছেড়ে এসে পাপনাশনে নামবেন পাপ কাটাতে।

এরপর কয়েকটি ষ্টেশন পার হয়ে এলাম তাঞ্জোর ষ্টেশনে, তখন বেলা দেড়টা। কুলি ডেকে ধর্মশালার সংবাদ নিলাম, তারা আমাদের পরামর্শ দিলে ধর্মশালা আছে বেশ কিছু দূরে। স্থান পাওয়া সন্দেহ। ষ্টেশনের কিছু দূরে রাজা-হাউস আছে, ভাড়া অল্প ; আপনাদের সুবিধা হবে।

বহু সময় ষ্টেশনে বিদেশী যাত্রী নামলে কুলি ও গাড়িওয়ালার প্রতিদ্বন্দিতায় যাত্রীদের বিভ্রান্তে ফেলে। কুলিদের স্বার্থ ষ্টেশনের কিছু দূরে কোন আবাসে পৌঁছে দিয়ে মজুরী ও ভাল বখসিস্ নিয়ে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখা। গাড়ীওয়ালারা পরামর্শ দেয় দু' মাইল দূরে সহরে ভাল ধর্মশালা আছে। মন্দির, বাজার ভাল হোটেল নিকটেই পাবেন। এখানে ভাড়া দিয়ে থাকতে হবে। প্রতিবার মন্দির যেতে আপনাদের গাড়ী ভাড়া দিতে হবে। সহরে ধর্মশালায় বিনা ভাড়ায় ব্যবস্থা ক'রে দেব। এই ভাবে যাত্রীদের সমস্যায় ফেলে।

আমার অভিজ্ঞতায় ষ্টেশনের সন্নিকটে ধর্মশালা ভাগ্যে মেলে ভাল। না হয় স্বল্পব্যয়ে রেষ্ট-হাউস কিংবা লজ পাওয়া গেলে গাড়োয়ানের স্তোক-বাক্যে ভুলবেন না। মনে রাখবেন ধর্মশালার উপর কোন সময়েই আস্থা রাখা যায় না। গাড়োয়ানদের উপরও নয়।

কুলিদের পরামর্শে রাজা-হাউসে এলাম। ভেবেছিলাম এটি একটি বড় লজ কিংবা হোটেল, রাজা-বাদশাদের জন্যই ব্যবস্থা হয়েছে। একটি বড় কমপাউণ্ডের মধ্যে প্রাসাদতুল্য একটি দ্বিতল ভবন। কুলিরা দ্বারে মালপত্র রেখে আমাদের ভিতরে অনুসন্ধান করতে বললে। অফিস কক্ষে অনুসন্ধান ক'রে জানলাম এই ভবনের নিম্নে ও দ্বিতলের প্রতি কামরা চার টাকা থেকে দশ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যায়। কম্পাউণ্ডের একদিকে এক সারি ফ্যামিলি কোয়ার্টার আছে তার ভাড়া দিন প্রতি আড়াই টাকা। দেখলাম এটি লজ বা হোটেল নয়, সরকারী যাত্রী নিবাস।

আমরা আড়াই টাকা ভাড়ায় ফ্যামিলি কোয়ার্টার নিলাম। শয্যাসহ দু'টি খাট, একখানি টেবিল, দু'খানি চেয়ার, বিজলী বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, সবই আছে। আর এই কক্ষের পশ্চাতে রন্ধন কক্ষ সমেত বারান্দা। বারান্দার নিম্ন ভাগে এক খণ্ড প্রাঙ্গণও আছে। আমাদের কোয়ার্টারের সন্নিকটে আছে ক্যানটিন। কম্পাউণ্ডের মধ্যে ক্ষৌরকারের সেলুন ও একটি রজকালয়ও আছে।

আমি বাক্স, বেডিং গৃহে এনে সেগুলি উপযুক্ত স্থানে ব্যবস্থা করলাম। ইতিমধ্যে গৃহিণী প্রধান ভবনটি পরিদর্শন ক'রে এসে বললেন—বড় বাড়ীটার উপরে যাওয়ার কার্পেট ঢাকা সিঁড়ি। কি বড় বড় ঘর, মেঝেয় কার্পেট বিছান, ঝকঝকে ফার্নিচার, ইজি-চেয়ার আর আমাদের লোক রেলবাবুদের মত একটা কামরা, রঙচটা খাট, ত্রিভঙ্গ চেয়ার-টেবিল দেখে আনন্দে আটখানা। এখন ক্যানটিনে কি পাওয়া যায় দেখে এস।

চা-পানের পর সুস্থ হয়ে গৃহিণী বললেন—আজ রবিবার, কাল সকালে বৃহদেশ্বর মন্দিরে যেতে হবে। এখন চল, এখানকার দোকান বাজার দেখে আসি।

রাজা হাউস থেকে বেরিয়ে প্রধান রাজপথ ধরে সহরের দিকে গেলাম। কিছু দূরে এসে দেখলাম জীবন বীমা কর্পোরেশনের নব-নির্মিত বিরাট সৌধ। পৌরপ্রতিষ্ঠান কার্যালয় ও হস্‌পিটাল। তার পরেই দেখলাম একটি নদী। সেতু অতিক্রম ক'রে এলাম সহরের মধ্যভাগে, যে উদ্দেশ্যে গৃহিণী বাজার দেখতে এলেন সে বাসনা সফল হ'ল না, কারণ আজ রবিবার, দোকান-বাজার সমস্ত বন্ধ। কেবল ফলের দোকানগুলি রাস্তার ধারে গুলজার ক'রে বসে আছে। সব্‌জি বাজারে গিয়ে কিছু আবশ্যকীয় দ্রব্য নিয়ে রাজা-হাউসে ফিরলাম।

কোয়ার্টারের সম্মুখে এসে দেখলাম আমাদের গৃহের বারান্দায় কয়েকটি খালি প্যাকিং-বাক্স ছিল, তারই একটি দখল ক'রে এক শ্বেতাঙ্গিনী উপবিষ্টা আছেন। বারান্দার নিকটে উপস্থিত মাত্র কিঁউ-কিঁউ ক'রে উঠলেন। তাঁর অনুযোগ উপলব্ধি করতে না পেরে বললাম—আপনার অভিযোগের কারণ আমাদের স্পষ্ট ক'রে বলুন, যদি কোন সাহায্য করতে পারি।

তিনি অদূরে কয়েকটি কিশোর কিশোরীদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে বললেন—আপনাদের এই সন্তানগুলি অতি অসভ্য আমার প্রতি অশ্রদ্ধার সহিত ব্যঙ্গোক্তি করছে।

বললাম—সঙ্গে আমার কোন সন্তান নেই। এরা কাহারা বা কাদের সন্তান আমাদের জানা নেই। দেখলাম আমার গৃহের সম্মুখে কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায় বালক-বালিকা চিৎকার ক'রে বলছে—এ মেমসাব, খানা খালেও—এ মেমসাব, খানা খালেও।

দেখলাম বিভ্রাট বটে, তাদের তিরস্কার ক'রে বিতাড়িত করলাম। তারা কিছু দূরে গিয়ে সেই একসুরে 'মেমসাব খানা খালেও' বলে কোলাহল করতে লাগল।

আমাদের পার্শ্বের কক্ষের দ্বারে এসে দেখলাম এঁদের পুরুষদের কেহ ঘরে নেই, কয়েকটি মহিলা কলহে মত্ত রয়েছেন। মেমসাহেবকে বললাম—ওদের পুরুষ অভিভাবক কাকেও দেখলাম না, বোধহয় কোন কাজে স্থানান্তরে গেছেন। আমি এদের সাবধান ক'রে দেব, আপনাকে কেহ ব্যস্ত করবে না। মেমসাহেব ক্রোধভরে জুতার খটাখট্ শব্দ ক'রে প্রস্থান করলেন। যাওয়ার সময় আর একবার সেই দলটির এবং আমার দিকে রোষপূর্ণ কটাক্ষপাত ক'রে চলে গেলেন।

গৃহিণী বললেন—মেমসাহেবের কি হ'ল ?

বললাম—ঐ ক্ষুদে দলটি মেমসাহেবকে বিরক্ত করছে। শুনছ না, ওরা বলছে 'মেমসাব খানা খালেও'।

গৃহিণী বললেন—ওরা বলছে তো আমাদের কি ? ও-কথায় রাগের কারণই বা কি আছে ?

বললাম—রাগ করা যাদের স্বভাব তারা সাধারণ কথাতেও রুষ্ট বা বিরক্ত হয়ে থাকে। মেমসাহেবের ধারণা ঐ দলটি আমাদেরই, সেই কারণে আমার নিকট অভিযোগ এনেছে।

গৃহিণী বললেন—কি অভাগ্যি! ঐ রকম ছেলে-মেয়ে আমাদের ঘরে হলেই গেছি।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পার্শ্ববর্তী কক্ষের পুরুষ মহাশয়রা ফিরলেন। মুটের মাথায়

একবোঝা জ্বালানী কাঠ, সব্জি ও থলের মধ্যে অনেক কিছু নিয়ে। উপযাচক হয়ে ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁরা এসেছেন উত্তর প্রদেশ প্রতাপগড় জেলা থেকে। আমি মেমসাহেবের অভিযোগের কথা তাঁদের জানালাম। তাঁরা ছেলেদের এ ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে বললেন—আমরা গিয়ে মেমসাহেবের নিকট ক্ষমা চেয়ে আসব।

এরপর শিশুপালেরা মেমসাহেবকে বিরক্ত করেছিল কি না জানি না। তবে রাত্রি প্রায় দু'টো পর্যন্ত অশান্তি দিয়েছেন এঁদের মহিলা মহল। সন্ধ্যা থেকে রন্ধন-আহার ও বাক-বিতণ্ডায় সরগরম ক'রে তুলেছিল। সুখের বিষয়, পরদিন প্রাতেই তাঁরা এখান থেকে বিদায় হয়েছিলেন।

তাঞ্জোরে প্রধানতঃ দেখবার বস্তু দু'টী—প্রথমটি বৃহদেশ্বর মন্দির, দ্বিতীয় আর্ট-গেলারী বা মিউজিয়াম। আজ প্রভাতে চললাম বৃহদেশ্বর মন্দিরে। রাজা-হাউস থেকে কিছুদূর গিয়ে হস্‌পিটাল তার পাশ দিয়ে একটি পথে গিয়ে দেখলাম এক বহু প্রাচীন দূর্গ। দূর্গ সীমানার চতুর্দিকে ভগ্ন-প্রাচীর, তার পাশেই দূর্গের গড়খাই। গড়খাইয়ের সেতু অতিক্রম ক'রে ভগ্ন দূর্গ প্রাচীরের উপর দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

দূর্গ প্রাচীরের এদিকে এসে দেখলাম—এর পরিধি কম নয়। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলাম কেবল ভগ্ন কক্ষের ধ্বংস স্তূপ, মধ্যে মধ্যে আগাছা জঙ্গল। কোন সাথী আমাদের ছিল না, এখানেও কোন গাইড নেই। বৃথা পরিভ্রমণ করা সমীচিন মনে হ'ল না। গৃহিণীও তাড়া দিচ্ছেন মন্দিরে যেতে অযথা বিলম্বের জন্য, দূর্গ দর্শন স্থগিত রেখে মন্দিরের পথ ধরলাম।

পরে শুনেছিলাম এটি সে যুগের মারাঠা সম্রাটদের দূর্গ। এবং এই দূর্গের পাশেই তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বৃহদেশ্বর মন্দির। আমার আগ্রহ ছিল দুর্গের অবস্থা যতই শোচনীয় হোক আমি দুর্গটি সম্যক ঘুরে দেখে যাব। কয়েক জন স্থানীয় লোক বলেছিলেন, দুর্গ মধ্যে ধ্বংস স্তূপ ব্যতীত দেখার কিছু নেই, আমি ব্যর্থ মনোরথে এ সংকল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কি আকর্ষণে জানি না আমার এখনও বাসনা যদি পুণরায় কোনদিন তাঞ্জোরে যেতে পারি এই দূর্গ ও বৃহদেশ্বর মন্দির দেখার আগ্রহ নিয়ে যাব।

দুর্গের পাশ দিয়ে বৃহদেশ্বর মন্দিরের গোপুরমের সন্নিকেট এলাম। এই গোপুরমের আয়তন যেরূপ, উচ্চতায় সেরূপ নয়। পশ্চাতে মূল মন্দির উচ্চতায় অনেকাংশে বড়। এ প্রদেশে সকল স্থানে মূল মন্দির অপেক্ষা গোপুরম দীর্ঘ। তাঞ্জোরে এসে এই প্রথম পার্থক্য লক্ষ্য করলাম মূল মন্দিরের উচ্চতা গোপুরম অপেক্ষা বৃহৎ। এরপর এরূপ আর কোন স্থানে দেখি নি।

হঠাৎ গৃহিণী বললেন—ওগো, ওদিকে দেখ। কালকের সেই ঝগড়াটে মেমসাহেব নয়? এখানে এসে হাজির হয়েছে। আবার না ঝগড়া বাধায়, ওর দিকে তাকিও না একপাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি চল।

দেখলাম রাজা-হাউসের সেই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাই বটে। গলায় একটি বায়নাকুলার ঝুলিয়ে হাতে একটি ক্যামেরা নিয়ে গোপুরমের দিকে চেয়ে আছেন। আমাদের দিকে দৃষ্টি পড়ায়—"হ্যালো, গুড মর্ণিং"; বলে খিল খিল শব্দে হেসে উঠলেন।

প্রতি নমস্কার ক'রে বললাম—আপনিও এসেছেন দেখতে, আপনাকে দেখে খুশী হলাম।

শ্বেতাঙ্গিনী সেইভাবে হাস্যবদনে বললেন—আমরা গতকাল এসেছিলাম। দুপুরে প্রখর রৌদ্রে আমার স্বামীর কাজের সুবিধা হয় নি সেই কারণে আজ প্রাতেই আবার এসেছি। গাইডের মুখে শুনলাম এটি এ প্রদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহদাকারের মন্দির। এই মন্দিরের উপর গম্বুজটি নির্মাণ ক'রে উপরে তোলবার সময় চার মাইল দূরে একটি গ্রাম পর্যান্ত ঢালু পথ নির্মাণ ক'রে গম্বুজটি উপরে তোলা হয়। মন্দিরটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, ঐ গম্বুজের ছায়া কোন সময়েই মাটিতে পড়ে না। সেইটি পরীক্ষার জন্য আমরা দিনে তিন চার বার এসে দেখে যাই।

দেখলাম অদূরে এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক একটি বৃহৎ প্লেট ক্যামেরা নিয়ে লক্ষ্য ঠিক করতে ব্যস্ত রয়েছেন। সহকারী আছেন এক বিলাতী পোষাকে সুদর্শন গাইড আর দু'টি কুলি। পার্শ্বে একটি বিরাট ট্রাঙ্ক ও চিত্র-গ্রহণের নানা সাজ-সরঞ্জাম। বহু বিদেশী পরিব্রাজককে নানা মন্দিরের চিত্র-গ্রহণে ক্ষুদ্র ক্যামেরা হাতে ঘুরতে দেখেছি কিন্তু এমন বিরাট ক্যামেরা ও সাজ-

সরঞ্জাম নিয়ে আর কোন সাহেবকে দেখি নি।

গত কল্যকার প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে ভদ্রতার খাতিরে বললাম—দুষ্ট ছেলেরা সম্ভবতঃ আর আপনাকে বিরক্ত করে নি। মহিলা সেইরূপ হেসে বললেন—না না, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এই কথা বলেই বালিকাসুলভ হাসিতে যেন ফেটে পড়লেন। গতকল্য এর রণচণ্ডী মূর্তি দেখে ভেবেছিলাম এ বিদেশিনী একটি কলহাস্তিকা, আজ দেখলাম সরল হাস্যময়ী মধুরভাষিণী। এই বিদেশিনীর হস্ত থেকে সহজে পরিত্রাণ পেয়ে মন্দির সীমানায় প্রবেশ করলাম। প্রথমেই দেখলাম মন্দির প্রাঙ্গণে আট-দশ ফুট উচ্চবেদীর উপর প্রস্তর নির্মিত এক বৃহৎ নন্দী (ষণ্ড) বিরাজ করছেন। এর উপরে ছাদের আবরণ, বেদীর চতুর্দিকে প্রশস্ত বারান্দা। ভক্তেরা নন্দীকে সিঁদুর-চন্দন কপালে দিয়ে, চরণে পুষ্প দিয়ে পূজা ক'রে তাঁকে পরিক্রমা করছেন। গৃহিণী কিছু ফুল-চন্দন নিয়ে নন্দীকে পূজা ক'রে এলেন। কি আশীর্বাদ পেলেন জানি না। আমি নন্দী প্রভুর বিশাল বপু দেখার জন্য চতুস্পার্শ্বে পরিক্রমা করলাম।

পরে মহিশুরের চামুণ্ডা পাহাড়ে আরোহণ পথে ও রামেশ্বর মন্দিরে এইরূপ বিপুলকায় নন্দী দেখেছি। আমার মনে হয় চামুণ্ডা পাহাড়পথের নন্দী দৈহিক অবয়বে শ্রেষ্ঠ। তার পরেই এই তাঞ্জোরের প্রভু। কনিষ্ঠ হলেন রামেশ্বর মন্দিরের নন্দী। তাঞ্জোরের ষণ্ডটির বৈশিষ্ট্য হ'ল এটি কাল গ্রানাইট পাথরে নির্মিত।

এই নন্দীর দক্ষিণ ভাগে একটি নাট মন্দির, তার পশ্চাতে একটি মন্দিরে আছেন পার্ব্বতি। পার্ব্বতি মন্দিরে পূজার পর এলাম শঙ্কর মন্দিরের দিকে। দশ বারো ফুট উচ্চ বেদীর উপর মন্দির। যেমন ভগবানের নাম বৃহদেশ্বর তেমনি মন্দিরটিও বৃহদাকার এবং স্থাপত্য শিল্পে অপূর্ব। অভ্যন্তরে প্রশস্ত তিনটি মহল; প্রথম মহলে আছেন গণপতি, দ্বিতীয় মহলে লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাঁদের পার্শ্বে আরও অনেক দেব দেবীর মূর্তি। সর্বশেষে দেখলাম বৃহদেশ্বরের বিরাট লিঙ্গ-মূর্তি। এমন বিরাট শিব লিঙ্গ আর কুত্রাপি দেখি নি। নিম্ন থেকে লিঙ্গ-মূর্তির উপর বিল্বপত্র, জল দিয়ে পূজা সম্ভব নয় সে কারণ শিব লিঙ্গের পাশে পিতল নির্মিত সোপান।

মূর্ত্তির চতুর্দিকে দ্বিতল বারান্দা। বারান্দার চতুর্দিকে রৌপ্য নির্মিত সুদৃঢ় রেলিং। দ্বিতলের বারান্দায় একটি রৌপ্য নির্মিত চৌকী। পুরোহিত মহাশয় পিতলের সোপান বেয়ে দ্বিতলের বারান্দায় যাবেন। তারপর সেই রজত চৌকীতে উপবেশন ক'রে শিব লিঙ্গের উপর পুষ্প, বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করবেন।

আমরা পূজা পদ্ধতি দেখলাম। গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল সেই সোপান বেয়ে দ্বিতলে গিয়ে শিবের মাথায় জল দেন কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশে সর্বত্র কড়া নিয়ম কোন ভক্তকেই দেব বিগ্রহ স্পর্শ ক'রে পূজার অনুমতি দেওয়া হয় না।

মন্দিরের চতুস্পার্শে বারান্দা। সম্মুখ ভাগে ও বামে সকলের অবাধ গতি। বামভাগে ও পশ্চাতের বারান্দায় শীতলা, কালী ও মহাবীর প্রভৃতি দেবতাগণ স্থান দখল ক'রে আছেন।

মন্দিরের বামভাগে প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চ একটি প্রকোষ্ঠে এক দেবী মূর্তি আছেন। সোপানের সাহায্যে সেই প্রকোষ্ঠে গিয়ে দেবী দর্শন করতে হয়। শিলা খণ্ড দিয়ে সু-কৌশলে খিলানে নির্মিত এই সোপান। সেই সোপান বেয়ে আরোহণ। আরোহন-অবরোহণের নিরাপত্তার জন্য কোন রেলিং নেই। পূর্বে ছিল এমনও অনুমান হয় না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই সতর্কতা পূর্বক উঠছেন। এক সঙ্গে অনেকে কিংবা দ্রুত গতিতে আরোহণ-অবরোহণ বিপজ্জনক। আমরাও উঠলাম, প্রথমে যতটা বিপদ সঙ্কুল অনুমান করেছিলাম কয়েক ধাপ যাওয়ার পর আর তদ্রূপ ভয় ছিল না। অবতরণ কালে আমার গৃহিণী সহজভাবে নামতে সক্ষম হলেন না। একটি সোপানে উপাবেশন ক'রে দ্বিতীয় সোপানে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ ক'রে নিম্নের সোপানে এসে বসেন, এইভাবে বসে বসে কোনরূপে নিম্নে এসে নিষ্কৃতি পেলেন। অবতরণ মোটেই কষ্ট সাধ্য বা বিপদজনক নয়। কোনদিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবলমাত্র নিম্নের সোপানগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে অবতরণের কোন অসুবিধা হয় না।

এরপর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে এসে দেখলাম—একটি নিম ও অশ্বত্থ বৃক্ষ রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন মূর্তির মত- পরস্পর আলিঙ্গণ অবস্থায় আছেন।

বৃক্ষ মূলে সিন্দুর ও পুষ্প দেখে বুঝলাম এঁরাও এ-স্থানে পূজার পাত্র। সেই বৃক্ষের ছায়ায় এ দেশীয় একদল মহিলা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সম্মুখে ক্যামেরা হাতে আমাদের পরিচিতা মেমসাহেব মহিলাদের চিত্র-গ্রহণে ব্যাপৃতা। আমরা কিছুক্ষণ তাঁর চিত্র-গ্রহণ ব্যবস্থা দেখলাম। যেভাবে সকলে হাস্য-কৌতুকে সময় অতিবাহিত করছেন কতক্ষণে তাঁদের চিত্র-গ্রহণ কার্য শেষ হবে বুঝতে পারলাম না।

মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে নানা দেব দেবীর মূর্তি। সেগুলি কেবলমাত্র প্রদর্শনী নয়, নিয়মিত পূজাদি হয়। তার জন্য স্বতন্ত্র পুরোহিতকেও দেখলাম। মন্দির দর্শন ও পূজা সমাধা ক'রে রাজা-হাউসে ফিরলাম। তখন মধ্যাহ্ণ বারোটা।

পরদিন আহারের পর গেলাম পুরাতন রাজপ্রাসাদ ও আর্ট-গ্যালারী বা মিউজিয়াম দেখতে। সহরের মধ্যভাগে কয়েকখানি পুরাতন আমলের সৌধ সংস্কার হয়ে অধুনা সরকারী দপ্তর ভবনে পরিণত হয়েছে। অনুমান করলাম এগুলি পুরাতন রাজপ্রাসাদের অংশ। কিছুদূর এসে দেখলাম একটি পার্কের মধ্যে বহু বালক ক্রীড়ারত। সেই পার্কের ফটকে ঢাল-তলোয়ার হাতে যাত্রার আসরের ভীম সেনের মত একটি প্রহরীর মূর্তি।

আমরা প্রথমে আর্ট-গ্যালারীতে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ মূল্য দশ নয়া পয়সা, কয়েকটি হলে সূক্ষ্ম কারুকার্যপূর্ণ প্রস্তর শিল্প, দেশীয় ও বিলাতী নানাপ্রকার তৈলচিত্র। অনেকগুলি রবি বর্মার তৈলচিত্রও দেখলাম। এ সকল দেখার পর আমরা সরস্বতী লাইব্রেরীর অনুসন্ধানে এলাম। ভবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখলাম একটি গুদাম ঘর। শতাধিক খালি প্যাকিং-বাক্স সজ্জিত ক'রে রাখা হচ্ছে। সেই গুদাম ঘরের দ্বারে তিনজন মজুর শ্রেণীর লোক কর্মব্যস্ত হয়ে বিশ্রাম করছে কিংবা এগুলির সু-ব্যবস্থায় চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে। প্রথমটি বৃদ্ধ, জানুতে আঘাৎপ্রাপ্ত হয়ে একখণ্ড মলিন বস্ত্র ক্ষতস্থানে বেঁধেছে। মধ্যভাগে বসেছে এক মধ্যবয়স্ক লোক তার মস্তকে ফেজ দেখে অনুমান হয় মুসলমান। তৃতীয় ব্যক্তি একটি যুবক।

তাদের নিকটে এসে প্রশ্ন করলাম সরস্বতী লাইব্রেরী কোন দিকে? তারা

প্যাকিং-বাক্সগুলির দিকে চেয়ে এমন তন্ময় আমার কথা আদৌ গ্রাহ্য করলে না।

গৃহিণী বললেন—ওরা বোধহয় হিন্দীও জানে না। নিকটে গিয়ে জোরে বল।

তাই করলাম কিন্তু কোন সুফল পেলাম না। আশ্চর্য বোধ করলাম আমার বাক্যে তারা যেন একেবারে কর্ণপাতও করলে না। প্যাকিং-বাক্সের দিকে লক্ষ্য ক'রে এমন মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছে, মনে হয় সমস্ত বাক্সগুলি নূতন ক'রে সজ্জিত করা প্রয়োজন কিংবা এত বাক্স স্থানান্তরিত করা তিন জনের পক্ষে সম্ভব নয়, এইরূপ কিছু একটা চিন্তায় মগ্ন।

আমাদের প্রশ্নে তাদের মনোযোগ না দেওয়ায় রুষ্ট হয়ে ফিরে আসছিলাম তবুও জিদের বশে শেষ একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলাম তারপর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তারা ভগবানের সৃষ্ট সজীব প্রাণী নয়। এগুলি শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যের অদ্ভুত নিদর্শন। মৃণ্ময় মূর্ত্তি।

আমরা বিস্ময় নেত্রে কিছুক্ষণ দেখলাম। মূর্ত্তি তিনটি শিল্পীর নিখুঁৎ প্রচেষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরও বিচক্ষণতার পরিচয় পেলাম মূর্তিগুলি এই সতন্ত্র স্থানে রেখে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যার জন্য শিল্পী দর্শকের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

আর্ট-গ্যালারী দেখার সময় কতিপয় বাঙ্গালী যুবককে দেখেছিলাম, কোন কলেজের ছাত্র। তাঁরা আজই তাঞ্জোরে এসেছেন এবং আজই সন্ধ্যায় তাঁদের অন্যত্র যাবার প্রস্তাব আছে। আমি তাঁদের নিকট গিয়ে মূর্তিগুলির স্বরূপ প্রকাশ না ক'রে তাঁদের ডেকে এনে গুদাম কক্ষটি দেখার অনুরোধ করলাম। আমাদের অনুরোধে তাঁরা গুদামের মধ্যে গেলেন এবং দর্শনীয় কিছু উপলব্ধি না ক'রে ফিরে এসে আমাদের বললেন—কিছুই তো দেখলাম না। কেবলমাত্র পুরাতন প্যাকিং-বাক্সের আবর্জনা। কুলিরা কাজ করছে।

তাঁদের বললাম—ঐ কুলিদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন। এবার তাঁরা গিয়ে কুলিদের প্রশ্ন করলেন কিন্তু তাঁদের কথায় কুলিদের মনোযোগ না দেওয়ায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে বেশ কয়েকটি কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। এরূপ

পরুষ ভাষা কোন সজীব মজুর শ্রেণীর উপর ব্যবহার করলে একটা অনর্থের সৃষ্টি হতো।

পরিশেষে আমি তাদের নিকটে গিয়ে বললাম—ওরা কোনদিনই আপনাদের কথায় সাড়া দেবে না। রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে জন্মে নেই। আপাদ-মস্তক ওদের মাটিতে পরিপূর্ণ।

এরপর তারা যে অভিনয় করলেন আমরা না হেসে থাকতে পারলাম না। তাঁরা করজোড়ে মূর্তিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—হে ভদ্রগণ, আমরা না বুঝে অতি গর্হিৎ কাজ করেছি। আমাদের ক্ষমা করুন। আপনাদের জন্মদাতাকে আমাদের আন্তরীক শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এরপর অন্বেষণ ক'রে আমরা সদলবলে গেলাম সরস্বতী লাইব্রেরী কক্ষে। তিনটি সুদীর্ঘ হল্। হলের দুই পার্শ্বে মেহগ্নি কাঠের আলমারির মধ্যে নানা আকারের গ্রন্থরাজী সজ্জিত। শুনলাম, বহু যুগের পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখানে সংরক্ষিত আছে। আলমারির কাঁচের আবরণের মধ্যে সেগুলিকে দেখা হ'ল মাত্র। ভিতরে কি বস্তু আছে জানি না। জানার শক্তিও আমাদের কারও নেই।

লাইব্রেরীর এক কর্মচারী আমাদের নিয়ে গেলেন দেওয়াল চিত্র দেখাতে। এগুলি নাকি কিছুদিন পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরাতন চোল আমলের চিত্রগুলির উপর নায়ক আমলের চিত্র অঙ্কিত হয়। নায়ক আমলের চিত্রগুলি স্থানে স্থানে খসে পড়ায় এর নিচে সেই চোল আমলের চিত্রগুলি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। কর্মচারীর মুখে শুনলাম নিচের চোল আমলের চিত্র দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন। চিহ্নগুলি রামায়ণ, পুরাণের ইতিবৃত্ত থেকে অঙ্কিত। কর্মচারী রামের জন্ম থেকে দশাননের নিধন প্রভৃতি চিত্রের পরিচয় দিয়ে এক টাকা পারিশ্রমিক নিলেন। নায়ক আমলের চিত্রগুলি সে যুগের আদৌ মনে হয় না। যেন কয়েক বৎসর পূর্বে অঙ্কিত। কোনস্থানে রঙের পারিপাট্যের হ্রাস পায় নি।

আর্ট-গ্যালারী ও সরস্বতী লাইব্রেরী দেখে রাজা-হাউস অভিমুখে ফিরলাম। নদীর পার্শ্বে একটি পথে বাজার। গৃহিনীর আগ্রহে বিনা কারণে বাজারের পথে গেলাম। বাজারের বাইরে ফুট পাতের উপর এক এক বোঝা নিমপাতা

নিয়ে বিক্রয়ে বসেছে। ফাল্গুন মাস। নিম-শুক্তো আহারের আগ্রহে কিনতে গেলাম। নিকটে গিয়ে দেখলাম, নিম নয়। নিমের মত এক প্রকার বৃক্ষের পাতা। গৃহিণী বললেন—ও মিষ্টি নিম। মাদ্রাজীরা ডালে সম্বরা দেয়। অনেকে সম্বরা-পাতাও বলে।

সেখান থেকে আর কিছু দূর গিয়ে দেখলাম বাদ্য-যন্ত্রের দোকান। পাখোয়াজের মত এক প্রকার বাদ্য-যন্ত্র স্তূপাকার করা আছে। তারই পাশে আর একটি দোকানে দেখলাম সেতার ও তানপুরার কারখানা। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দ্বারের পাশে বসে যন্ত্র পরীক্ষা করছেন। কক্ষের মধ্যে দেখলাম দশ বারো জন কারিগর কর্মরত। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের আহ্বান ক'রে বসতে অনুরোধ করলেন। হিন্দি ভালই জানেন। তানপুরার ও সেতারের জন্য লাউয়ের খোল পর্বত প্রমাণ স্তূপাকার ক'রে রেখেছেন। ভদ্রলোক তাঁর দোকানের কার্ড দিয়ে বললেন—যদি আপনার আবশ্যক হয় আমাদের পত্র দেবেন, আমরা যত্ন পূর্বক পাঠিয়ে দেব। বললাম—এই ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ রেলের পার্শ্বেলে কি পাঠান সম্ভব?

তিনি বললেন—আমরা বম্বে, দিল্লী, কলকাতায় পাঠিয়ে থাকি। আপনি বাঙ্গালী আমি দেখেই চিনেছি। কলকাতায় আমি বহু যন্ত্র পাঠিয়েছি। তারপর তিনি একটি খাতা খুলে কয়েক বৎসরে কোথায় কত তানপুরা পাঠিয়েছেন আমাকে দেখালেন। নামগুলির মধ্যে একটি পরিচিত নামও পেলাম। দেখলাম প্রখ্যাত ঠুংরি-গায়ক অনাথ বসু মহাশয়ের নাম ও ঠিকানা তাঁর খাতায় লেখা আছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজা-হাউসে ফিরলাম। গৃহিণী বললেন—এখানে দেখবার মত দু'টি জিনিসই আছে; এক বৃহদেশ্বর মন্দির, দ্বিতীয়টি আত্র যা দেখে এলাম। সহরটি ভাল। থেকে ও খেয়ে সুখ আছে।

বললাম—সুখ অধিক দিন ভোগ করা ভাল নয়। চল, কাল তিরুচিরপল্লী যাওয়া যাক। তারপর একেবারে রামেশ্বর। গৃহিণী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—জিনিস পত্র গোছ-গাছ ক'রে রাখ, ট্রেন কখন?

বললাম—যে ট্রেনে এসেছি সেই ট্রেনেই যাব। দেড়টার ট্রেন তিরুচিরিতে যাব সাড়ে চারটার মধ্যে। পথ বেশী নয়। মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার।

তিরুচিরপল্লী

পরদিন মালপত্র নিয়ে রাজা-হাউস থেকে বিদায় নিয়ে ষ্টেশনে এলাম। ট্রেনের বিলম্ব ছিল। গৃহিণী ট্রাঙ্কের উপর বসে বললেন—তাঞ্জোরের কোন নিদর্শন নেওয়া হ'ল না। বাজারে গেলে কোন দিকে তাকিয়ে দেখবে না। এখানে কি কোন দোকান আছে ছাই, কিছু দেখে শুনে নেব।

বললাম—কেন, বাবা বৃহদেশ্বরের মাথার বিল্বপত্র নিয়েছ, পার্বতীর কপালের সিন্দুরও পেয়েছ, অন্য নিদর্শনের কি দরকার? গৃহিণী ভেংচী কেটে মাথা নেড়ে বললেন—ওকি একটা নিদর্শন নাকি? সব জায়গার দেবতার পুষ্প, সিন্দুর একটা প্যাকেটেই রাখা হচ্ছে। ঠাকুরের ফুল কি একটা নিদর্শন? প্লাটফর্মের ওদিকে দেখে এস দিকি, যদি নেওয়ার মত কোন ভাল জিনিস পাওয়া যায়?

গেলাম ষ্টেশনের বাইরে। তাকিয়ে দেখলাম একটা দোকানে কয়েক কাঁদি কলা ঝুলছে মনে করলাম এক ছড়া নেওয়া যাক যতক্ষণ না তিরুচিরপল্লী পৌঁছান যায় এ বস্তুটির স্বাদ গ্রহণ করতে করতে যাওয়া যাবে। পরে ভাবলাম যাত্রাপথে এ বস্তু অযাত্রা। গৃহিণী হয়তো ভৎর্সনা ক'রে ফেরৎ পাঠাবেন। দরকার নেই। আর একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম গৃহিণীর মনোমত কোন বস্তুর দোকান আছে কি না।

ফিরে আসছি হঠাৎ দেখলাম কৃষ্ণবর্ণা, শীর্ণকায়া এক প্রৌঢ়া এক বোঝা তালপাতায় বোনা পাখা মাথায় নিয়ে চলেছে। তাকে ডেকে পাখাগুলি দেখে মনমত নিদর্শন হবে অনুমান ক'রে বললাম—আমার সঙ্গে এস। প্লাটফর্মের উপর ঠিক তোমার মত দেখতে আমার সহধর্মিনী বসে আছেন তোমার-ই প্রতীক্ষায়। তোমার উপকার হতে পারে।

প্রৌঢ়াকে সঙ্গে নিয়ে গৃহিণীর নিকট এসে বললাম—দেখ, বেশ ভাল নিদর্শন পেয়েছি।

গৃহিণী প্রৌঢ়ার মাথার দিকে চেয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন—ওকি হবে? আমি কি ঐ জিনিস আনতে বললাম। তুমি নিয়ে রাখ। মাথা গরম হলে ঘুরিয়ে মাথায় হাওয়া দেবে। তাঞ্জোরে ভাল ভাল মাদ্রাজী চাদর

পাওয়া যায়। কাল বাজারে দেখলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেল নিতে পারলাম না। মনে করেছিলাম আজ সকালে একবার বাজারের দিকে গিয়ে দু' একখানা নিয়ে আসব। সময় ছিল যথেষ্ট। অনায়াসে ঘুরে আসতে পারতাম। ঘর থেকে নড়ল না।

অবস্থা বুঝে প্রৌঢ়াকে মাথা নেড়ে বিদায় দিলাম। সে কিছুদূর যাওয়ার পর গৃহিণী বললেন—ওকে ডাক তো দেখি কি রকম পাখা এনেছে।

পুনরায় ডেকে তার পাখার বাণ্ডিল খুলে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলেন। সাদা ও চিত্রিত দু'প্রকার পাখা আছে। গৃহিণী পাখার কাঠের নলটি ধরে এক একখানি ঘুরিয়ে পরীক্ষা ক'রে একখানি রঙীন চিত্রিত পাখা পছন্দ ক'রে নিলেন।

এখন বিভ্রাট বাধল মূল্য নির্ধারণে। প্রৌঢ়া যা বলেন আমরা বুঝি না আমাদের কথাও তিনি বোঝেন না। নিকটে কোন ভদ্রলোককেও দেখতে পাচ্ছি না যে সমস্যার সমাধান করি। কোন কুলিও নিকটে নেই। অবশেষ প্রৌঢ়াই সমাধান করলেন। সাদা পাখায়, একটি সিকি দেখালেন। আর চিত্রিত পাখা দেখিয়ে একটা আধুলী দেখালেন। মূল্য বুঝলাম কিন্তু নিষ্পত্তি হবে কিরূপে। আমি প্রৌঢ়ার পথ অনুসরণ ক'রে চিত্রিত পাখার জন্য একটি সিকি দেখালাম তিনি রাজি হলেন না। বহু অনুনয় বিনয় ক'রে আরও একটি পাঁচ পয়সা দিয়ে সমস্যার সমাধান করলাম।

গৃহিণী পায়ের উপর পা দিয়ে বসে পাখাটি ঘুরুতে ঘুরুতে বললেন—এদিকে গরম পড়ে গেছে পাখা একটা সঙ্গে থাক।

টিকিটের ঘণ্টা পড়ল। আমরা টিকিট নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। এক খর্বকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার নিকট এসে প্রশ্ন করলেন—বাবুদের কি রামেশ্বর যাওয়া হবে?

মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ভদ্রলোক বাঙ্গালী। আনন্দিত হয়ে বললাম—মনের ইচ্ছা সেই প্রকার। আজ আমরা এখন চলেছি তিরুচিরিপল্লী। আপনি কোথায় যাবেন?

ভদ্রলোক বললেন—আমরাও রামেশ্বর যাওয়ার লাগি বেরিয়েছি। আজ

আমরাও তিরুচিরিতে নেমে শ্রীরঙ্গম যাব।

বললাম—ভাল। এর সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

ভদ্রলোকের সবিশেষ পরিচয় পেলাম। তিনি স্ত্রী ও বিধবা কন্যা নিয়ে রামেশ্বর চলেছেন। এঁর নাম দীনবন্ধু চাকী, জাতিতে গোপ, নিবাস বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখী গ্রামে। আমার ব্রাহ্মণ পরিচয় জেনে স্ত্রী ও কন্যাকে ডেকে প্রণাম করতে বললেন।

দীনবন্ধুবাবুকে বললাম—তিরুচিরিপল্লীতে আপনি কয়দিন থাকবেন? তিনি বললেন—তিরুচিরি ষ্টেশনে নেমে ওখানে থাকব না একবারে চলে যাব শ্রীরঙ্গম তীর্থে। এই কথা বলে পকেট থেকে একটি কাগজের বাণ্ডিল বার ক'রে আমাকে দেখালেন। তাঁর এক ভাগনা রেলে কাজ করেন। তিনি তাঁদের থাকার ও পথের সমস্ত বিবরণ লিখে দিয়েছেন।

আমি বললাম—আমাদের ইচ্ছা কয়েকদিন তিরুচিরিতেই থাকব। শুনেছি এখানেও কিছু দেখবার আছে। শ্রীরঙ্গম হয়তো কাল কিংবা পরশু যেতে পারি।

দীনবন্ধুবাবু বললেন—শ্রীরঙ্গমে ভাল ধর্মশালা আছে। তিরুচিরি ষ্টেশনে কি ধর্মশালা আছে?

বললাম—তিরুচিরিপল্লী কেবল ষ্টেশন নয়, একটি বড় সহর। ধর্মশালা আছে শুনেছি।

দীনবন্ধুবাবু বললেন—ভাগনা বলেছিল, ভিলিপুর থেকে শ্রীরঙ্গম যেতে একটা আলাদা রেলপথ আছে। একেবারে শ্রীরঙ্গমে নামতে হয়। আমরা শুনলাম এদিকে চিদম্বরমে নটরাজ মন্দির আছে। সেজন্য চিদম্বরমে ঘুরে নেমে নটরাজ মন্দির দেখে এদিকে আসতে হ'ল। রামেশ্বর যেতে হলে এই তিরুচিরি থেকেই যেতে হবে, না ঠাকুর মশাই?

অকস্মাৎ দীনবন্ধুবাবুর কন্যা চিৎকার ক'রে বললেন—বাবা, দেখ দেখ কি সুন্দর পাহাড়, আবার তার উপরে কি সুন্দর বাড়ী। বোধহয় রাজবাড়ী।

বললাম—এই পাহাড়টির নাম গোল্ডেন-রক। যাকে বলে স্বর্ণ-শৈল। এর চূড়ায় আছে একটি চমৎকার দুর্গ ও মন্দির। একদিন এসে দেখে যাবেন, এর পরই আসবে তিরুচিরিপল্লী ষ্টেশন।

কথায় কথায় এসে পড়লাম ত্রিরুচিরিপল্লী ষ্টেশনে। কুলি ডেকে বাক্স, বেডিং নামালাম। এদিকে দেখলাম দীনবন্ধুবাবুর মালপত্র। ছু'টি কম্বলে আবৃত রশি দিয়ে বাঁধা বেডিং। একটি বস্তায় বাসন ও তৈজসপত্র বলে মনে হ'ল। আর একটি বস্তায় রসদ প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী। ছু'টি ট্রাঙ্ক, আরও ছু'তিনটি গাঁঠরী।

কুলিরা একটি ঝটকা ডেকে মালপত্র সমেত দীনবন্ধুবাবুদের শ্রীরঙ্গমে পাঠালে। অন্য একটি ঝটকাওয়ালা আমাদের মালপত্র তুলে বললে—পাঁচ মিল পাঁচ টাকা।

তাকে বুঝিয়ে বললাম আমরা শ্রীরঙ্গম যাব না। আজ সহরে কোন ধর্মশালায় আমাদের নিয়ে চল। বুঝলাম ঝটকা-চালক তার নিজস্ব ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার ব্যবহারে অক্ষম। পরিশেষে এক ভদ্রলোক আমাদের উদ্ধার করলেন।

তিনি প্রথমে প্রশ্ন করলেন—আপনি কোন জাতি?

বললাম—ব্রাহ্মণ।

তিনি বললেন—এখানে ছত্রীদের একটি ধর্মশালা আছে। আপনাদের যদি সে ধর্মশালায় থাকতে আপত্তি না থাকে আমি ঝটকাওয়ালাকে বলে ব্যবস্থা ক'রে দিই।

মনে মনে বললাম—চণ্ডালের ধর্মশালা হলেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। ভদ্রলোককে জানালাম, আমাদের আপত্তি নেই। ভদ্রলোক ঝটকাওয়ালাকে সেইমত উপদেশ দিয়ে আমাদের দেড়টাকা ভাড়া দিতে বলে দিলেন।

ষ্টেশন থেকে প্রায় ছু'মাইল গিয়ে প্রধান রাস্তা ছেড়ে গলির মধ্যে একটি বড় বাড়ীর দ্বারে হাজির ক'রে ম্যানেজারের নিকট সাক্ষাৎ করতে বললে। দ্বারে ইংরাজী ও গুজরাটী ভাষায় লেখা আছে—'সিদ্ধি ধর্মশালা।' আমি ভিতরে গিয়ে এক শীর্ণকায় ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলাম—ম্যানেজার কোথায়? তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

তিনি বললেন—আমি ম্যানেজার। কি চাই আপনার?

বললাম—আমি তীর্থযাত্রী। আজ এখানে স্থানের জন্য এসেছি।

ম্যানেজার রুক্ষ মেজাজে উত্তর দিলেন—জায়গা মিলবে না।

ঝটকাওয়ালা আমার সঙ্গে ছিল। সে হিন্দি বা বাঙলা না জানলেও বেশ বুদ্ধিমান। আমাকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেল সিন্ধি এসোসিয়েশন ও ধর্মশালার সেক্রেটারী, টোলারাম বাবুর নিকট। তাকে আমাদের অবস্থা জ্ঞাপন করতে তিনি তাঁর পুত্রকে আমাদের সঙ্গে পাঠালেন।

এখন ম্যানেজার মহাশয়ের মেজাজ বেশ কয়েক ডিগ্রিতে নেমে গেল। আমরা স্থান পেলাম। দ্বিতলে মার্বেল মোজায়েক করা একটি প্রশস্ত কক্ষ। শয্যাসহ দু'টী খাট, বিজলী বাতি, পাখা, টেবিল, চেয়ার, কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম। বিজলী বাতি ও অন্যান্য বাবদ দৈনিক চার্জ এক টাকা। ঝটকাওয়ালার দ্বারা মালপত্র তুলে তাকে বিদায় দিলাম।

পরে জেনেছিলাম এই গলিতে এবং পার্শ্বের গলিতে কয়েকখানি বাড়ীতে যাত্রীদের কামরা ভাড়া দেওয়া হয়। একদিন কয়েকখানি যাত্রীনিবাস দেখে এলাম। পূর্বে জানা থাকলে আমরা এঁদের কৃপার পাত্র না হয়ে ঐ সকল যাত্রীনিবাসের একটিতে উঠতাম। ভাড়া দৈনিক দু'টাকা। বিজলী বাতি, পাখা ও জলের ব্যবস্থা ভালই আছে।

এই ধর্মশালার নিম্নতলে একটি কক্ষে লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি আছে। সন্ধ্যার পর দেখলাম প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন গুজরাটী মহিলা লক্ষ্মী-নারায়ণ কক্ষের বা মন্দিরের সম্মুখের বারান্দায় সমবেত হয়েছেন। এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। বুঝলাম এ স্থানে বহু গুজরাটী পরিবারের বাস। গুজরাটী এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী টোলারামবাবু বেশ বিত্তবান লোক। প্রধান রাস্তার উপর তাঁর চার-পাঁচটি জুয়েলারী দোকান, এতদ্ব্যাতীত আরও বহু প্রকার ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট।

গৃহিণী বললেন—আজ রাত্রে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। চল কোন একটা দোকানে গিয়ে দেখি যদি লুচি, পুরী কিছু পাওয়া যায়।

পরদিন সকালে ধর্মশালা থেকে গেলাম গণেশ মন্দির দেখতে। শুনলাম তিরুচিরিতে একমাত্র প্রধান দর্শনীয় এই গণেশ মন্দির। ধর্মশালার গলি থেকে বেরিয়ে গৃহিণী বললেন—গলিটা বেশ। ঠিক যেন আমাদের গোয়াবাগানের পল্লী। রাস্তায় জলের কলের ধারে কেউ আছে হাতে ছাই,

মেখে বাসী বাসনের গোছা নিয়ে। কেউ আছে ঘড়া কেঁকালে। কেউ কলের নিচে মাথা পেতে বসে অজস্র ঝগড়া চালাচ্ছে। এদিকে মুড়িওয়ালি মাসীর তেলেভাজা কড়াইয়ের ধারে একদল ছেলেমেয়ে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে দু'তিনটে ছেলে মারামারি বাধিয়েছে, তাদের মায়েরা কোমর বেঁধে ঝগড়ায় মেতেছে।

বললাম—তুমি কি এতদিন কেবল দেখছ তীর্থপথে আহার-নিদ্রা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অভাব-অভিযোগ কিছুই নেই। কেবল স্বর্গীয় আনন্দ আর ঈশ্বরের আরাধনায় লোকে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।

গৃহিণী বললেন—তা নয়। তবে এখানকার এ পাড়াটা দেখলে দেশের কথা মনে পড়ে যায়।

গলি ছেড়ে সহরের প্রধান রাস্তায় এলাম। পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্যের দোকান। তন্মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি কবিরাজের দোকান কিংবা কবিরাজখানা। আলমারির মধ্যে দেশীয় ভাষায় লেবেল মারা নানা আকৃতির শিশি বোতল। কোন স্থানে কবিরাজ মশায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে রোগীর অপেক্ষায় বসে আছেন। কোন দোকানে কবিরাজ মশায় চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে রোগীর বদন গহ্বর নিরীক্ষণ ক'রে রোগীর উদরে গতকল্যকার ভক্ষ্য-বস্তু পরীক্ষা ক'রে দেখছেন।

গৃহিণীকে বললাম—এদিকে বোধহয় ভাল ভাল কবিরাজ আছেন। অনেক দিন কলকাতা থেকে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরে তোমার দেহ ক্ষীণ ও কালো হয়ে গেছে, কবিরাজ দেখিয়ে কোন ওষুধের ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়।

গৃহিণী বললেন—তোমার জন্য মাথা ঠাণ্ডা কোন তেল থাকলে নিতে পার। কোবরেজের দোকান আর কয়টা। চোখেরও নজর নেই। এদিকে দেখ দিকি সার গেঁথে চলেছে সোনা-রূপো, হীরে-জহরতের দোকান। এদিকে রূপার গহনার বোধহয় খুব চলন। এগুলির গড়নও চমৎকার। চল তো একটা দোকানে গিয়ে দেখে যাই।

বললাম—ভগবান দর্শনে বেরিয়ে অযথা বিলম্ব করা উচিত নয়। পরে দেখা যাবে।

কিছুদূরে এসে লক্ষ্য করলাম অদূরে একটি গোপুরমের চূড়া ও তার পশ্চাতে

এক পাহাড়। পথের বামদিকে দেখলাম একটি সুন্দর পার্ক। তার পরেই এ রাস্তাটি মিশেছে আর একটি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রাস্তার সঙ্গে। এ পথের শেষ সীমানায় দেখলাম সেই গোপুরম, পথ অবরোধ ক'রে দণ্ডায়মান। এ প্রদেশের অন্যান্য গোপুরমের মত একটি সাধারণ গোপুরম নয়। এর বিশেষত্ব হচ্ছে গোপুরমের প্রবেশ পথের দেওয়াল গাত্রে অপূর্ব চিত্র-কলায় পরিশোভিত। শুনলাম চোল ও পল্লব বংশের রাজপুরুষগণ শিল্প ও চিত্র-কলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করেন এই তিরুচিরিপল্লীর গোপুরম ও মন্দির নির্মাণে।

আমরা গোপুরমের পথেই দেখলাম গণেশ মন্দির। বহু ভক্ত পুরুষ ও নারী এসেছেন গণপতির পূজায়। আমরা গণপতির পূজা দিয়ে চরণামৃত নিয়ে দেখতে লাগলাম গোপুরম প্রবেশ পথের অদ্ভুত চিত্র-কলা। নানা দেব-দেবীর চিত্র ও পুরাণ বর্ণিত আখ্যানের প্রতিচ্ছবি। বেশ কিছুক্ষণ এ সকল দেখার পর সম্মুখভাগে সোপান পথে বহু লোককে সেদিকে যেতে দেখে আমরা তাঁদের অনুসরণ করলাম।

কিছুদূর উর্ধে আরোহণের পর হাজির হলাম লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরের দ্বারে। অপূর্ব কারুকার্যসম্পন্ন দেওয়াল গাত্রে অভিনব পৌরাণিক চিত্র-কলা সম্বলিত মন্দির। এ স্থানে বহু ভক্তকে পূজা দিতে দেখলাম। স্থাপত্য শিল্প ও চিত্র-কলা দেখে মুগ্ধ হলাম।

এরপর আরও উর্ধ দিকে সোপান পথ দেখে সে দিকে অগ্রসর হলাম। কিছুদূর এসে হাজির হলাম শঙ্কর মন্দিরের দ্বারে। পথের এখানেও শেষ নয়, আরও উর্ধে উঠে এখন পর্বত কন্দর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের এক মুক্ত সমতল প্রান্তে হাজির হলাম। এ স্থানে কয়েকখানি চা-কফি, পূজার দ্রব্যাদি ও ফুলের দোকান। মন্দির ও মন্দিরের দেবতার চিত্রের দোকান দেখলাম।

এখন মুক্ত সমতল ক্ষেত্রে এসে নিম্নভাগে নিরীক্ষণ ক'রে বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে গেলাম। একদিকে সারা তিরুচিরিপল্লী সহরের দৃশ্য ; অন্যদিকে নারিকেল কুঞ্জের মধ্য দিয়ে চলেছে কাবেরী নদী তার সেতুর উপর দিয়ে শ্রীরঙ্গম-গামী রেলপথ। একখানি যাত্রীবাহী ট্রেনকে মন্থর গতিতে নারিকেল

কুঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে দেখলাম। বায়নাকুলার সঙ্গে থাকলে শ্রীরঙ্গমের গোপুরম এখান থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ স্থানটির মায়া এক নিমেষে ত্যাগ করা যায় না। যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছি। স্নিগ্ধ ফাল্গুনের বাতাস দেহ ও মনকে স্বর্গীয় শান্তিতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ স্থান থেকে দেখলাম প্রায় দেড়শত সোপান অতিক্রম ক'রে অনেকে উর্ধ্ব পথে চলেছেন, সঙ্গে নিয়ে চলেছেন পূজার দ্রব্য ও ফুল। আমরাও গেলাম সেই শীর্ষ স্থানে। এখানেও দেখলাম সিদ্ধিদাতা গণপতির মন্দির। গোপুরমের প্রবেশ পথে দেখেছিলাম গণপতির মন্দির। শীর্ষেও সেই গণপতি। গণেশ মন্দির বা গণেশ পাহাড়ের নামের সার্থকতা আছে, এটি কেবল মন্দির নয় শৈলশীরে মন্দিব দূর্গ।

একদিন রাত্রে এসে বিজলী বাত্তির আলোকে মন্দির দূর্গের শোভা ও নিম্ন-ভাগে সহস্র দ্বীপের প্রভাবে সহরের শোভা দেখে গিয়েছিলাম।

মন্দির দূর্গ থেকে বেরিয়ে গোপুরমের দক্ষিণ সীমানায় মন্দিরের সরোবর। এ স্থান থেকে পাহাড়ের শীরে গণেশ মন্দিরটি অতি চমৎকার দেখতে। এ সরোবরের মধ্যেও একটি মঞ্চ আছে। সরোবরের তীরে একটি বৃহৎ গীর্জা, নাম লেখা আছে 'সেণ্ট যোশেফ চার্চ'। গীর্জার পাশেই বিশপ হারবার বিদ্যালয় ভবন ও বাস ষ্টেশন।

আমরা সহরের দোকান, বাজার প্রভৃতি ঘুরে সিদ্ধি ধর্মশালায় এলাম বেলা প্রায় একটায়। আহারাদির পর আজ আর কোন স্থানে না গিয়ে সন্ধ্যার পর ধর্মশালায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ শুনলাম।

পরদিন সকালে গেলাম শ্রীরঙ্গমে নারায়ণ মন্দির দেখতে। গণেশ পাহাড়ের সানুদেশে সরোবরের তীরে এসে বাসে উঠলাম।

তিরুচিরিপল্লীর জনসাধারণ এ স্থানের নামের সংক্ষেপ ক'রে বলেন, ত্রিচি। আমাদের বাস ত্রিচি সহর ত্যাগ ক'রে নারিকেল কুঞ্জ ও সহরতলির পাশে ক্ষুদ্র পল্লীগুলির পাশ দিয়ে চলেছে। কী অপূর্ব পথের দৃশ্য। এরপর কাবেরী নদীর সেতু অতিক্রম ক'রে একটি মন্দির সন্নিকটে এসে বাস থামল। শুনলাম এটি জম্বুকেশ্বরম্। কথিত আছে এই স্থানে একটি হাতী ভগবান শঙ্করের উপাসনা করে। সেইজন্য স্থানটির নাম জম্বুকেশ্বরম্।

অনেকে নেমে গেলেন। গৃহিণী ফেরার পথে এ স্থানে নেমে জম্বুকেশ্বরম্ দেখার প্রস্তাব করলেন।

এরপর আমরা হাজির হলাম একটি বিরাট গোপুরমের সন্নিকটে। শুনলাম এই রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির। এটি এক মনোরম স্থান। কাবেরী ও তার শাখা নদী কলিরুণ পরিবেষ্টিত এই শ্রীরঙ্গম স্থানটি। বাস থেকে নেমে দেখলাম গোপুরমের সম্মুখে হোটেল, দোকান ও বাজার। অন্য দিকে দু'টি বৃহৎ ধর্মশালা ভবন। সেগুলি সংস্কার অভাবে হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। বাস থেকে নামা মাত্র একজন গাইড বা পাণ্ডা আমাদের সাহায্যে এলেন। গোপুরমের পাশ থেকে দুই বাহুর মত উচ্চ প্রাচীর সহরকে বেষ্টন ক'রে আছে।

গৃহিণী বললেন—খালি হাতে মন্দিরে চলেছ, পূজার ফুল আর কিছু নেওয়া তো দরকার। ইড্লির হোটেলের দিকেই খালি নজর।

পাণ্ডা বললেন—এখানে কিছু লওয়ার আবশ্যক নেই। মন্দির দ্বারে ভাল দোকান আছে। গোপুরমের মধ্য দিয়ে এ দিকে এসে দেখলাম, মন্দিরের কোন চিহ্ন নেই। একটি প্রশস্ত পথ। জনসাধারণ নিজ নিজ কাজে চলেছেন। সম্মুখে অন্য একটি অনুরূপ গোপুরম সেটিও অতিক্রম ক'রে এদিকে এসে মন্দির বা নাটমন্দিরের দর্শন পেলাম না। পূর্ব বারের মত জনপূর্ণ রাজপথ। ক্রমান্বয়ে সমপর্যায়ে আর একটি গোপুরম অতিক্রম করলাম। এখন দেখলাম এ স্থানে বিদ্যালয়, বাজার ও নানা দ্রব্যের দোকান। এখন আমাদের পাণ্ডা মশায় পূজার দ্রব্য ও ফুল নিতে আদেশ দিলেন। এবার একটি গোপুরম অতিক্রম ক'রে এলাম মন্দির সীমানার মধ্যে। দ্বারদেশে দেখলাম, নারায়ণের পরম ভক্ত ও বাহন গরুড় দেবতার মন্দির। রাম-ভক্ত মহাবীর হনুমানের আর নারায়ণ ভক্ত চির বিনয়ী গরুড়, দর্শন মাত্রেই চেনা যায়। এঁদের পরিচয়ের আবশ্যক হয় না।

এরপর নাটমন্দির অতিক্রম ক'রে এলাম নারায়ণ মন্দিরের দ্বারে। ভগবান নারায়ণ নাগরাজের ক্রোড়ে শয্যা নিয়ে অনন্তকাল নিদ্রা মগ্ন রয়েছেন। কী গাম্ভির্যপূর্ণ মূর্তি। পরে দাক্ষিণাত্যের পথে আরও

দুটো স্থানে এই অনন্তশয্যা রূপ দেখেছি। একটি কেরালারাজ্যে ত্রিবেন্দ্রামে। অন্যটি মহীশুর রাজ্যে শ্রীরঙ্গপত্তমে।

এই মূর্তিগুলির এমন মোহন পরিবেশ যে মূর্তির দিকে দৃষ্টি মাত্র তন্ময় হয়ে যেতে হয়।

এরপর এলাম মহেশ্বরের মন্দির দ্বারে। দেখলাম, পরম যোগী মহাকাল মহাধ্যানে নিমগ্ন আছেন। কি গাম্ভির্যপূর্ণ সৌম্য মূর্তি। বিশ্বেশ্বর বিশ্বের ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিয়ে নিজে হয়েছেন ভিখারী, পরম যোগী। অমৃত উপেক্ষা ক'রে গরল ধারণ করেছেন কণ্ঠে। এই মূর্তির দিকে প্রণাম ক'রে মূর্তি নির্মেতা ভাস্করকেও নমস্কার দেওয়া উচিত।

এখান থেকে এলাম শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে। যেমন ভূবনমোহন মূর্তি, তমনি রাজসিক আভরণ। শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর রত্নখচিত স্বর্ণ-্কুট দর্শকের মন আকৃষ্ট করে।

। স্থানে দেখলাম রাবণ সহোদর বিভীষণকে শ্রীরামচন্দ্রের পাশে স্থান ়াওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় সহোদর লক্ষণ, ভক্ত মহাবীরকে াদ দিয়ে বিভীষণকে দেব-সম্মান দেওয়ার তাৎপর্য বুঝলাম না।

।খন এসে পড়লাম সেই নয়ন বিভ্রান্তকারী সহস্র স্তম্ভের নাটমন্দিরে। তিটি স্তম্ভের নিম্ন থেকে ছাদ পর্যন্ত ধৈর্যবান ভাস্কর অক্লান্ত পরিশ্রমে ানাইট প্রস্তরের বুকে ফুটিয়ে তুলেছে মনোহর পরিবেশ। যেন সৃষ্টিছাড়া নাসৃষ্টির পরিকল্পনা। ভগবৎ অনুরাগী চোল পল্লবগণ উন্মুক্ত ক'রে য়েছিলেন তাঁদের ধনাগার। এই যে গোপুরমগুলি যাদের ছায়ায় সারা রঙ্গম আবৃত হয়ে আছে কী অসাধ্য সাধন করেছেন এ সকল নির্মাণে।

ণ্ডা মহাশয়ের নিকট বিদায় নিয়ে একে একে গোপুরমগুলি পার হয়ে ন স্ট্যাণ্ডে এলাম। কিছু আহারের ইচ্ছায় একটি দোকানের নিকট দ ধরা পড়লাম ট্রেনে পরিচিত দীনবন্ধুবাবুর কন্যার হাতে। প্রথমে মরা তাকে চিনতে সক্ষম হই নি আমার হাত ধরে আমাদের রপূর্বক নিয়ে গেলেন তাঁদের ধর্মশালার কক্ষে। বাইরে থেকে শালার অবস্থা যতটা হীন ভেবেছিলাম ভিতরে এসে দেখলাম তাদৃশ । দীনবন্ধুবাবু আমাদের সাক্ষাৎ পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হলেন।

আমাদের ত্রিচির ঠিকানা নিয়ে পরদিন সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের সহজে বিদায় দিলেন না। তাঁদের দেশ থেকে আনা চিঁড়ে, দুধ, কলা ও মিষ্টান্ন সহযোগে আমাদের পরিতোষ পূর্বক ভোজন করালেন। তাঁদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম। দীনবন্ধুবাবু বলেছিলেন, জামাতার অকালমৃত্যুতে তাঁর কন্যা শোকে ম্রিয়মান হয়ে আছে। আমরা তা'র দেহে ও ব্যবহারে সেরূপ কোন লক্ষণই দেখলাম না।

ফেরার পথে গৃহিণীর আগ্রহে জম্বুকেশ্বর ভগবানের দর্শনে এলাম। মন্দির মধ্যে একটি চতুস্কোণ গহ্বরে লিঙ্গমূর্তি সকল সময় সলিল মগ্ন আছেন। ভূগর্ভে একটি মৃদুগতি উৎস থাকায় এই বিস্ময়কর সৃষ্টি হয়েছে সহজেই উপলব্ধি হয়। মন্দিরের পুরোহিত মহাশয় অনেক অলীক কাহিনী শোনালেন।

দীনবন্ধুবাবুর ধর্মশালায় ফলারের ব্যবস্থায় মধ্যাহ্নে রন্ধনের প্রয়োজন ছিল না। অপরাহ্নে রেলষ্টেশনে গেলাম। আগামীকাল রামেশ্বরধাম যাওয়ার প্রস্তাব ছিল, সেজন্য যদি কোন রিজার্ভেশন পাওয়া যায়। রিজার্ভেশন আইনে রামেশ্বরের দূরত্ব কম থাকায় রিজার্ভেশন পেলাম না। শুনলাম রামেশ্বর-এক্সপ্রেসে দু'খানি বগী এস্থানে জুড়ে দেওয়া হয়! পূর্বাহ্নে এসে স্থান সংগ্রহ করলে জনতার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সেই ব্যবস্থাই শ্রেয় মনে ক'রে ধর্মশালায় ফিরলাম।

পরদিন প্রাতে বাজারে গেলাম। প্রধান রাস্তার ধারে একটি সাধারণ বাজার। তারই দু'ফার্লং দূরে একটি বড় পাইকারী বাজার। দু'টি বাজার দেখে কিছু সবজি ও ফল নিয়ে ধর্মশালায় এলাম। এস্থানেও ইড্‌লি ও ধোষা প্রস্তুতের জন্য দু'তিনটি চাল, গম পেষাই বিদ্যুৎ পরিচালিত যন্ত্র দেখলাম।

অপরাহ্নে দীনবন্ধুবাবু স্ত্রী ও কন্যাসহ অনুসন্ধান ক'রে আমাদের ধর্মশালায় এলেন। এ ধর্মশালার সুখ-সুবিধা দেখে আনন্দিত হলেন। গৃহিণী সকলকে চা ও হালুয়া প্রস্তুত ক'রে খাওয়ালেন। এঁরা আরও কয়েকদিন শ্রীরঙ্গমে থাকবেন, তারপর যাবেন রামেশ্বর। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাঁদের বাস ষ্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গণেশ পাহাড়ের দিকে গেলাম। আজ আর একবার

সকলে উঠলাম গণেশ পাহাড়ে। এখন পাহাড় শীর্ষ থেকে দেখলাম বিজলী বাতির সাহায্যে সহরের ভিন্নরূপ। বেশ কিছুক্ষণ পাহাড়ে থেকে সৌন্দর্য উপভোগ ক'রে নিয়ে এলাম। এঁদের বাস ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ধর্মশালায় ফিরলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে দু'খানি সাইকেল-রিক্সা ডেকে মালপত্র নিয়ে ষ্টেশনে এলাম। কুলিদের সাহায্যে খালি কামরার ব্যবস্থা ক'রে আরামে বসলাম।

রামেশ্বর

ঊষার আলো স্পষ্ট প্রকাশের সঙ্গে মাদ্রাজ—রামেশ্বর-এক্সপ্রেস তিরুচিরিপল্লী ষ্টেশনে হাজির হ'ল। আমাদের কামরা দু'টি সেই ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হ'ল। কামরা থেকে ষ্টেশনের দেওয়ালে কয়েকখানি প্রাচীর-পত্রে দেখলাম "রামেশ্বরমে মহা শিবরাত্রি মেলা দর্শন করুন!" বাঙলায় তারকেশ্বরে, নেপালের পশুপতিনাথ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষস্থানে শিবরাত্রিতে বিশেষ যাত্রী সমাগমের কথা শুনেছি কিন্তু রামেশ্বরের বিষয় আমার আদৌ জানা ছিল না। ভীত হয়ে গৃহিণীকে বললাম—ওগো শুনছ, রামেশ্বরে শিবরাত্রি-মেলা হয়। আনন্দে চলেছ, অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে।

গৃহিণী বললেন—অদৃষ্ট ভাল বলেই শিবরাত্রির সময় রামেশ্বরে চলেছি। নির্জন কামরায় আরামে বসেছিলাম কিন্তু আরাম আমাদের স্থায়ী হ'ল না। এক দল রাজস্থানের তীর্থযাত্রী মলিন কাঁথা, কম্বল আবৃত শয্যার বাণ্ডিল ও বস্তা বস্তা রসদ ও তৈজসপত্র প্রভৃতি কামরায় তুলে আমাদের শান্তির বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। ট্রেন যতদূর অগ্রসর হয় আমাদের অবাঞ্ছিত সহযাত্রীর জনতা ততই বৃদ্ধি পায়। সর্ব শেষে মানমাদুরাতে এসে আর একটি সম্প্রদায় কামরায় প্রবেশ ক'রে মিত্রশক্তির চাপ বৃদ্ধি করলেন। এঁদের সঙ্গে ছিল কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ আর এক ডজন শিশু। প্রথমে

এই সম্প্রদায়ের আগমণে অস্বস্তিবোধ করেছিলাম কিন্তু পরে তাঁদের সাহচর্যে শিশুদলের আনন্দ কোলাহল ও শিশুসুলভ ব্যবহারে আনন্দিত হয়েছিলাম। অতি সামান্য সময়ের মধ্যে তাঁরা আমাদের আত্মীয়তায় পরিগণিত করেন। এঁরা নামলেন রামেশ্বরের প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পূর্বে রামনাথপুরমে। এটি একটি সমৃদ্ধ নগর। রামেশ্বরের সদর আদালত। রাজবাটী ও কয়েকটি মন্দির এ স্থানের আকর্ষণীয় দর্শন বস্তু। রামনাথপুরম ষ্টেশনে এসে পুরুষ ও মহিলারা তাঁদের আলয়ে কয়েকদিন অবস্থান ক'রে রাজবাড়ী ও মন্দির দেখে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। বিশেষ বিপদে পড়লাম শিশুদের আচরণে। তারা অনুরোধ ও প্রার্থনায় আমাদের কামরা থেকে নামাতে অকৃতকার্য হয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কান্না সুরু করলে। শেষ পর্যন্ত কৌতুক বিষাদে পরিণত হ'ল। বহু প্রকারে তাদের সান্তনা দিলাম কিন্তু অন্তরে একটা দাগ থেকে গেল যা বিলীন হতে বেশ সময় লেগেছিল। বিস্ময়ের বিষয় উভয় পক্ষই পরস্পরের ভাষা অবধারণে অক্ষম।

রামনাথপুরমে এঁদের বিদায় দিয়ে দুই একটি ষ্টেশনের পর আমরা এসে হাজির হলাম মানদাপাম ষ্টেশনে। পরের ষ্টেশন পানবাম। এই দুইটি ষ্টেশনের মধ্যভাগে এক সেতু-পথ। যে সেতুর পৌরাণিক নাম সেতুবন্ধ। তার পরেই হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ বা চারধামের এক ধাম রামেশ্বর তীর্থ। এরূপ সমুদ্র প্রণালীর উপর সেতু ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। পানবাম থেকে ট্রেন ছাড়তে আমরা সেতু দর্শনের আগ্রহে গা-ঝাড়া দিয়ে বসলাম। ট্রেন মন্থর গতিতে সেতু-পথ অতিক্রম করতে লাগল। একবার দক্ষিণে একবার বাম গবাক্ষে গিয়ে সমুদ্র দৃশ্য ও সেতু-পথ নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। উভয় দিকেই অদূরে বিশাল সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নিম্ন দিকে সেতুর দিকে চেয়ে দেখলাম নীল জলরাশি। তরঙ্গের উদ্দীপনা নেই। ট্রেন থেকে যতটুকু লক্ষ্য হয় দেখলাম অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ড সমুদ্র বারিতে গলা পর্যন্ত নিমগ্ন ক'রে সেতুর দিকে চেয়ে আছে। দেখে মনে হয় শৈলখণ্ডগুলি শৈবালে আবৃত। সেতুর উপর রেল-পথের উভয় পার্শ্বে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই।

শুনলাম পুরাতন সেতুটি উনিশ'শ চৌষট্টি সালে প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগে ধ্বংস হয়। এটি সুদৃঢ় ও সমুদ্র বক্ষ থেকে কিছু উচ্চে নির্মিত হয়েছে। স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তার জন্য কিছু মাত্র আস্থাবান হতে পারলাম না। ট্রেন ধীর গতিতে সেতু অতিক্রম ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কয়েক বৎসর পূর্বে এই স্থান থেকে রামেশ্বর ও ধণুষ্কাডির দু'টি পৃথক লাইন ছিল। ধনুষ্কাডির যে পথটি ধ্বংস হয়েছে তার পুনঃসংস্কার আজ পর্যন্ত হয় নি, ভবিষ্যতে হবে কিংবা কতদিনে হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

পানবামে ট্রেন উপস্থিত মাত্র রামেশ্বর তীর্থের পাণ্ডা কিংবা পাণ্ডাদের ছড়িদার যাত্রী সংগ্রহের জন্য হাজির হলেন। এক একটি যাত্রীদলকে দশ-বারোটি পাণ্ডা কিংবা পাণ্ডার ছড়িদাররা ঘিরে ফেললেন। সকলেই অতি দরদী। যাত্রীদের উপযুক্ত বাসস্থান ও সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার জন্য বিশেষ আগ্রহী। বাক-পটুতায় সকলেই সমান দক্ষ। কয়েকজন পাণ্ডার ছড়িদার আমাদের নিকট এসে নানারূপ হিতোপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন।

তাঁদের বললাম—আমাদের জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নেই। আমাদের পৈতৃক পাণ্ডা গঙ্গাধর পিতাম্বর দশ পুত্র। (এ নামটি আমি কয়েকঘণ্টা পূর্বে রামনাথপুরমের সহযাত্রীদের নিকট জেনেছিলাম।)

নাম শ্রবণ মাত্র তাঁরা বিমর্ষ বদনে সরে গেলেন। এক শীর্ণকায় খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণ সহাস্য বদনে আমাদের সম্মুখে এসে নমস্কার ক'রে বললেন—আমি গঙ্গাধর পিতাম্বর পাণ্ডার ছড়িদার। কোন চিন্তা নেই। আমি তাঁর নিকট আপনাদের পৌঁছে দেব।

গৃহিণী আনন্দিত হয়ে তাঁকে বললেন—আমরা রামেশ্বরের কৃপায় শিবরাত্রির সময় এ স্থানে এসেছি। শিবরাত্রি পর্যন্ত আমাদের ঠাঁই ক'রে দিতে হবে।

ছড়িদার গৃহিণীর মুখের বাণী কেড়ে নিয়ে বললেন—নিশ্চয় মা, শিবরাত্রি এখানে দেখবেন বইকি। শিবরাত্রির আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকী। আপনাদের কোন চিন্তা নেই। আমি সব রকম ব্যবস্থা ক'রে দেব।

রামেশ্বরম ষ্টেশনে পৌঁছান মাত্র ছড়িদার যত্ন পূর্বক আমাদের মালপত্র ট্রেন থেকে নামিয়ে একটি ঝটকায় তুলে বললেন—আপনাদের কোন স্থানে

থাকার অভিরুচি বলুন? দেবস্থান রেষ্ট-হাউস আছে, ভাড়া সুবিধা। দৈনিক দু'টাকা থেকে দশ টাকা।

তাঁকে বললাম—প্রভু, দেবস্থানে আমাদের স্থান দেবেন না। যদি কোন ধর্মশালায় ব্যবস্থা করতে পারেন সেই চেষ্টা করুন।

ছড়িদার হেসে বললেন—আমাদের পাণ্ডার সুন্দর ধর্মশালা আছে। সেই স্থানেই ব্যবস্থা হবে।

রামেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে একটি বাটীর সম্মুখে এসে আমাদের ঝটকা থামিয়ে বললেন—এই ধর্মশালা। ভিতরে গিয়ে দেখে অসুন। এ স্থানে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।

রামেশ্বরে শিবরাত্রি একটি প্রধান পর্ব। এই উপলক্ষ্যে এস্থানে ধর্মশালা, যাত্রীনিবাস ও দেবস্থানের রেষ্ট-হাউসগুলি সাধ্যমত মেরামত করা হয়। পাণ্ডা মহাশয়ের বাটী ও ধর্মশালা সম্প্রতি মেরামত হয়েছে। ধর্মশালার কক্ষগুলি ক্ষুদ্র ও গবাক্ষহীন। জলের ব্যবস্থা রাস্তার সরকারী কল। শৌচাগারের ব্যবস্থা ভাল নয়। এরূপ স্থানে দশ-বারো দিন অবস্থান যে আরামদায়ক নয়, তা দর্শন মাত্রেই উপলব্ধি করলাম।

ছড়িদারকে বললাম—আমি পাণ্ডা মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করি। তাঁর বাস-ভবন কত দূর?

নিকটেই তাঁর বাস-ভবন। আমাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিকটে গেলেন। পাণ্ডা মহাশয়ের সাক্ষাৎ পেলাম। এক গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তাঁকে নমস্কার জানিয়ে তাঁর ভবনে একটি কামরা প্রার্থনা করলাম। তিনি সহজেই রাজী হলেন। আমাদের জন্য একটি হলঘর ও রন্ধনের জন্য একটি ছোট কামরা দিলেন। পানীয় জল ও শৌচাগারের সু-ব্যবস্থা আছে। ভাড়া ব্যবস্থা করলাম দৈনিক দেড় মুদ্রা।

এখন উপলব্ধি করলাম। ভগবান রামেশ্বর সত্যই আমাদের প্রতি কৃপা করলেন। আমরা দশ দিন পাণ্ডা মহাশয়ের ভবনেই ছিলাম। যতটুকু আশা করেছিলাম তার অধিক সুখ-সুবিধা আমরা উপভোগ করেছি।

পাণ্ডা ভবনের হল্ ঘরটির একদিকে শয্যা রচনা করলাম। সম্মুখের ছোট ঘরে, রন্ধনের তৈজস ও দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবস্থা ক'রে দশ দিনের মত সংসার

পেতে নিশ্চিন্ত হলাম। পাণ্ডা মহাশয় বলেছিলেন প্রতি শিবরাত্রির মেলার সময় বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যদি আবশ্যক হয় দুই এক দিনের জন্য হল্ ঘরটি ছেড়ে দিয়ে ঐ ছোট ঘরে আপনাদের রাত্রি যাপন করতে হবে। আমরা আনন্দে স্বীকৃত হয়েছিলাম। রামেশ্বরের কৃপায় কিংবা আমাদের ভাগ্য বলে এবার সেরূপ যাত্রী সমাগম হয় নি। আমরা শান্তিতেই দশ দিন কাটিয়েছিলাম।

পাণ্ডা ভবন থেকে বেরিয়ে পড়লাম সহরটি দেখার ইচ্ছায়। পাণ্ডা ভবনের সম্মুখের প্রধান রাস্তার বিপরীত দিকে দেখলাম একটি ছোট মিষ্টান্নের দোকান ও তার সঙ্গে অতি সাধারণ রুটির হোটেল। মিষ্টান্নের খরিদ্দার অভাবে আলমারির মধ্যে থালায় রক্ষিত দ্রব্যগুলি শুস্ক ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। দোকানের মধ্যে কয়েকজন ডাল-রুটির খরিদ্দারকে দেখলাম। দোকান মালিক গুজরাটী ব্রাহ্মণ। গৃহিণী প্রস্তাব করলেন—রাত্রের আহারের জন্য অন্যত্র না গিয়ে এই স্থানেই ব্যবস্থা করা উচিত।

ব্রাহ্মণকে সে কথা জানাতে তিনি আনন্দিত হয়ে আমাদের আহারের সু-ব্যবস্থা ক'রে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমরা কিছু অগ্রিম দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি জানিয়ে দিলেন সন্ধ্যার কিছু পরেই তাঁর দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয় সুতরাং তৎপূর্বে আমাদের আহার সমাধা করতে হবে। আমরা স্বীকৃত হয়ে দোকানের বাহিরে এলাম।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে রামেশ্বর ধাম জরীপ ক'রে ফেললাম। ষ্টেশন থেকে দক্ষিণ দিকের রাস্তাটি এসে মন্দিরের নিকট প্রধান রাস্তায় মিলেছে। মন্দির দ্বারের গোপুরমের সম্মুখে রাস্তাটি একমাত্র সহরের প্রধান পথ। এই পথটি পশ্চিম দিকে কিছু দূর চলে গেছে সহরের বুক চিরে। পরে দেখেছিলাম এদিকে দেবালয় ও কয়েকটি পুস্করিণী কিংবা কুণ্ড আছে তীর্থ যাত্রীরা সেদিকে যান দর্শনে বা স্নানে। মন্দিরের উত্তর দিকে পুরাতন পল্লী ও শেষ প্রান্তে আছে একটি বিশেষ দেবালয় এর নাম রামজুরকা। মন্দিরের পূর্বে ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি দিগন্তে ভেসে চলেছে।

আমাদের পাণ্ডা ভবনের পূর্ব দিকে এক ফার্লং দূরে মন্দির। সেই

দিকে গেলাম। মন্দিরের নিকটবর্তী পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ তৈজসের দোকান।

আমরা আজ অপরাহ্ণে মন্দির মধ্যে না গিয়ে মন্দির সীমানার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ ক'রে দেখলাম। এমন বিরাট মন্দির সীমানা ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখি নি। মনে হয় একবার মন্দির সীমানা প্রদক্ষিণ করলে এক মাইল পথ বিচরণ করা হবে। মন্দিরের পশ্চিমে গোপুরমের সম্মুখে দোকান ও কয়েকটি ভবন। দক্ষিণ দিকে দেবস্থান রেষ্ট-হাউস, লজ্, জৈন ধর্মশালা ও অনুরূপ যাত্রী নিবাস। পূর্বে মন্দির সংক্রান্ত কয়েকটি কার্যালয় ভবন মন্দিরের শোভাযাত্রায় আসবাবের ও রথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা আছে। তার পরেই সমুদ্র। এই সমুদ্রতীরে শঙ্কর মঠ ও ভদ্রকালীর মন্দির। উত্তরে দেবস্থান রেষ্ট-হাউস প্রভৃতি ভবন।

সহরে সাধারণ যান-বাহন কয়েকখানি ঝটকা ও সামান্য কয়েকটি সাইকেল-রিক্সা ব্যতীত অন্য কোন যান নেই। বাস, ট্যাক্সি একেবারেই নেই। আর প্রয়োজনই বা কি। একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের পরিধি মাত্র সামান্য কয়েক মাইল। এর জন্য দূর-দূরান্তর কোন স্থানে যাওয়ার আবশ্যক হয় না। একমাত্র ষ্টেশন যাওয়ার জন্য সাইকেল-রিক্সা কিংবা ঝটকাই যথেষ্ট।

গৃহিণী সতর্ক ক'রে বললেন—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আজ আর পথে ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। রুটির দোকানে টাকা জমা দিয়ে এসেছ সে হয়তো এতক্ষণ ঝাঁপ বন্ধ ক'রে সরে পড়েছে।

দোকানে এসে দেখলাম ব্রাহ্মণ দোকানের সম্মুখ ভাগ অর্ধাবৃত ক'রে আমাদের জন্য প্রতীক্ষায় আছেন।

এঁর দোকানে আহারে পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম। ইচ্ছা করেছিলাম রামেশ্বরে যে কয়দিন অবস্থান করব অন্ততঃ রাত্রের আহার এঁর দোকানেই সমাধা করব। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যার পূর্বাহ্নে দোকান বন্ধ হওয়ায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।

পরদিন প্রাতে গেলাম মন্দির দর্শনে। পথিমধ্যে ষ্টেশন রোডের সংযোগস্থলে সবজি বাজার। বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোন ষ্টল নেই। পথের পার্শ্বে কয়েকটি দোকানে আলু, কুমড়া, প্রভৃতি কয়েক

প্রকার আনাজ। অধিকাংশ সবজির দোকান রাস্তার উভয় পার্শ্বে নিয়ে বসেছে। স্ত্রীলোক দোকানদার সহরতলি থেকে এসকল দ্রব্যাদি এনে এস্থানে বিক্রয় ক'রে যায়। পেঁপে, কলা ও প্রচুর ডাব বিক্রয়ের জন্য রেখেছে। দুধ-দইয়ের পশরাও আছে। হাঁসের ডিমও দেখলাম। পরে দেখেছিলাম সকালের অপেক্ষা বৈকালে বাজার জমকাল হয়। ফুটপাথের পাশে কয়েকটি লোক তালরসের কলসি নিয়ে বসেছে। ক্রেতাও দেখলাম। তালবৃন্তের পাত্রে ফুটপাথে বসেই রসপান করছে। এগুলি তাড়ি নয়। মিষ্ট রস।

সহরতলি থেকে সবজি, দুধ-দইয়ের পশরা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফেরি করতে দেখেছি। আমাদের পাণ্ডা ভবনের দ্বারেও এই সকল দ্রব্য বিক্রয়ে আসে। মূল্য সুবিধা। দই খুচরা বিক্রয় করে না। দু'কিলো পরিমাণ এক হাঁড়ি দই নিতে হবে। বাজার দেখে গেলাম গোপুরমের সন্নিকট। প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ গোপুরমের নিম্নে মন্দির সীমানার প্রবেশদ্বার। দুর্গের মত লৌহদ্বার। প্রতিদিন রাত্রে এই দ্বার বন্ধ করা হয় ও প্রত্যূষে সাধারণের প্রবেশের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। গোপুরম গাত্রে দেব-দেবীর মূর্তি ও শিল্প-কলা এ দেশীয় অন্যান্য মন্দিরের অনুরূপ।

মন্দির সীমানায় প্রবেশ ক'রে দেখলাম অন্যান্য মন্দিরের মত মূল মন্দিরের চতুর্দিকে মুক্ত প্রাঙ্গণ নেই। নাটমন্দিরের দীর্ঘ পথের দুই পার্শ্বে পাঁচ ফুট বারান্দার উপর বৃহদাকার স্তম্ভের শ্রেণী। প্রতি স্তম্ভের উপরিভাগে একটি প্রস্তর নির্মিত বিরাট গজ-মুণ্ড। তাদের শুণ্ড স্তম্ভের নিম্নভাগ পর্যন্ত লম্বায়মান। ঠিক যেন বারান্দার দুই পার্শ্বে ঐরাবতেরা, তাদের মস্তকে নাটমন্দিরের ছাদটি রক্ষা করছে।

মন্দির সীমানায় প্রবেশ ক'রে মনে হয় যেন কোন বাজারে প্রবেশ করলাম। নাটমন্দিরের উভয় পার্শ্বে বারান্দায় নানাবিধ দ্রব্যের দোকান। শঙ্খ, চুড়ি, শিশুদের খেলনা, মন্দির ও বিগ্রহের চিত্র। তালবৃন্তে নির্মিত টুপি, ভ্যানিটি ব্যাগ প্রভৃতি দ্রব্যের দোকান। শ্রেণীবদ্ধ দোকানগুলি দেখে এলাম এদিকের সীমান্তে। পূর্বদিকের গোপুরম দ্বারে এসে দেখলাম এই দ্বারটি মন্দির সীমানার প্রধান প্রবেশ পথ। দ্বারের বাম-ভাগে একটি

বিচিত্র কারুকার্যে পূর্ণ স্তম্ভবিশিষ্ট সুসজ্জিত হল্। এ স্থানটিতে প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্গীত-বাদ্য হয়ে থাকে। এই হলের স্তম্ভগুলির নির্মাণে একটি বিশেষত্ব আছে যা অন্যত্র দেখি নি। প্রতি স্তম্ভে গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত পুরুষ ও নারীর নানা ভঙ্গিমার মূর্তি। কোন স্তম্ভের গাত্রে স্বাস্থ্যবান পুরুষ মূর্তি নারী স্কন্ধে নৃত্য করছেন। অন্য স্তম্ভে অনুরূপ স্বাস্থ্যবতী নারী পুরুষ স্কন্ধে নৃত্যরতা। মূর্তিগুলি নানা বর্ণে রঞ্জিত আছে। একপাশে বাদ্য-যন্ত্র ও তানপুরা দেখলাম। গায়কের বেদীর সম্মুখে শ্রোতাদের আসনের ব্যবস্থা আছে। আমরা কয়েকদিন সন্ধ্যার পর এসে সঙ্গীত-বাদ্য উপভোগ ক'রে গেছি। সেদিক থেকে এসে দ্বিতীয় মহলের দ্বারে দেখলাম একদা স্বামী বিবেকানন্দ রামেশ্বর দর্শনে এসে স্বহস্তে লিখে একটি প্রশংসা-পত্র দিয়েছিলেন। অবশ্য ইংরাজীতে। সেটি মর্মরে প্রতিলিপি নির্মাণ ক'রে সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে। তার অনুবাদ—"আমি মন্দিরের পুরোহিত এবং কর্তৃপক্ষের বিনীত ও ভদ্র ব্যবহারে অতি আনন্দ পেলাম।" তিনি সাক্ষর করেছেন বিবেকানন্দ নামে। দ্বিতীয় মহলে মূল মন্দিরের সম্মুখে বৃহদাকার নন্দীর (ষণ্ডের) মূর্তি। যেমন দেখে এলাম তাঞ্জোরের শঙ্কর মন্দিরের সম্মুখে। সেটির বর্ণ কাল, এটি শ্বেত বর্ণের। ললাটে ও পদ চতুষ্টয়ে ভক্তেরা সিন্দুর চর্চিত ক'রে পুষ্প দিয়ে পূজা ক'রে গেছেন। এরই সম্মুখে মূল মন্দিরে আছেন রামেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ মূর্তি।

এই মন্দিরের দক্ষিণ-ভাগে পার্বতী মন্দির। গৃহিণী পূর্ব গোপুরম দ্বারে এসে পূজার দ্রব্য ও কিছু ফুল এনে প্রথমে রামেশ্বর মন্দিরে ও পরে পার্বতী মন্দিরে পূজা দিলেন।

এদিকে আর একটি মন্দিরে লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি দেখলাম। মন্দির সীমানার মধ্যে আরও যে সব আকর্ষণীয় বিষয়-বস্তু আছে সেগুলি পরে উল্লেখ করব। এখন আমরা পূর্ব গোপুরম্ অতিক্রম ক'রে পাণ্ডা ভবনে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করলাম। মন্দির সীমানায় পূর্ব দিকে দেবস্থান রেষ্ট-হাউস কার্যালয়টি দেখলাম। ফেরার পথে দেখলাম এই মন্দিরের দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বের দু'টি গোপুরম্ ভূমিস্মাৎ হয়ে আছে। বহু ভাস্কর ও কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে এ দু'টি দেউলের সংস্কার কার্যে।

মন্দিরের সন্নিকটে একটি দোকানে ডাব ও দই কিনলাম। দোকানদার এক সুশ্রী যুবতী। সুন্দর বাঙ্গলা বলে। দই ক্রয়ের জন্য কোন পাত্র আমাদের সঙ্গে ছিল না। তিনি তাঁর ঘর থেকে একটি পাত্রে দধি দিয়ে সময় মত পাত্রটি প্রত্যার্পণের অনুরোধ করলেন।

মধ্যাহ্নে বিশ্রাম না ক'রে গেলাম ষ্টেশনের দিকে। বাড়ীর পত্রের আশায়। পদব্রজেই গেলাম। পথের বাম দিকে সমুদ্রের কিনারায় একখানি জাহাজ দেখে গৃহিণী বললেন—এই জাহাজ বোধহয় ধনুস্কাডি যাবে। এখন রেলরাস্তা নেই, লোকে জাহাজে ধনুস্কাডি যায়। চল না, একদিন ধনুস্কাডি দেখে আসি।

বললাম—ধনুস্কাডি যাওয়ার জন্য কোন জাহাজ নেই। ও জাহাজ যায় লঙ্কাদ্বীপ।

তিনি বললেন—চল না লঙ্কা গিয়ে রাবণ রাজার বাড়ী দেখে আসি।

বললাম - লঙ্কা যেতে হলে ভারত সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

ব্রাহ্মণী বললেন—অনুমতি নিতে হবে না ছাই। জাহাজ ভাড়ার খরচের ভয়ে যাওয়ার ইচ্ছা নেই। সীতার অশোক বনটা দেখা উচিত।

বললাম—অশোকবন কেটে এখন লঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি বন্দর নায়কের প্রাসাদ তৈরী হয়েছে। জাহাজ ভাড়ার ভয় যত না হোক, ভয় সেই রাবণের। রাবণেরা চিরদিন অমর হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছে, সীতা-হরণ হচ্ছে দিনে দুপুরে। ওদিকে পা না বাড়ানই ভালো।

উনি আর কোন জবাব দিলেন না। জাহাজের মাস্তুলের দিকে ফিরে ফিরে দেখতে দেখতে চললেন।

ষ্টেশনে গিয়ে দু'খানি পত্র পেলাম। ষ্টেশনে বসে পত্রের উত্তর লিখে ডাকে দিয়ে ফিরলাম।

ফেরার পথে এবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল বন্দরের দিকে। ষ্টেশন পথ ছেড়ে বন্দর পথের দিকে এলাম। এদিকে কয়েক ঘর শ্রমিক শ্রেণী লোকের বাস। মনে হয় এরা জাহাজে কিংবা বন্দরে কর্ম করে।

জনৈক শ্রমিক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানলাম—ধনুস্কাডি ধ্বংশের পর কলম্বের জাহাজ রামেশ্বরের এই বন্দর থেকে যাতায়াত করে।

প্রতি সোমবার কলম্বের জাহাজ এখানে আসে। কলম্বো রওনা হয় প্রতি শুক্রবারে।

তাকে প্রশ্ন করলাম—কলম্বো যাওয়ার কোন সুবিধা এস্থান থেকে হতে পারে?

সে বললে—জাহাজে যেতে হলে পাশপোর্ট ভিসা আপনাকে নিতেই হবে, সে অনেক হাঙ্গামা। পাশপোর্ট এখানে দেওয়া হয় না। মাদ্রাজ থেকে নিতে হবে। আপনারা কলকাতা থেকেও নিয়ে আসতে পারতেন। তারপর সে হেসে নিম্নস্বরে বললে, আমাকে যদি ভাল বখসিস্ দেন বিনা পাশপোর্টে আমি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।

বললাম—সেই ব্যবস্থাই ভাল। জাহাজ ছাড়ার পূর্বে আমরা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

সে বললে—আমার নাম সুলতান। তারপর একটি বাটীর দ্বারে একটি কৃষ্ণাঙ্গীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে বললে, এই বাড়ীতে গিয়ে ওকে বললেই আমাকে ডেকে দেবে।

তার নিকট থেকে ফিরে ইচ্ছা করলাম জাহাজটি একবার দেখে যাই। অদূরে দেখতে পেলাম জাহাজ আরোহণের জেটীর ফটক। পিছন ফিরে গৃহিণীকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম তিনি এক মহিলার সঙ্গে আলাপে ব্যাপৃতা। কিছুক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করলাম কিন্তু তিনি মহিলাকে ত্যাগ ক'রে না এসে আমাকে সঙ্কেত ক'রে ডাকলেন। নিকটে যেতে গৃহিণী বললেন—ইনি এসেছেন কালনা থেকে। সেখানকার মেয়ে স্কুলের টিচার। শিবরাত্রি পর্যন্ত রামেশ্বরে থাকবেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। মহিলা অবিবাহিতা। একাই এসেছেন। রামেশ্বরে কয়েকদিন থাকবেন। হয়তো এরপর মাদুরা কি কন্যাকুমারীও যেতে পারেন। বেশ ফিটফাট, গল্প প্রিয়। নাম শিবাণী রায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এদিকে কি কোন কাজে এসেছেন?

শিবাণী বললেন—কাজ আমার কিছু নেই। এদিকে এলাম বন্দরে জাহাজ দেখার ইচ্ছায়।

বললাম—আমাদেরও সেই ইচ্ছা। চলুন এক সঙ্গেই যাই। শিবাণী প্রশ্ন করলেন—ধমুস্কাডির রেলপথ এখন আর নেই। নৌকাতে যাওয়া যায় না ?

বললাম—এই সমুদ্রে নৌকাযোগে যাওয়া সহজ সাধ্য নয়। কাকেও যেতে শুনি নি। আপনার বোধহয় ধমুস্কাডি যাওয়ার অত্যন্ত আগ্রহ ?

শিবাণী বললেন—আমার সে আগ্রহ নেই। রামেশ্বর দর্শন ভাগ্যে ঘটেছে এইটুকুই যথেষ্ট। আমাদের রেষ্ট-হাউসের এক ভদ্রমহিলার বিশেষ আগ্রহ। তাঁরই অনুরোধে আমি সংবাদ নিতে এসেছি।

গৃহিণী বললেন—তিনি কি আপনার নিকট থাকেন, কালনা থেকে এসেছেন বোধহয় ?

শিবাণী বললেন—আমার সঙ্গে আসেন নি, আমার আসার কয়েকদিন পূর্বেই এসেছেন। কোথা থেকে এসেছেন ঠিক জানি না, আমার রুমেও থাকেন না। ভদ্রমহিলা যেন একটা হেঁয়ালী।

গৃহিণী বললেন—সে আবার কি ?

শিবাণী বললেন—আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম এক রুমে থাকতে। রাজী হন নি। আমি রান্না ক'রে তাঁকে খেতে অনুরোধ করেছি, খান নি। যা অনুরোধ করবেন তাতে রাজি হবেন না। তাঁর যা অভিরুচি হবে, তাই করবেন। হাতে টাকা আছে যথেষ্ট। ইচ্ছা হলে খাবেন, উপবাস করতেও পটু।

কথায় কথায় জেটীর ফটকে এসে দেখলাম ফটকে তালাবন্ধ। ভিতরে এক ভদ্রলোককে দেখে আমাদের ইচ্ছা জানালাম। তিনি জানালেন—পোর্ট কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। বাধ্য হয়ে সকলে ফিরলাম।

পথে এসে গৃহিণী প্রশ্ন করলেন—যে মেয়েটি আপনাদের রেষ্ট-হাউসে থাকে, সেও কি অবিবাহিতা ?

শিবাণী বললেন—সে কথাও সঠিক বলতে পারলাম না। বাঙ্গালী সধবার চিহ্ন সিঁদুর ব্যবহার করতে দেখি নি। অধিকাংশ সময় যপ-তপ নিয়ে থাকেন। চমৎকার চেহারা। বেশ শিক্ষিতা বলে মনে হয়। হাসতেও

যেমন, আবার গম্ভীর মৌণী হয়ে থাকতেও পারেন বেশ।

গৃহিণী বললেন—তার নাম কি ঘেঁটু ?

শিবাণী আশ্চর্য হয়ে বললেন—তাঁর ঐ ডাকনাম বলেছিলেন। ভাল নাম জানি না। উনি কি আপনাদের পরিচিতা, কোন আত্মীয়া ?

গৃহিণী তাঁকে বললেন—আত্মীয় আমাদের নয়। পথেই তাকে পেয়েছিলাম। তাকে দেখলেই করুণা হয়, স্নেহের বসে তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু ধরা সে কাকেও দিতে রাজী নয়।

কথায় কথায় মন্দির পথের কেন্দ্রস্থলে এলাম। শিবাণী গেলেন তাঁদের রেষ্ট-হাউসে, আমরা পাণ্ডা ভবনে ফিরলাম।

গৃহিণীকে বললাম—ভদ্রমহিলার প্রকৃতি বেশ সহজ সরল। মনে কোন আবিলতা নেই। অনর্গল কথা বলতে ক্লান্তি নেই। যত কথা বলে তার বেশী হাসে।

গৃহিণী বললেন—বাপ, মাষ্টারনী যা বকে মাথা ধরে গেল।

বললাম —একটু চায়ের ব্যবস্থা কর চায়ে চিনির পরিমাণ বেশী হলেই মাথা ঠাণ্ডা হবে।

চা-পানের পর গৃহিণী বললেন—ঘরে তালা দাও। এখনি একবার মাষ্টারনীদের বাসায় গিয়ে দেখতে হবে ও হতভাগী কেমন আছে কি করছে।

গৃহিণীর ইচ্ছায় শিবাণীদের রেষ্ট-হাউসের অন্বেষণে বাহির হলাম। মন্দিরের নিকট এসে বাধা পেলাম এক ঝটকাওয়ালার দ্বারা। আমাদের হিতোপদেশ দিলে আপনাদের অতি সৌভাগ্য আজ এসেছেন রামেশ্বরে। আজ প্রাতে শোভাযাত্রা ক'রে রামেশ্বরের ভগবান গেছেন রামজোরোকায়। বৎসরে এসময় একটি দিন তিনি রামজোরোকায় থেকে আজই রাত্রে চলে আসবেন মন্দিরে। আজ ভগবানকে রামজোরোকায় দর্শন মহাপুণ্য। শিবরাত্রের কয়েকদিন পূর্ব থেকে প্রতি সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা ক'রে রামেশ্বরে ভগবান সহরের বিভিন্নস্থানে অধিষ্টিত হয়ে পূজা গ্রহণ করেন। এ সকল শোভাযাত্রা আমরা এই কয়েকদিন প্রত্যহ দেখেছি। প্রকৃত রামেশ্বরের লিঙ্গমূর্তি স্থানান্তরিত ক'রে নিয়ে যায় না। যাওয়া সম্ভবও নয়। কয়েকটি

বিগ্রহ মূর্তি নিয়ে হয় এই শোভাযাত্রা।

গৃহিণী ঝটকাওয়ালার পরামর্শে আনন্দিত হয়ে বললেন—চল না গো লোকটা বেশ ভাল দেখছি। আজ রামজোরোকায় রামেশ্বর দর্শন হবে সত্যই ভাগ্যের কথা। এর গাড়িতেই যাওয়া ভাল। ভাড়া চাইছে দু'টাকা।

আমি ঝটকাচালককে বললাম—বাপধন, আমাদের উপরে তোমার এত কৃপা ভাড়াটা এক টাকা নিয়ে গরীবকে রেহাই দাও।

ঝটকাচালক বললে—বাবুজী, দিনকাল বড় মাঙ্গা। ঘোড়ার খরচ পড়ে দৈনিক দু'টাকা আমি সেইটেই চেয়েছি। পরিশেষে দেড় টাকায় রফা ক'রে তার ঝটকায় উঠলাম।

ঝট ক'রে ঝটকা গিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই রামজোরোকায় হাজির হ'ল। আমার ভক্তটি বললে—এসে গেছি বাবু ঝট ক'রে দেখে আসুন। আমাকে আরও সোয়ারীর চেষ্টা দেখতে হবে। দেড় টাকায় তো পেট ভরবে না।

ভক্ত ঝটকাচালককে বললাম—এক ঝটকায় আমার কর্ণ মর্দন ক'রে আধ মাইল পথ এনে দেড় টাকা আদায় করলে। কয় ঝটকায় তোমার ক্ষুধা মিটবে শ্রীরামচন্দ্র জানেন। এটুকু পথ আমরা অনায়াসে পায়ে চলেই আসতে পারতাম।

গৃহিণী বললেন—তীর্থস্থানে ঝগড়ার দরকার নেই। ঝটকাচালককে বললেন, বাবা মন্দিরে লাইন হয়েছে আমরা পূর্বে কখনও আসি নি ভাল করে দেখে যাই। তুমি কষ্ট ক'রে একটু অপেক্ষা কর। আমরা অযথা বিলম্ব করব না।

একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর এক সাধারণ মন্দির। সেই মন্দিরটি রাম-জোরোকা নামে খ্যাত। পৌরাণিক আখ্যান শুনলাম—শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের পর এই স্থানে এসে বিশ্রাম করেন। এই কারণে এর নাম হয় রামজোরোকা। আজ বিশেষ উৎসবে মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রীপূর্ণ হয়েছে। মন্দিরের বারান্দায় এসে দেখলাম অভ্যন্তরে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা দেবীর মূর্তি। ভক্ত মহাবীরও আছেন। ছায়াসম অনুগামী পরম সুহৃদ ভ্রাতা

লক্ষণের মূর্তি এ মন্দিরে স্থান পায় নি। বিগ্রহ দর্শন ও পূজার পর পার্শ্বের সোপান বেয়ে দ্বিতলের বারান্দায় উঠলাম। লক্ষ্য করলাম এইস্থান থেকে সমগ্র রামেশ্বর সহরটি ও রামেশ্বর দ্বীপের অধিকাংশ স্থান বেশ লক্ষ্য হয় এই টুকুই রামজোরোকার বিশেষত্ব। আমরা দ্বিতলের বারান্দাগুলি পরিক্রমা ক'রে পশ্চাৎভাগে এসে দেখলাম আমাদের ঘেঁটু, শ্রীমা সারদামনির মত মৌণী হয়ে বসে আছে। ক্রোড়ে রেখেছে একটি সুপক্ক পেঁপে।

আমাদের অকস্মাৎ এস্থানে দেখে কোন বিস্ময় প্রকাশ না ক'রে বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে—কাকীমা, পেঁপেটা কটুন তো।

গৃহিণী হেসে বললেন—আশ্চর্য, আমরা যেন পেঁপের লোভে এখানে এসেছি। ও তুই রেখে দে পরে খাবি। তুই কবে রামেশ্বরে এসেছিস?

সে বললে—পাঁচ-ছ'দিন হ'ল এসেছি, আপনারা তো কাল এলেন।

গৃহিণী বললেন—কেমন ক'রে জানলি আমরা কাল এসেছি?

সে বললে—কাল বৈকালে পাণ্ডার বাড়ীতে বাক্স-বেডিং তুলছিলেন দেখেছি। আজ দুপুরে গিয়ে দেখলাম আপনাদের ঘরে তালাবন্ধ। তারপর এখানে চলে এলাম, পেঁপেটা কাটুন।

গৃহিণী বললেন—আমি কি তোর জন্য এখানে বঁটি নিয়ে এসেছি।

সে বললে - কাকামণির পকেটে ছুরি আছে।

আমার পকেটে সকল সময় একটি ছুরি থাকে, বুঝলাম সেটা তার অবিদিত নেই।

গৃহিণী তার পাশে বসে একবার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—খুব রোগা হয়ে গেছিস। তিরুপতির সেই সন্ন্যাসী তোর গুরুদেব তোকে আসবার অনুমতি দিলেন?

ঘেঁটু বললে—তিনি লছমনঝোলা গেছেন, বৈশাখে ফিরবেন। সেই সময় তিনি সাক্ষাৎ করতে বলে দিয়েছেন।

গৃহিণী বললেন—এতদিন সেইখানে ছিলি?

ঘেঁটু বললে—সেখান থেকে অনেকদিন চলে এসে ছিলাম তিরুবন্নমালাইয়ে, কৈলাশ পাহাড়ের পাশে। এক বাঙ্গালী মহিলার মঠে।

গৃহিণী বললেন—তার নাম কি কুমু?

ঘেঁটু আনন্দে আমাদের পানে চেয়ে বললে—আপনারা তাকে চেনেন? আমি বললাম—তাকে আমরা দেখেছি, ইচ্ছা সত্বেও বিশেষ মেলামেশা সম্ভব হয় নি। আমরাও তিরুবন্নমালাইয়ে ছিলাম মহর্ষি রমণ আশ্রমে। আশ্রমের আর একজন বাঙ্গালী শিষ্য আছেন তাঁর নাম মুখার্জ্জী। আমাদের শালখের লোক।

গৃহিণী পেঁপে কেটে বললেন—সে সব কথা পরে হবে। পেঁপে খেয়ে নাও।

রামজোরোকা দর্শনের পর ঘেঁটুকে সঙ্গে নিয়ে ঝটকায় উঠলাম। মন্দিরের পাশে এসে ঝটকা থেকে নেমে ঘেঁটু অনুরোধ করলে তাদের রেষ্ট-হাউসে যাওয়ার জন্য। এখানে সে এক চমৎকার দিদিমণি পেয়েছে, তাকে অতিশয় যত্ন করে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা।

গৃহিণী বললেন—কে দিদিমণি শিবাণী?

সে কৌতূহল নেত্রে চেয়ে রইল গৃহিণীর মুখের পানে।

গৃহিণী বললেন—আমরা তাকে চিনি। তোরা একই বাড়ীতে থাকিস তাও জানি। আমরা এখানে সমুদ্রতীর দেখি নি, আমরা এখন সেইখানেই অপেক্ষা করব। তুই শিবাণীকে সঙ্গে নিয়ে আয়।

মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে কয়েকখানি দেবস্থান রেষ্ট-হাউস ভবন। এই ভবনগুলির মধ্যে একটিতে শিবাণী ও ঘেঁটু স্থান নিয়েছে। আমরা ঘেঁটুকে তাদের রেষ্ট-হাউসে পৌঁছে দিয়ে মন্দিরের প্রধান দ্বার বা পূর্বদ্বারে এসে দেখলাম আজ সন্ধ্যায় শোভাযাত্রার তোড়জোড় চলেছে। দু'খানি রথ ও একটি চতুর্দোলায় ডায়নামো দিয়ে আলোক মালায় সজ্জিত হচ্ছে। আমরা ফটকের সম্মুখের পথ ধরে সামান্য দূর এসে সমুদ্রতীরে হাজির হলাম। পথের বাম-ভাগে শঙ্কর মঠ। মঠের পশ্চাতে সমুদ্রের কিনারায় ছোট মিনারের মত একটি গোলাকার দ্বিতল স্তম্ভ। মঠে প্রবেশ ক'রে দেখলাম কক্ষগুলির দেওয়ালে নানা দেব-দেবীর ও মনিষীগণের চিত্র। গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের চিত্রও দেখলাম। মঠের পশ্চাতে দ্বিতল স্তম্ভের গাত্রে শঙ্করাচার্যের জীবনের কয়েক প্রকার চিত্র।

পথের দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে ভদ্রকালীর মন্দির।৮ মন্দিরের চতুর্দিকে প্রশস্ত বারান্দা। আমরা সেই বারান্দার দিকে গিয়ে দেখলাম যেন

অকস্মাৎ আমরা বাঙলা দেশে এসে গেছি। পুরুষ ও মহিলা মিলে চব্বিশটি যাত্রীর একটি দল কয়েকদিন পূর্বে রামেশ্বরে এসেছেন। এঁরা কুম্ভ স্পেশাল কিংবা কোন তীর্থ স্পেশাল শ্রেণীর যাত্রী নন। এসেছেন সেথোর সাহায্যে।

এক শ্রেণীর লোক কলকাতা ও পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র গৃহস্থ লোক ও মহিলাদের নিয়ে যান নানা তীর্থস্থানে। এতে সেথোদের কিছু অর্থ উপার্জন হয়। এই সকল তীর্থ-বন্ধুদের অধিকাংশ অশিক্ষিত কিংবা অর্দ্ধ-শিক্ষিত কিন্তু এরা অতি কর্ম পটু। বিশেষ অভিজ্ঞ। সুগম বা দুর্গম তীর্থস্থানগুলির রাস্তাঘাট, বাসস্থান, যাতায়াতের ও সর্বপ্রকার ব্যায়ের হিসাব এদের নখদর্পনে।

আমরা এই তীর্থ-যাত্রীদের সংস্পর্শে এসে আনন্দিত হলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা মিশে গেলাম এই যাত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে। দুই একদিনের মধ্যে এঁদের সঙ্গে গল্পগুজবে নানা প্রদেশের তীর্থস্থান প্রভৃতির পরিচয় বর্ণনায় আমি যেন এ সম্প্রদায়ের কথকঠাকুরে পরিণত হয়েছিলাম।

প্রত্যহ অপরাহ্ণ চারটায় এসে দলের মধ্যভাগে স্থান দখল করতাম, সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত নানা আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হ'ত। এঁদের মধ্যে দু'জন পুরুষ আর কয়েকজন মহিলা আমাদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ষষ্ঠীদিদি, মোহিণী দিদি, নন্দর মা, বনমালী দাদা, দলুই মশায় প্রভৃতি। আর ছিল প্রধান ভক্ত, ভরতের দিদি ও লাখপতিয়া, ইনি বিহারী। পরিচয় না দিলে বিহারীর কোন চিহ্ন এঁর দেহে নেই। শ্যামবর্ণা, আঁট-সাঁট গঠন, বয়স চল্লিশের নীচে। কথা বলতে, হাসতে, দোকানে দরদাম ক'রে দ্রব্যাদি ক্রয় করতে সুনিপুনা। বিতণ্ডায় শ্রেষ্ঠ কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে অযথা কাহাকেও কোন কথা বলতে শুনি নি। হাস্য-পরিহাসে কলহের নিষ্পত্তি ক'রে কাজ হাসিল করতেন।

আজ সূর্য্যাস্তের পূর্বেই সভাভঙ্গ হ'ল। এঁদের পরিচালক ডাকতে এলেন রামজোরোকা যাওয়ার জন্য। আমরা শঙ্কর মন্দিরের নিকটে এসে দেখলাম ঘেঁটু ও শিবাণী অপেক্ষাকৃত নির্জনস্থান মনোনীত ক'রে মন্দিরের

সোপানে বসে হাস্য-পরিহাস করছে। এখন তাকে দেখলাম তার প্রকৃতির ভিন্ন রূপ। হাসির বেগে যেন ভেঙ্গে পড়ছে।

গৃহিণীকে দেখে বললে—শুনেছেন কাকীমা, দিদি রামেশ্বর সম্বন্ধে একখানা বই লিখবে?

শিবাণী বললেন—কেন, আমি কি লিখতে পারি না?

ঘেঁটু বললে—দিদিমণি তুমি লেখ তো আমি প্রকাশক হয়ে ছাপাব। দিদিমণির বইয়ে আমার নামটাও ছাপা হবে। কতদিনে লিখবে দিদিমণি?

শিবাণী বললেন—আমি যখন লিখব তখন তোর অস্তিত্ব থাকবে না। সামনের ফাল্গুনের সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর মাথায় লাঠি মেরে ঘেঁটু ভেঙ্গে, খোলাম কুঁচি ক'রে, রামেশ্বরের পথে বিছিয়ে দেব।

ঘেঁটু বললে—দিদিমণি, তোমার এত অনুগ্রহ। এই নশ্বর দেহকে রামেশ্বরের পথের ধূলায় মিশিয়ে দেবে। কি সৌভাগ্য আমার! এখন একটু পায়ের ধূলা দাও। শিবাণীর পদ স্পর্শ ক'রে নিজের মাথায় হাত দিলে।

শিবাণীর ও ঘেঁটুর অনুরোধে গেলাম ওদের রেষ্ট-হাউসে।

শিবাণীর কক্ষে দেখলাম সাধারণ শয্যা বিশিষ্ট একটি খাট। বেশ পরিস্কার পরিছন্ন। সূঁচের কাজ করা আবরণে আবৃত একটি ক্ষুদ্র টেবিল। টেবিলের উপর মাল্যশোভিত দু'টি ফটো ও একখানি গীতা। ফটো দু'খানির পরিচয় পেলাম, একখানি এর মাতৃদেবীর, অন্যটি গুরুদেবের। খাটের তলায় একটি ট্রাঙ্ক। এতদ্ব্যতীত সমস্ত কক্ষটির মেঝেয় রাখা হয়েছে রন্ধন-তৈজসপত্র। যথা—ষ্টোভ, কাপ-ডিস, ছোটবড় নানা আকারের টিনের কৌটা। দু'তিনটে বিভিন্ন আকারের ব্যাগ।

গৃহিণী কৌটাগুলির ও ব্যাগের অন্তরের পরিচয় নিলেন। কৌটাগুলিতে মশলা, পাঁপর, বড়ি, চা-চিনি, ভেলিগুড়, চিঁড়ে প্রভৃতি। ব্যাগগুলির মধ্যে চাল, ডাল, আটা, ময়দা প্রভৃতি। মেঝেয় একখানি কার্পেটের আসনও দেখলাম। সুদূর বিদেশে মাত্র একার জন্য এঁত দ্রব্য সঙ্গে লওয়ার তাৎপর্য বুঝলাম না। গৃহিণী সব দেখে শুনে বললেন—বাহাদুর মেয়ে বটে!

তারপর গেলাম ঘেঁটুর কক্ষে। শিবাণী আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘেঁটুর কক্ষে পৌঁছে দিয়ে গেল। তিন-চারখানি কামরার পরে পূর্বে ও দক্ষিণে বারান্দাযুক্ত একখানি কামরা। দ্বারের সামনা-সামনি একখানি খাট লম্বায়মান। বেডিংটি কোনরূপে বন্ধনমুক্ত হয়ে খাটের উপর স্থান পেয়েছে। খাটের পাশে একটি লেদার ট্রাঙ্ক, তার উপর কয়েকখানি পরিত্যক্ত শাড়ী, ব্লাউজ। দেওয়ালের হুকে আটকানো আছে একটি এয়ার ব্যাগ ও একটি থার্মফ্লাস্ক। শিবাণীর কক্ষের অনুরূপ একখানি টেবিলের উপর দু'টি উচ্ছিষ্ট চায়ের পাত্র ও এক বোতল জল আছে। টেবিলের পাশে একখানি লোহার চেয়ার। ঘেঁটু ক্ষিপ্রহস্তে শাড়ীর আঁচল দিয়ে চেয়ারটি মুছে আমাকে বসতে অনুরোধ করলে। গৃহিণী বিনা অনুরোধেই তার খাটের একপ্রান্তে বসলেন। পরক্ষণে ঘেঁটু এখনই আসছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শয্যার উপর উপাধানের পাশে দেখলাম কয়েকখানি পুরাতন ইংরাজী মাসিক পত্র আর দু'খানি হৃষ্টপুষ্ট ইংরাজী কেতাব। তন্মধ্যে একখানি শ্রীভাণ্ডারকর প্রণীত দাক্ষিণাত্যের পুরাতন ইতিহাস। অন্যখানি স্বামিজীর চিকাগোর বাণী। চিকাগোর বাণীটির ভিতরে নানাস্থানে পেনসিলে দাগ দেওয়া হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসেও সেইরূপ প্রতি পত্রে পেনসিলের দাগ, কোন কোন পত্রের পার্শ্বে পেনসিলে মন্তব্য লেখাও হয়েছে।

শিবাণী একখানি থালায় দু'কাপ চা আর দু'খানি ডিসে চিঁড়ে ভাজা নিয়ে টেবিলের উপর যত্নপূর্বক রেখে গৃহিণীকে বললেন—পাগলী কোথায় গেল ?

গৃহিণী বললেন—এখনি আসছি বলে কোথায় গেল। আমরা ভাবলাম হয়তো তোমার নিকটেই গেছে।

শিবাণী বললেন—আপনারা চা খান। সে এলে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। আমার নিকট চা খেতে সে কোনদিন আপত্তি করে নি। শিবাণী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আমি বললাম আমাদেরও কোন আপত্তি নেই, উপরন্তু সদ্য ঘিয়ে ভাজা চিঁড়ের ডিস যখন চায়ের সঙ্গে এসেছে।

গৃহিণী প্রথমে কাপ ধরে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন—না গো, চা ভালই করেছে। মিল্ক-পাউডারের নয়, এখানকার ভাল দুধে চা তৈরী করেছে। আমাদের খাওয়া শেষ হতেই ঘেঁটু ফিরে এল, তোয়ালে ঢাকা একটি ট্রে হাতে লজের এক ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে। ঘেঁটুর টেবিল থেকে চায়ের কাপ-ডিস ও জলের বোতল নামিয়ে রেখে ট্রেটি সেই স্থানে রাখা হ'ল। লজের ছোকরা প্রস্থান করলে, ট্রে সমেত টেবিলটি আমাদের সম্মুখে রেখে বলল—তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।

শিবাণী শাড়ী পরিবর্তন ক'রে ঘেঁটুর কক্ষে প্রবেশ ক'রে বললেন—এতক্ষণ ছিলি কোথায়? তারপর ট্রে-র দিকে লক্ষ্য পড়তে বললেন, কাকীমাদের খাওয়ার জন্য হোটেলে গিয়ে ঐ সব আনলি আমি তার পূর্বেই চা, চিঁড়ে ভাজা দিয়ে সম্মান রক্ষা করেছি। ঘেঁটুকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, তুই তৈরী হয়ে নে। মঠে যাব।

আমি ট্রে-র আবরণ উম্মোচণ ক'রে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দুইখানি বড় ডিসে এক একখানি বিরাট মশলা ধোসা। দু'টি প্লেটে দু'খানি ক'রে দই-বড়া, একটি বড় প্লেটে পকৌড়ী আর দু'প্লেট চালের পায়েস।

গৃহিণী রাগ ক'রে বললেন—আমরা এইমাত্র যা খেয়েছি তার বেশী আর কিছুই মুখে দিতে পারব না। এসব রেখে দাও রাত্রে খাবে। শেষ পর্যন্ত ঘেঁটুর ও শিবাণীর জুলুমে খেতে বাধ্য হলাম। তবে সকলে ভাগাভাগি ক'রে সেগুলিকে উদ্ধার করা হ'ল। তারপর সকলে গেলাম মন্দিরের পূর্ব গোপুরমের উত্তরে রামকৃষ্ণ মঠে। এ স্থানের মন্দিরে শিব লিঙ্গ আছে। এখানে পূজার্থিকে শিব লিঙ্গ স্পর্শ ক'রে পূজার জন্য কোন বাধা নিষেধ নেই। শুনলাম শিবাণী ও ঘেঁটু প্রত্যহ সন্ধ্যার পর মঠে এসে জপে বসেন। এঁরা আজও মঠেই স্থান নিলেন। আমরা মঠ দেখে এলাম মন্দিরের সঙ্গীত আসরে।

দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটক সঙ্গীত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর। আজকার আসরে এসেছেন এ প্রদেশের কোন খ্যাতনামা শিল্পী। এ সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই, শ্রুতিসুখকরও নয় কিন্তু কিছুক্ষণ ধৈর্য ধারণ করতে পারলে রস উপলব্ধি করা যায়। আর সঙ্গীত যেরূপই হোক

সঙ্গতে আপনার মাথা দুলিয়ে ছাড়বে।

রাত্রি প্রায় ন'টার পর আমরা সেস্থান থেকে বেরিয়ে পাণ্ডা ভবনের দিকে ফিরলাম। পথিমধ্যে দেখলাম আজকের শোভাযাত্রা। দু'খানি রথ ও চতুর্দোলা আলোক মালায় সজ্জিত ক'রে বাদ্যসহ চলেছে। আমরাও তার পশ্চাৎ অনুসরণ করলাম। শোভাযাত্রা কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে বিরাম গ্রহণ করেও ভক্তদের পূজা গ্রহণ ক'রা হয়। পুরোহিত সেই রথের কিংবা চতুর্দোলার পাশেই থাকেন। একজন নয়, দশ-বারোজন। প্রায় এক ঘণ্টায় শোভাযাত্রা কয়েক গজ মাত্র এসে একটি ভবনের দ্বারে স্থির হয়ে যায়। আজ এই ভবনেই হবে বিগ্রহদের স্থিতি। আজকের শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন গণপতি, সরস্বতী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ। আমরা বিগ্রহকে এস্থানে রেখে পাণ্ডা ভবনে ফিরলাম তখন রাত্রি দশটা। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্বাহ্নে গৃহিণী বললেন—উঠে পড়।

বললাম—চা হয়ে গেছে নাকি ?

তিনি বললেন—না, চা এখন খাওয়া চলবে না। আজ শনিবার, সমুদ্রস্নান ক'রে ভদ্রকালীর মন্দিরে যেতে হবে। কালীঘাটের মা আর রামেশ্বরের ভদ্রকালী এক।

শয্যাত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। সমুদ্রস্নান ও ভদ্রকালীর মহিমায় মুগ্ধ হই নি। সূর্যোদয়ের পূর্বে সমুদ্র উপকূলে গিয়ে সূর্যোদয় দর্শণের বাসনায় রওনা হলাম।

সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখলাম আমার মত আরও অনেক দর্শকের সমাবেশ হয়েছে। আমি এসে ভদ্রকালীর বারান্দায় বসলাম।

গৃহিণী বললেন—আবার এদিকে বসলে কেন ? স্নান সেরে নাও আরও কাজ আছে।

আমি সমুদ্রতীরবর্তি জনগণকে দেখিয়ে বললাম—এঁরা যে নীলজলরাশির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন আমিও তারই জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, তারপর স্নানে নামব। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে অনেক হাঁকাহাকি, ডাকাডাকির পর সূর্যদেবের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তিনি কোনরূপে মুখ তুলে ফিক্ ক'রে একটু হেসেই এক খণ্ড রঙিন অম্বরে বদন আবৃত

করলেন। জবাকুসুমবর্ণের পূর্ণবদন দর্শন ঘটল না।

গৃহিণী বললেন—আমি জানি এখান থেকে ও-সব ভাল দেখা যায় না। সে দেখতে হলে পৌষ মাসে পুরীর সমুদ্রের ধারে দাঁড়াতে হবে। আমার কাকা একবার গিয়ে দেখে এসেছেন। সূর্যদেব জলের মধ্য থেকে লাফ দিয়ে আকাশে ওঠেন। সব দেশ থেকে কি সব জিনিস দেখা যায়?

বললাম- তেল, গামছা দাও স্নানটা করে আসি।

গৃহিণী বললেন—সংকল্প করতে হবে।

বললাম- সেই সংকল্প করেই তো এখানে এসেছি।

গৃহিণী বললেন—কি যে বলো কিছু মানে হয় না। রামেশ্বরের মত তীর্থস্থানে এসে প্রথম দিন সমুদ্র স্নান করতে হলে ব্রাহ্মণ দিয়ে মন্ত্রপাঠ ক'রে সংকল্প করতে হয়। তারপর হবে স্নান।

বললাম—এত সকালে আবার কোথায় ঘাটের পাণ্ডা পাওয়া যাবে জানি না।

পুরীর সমুদ্রের মত এখানে তরঙ্গের ভয় নেই। ইচ্ছামত জলে নেমে নির্ভয়ে স্নান সমাধা ক'রে উপরে উঠলাম।

গৃহিণী বললেন—আজ ভদ্রকালীর পূজা দিতে হবে। এদিকে ভাল ফুলের দোকান নেই। গোপুরমের কাছে ভাল ফুলের দোকান আর ডালি পাওয়া যাবে। তাঁর আদেশ মত পূজার ডালি, কিছু ফুল ও ফুলের মালা নিলাম। জবা ফুলের মালা নয়, নাম না জানা এক প্রকার ফুল। যা এদেশের মহিলাদের কবরীতে দুলতে দেখেছি, এ সেই পুষ্পের মালা। সেগুলি হাতে নিয়ে ভদ্রকালীর মন্দিরে এলাম।

পুরোহিত মশায় তখন সবেমাত্র মন্দিরের দ্বার খুলেছেন। আমাদের সম্মুখে দর্শন মাত্র আনন্দে আহ্বান ক'রে বললেন—মা ভদ্রকালী আজ প্রথমেই আপনাদের পূজা গ্রহণ করবেন। পুরোহিত মহাশয়ের আহ্বানে ও তাঁর মধুর বাণীতে গৃহিণী আনন্দিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। পুষ্প ও পূজার ডালি পুরোহিত মশায়ের হাতে দিলাম। তিনি আমাদের বললেন, এই ভদ্রকালী কে জানেন? আপনাদের বাঙলা দেশের কালীঘাটের সাক্ষাৎ মা কালী।

পুজা সমাধা হ'ল। পুরোহিত মশায় দাবী করলেন—আজ প্রভাতে মা সর্বপ্রথম আপনাদের পূজা গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণা এক টাকা ও অদ্যকার ভোগের জন্য পাঁচটাকা আপনাদের দিতে হবে।

বহু স্তুতি মিনতির পর দক্ষিণা পঁচিশ পয়সা ও ভোগের জন্য পঞ্চাশ পয়সা তাঁর হাতে অর্পণ ক'রে নিস্কৃতি পেলাম। ভদ্রকালী পূজার পর পূর্ব ফটকে প্রবেশ ক'রে রামেশ্বর মন্দিরে এলাম। রামেশ্বর লিঙ্গমূর্তি, পার্বতী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি দর্শন ক'রে মন্দিরের স্তম্ভগুলি দেখতে দেখতে পশ্চিম ফটকে হাজির হলাম। পূর্বেই বলেছি এ ফটকটির দ্বারে বহুবিধ দ্রব্যের দোকান। একটি তালপত্রে নির্মিত দ্রব্যের দোকানে দেখলাম ঘেঁটু ও শিবাণীকে। উভয়ে দোকানের মালিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে কলহে মত্ত হয়েছে। বিতণ্ডার কারণ জানলাম তারা একটি তালপত্রে নির্মিত ভ্যানিটি ব্যাগ পছন্দ করে। দোকানদার মূল্য চেয়েছিল দেড়-টাকা। এ পক্ষ দেড় টাকার স্থলে এক টাকা দিতেই শিবাণীর হাত থেকে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে 'ভাগো' বলে অসম্মান করেছে। গৃহিণী ভদ্রকালীর মন্দিরে সদ্য সিঁদুর লিপ্ত ললাট নিয়ে দোকানের সামনে হাজির হলেন। তারপর ভ্যানিটি-ব্যাগটি হাতে নিয়ে শিবাণীর হাতের টাকাটি নিয়ে দোকানের গদিতে রেখে সকলকে আহ্বান ক'রে বললেন—চল।

দোকানদার কোন ভাষায় কি যেন বললেন। আমার গৃহিণী সে ভাষা হৃদয়ঙ্গম না করেই বললেন—ভদ্র জেনানাকে অপমান! তোর ইচ্ছা হয় দেগা নয় তো নেই দেগা, অপমান কাহে করে গা?

এবার দোকান মালিক নম্রভাবে বললেন—হাম বুঢ়া বাত কুছ নেই বোলা মাইজী। বউনীকা বখৎ একদর বোল দিয়া। এ মাইজী লোক বহুৎ কমতি দাম দেনে মাঙ্গতা। হামারা লোকসান হোগা।

গৃহিণী বললেন—এই ব্যাগ এক টাকা? এ মেয়ে বহুৎ দাম দিয়া। বলেই প্রস্থানে উদ্যত হলেন। দোকানদার কি যেন বলতে গেলেন। গৃহিণী দোকানের দিকে ফিরে বললেন—ফের বাৎ বোলেগা তো তোর দোকানের সব জিনিস ছত্রাকার কর দেগা!

দোকানদার এবার নির্বাক হয়ে, নারী বাহিনীর দিকে নিরীক্ষণ করতে

লাগলেন। সত্যই দোকানদার যেন কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছেন।

আমি বললাম—মা ভদ্রকালীর পূজা দিয়ে এসে রণে জয়ী হয়েছ। এখন চলো বাজারের দিকে। শিবাণীকে বললাম, আপনারা এখন কি রেষ্ট-হাউসে যাবেন ?

শিবাণী হাতের ব্যাগটির দিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—এইটে কেনার প্রয়োজন ছিল। এর মধ্যে বাড়ীর ছেলেদের জন্য কিছু খেলনা নিয়ে যাব। শিবরাত্রের দিন কিছু মিষ্টি দরকার মহাদেবের পূজোয় লাগবে কিন্তু সে রকম দোকান কোথাও দেখছি না।

আমি বললাম—আমাদের পাণ্ডাবাড়ীর সামনে একটি গুজরাটী ব্রাহ্মণের দোকান আছে সেখানে ডাল-রুটী আর প্যাড়া পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গে চলো সেই দোকানের ব্রাহ্মণের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।

এঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলাম বাজারের দিকে। কয়েক প্রকার সব্‌জী নিয়ে এলাম মুদীর দোকানে। তিন পয়সার করকচ লবণ নিলাম। ঘৃতের প্রয়োজন ছিল। দোকানে একটি পাত্র ধার নিয়ে আড়াই শত গ্রাম ঘি নিলাম। উল্লেখ করা প্রয়োজন এ স্থানের ঘৃত খাঁটি কিনা জানি না, তবে বাঙ্‌লা দেশের বাজারে এরূপ ঘৃত দুস্প্রাপ্য। শিবাণী কয়েক প্রকার সব্‌জী কিনে ব্যাগজাত করলেন।

ঘেঁটু প্রশ্ন করলে—কাকীমা, আপনারা বাজারে এসেছিলেন তবে মন্দিরে গেলেন কেন ? আজ কি মন্দিরে পূজায় গিয়েছিলেন ?

গৃহিণী বললেন—আজ মন্দিরে পূজার জন্য যাই নি। খুব সকালে গিয়ে ছিলাম সমুদ্রস্নানে আর ভদ্রকালী মন্দিরে পূজা দিতে।

পথের পার্শ্বে এক বৃদ্ধা এক বোঝা সজনার ডাঁটা নিয়ে বসেছিল কিছু নিলাম।

ঘেঁটু বললে—কাকীমা, আমি কোনদিন বাজারে আসি নি। লজেই খাই। বাজারে আমার প্রয়োজনও হয় নি। আজ বাজার দেখলাম। সব রকম সব্‌জী কিছু কিছু পাওয়া যায়। সুক্তর সব্‌জীও সব রকম আছে। লজে ও সকল বর্জ্জন ক'রে সেই এক ডিস ভাত, জলের মত ডাল কিংবা তেঁতুলের জল। তরকারী কিছু থাকে কিন্তু কি উপাদানে প্রস্তুত স্বয়ং

নিউটনও আবিষ্কার করতে পারবেন না। একখণ্ড পাঁপর দগ্ধ আর এক বাটি দইয়ের পাত্র ধোয়া জল। যাকে এরা বলে ঘোল।

শিবাণী বললেন—ভাল হোটেলও আছে মাছ-মাংসের অভাব নেই। সেখানে ব্যবস্থা করলে সবই পেতে।

ঘেঁটু বললে—মাছ-মাংসের কথা বাদ দিলাম। মাংস খেলে এ দেশের হিন্দুদের জাত যায়। একটা কথা বলি এই যে সারা মাদ্রাজে অপরিমিত নারকেল। একা নারকেলেরই একশ' রকম মিষ্টান্ন হতে পারে। আটা, ময়দা, ভাল ঘি, চিনির অভাব নেই—খাজা, গজা, রসকরা, চন্দ্রপুলী প্রচুর হতে পারে তাও এ দেশের লোক মুখে দেবে না। নারকেল যে সুখাদ্য প্রস্তুতের একটা প্রধান অঙ্গ তা যেন এদের ধারণার অতীত। নারকেল ওদের তরকারীতে ব্যবহার করতে দেখেছি। কাঁচাই ফল হিসাবে খেয়ে থাকে। আর হাড়মজ্জা পেষণ ক'রে যে তেল নির্গত হয় রন্ধনে কিছুটা ব্যবহার হয়। বাকী বিদেশে রপ্তানী ক'রে পরমার্থ লাভ করে। দেবতাকে নিবেদন করে কাঁচা নারকেল আর পাকা কলা। আসল কথা কি জানেন কাকীমা, এদেশের মহিলারা কোনদিনই রন্ধন-কুশলী নন। দৈহিক শক্তি দিয়ে সংসারে যতটুকু সাহায্য হয় করে। স্বামী সন্তানের মুখরোচক আহার পরিচর্যায় কোনদিন মন দেন নি।

শিবাণী বললেন—এবার তুই ঠকেছিস, এই খাদ্য খেয়েই তো এদের এত শক্তি।

ঘেঁটু বললে—শক্তির কথা স্বতন্ত্র। আমাদের ওদিকে দুমকা জেলার সাঁওতালেরা মোটা-চালের অন্ন খায় আর অন্নের মাড় খেয়েই প্রচুর শক্তি ধারণ করে। দৈহিক শক্তি এদের (সম্বর) ভাতে হয় না। দেশের জল হাওয়া এর প্রধান সহায়।

শিবাণী বললেন—এদেশের মন্দির, স্থাপত্য শিল্পকলা, এরাই তো তার নির্মাতা। সে কথা তো মানতেই হবে।

ঘেঁটু বললে—সে অন্য কথা। এ প্রদেশের রাজন্যবর্গ, ভাস্কর ও শিল্পীরা যে স্থাপত্য শিল্পের নির্দশন রেখে গেছেন আজ তা বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের গৌরব। আমি আলোচনা করছি বাঙ্‌লার রন্ধনশালায়

অন্নপূর্ণার কথা। কিরূপে নিজহস্তে উপাদেয় খাবার প্রস্তুত ক'রে আত্মীয় ও অতিথিদের পরিতৃপ্ত করতে হয়, তারই জন্য তাঁদের সারাজীবন সাধনা। তাঁরা শিশুকাল থেকে মা-ভগ্নী, গুরুজনদের কাছে রন্ধনশালায়, কেমিষ্ট্রির সুশিক্ষা গ্রহণ ক'রে থাকেন।

আমরা গুজরাটী ব্রাহ্মণের দোকানে এলাম। গৃহিণী মূল্য জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ বললেন—পঁচিশ পয়সা পিস্।

ঘেঁটু চার টাকার প্যাড়া নিয়ে তাঁকে বললেন—আজ আপনার দ্রব্য পরীক্ষা ক'রে দেখব। তারপর আমার গৃহিণীকে বললেন, চলুন কাকীমা, আপনার ঘরে গিয়ে জল খাব। পাণ্ডা ভবনে এসে জলপানের পর গৃহিণী প্রস্তাব করলেন, আজ এ বেলা তোমাদের রেষ্ট-হাউসে গিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। লজে, হোটেলে খেয়ে ঘেঁটুর খুব কষ্ট হচ্ছে। বেশ রোগা হয়ে গেছে। আজ আমি দু'টো ভাত-ডাল খাইয়ে দেব। তোমরা আজ এবেলা বিশ্রাম নাও।

এ প্রস্তাবে ঘেঁটু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শিবাণীকে বললে—দিদি, আজ কাকীমার হাতের রান্না খেয়ে দেখবে জন্মের অরুচি সেরে যাবে।

শিবাণী প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। ঘেঁটুর আগ্রহে বাধ্য হয়ে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

আহারের পর কিছুক্ষণ দিবা-নিদ্রা দিয়ে গেলাম সমুদ্র-তীরে ভদ্রকালীর বারান্দায়, বাঙ্গালী সমিতির উদ্দেশ্যে। মন্দিরের নিকট এসে ঘেঁটু ও শিবাণী তাঁদের রেষ্ট-হাউসে গেলেন। আমরা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হলাম। বাঙ্গালী সমিতির সভা ভঙ্গের পর গেলাম শিবাণীদের রেষ্ট-হাউসে।

শিবাণী ঘেঁটুকে বললেন—চলো আজ বড় শোভাযাত্রা যাবে। সকলে শোভাযাত্রা দেখে মঠে যাব।

ঘেঁটু বললে—তুমি যাও। ইলেকট্রিক আলো দেখে এস। আমি মঠেই তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

শিবাণী বললেন—দেখুন দিদি, কি স্পর্ধা! শোভাযাত্রা দেখা মানে ইলেকট্রিক আলো দেখা। কাল রথে ভগবানকে কি সুন্দর সাজিয়েছিল।

ঘেঁটু বললে—ভগবানকে কোন দিন দেখি নি, আছে কি না তাও জানি

না। পৌরাণিক দেবমুর্ত্তির কথা যদি বল, সে তো মন্দিরেই ভাল দেখা যায়।

শিবাণী বললেন—তোর কিছুমাত্র ভক্তি নেই।

ঘেঁটু সাহাস্যে বললে—তোমার একথা অতি সত্য। আমি ভক্ত নই ভক্তিও আমার নেই। ভক্তি সকলের অন্তরে জমা থাকে না। ভক্তি এসে হৃদয়ে বাসা বাঁধে। এ ড্রাম-পিটানো আলোক মালার শোভাযাত্রায়, ভক্তি আকর্ষণ করতে অক্ষম।

গৃহিণী বললেন—ঘেঁটুর কেন ভাল লাগে নি জানি না। আমার তো খুব ভাল লাগে। কাল রাত্রে পাণ্ডা বাড়ী যাওয়ার পথে শোভাযাত্রা দেখলাম। কত লোকে রাস্তাতেই ভগবানের পূজা দিচ্ছে। আমি ওঁকে বললাম, আমাদেরও পূজা দাও, উনি ফাঁস কাটাবার উদ্দেশ্যে বললেন—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণের পূজা দেওয়া অশাস্ত্রীয়।

চতুর্দ্দোল কাঁধে নিয়ে যারা যাচ্ছিল, তাদের একজন ওঁকে ধরে বললে—বাবু ভগবানের চতুর্দ্দোলে একবার কাঁধ দিন, তাদের কথা এড়াতে না পেরে একবার চতুর্দ্দোলের বাঁশে কাঁধ দিয়ে ওদের হাতে দু'আনা পয়সা দিলে।

আমি বললাম—পূজা দিতে হলে কমপক্ষে দু'টাকা অপব্যায় হতো। তার স্থলে দু'আনায় কাজ মিটলো।

ঘেঁটু মুখে আঁচল দিয়ে হেসে নিয়ে বললে—চলুন কাকামণি, আজ আর একবার কাঁধ দেবেন, আমি দেখব।

এবার শিবাণী হেসে বললেন—শোভাযাত্রা যেতে এখন অনেক বিলম্ব। চলুন সকলে মঠে যাই।

বললাম—সে আর এক বিপদ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৌনী হয়ে বসে থাকতে পারব না। বরং মন্দিরে চলো। এখন মন্দিরে গানের আসরে গিয়ে বসি।

শিবাণী বললেন—ও গান কিছু বোঝা যায় না। গলা কাঁপিয়ে কি যে গুটু গুটু ক'রে গানের তান দেয় আমার একটুও ভাল লাগে না।

বললাম—ধৈর্য ধরে দু'চারদিন শুনলে বেশ ভাল লাগবে। কর্ণাটী সঙ্গীত তাচ্ছিল্যের জিনিষ নয়।

শিবাণী বললেন—চলুন যাই। বেশীক্ষণ বসব না। মঠেও একবার যাব।

আমরা ঘণ্টাখানেক সঙ্গীতের আসরে থেকে পথে শোভাযাত্রা দেখে পাণ্ডা ভবনের দিকে ফিরলাম।

সঙ্গীতের আসর থেকে ফেরার পথে গৃহিণী হাজার-এক তাল সঙ্গীতের সুর ধরলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন—আমাদের পাণ্ডামহারাজ এ স্থানের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাণ্ডা। একে ব'লে সেই আসল রামেশ্বর দেখার ব্যবস্থা কর। যদি প্রয়োজন হয় কিছু টাকা দিয়ে রাজী করাবে। বললাম—সামান্য টাকা না হয় ব্যয় করলাম কিন্তু যেতে হবে অতি প্রত্যুষে। গৃহিণী কোনরূপে নিরস্ত হলেন না। তাঁর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে, গেলাম পাণ্ডা মহাশয়ের অন্বেষণে।

তিনি তাঁর অফিস কক্ষে হিসাবের খাতা-পত্র দেখছিলেন। আমি সম্মুখে যেতেই তিনি হেসে বল্‌লেন—কি চাই বাঙ্গালীবাবু ?

আমি তাঁর সম্মুখে বসে সেই প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। তিনি সহাস্যে বললেন—অতি প্রত্যুষে যেতে পারবেন কি ? অন্ততঃ রাত চারটেয় উঠে আপনাদের যেতে হবে মন্দিরে। এর জন্য ব্যয় অতি সামান্য। মন্দিরের অভ্যন্তরে মূল রামেশ্বর মন্দিরের দ্বারে অফিস আছে। দু'জনের জন্য এক টাকা মূল্যের দু'খানি টিকিট ক্রয় করতে হবে। দু'টাকা মূল্যেরও টিকিট আছে কিন্তু নিস্প্রয়োজন। এক টাকা মূল্যের টিকিটেই ভাল দেখা যায়।

আপনারা টিকিট নিয়ে মন্দির দ্বারে দাঁড়াবেন। মন্দিরের অন্য কক্ষ থেকে পাল্কীতে সেই স্ফটিক লিঙ্গমূর্ত্তি আনা হবে। তারপর হবে লিঙ্গমূর্ত্তির দুগ্ধে স্নান, পূজা প্রভৃতি। এ সকল দেখায় কোন অসুবিধা নেই তবে অতি প্রত্যুষে আপনাদের যেতে হবে। আমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা গিয়ে দেখে আসতে পারবেন। প্রতিদিন কিছু কিছু যাত্রী স্ফটীক লিঙ্গ দর্শনে যান। কাল প্রত্যূষে চ'লে যান। এর পর শিবরাত্রের যাত্রী সমাগমে দর্শনের অসুবিধা হবে।

গৃহিণী শুনে বললেন—এখনই শুয়ে পড়, ভোরে উঠতে হবে। রাত্রি তিনটার সময় আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললেন, দেখতো ঘড়িতে কত বাজল ? বললাম—এখন শুয়ে পড়। এখন রাত তিনটে।

উনি বললেন—উঠে পড়, মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হতেই চারটা বেজে যাবে। দেরী হলে আর দর্শন পাবে না।

প্রায় সাড়ে তিনটায় হাঁক-ডাক ক'রে পাণ্ডাভবনের সদরের তালা খুলিয়ে আসল রামেশ্বর দেখতে বাহির হলাম। পথ জনমানব শূন্য। পশ্চিম দিকের গোপুরম দ্বারে এসে দেখলাম ফটকে বিরাট আকারের কয়েকটি তালা ঝুলছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তালা উন্মোচনের কোন লক্ষণ না দেখে গৃহিণী অধৈর্য হয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের দোষারোপ করতে লাগলেন। বললাম—নিষ্ফল আক্রোশ। এতে কোন সুবিধা হবে না। চলো দেখি, পূর্ব্ব গোপুরমের দিকে যাই। মন্দির পার্শ্ব দিয়ে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে পূর্ব ফটকে এসে দেখলাম আমাদের মত দর্শনেচ্ছুক দু'জন ভদ্রলোক কয়েকজন মহিলাসহ গোপুরম দ্বারে অপেক্ষা করছেন। মনে কিছু সাহস পেলাম। আমরা ফটকের দ্বারে একটি ধাপেতে বসলাম।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সাক্ষাৎ পেলাম এক বাঙ্গালী প্রৌঢ় ভদ্রলোকের, তাঁর নাম জানলাম মিঃ মুখার্জী। এঁর আদি নিবাস উত্তর পাড়ায়, অধুনা দক্ষিণ কলিকাতায় নিজ বাস ভবন নির্মাণ করেছেন। এসেছেন সহধর্মিণী ও শ্যালিকাসহ।

শান্ত প্রকৃতির অতি সরল লোক। আমাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে কয়েকবার আমাদের পাণ্ডা ভবনে এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি লজে। আমরাও কয়েকবার তাঁদের লজে গিয়ে ছিলাম। কন্যাকুমারীতে একই ভবনে ছিলাম। দু'দিন অবস্থানের পর এঁরা ত্রিবেন্দ্রাম যাত্রা করেন। তারপর আর আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে নি।

মুখার্জীবাবু বললেন—আমরা গতকাল এসেছিলাম কিন্তু স্ফটিক মূর্ত্তি দেখা সম্ভব হয় নি। কাল রামনাথ পুরমের রাজার দেহান্তর ঘটে। তিনি ছিলেন নাকি এ মন্দিরের সর্বময় কর্ত্তা। তাঁর শবদেহ রাজপ্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত মন্দিরের দ্বার উন্মোচন বন্ধ ছিল। সুতরাং কাল দর্শনও সম্ভব হয় নি। ক্রমে আরও কয়েকজনের সাক্ষাৎ পেলাম। প্রায় সাড়ে চারটায় প্রথম দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। আমরা প্রথম মহলে এসে বসলাম। কিছু পরেই একজন লোক একটি সবৎস গাভীর রজ্জু ধরে সেই

স্থানে উপস্থিত হলেন। শুনলাম এই গাভীর দুগ্ধ দোহন ক'রে সেই দুগ্ধে স্ফটিক-লিঙ্গের স্নান হবে।

কয়েক মিনিট পরে দ্বিতীয় দ্বার উন্মুক্ত হতে আমরা মূল মন্দিরের সম্মুখে এলাম। আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে টিকিট অফিসে দু'খানি টিকিট নিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। আমাদের সঙ্গের কয়েকজন লোক অধিক মূল্যের টিকিট ক্রয় করায় গৃহিণী বেশ ক্ষুব্ধ হলেন। তবে বালীগঞ্জের মুখার্জী মহাশয় এক টাকা মূল্যের টিকিট লওয়ায় আর বিশেষ অনুযোগ করলেন না। আমরা সকলে টিকিট হস্তে মূল মন্দির দ্বারে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম মন্দির দ্বারে আট-দশটি সীল করা তালা বন্ধ। কিছু পরে এলেন দু'জন পুরোহিত আর খাঁকী পোষাকধারী মন্দিরের এক জমাদার। পুরোহিত মহাশয় জমাদারের হাতে একগোছা চাবি প্রদান করলেন। এক একটি তালার সীল ভঙ্গ ক'রে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করা হ'ল। রামেশ্বর লিঙ্গের সম্মুখে রাখা হ'ল একটি প্রস্তর টেবিল। প্রায় তার তিন ফুট দূরে একটি পিতলের রেলিং। দু'টাকা মূল্যের টিকিটধারীগণ সেই রেলিং-এর নিম্নে স্থান গ্রহণ ক'রে উপবেশন করলেন। আমরা বা আমাদের মত যাঁরা এক টাকা মূল্যের টিকিট নিয়েছেন তাঁরা দেখবেন এদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে। সুবিধা বুঝলাম আমাদের মত এক টাকা মূল্যের টিকিটধারীদের এই স্থান থেকে দাঁড়িয়ে দেখার বিশেষ সুবিধা। দু'টাকা মূল্যের টিকিট-ধারীরা দু'ফুট আগে গিয়ে বসে উপর দিকে মাথা তুলে দেখার সুবিধা হয় না।

এরপর বাদ্য সহকারে কয়েকজন পুরোহিত বেদধ্বনী ক'রে স্বর্ণখচিত কিংখাপে আবৃত একটি পাল্কীতে আনা হ'ল স্ফটীক-লিঙ্গ। পাল্কীর দুই পাশে এলেন দু'জন পুরোহিত স্ফটীক-লিঙ্গকে পাহারা দিয়ে। পাল্কীর মধ্য থেকে স্বর্ণ সিংহাসন সমেত স্ফটীক-লিঙ্গ রাখা হ'ল সেই মর্মর টেবিলে। মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে সেই গাভীর দুগ্ধে লিঙ্গ-মূর্তিকে স্নান করান হ'ল। এরপর যথারীতি পূজা ও আরতি সমাধা হ'লে প্রধান দ্বারবান, বিগ্রহ বাহকেরা ও গাভীর মালিক আমাদের নিকট কিছু বখশিস্ আদায় করলেন। যাত্রীদের নিকট তাদের এ পুরস্কার প্রাপ্য।

অপরাহ্ণে এলাম সমুদ্র তীরে বাঙ্গালী সমিতি সভায়। আজ আরও অনেক নূতন মুখ দেখলাম। প্রথমেই লক্ষ্য করলাম শ্রীরঙ্গমের দীনবন্ধু চাকী মহাশয়কে। তিনি স্ত্রী ও কন্যা পুঁটুরাণীকে নিয়ে সহাস্য বদনে বসে আছেন। আমাদের দেখেই সকলে উঠে এসে প্রণাম করলেন। ওঁরা স্থান নিয়েছেন আমাদের পাণ্ডা মহাশয়ের ধর্মশালা ভবনে। পাণ্ডা মহাশয়ের ছড়িদার যে ভবনে আমাদের প্রথমে নিয়ে যান। এঁদের সেই ধর্মশালা ভবনে কোন অসুবিধা হয় নি, বেশ শান্তিতেই আছেন। আমরা কয়েকবার এঁদের সঙ্গে সাক্ষাতে ধর্মশালা ভবনে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি এক ধনী অথর্ব ব্যক্তি পাণ্ডা মহাশয়ের পুরাতন যজমানকে। তিনিও সেই ভবনে আছেন। এ ভদ্রলোকের পাছে কোন অসুবিধা হয় সেজন্য পাণ্ডা মহাশয় তাঁর জন্য সদা-সর্বদা একজন কর্মচারি নিযুক্ত ক'রে দিয়েছেন। আর আছেন বম্বের এক ধনী পরিবারের গৃহিণী। তিনি বার-চৌদ্দ বৎসরের একটি পুত্রকে সাথে নিয়ে এসে এই ধর্মশালায় কক্ষ নিয়েছেন। মোটরে এসেছেন বম্বে থেকে। রামনাথপুরমে মোটর রেখে এসেছেন রামেশ্বরে।
এই মহিলাকে পুনরায় দেখেছিলাম মাদুরা গিয়ে। তাঁর মোটরও দেখলাম, ড্রাইভারও সকল সময় তাঁর নিকটেই রয়েছেন। এই মহিলা শিবরাত্রের পরদিন পাণ্ডা বাড়ীতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ক'রে বস্ত্র ও অর্থদান করেন ও সমারোহে ভোজ দেন। এই ভোজে আমরাও নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে আহার করেছিলাম।
আজকার সভা ভঙ্গ ক'রে দেখলাম শিবাণী ও ঘেঁটুকে। সেই শঙ্কর মঠের নীচে। আমরা গিয়ে তাদের নিকট বসলাম। হঠাৎ এক যুবতী ঘূর্ণী-ঝড়ের মত এসে শিবাণী ও ঘেঁটুর সম্মুখে এসে বললেন—আপনারা কোন স্পেশালে এসেছেন ?
শিবাণী বললেন—আমরা স্পেশালের লোক নই, খাঁটি অর্ডিনারি। যুবতী যেন তাচ্ছিল্যভাবে চোখটা ঘুরিয়ে বললেন—রামেশ্বর সহরটা কি নোংরা! এক দণ্ড থাকতে ইচ্ছে করে না। আপনাদের ভাল লাগছে ?
ঘেঁটু তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে—তোমার মুখটা হোয়াইট ওয়াস ক'রে নয়ন গবাক্ষে কাজলের প্রলেপ দিতে কত খরচ হয়েছে ?

যুবতী বললেন—আপনিও প্রসাধন ব্যবহার করতে পারেন।

ঘেঁটু বললে—সে জন্যই তো জানতে চাইছি কত খরচ পড়ল।

যুবতী আর কোন উত্তর না দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিমায় চলে গেলেন।

ঘেঁটু ডাক দিয়ে বললে—ও কত্থক-নৃত্যের চলন এ দেশে চলবে না। ভারত নাট্যমটা তাড়াতাড়ি প্র্যাকটিস ক'রে ফেল। আরও কি যেন বলতে গেল পাশ থেকে শিবাণী ঘেঁটুর মুখটা হাত দিয়ে টিপে ধরলেন। দীনবন্ধুবাবু আমাদের এ স্থানে দেখে সমুদ্রতীর থেকে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে।

পরদিন সকালে দীনবন্ধুবাবু স্ত্রী ও কন্যাসহ আমাদের পাণ্ডা ভবনে এলেন। আজ এঁরা চলেছেন রাম-কুণ্ড, লক্ষ্মণ-কুণ্ড, ও সীতা-কুণ্ড দেখতে। সেখানে স্নান ক'রে আসবেন।

গৃহিণী বললেন—এঁরা কত জায়গায় কত কি দেখে বেড়াচ্ছেন, তুমি কিছুই দেখবে না। সেই সমুদ্রের ধারে গিয়ে বাজে মজলিস করবে। চলো আমরাও রাম-লক্ষ্মণ কুণ্ড দেখে আসি।

বললাম—আমি আনন্দে সম্মত আছি। বিনা ব্যায়ে স্নান ক'রে পুণ্য অর্জনের চেয়ে ভাল আর কি আছে? একটু অপেক্ষা কর আমি পাণ্ডা মহাশয়ের নিকট সেই স্থানের বিষয় জেনে আসি।

দীনবন্ধুবাবু বললেন—ঠাকুর মশায়, জানার কিছু নেই। পাণ্ডা মহাশয়ের বাড়ীর সামনের রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে মাইলখানেক গেলেই রাম-কুণ্ডে পৌঁছে যাব।

বললাম—কয়েকদিন বহু যাত্রীকে ঐ পথে যেতে দেখেছি। সেদিন বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল বর-কনে। কালও দেখলাম একটি শিশুকে নিয়ে কয়েকজনে জাঁক-জমক ক'রে যাচ্ছিলেন। মনে হয় এ দেশের লোক উৎসবে ঐ কুণ্ডতে গিয়ে স্নান কিংবা পূজা দেওয়ার বিধি পালন করেন।

গৃহিণী বললেন—রৌদ্রে এক মাইল পথ যেতে কষ্ট হবে। একটা ঝটকা নিলে হতো না?

দীনবন্ধুবাবুর কন্যা বললেন—এক মাইল পথ যেতে ঝটকা-মটকা কি হবে? সহর দেখতে দেখতে চলে যাব।

তেলের শিশি ও গামছা, কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাম-কুণ্ড স্নানে। প্রায় মাইলখানেক পথ এসে দেখলাম সীতা-কুণ্ড। একটি অৰ্দ্ধ শুষ্ক ক্ষুদ্র খাল বিশেষ। এক সময় হয়তো সীতা-কুণ্ডের মহিমা ও সৌন্দর্য ছিল এখন তার অবস্থা অতীব হীন। যাত্রীদের নিকট এ কুণ্ডের কোন সমাদর নেই। কেহ দেখার জন্যও আগ্রহ করেন না। যাত্রীদের কেহ কেহ এ কুণ্ডের কর্দমাক্ত জল স্পর্শ ক'রে তু'এক বিন্দু মস্তকে দেন।

এর পর পথের বামভাগে একটি বৃহৎ সরোবর। শুনলাম এটি রাম-কুণ্ড। কুণ্ডের সম্মুখে একটি মন্দির। মন্দির মধ্যে রাম-লক্ষ্মণ, সীতা দেবীর মূৰ্ত্তি। হনুমানও বাদ যান নি। একদিকে সিদ্ধিদাতা গণপতিও বিরাজ করছেন। মন্দিরে কিছু প্রণামী দিয়ে রাম-কুণ্ডের তীরে এলাম। অনেকে স্নান করছেন।

কয়েকজন বললেন—অদূরে লক্ষ্মণ-কুণ্ড আছে। সেটি আরও ভাল, সকলে সেইকুণ্ডতে স্নান করেন।

এঁদের কথামত লক্ষণ-কুণ্ডের উদ্দেশ্যে চললাম। কয়েক পা গিয়ে লক্ষ্মণ-কুণ্ডের দর্শন পেলাম। কিন্তু হতাশ হলাম। এ কুণ্ড রাম-কুণ্ড অপেক্ষা আকারে ছোট। জলও তাদৃশ্য ভাল ব'লে মনে হ'ল না।

পুঁটু বললে—রামের চেয়ে লক্ষ্মণ কখনও ভাল হয়? এ দেশের লোকের যেমন বুদ্ধি। চলুন আমরা রাম-কুণ্ডতে ফিরে যাই।

বললাম—পুঁটু ঠিক কথাই বলেছে। তা ছাড়া জ্যেষ্ঠ বর্তমান থাকতে কনিষ্ঠের কৃপালাভের আবশ্যকতা কি? আমরা এক এক অঞ্জলি লক্ষ্মণ-কুণ্ডের জল মস্তকে দিয়ে পুনরায় রাম-কুণ্ডের তীরে এলাম।

আমাদের দর্শনমাত্র এক লক্ষ মৎস্য বদন ব্যাদন ক'রে আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল।

পুঁটু বললে—এখানে থেকে এত আস্পৰ্দ্ধা! তোদের পেতাম আমাদের সোনামুখীতে, তেলে ভেজে ছাল-কাঁটা শুদ্ধ চিবিয়ে খেতাম।

সকলে তেল মেখে ঘাটে নামলাম। কয়েক পয়সার মুড়ি, ছোলা-ভাজা নিয়ে পুকুরের জলের কিছু দূরে নিক্ষেপ ক'রে ঘাটের সীমানা কিছু হালকা ক'রে স্নান সমাধা করলাম।

তারপর ধীরে ধীরে ফিরলাম পাণ্ডা ভবনের অভিমুখে। আমরা কুণ্ডায় যাওয়ার সময় জুতা বর্জন ক'রে গিয়েছিলাম। এখন বেলা অধিক হওয়ায় রাস্তার বালু ও পাথর উত্তপ্ত হওয়ায় আমাদের পুণ্য আহরণে যথেষ্ট বেগ পেলাম। ঝটকা না লওয়ায় গৃহিণী সারাপথ আমার কার্পণ্যের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করতে করতে এলেন। দীনবন্ধুবাবুদের কোনরূপ কাতরতা দেখলাম না। পুঁটুরও না। তাঁরা হাসি মুখে নির্বিবাদে নগ্নপদে আনন্দে চলে এলেন।

ধর্মশালার দ্বারে এসে দীনবন্ধুবাবু এক তরমুজওয়ালাকে ডেকে দু'টি তরমুজ ক্রয় ক'রে একটি তরমুজ আমাকে দিলেন। বললেন—পুণ্যস্নানের পর ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর্তব্য। এদেশে তেমন ভাল জিনিস কিছু মেলে না। মিষ্টান্নও নয়। বৈকালে দীনবন্ধুবাবুকে সমুদ্রতীরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আজ অপরাহ্নে যাবেন রামজোরোকা দেখতে। কিছু বিলম্বে গিয়ে আমাদের সঙ্গে মিলবেন।

আমরা অপরাহ্নে নিয়মিত সমুদ্রতীরের সভা অভিমুখে রওনা হলাম। মন্দিরের নিকট এসে গৃহিণী বললেন—চলো শিবাণীদের বাড়ীতে গিয়ে ওদের সঙ্গে নিয়ে যাই।

গেলাম রেষ্ট-হাউসে। পরম যত্নে শিবাণী নারকেল-মুড়ি, বাদাম ভাজা সহ চা দিলেন। চা-পানের পর শিবাণী বললেন—ঘেঁটু শাড়ী বদলে নে। চল সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসিগে।

ঘেঁটু বললে—বাব্বাঃ! সমুদ্রের ধারে আজ স্থান পাবেন না। আজ দু'তিনখানি বাঙ্‌লা থেকে তীর্থ-যাত্রী স্পেশাল এসেছে।

শিবাণী বললেন—চলুন আপনারা, আমি আপনাদের সঙ্গে যাই। ও ঘর বন্ধ ক'রে ধ্যানে বসুক।

আমরা মন্দিরের গোপুরমের সন্নিকটে গিয়ে দেখলাম ঘেঁটু শিবাণীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

গৃহিণী বললেন—তোর যে আজ আসতে ইচ্ছা ছিল না তবে এসে গেলি কি মনে ক'রে?

ঘেঁটু বললে—আমি না থাকলে দিদিমণি যা তা কিনে ঠকবেন তাই আমাকে

আসতে হ'ল।

শিবাণী বললেন – কি আমার গার্জেন এলেন, আমাকে রক্ষা করতে। আজ সকালে বাজারে গিয়ে একটা পেঁপে ও কাজু বাদাম নিয়েছিলাম। সেগুলো একেবারে অখাদ্য, ও আমাকে সেই খোঁচা দিতে এসেছে।

সমুদ্রতীরে এলাম। আমাদের কথকথার আসরটি কতকগুলি অপরিচিত ভদ্রলোক দখল ক'রে বসেছেন। আমাদের দলটির অনেকে অনুপস্থিত। যে কয়েকজন এসেছেন তাঁদের স্থান আজ অন্যে জবর-দখল করায় শুষ্ক মুখে একপাশে বসে কাতর নেত্রে দখলকারীদের নিরীক্ষণ করছেন। আমাকে দেখে তাঁদের ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। জনৈকা প্রৌঢ়া কয়েকটি মহিলার প্রতি সংকেত ক'রে বললেন—ওরা তিত্থি করতে আসে নি বাবা, সাজ গোজের বাহার দেখাতে এসেছে।

বললাম—আমাদের আজকের আসর বালির উপরেই হবে। আমি অদূরে মনোমত স্থান সংগ্রহ ক'রে বসলাম। পশ্চাতে শঙ্কর মন্দিরের দ্বারে গৃহিণী, ঘেঁটু ও শিবাণী বসলেন। আমি সমুদ্রের সীমাহীন নীল বারির দিকে দৃষ্টি রেখে মনে মনে পকেটের হিসাব করতে লাগলাম।

আমার অনতিদূরে পরিষ্কার বাঙ্‌লা ভাষা কর্ণে আসতে ফিরে দেখলাম দু'জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সাংসারিক আলাপ-আলোচনায় রত হয়েছেন। যতটুকু শুনলাম একজন অন্যকে বলছেন—এইবার ফিরে গিয়ে মাগীকে টিট্ করতেই হবে। ভাইপোটা তত পাজী নয়, যত নষ্টের গুরু ঐ শা—।

অন্যজন বলছেন—আমার হাতে ছেড়ে দাও। এক মাসের মধ্যে খেজুর গাছ তেলপারা ক'রে দেব।

এরপর আমার লক্ষ্য পড়ল কয়েকটি মহিলার বেশ-বিন্যাসের উপর।

এরা বাঙ্গালী তা সহজেই বুঝলাম। কিন্তু সধবা কি বিধবা কিংবা কুমারী অনুমান করতে সক্ষম হলাম না। বাঙ্‌লা থেকে এসেছেন এই দূর প্রদেশে কিন্তু সারা অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার দেখে দুঃসাহসের পরিচয় পেলাম। গৃহিণীকে নিকটে ডেকে বললাম—আমরা হাতের অঙ্গুরী ব্যতীত কোন জিনিস বিদেশে সঙ্গে রাখতে ভরসা করি না। এঁদের দিকে চেয়ে দেখ, কি সব দামী সোনার গহনা নিয়ে বেরিয়েছেন!

কিছু পরেই শিবাণী ও ঘেঁটু এসে হাজির হ'ল।
গৃহিণী এদের আভরণের দিকে নিরীক্ষণ করতে বললেন।
ঘেঁটু এক নজরে দেখেই বললে—কাকীমা যেন কেমন! ও সব আসল সোনার একটিও নয়। মাদ্রাজের বাজারে সেট-সমেত পাওয়া যায়। তারপর নির্ভয়ে মহিলাদের নিকট গিয়ে বললে—আপনারা এ সেট কত ক'রে নিয়েছেন?
ঘেঁটুর এই প্রশ্নে সকলে নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জনৈক মহিলা নিম্নস্বরে বললেন—সব সেট একদাম নয়। আমার সেট আশী টাকায় নিয়েছি। অন্য এক মহিলার দিকে ইংগিত ক'রে বললেন, আমার ননদের সেটটার দাম নিয়েছে একশ কুড়ি টাকা।
গৃহিণী তাঁদের নিকটে গিয়ে ভালরূপে নিরীক্ষণ ক'রে বললেন—সে না হয় বুঝলাম কিন্তু পথে-ঘাটে প্রাণ নিয়ে হবে টানাটানি।
আজ বিভিন্ন প্রকৃতির যাত্রীদের পাশে পাশে ঘুরে বেড়ালাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখা পেলাম দীনবন্ধুবাবুদের। তাঁদের সঙ্গে শিবাণী ও ঘেঁটুর পরিচয় করিয়ে দিলাম।
প্রথমে শিবাণী ও ঘেঁটুকে দেখে পুঁটুর সঙ্কুচিতভাব ছিল তারপর ধীরে ধীরে অস্বচ্ছন্দতা কাটিয়ে সখীত্বে পরিণত হ'ল। দীনবন্ধুবাবু ক্রমাগত অনুরোধ করেন আপনারা কলকাতায় ফিরে একবার গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দেবেন। সোনামুখী থেকে নিকটে বিষ্ণুপুর গিয়ে মদনমোহন দর্শন ক'রে আসবেন।
সন্ধ্যার পর ঘেঁটু ও শিবাণী মঠের দিকে গেলেন। আমরা মন্দিরে ঢুকলাম।
দীনবন্ধুবাবুর মুখে শুনলাম তিনি কাল প্রাতে সমুদ্রতীরে পিতৃপুরুষের কাজ করবেন। আমাদেরও সেই বাসনা ছিল। সকলে এক সাথে সমুদ্রতীরে করণীয় কাজ করা হবে। আমি কয়দিন পূর্বেই রামেশ্বরে এসেছি। পাণ্ডা মহাশয়ের পরামর্শে আমরাও ঐ দিনই ধার্য করেছিলাম। আমাদের পরিচিত দীনবন্ধুবাবুর সহযেগিতা লাভ ক'রে আনন্দিত হলাম।
আজ রামেশ্বরধামে মহা শিবরাত্রি উৎসব। ভেবেছিলাম আজ বোধহয়

আমাদের পাণ্ডা মহাশয় বিশেষ ব্যস্ত থাকবেন। দীনবন্ধুবাবু তাঁর স্ত্রী, কন্যাসহ আমাদের নিকট এসে সমুদ্রতীরে কাজের ব্যবস্থার জন্য পাণ্ডা মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আমিও তাঁর নিকট আমাদের ইচ্ছা জানালাম।

এ স্থানে উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের পাণ্ডা মহাশয় বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এঁর নিজস্ব একটি যাত্রী-নিবাস বা ধর্মশালা আছে। তা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যাত্রীদের নিকট এঁর দাবী যৎসামান্য। বা সাধ্যমত। যাত্রীদের মন্দিরে পূজা বা সমুদ্রতীরে যাত্রীদের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি কর্ম তিনি নিজে কিছুই করেন না। তাঁর নিয়োজিত কয়েকটি পুরোহিত আছেন তাঁদের দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। কেবল-মাত্র যাত্রীদের বিদায়কালে যথাবিধি মন্ত্রপাঠ ক'রে আশীর্বাদ করেন। সেই সময় যাত্রীদের বাটীর জন্য প্রসাদ দিয়ে থাকেন।

আমাদের অভিপ্রায় পাণ্ডা মহাশয়কে জ্ঞাত করা মাত্র তাঁর ছড়িদারকে ডেকে আমাদের সকল কার্যের ভার অর্পণ করলেন। আমরা সকলে ছড়িদারের সঙ্গে গেলাম। মন্দিরের নিকট এসে ছড়িদার মহাশয় বললেন—আপনারা সমুদ্রতীরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।

সমুদ্রতীরে প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষার পর ছড়িদার মহাশয় কাগজের মোড়কে কিছু দ্রব্য ও রজ্জু সমেত একটি বালতি হাতে নিয়ে হাজির হলেন। এক্ষণে তিনি পাণ্ডা মহাশয়ের নিয়োজিত পুরোহিত মহাশয়কে আহ্বান ক'রে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পুরোহিতের মলিনবর্ণ শীর্ণকায় অবস্থা দেখে আমাদের লেশমাত্র শ্রদ্ধার সঞ্চার হ'ল না। তিনি প্রথমত: তামিল-ভাষী লোক! তদুপরি তাঁর আকার দেখে আমরা বিতৃষ্ণ হলাম।

পুরোহিত আমাদের নিকট এসে পরিস্কার বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথমে আমাদের স্নান ক'রে আসতে বললেন। তারপর আচমন থেকে আরম্ভ ক'রে বিষ্ণু প্রণাম ও সূর্য প্রণাম পর্যন্ত সুন্দররূপে সকল কার্য সমাধা করলেন। অতি স্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ ও তাঁর নম্র স্বভাবে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

শ্রাদ্ধ কার্যের নিয়মিত বস্তুগুলি একে একে আমাদের হাতে দিতে লাগলেন কোশা-কুশী, হরিতকি, তিল, যব, কুশ প্রভৃতি। আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ-ধমু দান বিধি। সে কারণ তিনি একটি ধমু সঙ্গে এনেছিলেন। আমাদের হাতে মন্ত্রপুত ক'রে সেই ধমুটি তাঁর হস্তে অর্পণ করতে বললেন। একটি চমৎকার ধমু। ওজনে চার পাঁচ তোলা। এরূপ একটি ধমু আমাকে দান করতে হলে রামেশ্বরের পর আর কোন স্থানে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না। পরিশেষে বালুর পিণ্ডদান ক'রে কার্য সামাধা হ'ল। এ সকল কার্যে পুরোহিতকে দক্ষিণা ও তাঁর দ্রব্যের মূল্যবাবদ দিতে হ'ল মোট পাঁচ টাকা। সকল প্রকার বিধি ব্যবস্থায় আমাদের স্নান করতে হ'ল পাঁচ বার।

সমুদ্র তীরে শ্রাদ্ধ কার্যের পর পুরোহিত মহাশয় বললেন—আপনারা ছড়িদারের সঙ্গে গিয়ে কুণ্ডায় স্নান করুন। আজ আপনাদের রামেশ্বর পার্বতীর পূজা আমি স্বয়ং গিয়ে করিয়ে দেব।

কুণ্ডায় স্নান বাক্যটি বুঝে উঠতে পারলাম না। এখানেই তো পাঁচ দফা স্নান হ'ল আবার কোথায় গিয়ে স্নান করতে হবে কে জানে ?

ছড়িদার ও দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে মন্দির মধ্যে এলাম। এখন আরম্ভ হ'ল সেই রসি-বালতির কাজ। তিনি মন্দিরের এক নিভৃত স্থানে আমাদের হাজির ক'রে বললেন—এই কূপের পবিত্র জলে স্নান করুন। তিনি আরও বললেন, এরূপ কূপ একটি নয়। বাইশটি কূপ দেখতে পাবেন।

এই রামেশ্বর মন্দির কম্পাউণ্ডের মধ্যে এতগুলি কূপ প্রচ্ছন্নভাবে আছে আমাদের ধারণাতীত। ছড়িদার একটি কূপের সন্নিকটে হাজির ক'রে বললেন—আমি জল তুলে আপনাদের সাহায্য করছি। কূপের জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। আপনারা এই পবিত্র কূপের জল এক এক অঞ্জলি মাথায় দিন।

দীনবন্ধুবাবু বললেন—মন্দির মধ্যে এত কূপ নির্মাণের কারণ কি ? যাত্রীরা স্নান করেন কি উদ্দেশ্যে ?

ছড়িদার আমাদের এক সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করলেন। লঙ্কায় রাবণ বধের পর রামচন্দ্র এ স্থানে এসে মহেশ্বরের নিকট কাতরভাবে নিবেদন করেন—হে মহেশ্বর, আমি সীতা উদ্ধারের জন্য রাবণ বধ

করেছি। সেই রাবণ মহাপাপাচারী হলেও ব্রাহ্মণ সন্তান। আমি যে সেই ব্রাহ্মণ বধ ক'রে ব্রহ্ম-হত্যার পাপ অর্জন করেছি তা থেকে কিরূপে মুক্ত হব?

মহেশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন—এই স্থানে আমি ভারতের সকল পুণ্য তীর্থের জল এনে কূপ মধ্যে পূর্ণ ক'রে রেখেছি। তুমি সেই পবিত্র জলে স্নান করলেই ব্রহ্ম-হত্যা ও সকল প্রকার পাপ কার্য থেকে মুক্তি লাভ করবে। এই রামেশ্বরের প্রধান মাহাত্ম্য। যাবতীয় পুণ্য তীর্থের জল এই সকল কূপে সঞ্চিত আছে। এই পুণ্য-বারিতে স্নানে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। এই কারণেই রামেশ্বর ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

দেখলাম আমাদের মত কয়েকজন সৌখীন বাঙ্গালীও স্নানে কিংবা কূপ দর্শনে এসেছেন। তাঁরা কোনরূপে এক এক অঞ্জলী জল মস্তকে দিয়ে পাণ্ডাদের আদেশ পালন কিংবা সঞ্চিত পাপ থেকে উদ্ধার লাভ করছেন। কয়েকজন অবাঙ্গালীকেও দেখলাম তাঁরা স্বহস্তে বালতি নিয়ে জল উত্তোলন ক'রে বিনা দ্বিধায় সেই শীতল সলীলে পরমানন্দে অবগাহন স্নানে রত হয়েছেন।

গৃহিণী বালতিতে হাত দিয়ে জল স্পর্শ ক'রে বললেন—ও বাবা, এ যে দেখছি অলকনন্দার মত বরফ গলা জল! বাবা রামেশ্বরকে প্রণাম ক'রে এক এক অঞ্জলি জল সকলে মাথায় দাও। আমরা সকলে তাঁর পরামর্শে স্বীকৃত হয়ে পুণ্য তীর্থের জল মাথায় দিলাম। দীনবন্ধুবাবু ও তাঁর সহধর্মিনীও তাই করলেন।

দীনবন্ধুবাবুর কন্যা পুঁটুরাণী বললেন—তোমাদের ঠাণ্ডা লাগে ঘরে গিয়ে শাল গায়ে দিয়ে বসগে। আমি এক এক বালতি জল মাথায় না ঢেলে এক পাও যাচ্ছি না।

করলেও সে তাই। এক একটি কূপে স্নান ক'রে সেই সিক্ত বস্ত্রে বিনা ক্লেশে আনন্দেই চলেছে অন্যান্য কূপের দিকে। শীত-কাতরতা কিংবা ক্লান্ত তাকে আদৌ মনে হ'ল না। বেশ রোমাঞ্চ সংগ্রহ ক'রে কূপের পর কূপগুলিতে স্নান ক'রে চলেছে। কয়েকটি কূপে স্নানের পর পুঁটুর স্নান দেখে আমার গৃহিণীও উৎসাহিত হয়ে বললেন—আমি দু-এক বালতি জল মাথায় ঢালব।

বললাম—জল ঢাল আমার আপত্তি নেই, তবে আদ্র বস্ত্রে ঘুরতে হবে সারা রামেশ্বর মন্দির। কি জানি কি চিন্তা ক'রে তিনি নিরস্ত হলেন।

ছোট বড় অনেকগুলি কূপ দেখলাম। সেই কূপের পবিত্র বারি মস্তকে দিয়ে সংক্ষেপে স্নান করলাম। কয়েকটি কূপ ক্ষুদ্র সরোবর সদৃশ, কয়েকটি বারি শূন্য। সকল কূপগুলি প্রদক্ষিণ ক'রে ও তার পবিত্র বারি মস্তকে দিয়ে মহাপাপের পরিত্রাণ হ'ল কিনা জানি না। তবে আজকার মত পরিত্রাণ পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

এরপর এলাম মূল মন্দিরের দ্বারে। দেখলাম আমাদের সমুদ্রতীরের পুরোহিত মশায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আজ মহা পুণ্যতিথি শিবচতুর্দশী ব্রত। প্রায় শতাবধি পূজার্থির লাইন পড়েছে। আমাদের সেজন্য এক মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় নি। ছড়িদার আমাদের জন্য পূজার দ্রব্য ও ফুল নিয়ে এলেন। এ স্থানে দেখলাম আমাদের সেই শীর্ণকায় পুরোহিতের অপ্রতিহত ক্ষমতা। বিনা দ্বিধায় ও বিনা কালক্ষেপে আমাদের হাজির করলেন মূল রামেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে। যথারীতি পূজা। শুষ্ক নারিকেল, কলা ও আতরের শিশির মতন একটি শিশিতে এক টাকা মূল্যের গঙ্গা জল নিয়ে ভগবান রামেশ্বরের মস্তকে অর্পণ ক'রে পার্বতী মন্দিরে এলাম। এ স্থানে পূজাদি দিয়ে পুরোহিত মহাশয়কে সাধ্যমত দক্ষিণা বা প্রণামী দিয়ে পাণ্ডা ভবনে ফিরলাম।

গৃহিণী প্রস্তাব করলেন—রামেশ্বরধামে এই মহাপুণ্য তিথিতে যখন এসেছি এই দিনে যথাবিধি আহার না ক'রে সন্ধ্যায় পুনরায় মন্দিরে রামেশ্বর দর্শনের পর সামান্য কিছু ফল মিষ্টান্নের আহার ব্যবস্থা হবে। সুতরাং অন্য কোন কাজ না থাকায় আরামলাভই শ্রেয় বিবেচনায় শয্যা রচনা ক'রে অদ্যকার ব্যায় সম্বন্ধে চক্ষু মুদে মনে মনে একটা খসড়া প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হলাম।

অপরাহ্ণে গৃহিণীর ডাকে শয্যা ত্যাগ ক'রে দেখলাম রামেশ্বর সহরের ভিন্ন রূপ। আমাদের পাণ্ডা ভবনে প্রধান রাস্তাটি লোকারণ্য। পূর্বেই বলেছি এই পথের পূর্ব দিকে মন্দির, পশ্চিমে রাম-কুণ্ড ও লক্ষ্মণ-কুণ্ড। এখন প্রবল জনস্রোত সেই কুণ্ডের দিকে চলেছেন স্নানে। তারপর

তাঁরা যাবেন মন্দিরে পূজার জন্য। স্থানীয় নববিবাহিত দম্পতি পূজার দ্রব্য ও বাদ্য সহকারে চলেছেন। শিশু ক্রোড়ে মাতা ও তাঁর আত্মীয় স্বজন চলেছেন পূজার দ্রব্য ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। আর দেখলাম প্রায় পাঁচ শতাধিক নানা দেশীয় সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা। এঁরা স্নান ক'রে মন্দিরাভিমুখে ফিরছেন। কয়েক জনের মস্তকে বিপুল পূজার ফল, পুষ্প ও দ্রব্যাদি। আজ স্নানের পর বিভূতির পরিবর্তে চন্দন-চর্চ্চিত হয়ে বিরাট বাদ্য দলসহ মহোল্লাসে নৃত্য করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। সন্ন্যাসীর এরূপ শোভাযাত্রা ইতিপূর্বে কোথাও দেখি নি।

গৃহিণীর অদেশে বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে আমরাও মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হলাম। সন্ধ্যার পূর্বেই হাজির হলাম মূল রামেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গনে। আজকার পূজা প্রাতেই সমাধা করেছি। এখন গৃহিণীর প্রেরণায় এলাম সান্ধ্যপূজা দেখতে। এখন জানলাম আজকার পূজার টিকিটের মূল্য দ্বিগুণ। কিছু ফুল ও দু'খানি টিকিট নিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। আজকার শিবরাত্রের বিশেষ অনুষ্ঠানের নূতনত্ব কিছু দেখলাম না। প্রথানুযায়ী একটি নারিকেল, কলা, ধূপ, কর্পূর-চন্দন গুড়া, কেহ কেহ আতরের শিশিতে সামান্য পরিমাণ গঙ্গাজল হাতে নিয়ে চলেছেন মন্দির দ্বারাভিমুখে। দাক্ষিণাত্যের কোন মন্দিরেই বিগ্রহকে স্পর্শ ক'রে যাত্রীদের পূজার বিধি নেই, আজও নয়।

বাঙ্‌লা দেশে শিবরাত্র উৎসবে রাশি রাশি ডাব, পর্যাপ্ত গঙ্গাজল, দুধ, দই নানাবিধ ফল, চিনির নৈবিদ্য দেওয়া হয়। এই দিনে বিশেষ পূজার পুষ্প আকন্দ পুষ্প ও ধুতুরা ফুল ও ফল। এগুলি আজকার দিনে প্রধান উপকরণ।

এ প্রদেশের জনগণের দৈহিক আহার্য (সম্বর) ভাত, তেঁতুলের জল, ঘোল। ভগবানের নৈবিদ্যও যথাবিধি নারিকেল, কলা, ধূপ, কর্পূর।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়েক স্থানে মেলা দেখেছি। রামেশ্বরে শিবরাত্রিতে মহামেলায় বিজ্ঞাপন দেখে এস্থানে মেলার যে কল্পনা করেছিলাম তারও কোন নিদর্শন নেই। স্থায়ী বা কয়েকটি অস্থায়ী দোকান মন্দিরের আশে পাশে আছে। সেগুলি কোন বিশেষ মিষ্টান্নের

দোকান নয়।

মেলায় সস্তা দরের তৈজসপত্র, ছেলেদের খেলনা, চুড়ি প্রভৃতি দ্রব্য ও মেলার প্রধান আকর্ষণ সার্কাস, বাঘের খেলা, ছেলেদের নাগর দোলা, ঘোড়ার দোলাও নেই। তবে স্থায়ী পিতল-কাঁসার তৈজসের দোকান ও কয়েক প্রকার বস্ত্রের দোকান যাত্রীদের দৃষ্টি পথে পড়ে। মেলার আকর্ষণ শিব-চতুর্দশী তিথির সপ্তাহকাল পূর্ব থেকে সন্ধ্যার পর রাজপথে রথে, চতুর্দোলে প্রভৃতি যানে বিগ্রহ নিয়ে শোভাযাত্রা। প্রতি সন্ধ্যায় এ সকল উপভোগ্য, দর্শনীয়। এতদ্ব্যাতীত চমকপ্রদ দর্শনীয় কিছুই নেই।

মন্দিরে সান্ধ্য পূজার পর গেলাম পার্শ্বের মঠে, গৃহিণীর আগ্রহে। কারণ এই মঠে আছেন শিবলিঙ্গ। সকল প্রকার যাত্রীই বিনা বাধায় স্পর্শ ক'রে শিব পূজা করতে পারেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গৃহিণী সেই উদ্দেশ্যে কিছু ফুল নিয়ে শিবের মস্তকে দিয়ে শিব-চতুর্দশীর দিনে আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। আমি দেখলাম শিব লিঙ্গের অনতিদূরে শিবাণী ও ঘেঁটু ধ্যান-মগ্না। গৃহিণীর পূজার পর অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল অপেক্ষা ক'রেও তাঁদের স্বরূপ অবস্থায় ফেরার কোন লক্ষ্মণ দেখলাম না। অতএব তাঁদের ধ্যানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাধা না দিয়ে পাণ্ডা ভবনে ফিরলাম।

রামেশ্বরে মহাশিবরাত্র পর্ব শেষ। আমাদের অন্তরেও বিসর্জনের বাদ্য শুরু হয়ে গেছে। আজ পাণ্ডা ভবনে আমাদের নিমন্ত্রণ থাকায় গৃহিণীর রন্ধনের কোন তাগিদ নেই। পাণ্ডা ভবনের সম্মুখে প্রধান পথটি জন-বিরল হয়েছে। প্রাতঃকাল থেকে দেখছি পাণ্ডা ভবনে লোক সমাগম হচ্ছে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের আগমণ শুরু হয়েছে। আহারের অবশ্য বিলম্ব আছে। পাণ্ডা মহাশয়ের কতিপয় শিষ্য ব্রাহ্মণদের বস্ত্র, গামছা ও নগদ অর্থ দান করছেন। তার পৌরহিত্য করছেন স্বয়ং আমাদের পাণ্ডা মহাশয়। দাতাদেরও দেখলাম। পাণ্ডা মহাশয়ের ধর্মশালার সেই অথর্ব ভদ্রলোক আর আমাদের পরিচিত দীনবন্ধুবাবুর কন্যা পুঁটুরাণী সহস্তে ব্রাহ্মণদের ধুতি পরিবেশন করলেন। পুঁটুরাণী আমাকেও একখানি বস্ত্র দিতে অভিপ্রায় করতে তাঁকে বললাম তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে আমি তোমার দান আনন্দে গ্রহণ করব। এখানে নয়। আর দেখলাম বস্ত্রের

সেই প্রৌঢ়া মহিলাকে। তিনি ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করছেন সে জন্য অন্দর মহলে তদারকে ব্যাস্ত।

গৃহিণী এসে বললেন—হাঁ ক'রে বসে দেখছ কি? বাজারে যথেষ্ট দোকান রয়েছে। ভাল কাপড়, গামছা সবই পাওয়া যায়। খানকয়েক কাপড় না হোক, কয়েকখানা গামছা নিয়ে আজকের দিনে দান করতে পারতে। কিছু না হোক বারোজন ব্রাহ্মণকে বারোটা টাকাও কি দিতে কষ্ট হবে?

মনে মনে ভাবলাম, এ বলে কি-রে! আর কাল বিলম্ব না ক'রে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে ঘুরে আসাই শ্রেয়।

গৃহিণী বললেন—আর বাইরে যেতে হবে না। এইবার ম্যাপ আর টাইম-টেবেল নিয়ে বস সারাদিন কেটে যাবে।

দেখলাম সম্মুখে বালীগঞ্জের মুখার্জী মশায় এসে হাজির। নমস্কার ক'রে বললেন—আহারাদি সেরে ফেলেছেন নাকি?

তাঁকে গৃহে বসিয়ে বললাম—আজ আমাদের আহারের বিলম্ব হতে পারে। পাণ্ডা ভবনে আমাদের ভগবানের ভোগ প্রসাদের নিমন্ত্রণ। শিবরাত্রি উপলক্ষে এঁর বহু ধনী শিষ্য এসেছেন, বস্ত্র-গামছা প্রভৃতি দান করছেন। জনৈক ধনী শিষ্যা ব্রাহ্মণদের ভোজের আয়োজন করেছেন। আমরা সেই অতিথিদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি।

মুখার্জী মশায় বললেন—সে তো আপনাদের পরম সৌভাগ্য মনে হয়। শিবরাত্রের পরদিন ভগবানের প্রসাদ পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমাদের অদৃষ্টে লজের সেই তেঁতুলের ঝোল, তাজা লঙ্কার ব্যঞ্জন আর আতপ চালের অন্ন। এখানে আর ভাল লাগছে না। আজ রাত্রি দু'টো পনেরয় মাদুরা যাত্রা করব।

বললাম—কয়দিন এস্থানে অবস্থানের পর অমাবস্যায় যাত্রা করবেন? রাত্রি দু'টো পনেরয় ট্রেন। অর্থাৎ আজ সারা রাত্রি জাগরণ। আমার মনে হয় কাল অপরাহ্ণ সাতটায় যাত্রা করা ভাল ছিল।

মুখার্জী মশায় বললেন—একদিন থাকা মানে, লজ ভাড়া, হোটেল খরচ। ওঁদেরও ইচ্ছা নয়। দেখুন তো একবার টাইম-টেবেলটা। মাদুরা থেকে কন্যাকুমারী যাওয়ার ট্রেনটা কি রকম আছে?

বললাম— সেদিন ম্যাপ, টাইম-টেবেল দেখে ট্রেন ভাড়া প্রভৃতি সব লিখে দিলাম।

মুখার্জী মশায় ফতুয়ার পকেট থেকে কয়েকখানা কাগজ বের ক'রে বললেন— দেখুন তো এর মধ্যে আছে বোধহয়।

ভদ্রলোক তাদৃশ বয়স্ক বা অতি বৃদ্ধ নন। শিক্ষিত ও অতি সরল কিন্তু ভ্রান্তমনা। ইতিপূর্বে কয়েকবার টাইম-টেবেল আলোচনা ক'রেও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছেন না। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনার পর পুরাতন সঙ্কল্পই স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে সহাস্য বদনে বিদায় গ্রহণ করলেন। বেলা বারোটার পর ভোগের প্রসাদ গ্রহণের জন্য আহ্বান পেলাম। পঙ্‌তি ভোজন নয়, আমাদের কামরায় পাণ্ডা গৃহিণী ও তাঁর পুত্রেরা পরিবেশন ক'রে গেলেন। এসকল দক্ষিণ দেশীয় পদ্ধতির আহার্য নয়। গুজরাট প্রদেশের ব্যবস্থা মনে হয়। অন্ন, কয়েক প্রকার ব্যঞ্জন, ডাল, পরমান্ন প্রভৃতি। আর একটি পাত্রে পুরী, হালুয়া, তরকারী, ডাল ও মিষ্টান্ন, দই প্রভৃতি।

গৃহিণীকে বললাম—পুরী, তরকারী, হালুয়া, মিষ্টান্ন রাত্রের জন্য সংগ্রহ ক'রে রাখ। চেষ্টা ক'রে দেখ যদি অন্ন-প্রসাদ শেষ করতে পার। এত দ্রব্য পরিবেশণের পরও স্বয়ং পাণ্ডা ও পাণ্ডা-গৃহিণী আমাদের আহারের যেন কোন ক্রুটী না হয় সেজন্য পুণঃ পুণঃ তত্বাবধান ক'রে গেলেন। দ্রব্যাদি অপচয়ের ভয়ে গুরু ভোজন হয়ে গেল ; পুরী, তরকারী, হালুয়া রাত্রের জন্য সঞ্চিত রাখা সত্বেও। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গেলাম পাণ্ডা মশায়ের ধর্মশালায়, দীনবন্ধুবাবুদের সংবাদ গ্রহণে। পাণ্ডা মহাশয় আমাদের অনুরূপ এঁদেরও প্রসাদ পাঠিয়েছেন। এঁরাও কিছু রাত্রের জন্য রেখে অন্ন-প্রসাদ আহার ক'রে বিশ্রাম করছিলেন। আমাদের দেখে সাদরে আমাদের বসালেন। দীনবন্ধুবাবুর নিকট জানলাম ওঁরা আর অগ্রসর হবেন না। দেশের কাজ-কর্মের ক্ষতি হবে। যদি ভগবান দিন দেন বারান্তরে এসে দেখে যাবেন। এঁরা আগামী কাল মাদ্রাজ রওনা হবেন। ভেবেছিলাম এঁদের সঙ্গ সুখে আনন্দে আমাদের কিছুদিন কেটে যাবে। মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল।

এঁদের নিকট বিদায় নিয়ে গেলাম ঘেঁটু ও শিবাণীদের রেষ্ট-হাউসের দিকে। পথি মধ্যেই এদের সাক্ষাৎ পেলাম। শিবাণী বললে—কাল আপনাদের দর্শন পেলাম না কেন ?

গৃহিণী বললেন—দর্শন দিতে আমরা গিয়েছিলাম। মঠে গিয়ে তোমাদের ধ্যানস্থ মূর্তি দর্শন করেই ফিরতে হ'ল। ধ্যান ভঙ্গ করতে সাহস করি নি। এখন তোমরা কোথায় চলেছ ?

ঘেঁটু বললে—আমাদের গন্তব্যের কোন স্থিরতা নেই। তবে আর সমুদ্র তীরে যাব না।

আমি বললাম—চলো আজ মন্দিরের উত্তর দিকের কিছুদূর ঘুরে আসি। এপথে একদিনও যাওয়া হয় নি।

কয়েকটি পুরাতন বাস ভবন ও যাত্রী-নিবাস পশ্চাতে রেখে দেখলাম এ পথের দুই পার্শ্বে স্থানীয় দরিদ্র পল্লী। মধ্যে মধ্যে কয়েকখানি নূতন একতল আধুনিক সৌখীন ভবনও দেখলাম। এগুলির মালিকও প্রাচীন অধিবাসিদের আত্মীয় প্রতিবেশী। এ সকল অধিবাসিদের স্ত্রীলোকগণকে দেখলাম তাল-পত্রের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতে নিযুক্ত। মনে হয় মন্দিরে যে সকল তালপত্রে-নির্মিত দ্রব্য বিক্রয় হয় এরাই তাদের প্রধান বা একমাত্র শিল্পী।

আরও কিছু দূর গিয়ে লক্ষ্য করলাম একটি মন্দির ও তার সম্মুখে ছোট গোপুরম। এই পথেই রামজোরোকা মন্দির। রামেশ্বরের প্রায় সকল যাত্রী রামজোরোকা দর্শনে যান। আমরাও রামজোরোকা মন্দির দেখে গেছি কিন্তু পথিমধ্যে এ মন্দিরের দিকে লক্ষ্য করি নি।

আমরা সকলে মন্দির মধ্যে গেলাম। এক বৃদ্ধা প্রদীপ হস্তে এসে আমাদের দর্শনের সাহায্য করলেন। মন্দির মধ্যে বহু পুরাতন নারায়ণ মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ। এরপর এলাম ছোট গোপুরম অতিক্রম ক'রে একটি মন্দিরে। কয়েকটি বালক আমাদের গাইডরূপে এসে সাহায্য করলে। মন্দির অভ্যন্তরে দেখলাম এক বিরাটকায় মূর্ত্তি। অনুমান করলাম হয়তো মহাবীরের। বালকবৃন্দ আমাদের বললে—ভগবান কাল-ভৈরবের মন্দির। এরই পার্শ্বে শীতলা মাতার মন্দিরও দেখলাম। এখন আমরা বালক

গাইডদের বিদায় দিতে গিয়ে বিপদে পড়লাম। দেখলাম বালক সম্প্রদায়টি একটি পরিপুষ্ট আকার ধারণ করেছে। প্রত্যেককে দু' নয়া পয়সা হিসাবে বিদায় করতে চল্লিশটা দু' পয়সা ব্যায় হ'ল।

নানা কথায় ও গল্পে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। গৃহিণী বললেন—চলগো কয়দিন এখানে এসেছি কিছু কিনতে পারি নি। আজ কিছু কিনে রাখি।

বললাম—এ স্থানে কেনার মত কোন দ্রব্যই দেখছি না। কেবল তাল-পাতার টুপি, চুবড়ী আর কাঁচের চুড়ি। বাজে অপব্যয়।

গৃহিণী বললেন—কিছু কিনতে হলেই অপব্যায় মনে হয়। এখানকার একটা ঘটি কিনতে হবে। রামেশ্বরের বিখ্যাত ঘটি। লাখপতিয়া নিয়েছে বেশ বড় ঘটি পনের টাকায়। আমাদের এতবড় দরকার নেই। ছোট হলেই চলবে। দশ টাকাতেই হবে।

সকলে এলাম বাজারের দিকে। শিবাণী রুদ্রাক্ষের কিছু মালা খরিদ করলে। গৃহিণী বললেন—মালাগুলি চমৎকার মজবুদ ক'রে গাঁথা। আমাদেরও তিনগাছা নাও। দেড় টাকা ব্যায়ে মালা নিলাম।

গৃহিণী একটি রুদ্রাক্ষের মালা ঘেঁটুর গলায় উপহার দিলেন। ঘেঁটু কোন আপত্তি করলে না।

আমি বললাম—গৌরীর মত মানিয়েছে।

গৃহিণী বললেন—চলো ঘটির দোকানে।

শিবাণী বললেন—দিদি, রাত্রে ঘটি কিনবেন না। বাজে মেটালে রঙ্ ক'রে ঠকিয়ে দেবে।

গৃহিণী আমার মুখের দিকে তাকালেন। ভাবলাম অন্যকার মত শিবাণী আমার শিরে ঘটি'র আঘাত থেকে অব্যাহতি দিলেন।

বললাম—ও বিষয়ে আমার জানা নেই। শিবাণী যখন নিষেধ করছেন আজ রাত্রে না নেওয়াই শ্রেয়। এরপর মন্দিরের ও বিগ্রহের কয়েক প্রকার আলেক্ষ্য ক্রয় ক'রে পাণ্ডা ভবনের দিকে অগ্রসর হলাম। শিবাণী ও ঘেঁটু গেল রজকালয়ে।

পরদিন প্রাতে এসেছিলাম গৃহিণীর আগ্রহে বাজারের দিকে ঘটি ক্রয়ের ইচ্ছায়। কিন্তু সেদিন রবিবার থাকায় সমস্ত বাজার ছিল বন্ধ। আমিও

ঘটির আতঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম।

শেষ একবার রামেশ্বর মন্দিরে ও সিদ্ধেশ্বরীর দ্বারে গিয়ে বিদায় নিয়ে পাণ্ডা ভবনে ফিরলাম। আমি ব্যবস্থা করেছিলাম রামেশ্বর থেকে কন্যাকুমারীকা যাওয়ার এবং ফেরার পথে মাতুরায় মিনাক্ষী মন্দির দর্শন।

আমরা সংক্ষেপে আহারাদি সমাধা ক'রে বেডিং বাঁধলাম। পাণ্ডা মহাশয় আমাদের ভগবানের প্রসাদ ও সুফল আশীর্বাদ করলেন। পাণ্ডা-গৃহিণী দিলেন পাথেয়। অর্থাৎ দু'জনের জন্য প্রচুর পুরী, তরকারী, হালুয়া।

বেলা দেড়টায় ট্রেন। কয়ম্বাটোর-এক্সপ্রেস। আমরা মাতুরায় নেমে তিরুনালভেলির ট্রেনে উঠব। ঐ ট্রেন প্রত্যুষে হাজির হবে তিরুনাল-ভেলি। সে স্থান থেকে বাস পথে কন্যাকুমারীকা। একটা ঝটকা ডেকে মালপত্র তুলে পাণ্ডা মহাশয় ও পাণ্ডা গৃহিণীর নিকট বিদায় নিয়ে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হলাম।

কন্যাকুমারীকা

(সুচীন্দ্রম্ নাগরকয়েল)

ট্রেন ছাড়ল। মনের মধ্যে নূতন চিন্তা এসে বাসা বাঁধতে লাগল। কতদূর পাড়ি দিতে হবে। কোথায় পাব আস্তানা। ক্রমে ফিরে এলাম দশ দিনের শস্তিকুঞ্জে—সেই রামেশ্বরে। সমুদ্র তীরে, মন্দিরে, দীনবন্ধুবাবু পুঁটুরাণীদের ধর্মশালার কক্ষে। এঁরা বেশ শান্ত সরল লোক। অনায়াসে আসতে পারতেন আরও কিছুদূর আমাদের সহযাত্রী হয়ে। দু'দিনের আত্মীয়তায় বেঁধে ঝুপ ক'রে এক কথায় পাশ কাটিয়ে গেল। তারপর এলাম দারুণ অভিমান নিয়ে শিবাণীদের রেষ্ট-হাউসে। ঘেঁটু খেয়ালী মেয়ে, চাই না তাকে সহযাত্রীরূপে। শিবাণী অনায়াসে আমাদের সাথি হতে পারত। তার গল্পে, হাসিতে আমাদের ট্রেন যাত্রার ক্লেশ লাঘব হতো। এ-তো আমারই স্বার্থের কথা। তাদের সুবিধা তারা বেছে নেবে। সহযাত্রী পরমাত্মীয়ের মত নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মিলিয়ে পাশে পাশে চ'লে

মাঝ পথে পাশ কাটিয়ে যাত্রার পরিবর্তন করে। না না, এরা কেহই আত্মীয় নয়। বন্ধু নয়। ওর নামই ভ্রান্তি, এ কেবলমাত্র ছায়া। কাকেও কোন দিন ধরে রাখা যাবে না।

ট্রেন এসে থামল খাঙ্গাচি মাদামে। সুখ দুঃখের সকল চিন্তা মুছে গেল শুষ্ক মৎস্যের দুর্গন্ধে। মাদ্রাজ সরকারের লিখিত নির্দেশ দেখলাম, এখানে অবতরণ ক'রে মৎস্য ভাণ্ডার দেখে যান। গৃহিণী নাকে কাপড় দিয়ে বললেন—সেই রামেশ্বর ষ্টেশন থেকে শুঁটকী মাছের দুর্গন্ধ শুরু হয়েছে এ যেন আর ছাড়তে চাইছে না।

মনে মনে ভাবলাম কল্পনা যতই রঙিন হোক আমার অদৃষ্টে তার শেষ পরিণতি এই দুর্গন্ধ বা দুঃখভোগ।

এরপর পানবামের সেই ভয়াবহ সেতু পার হয়ে যখন একুলে এলাম সুখ দুঃখের আলোছায়া সব মুছে নিয়ে ফিরে এলাম আবার সেই পুরাতন পথে। আবার সেই কুজ্ঝটিকাপূর্ণ ভবিষ্যৎ চিন্তা।

রামনাথপুরম, মান মাদুরা অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাদুরায় পৌঁছে গেলাম।

গৃহিণী বললেন—কুলিরা বলছে ষ্টেশনের সামনেই ভাল ভাল ধর্মশালা আছে। এখনও রাত্রি হয় নি চলো আজকে মাদুরায় থেকে যাই। মিনাক্ষী মন্দির দেখে দু'চারদিন বাদে কন্যাকুমারীকা গেলেই হবে।

বললাম—তুমিই তো ব্যবস্থা করেছিলে সন্ধ্যার পর মাদুরায় নামবে না। এখন সুবিধা বুঝে ব্যবস্থা বদল করলে চলবে কেন? রামেশ্বরের পাণ্ডা বলেছেন রামেশ্বরে শিবরাত্রির যাত্রীর অধিকাংশ কন্যাকুমারীকা যাবে। বিলম্ব হলে স্থানাভাবে কষ্ট পাবেন। এই পথেই আমাদের ফিরতে হবে। সে সময় মাদুরা দেখাই প্রশস্ত।

গৃহিণী বললেন—ট্রেনে রাত্রি জেগে না গিয়ে দিনে যাওয়ার কোন ট্রেন নেই?

বললাম—আছে। সকালে তিরুনালভেলি-এক্সপ্রেসে যাওয়া যায়। সারাদিন প্রায় ট্রেন ভ্রমণ ক'রে তারপর বাসে গিয়ে সন্ধ্যায় অজানা জায়গায় অসুবিধায় পড়তে হবে। ফিরতি পথে আমরা বৈকালে এসে যাব মাদুরায়।

মনে হয় ধর্মশালার খোঁজে কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না। আমরা রামেশ্বর থেকে তিরুনালভেলির টিকিট নিয়েছি। সুতরাং আজই আমাদের টিকিটের উসুল নিতে হবে।

কুলিরা বললে—তিরুনালভেলির ট্রেন প্লাটফর্মে হাজির আছে। তবে ছাড়বে দু'ঘণ্টা পরে। আপনারা নিশ্চিন্তে ট্রেনে গিয়ে বসতে পারেন।

আমরা আনন্দে জনবিরল কামরায় সুবিধা মত স্থান দখল ক'রে বসলাম ট্রেন ছাড়তে যথেষ্ট বিলম্ব আছে। আমরা স্টেশনে হাত মুখ ধুয়ে পাণ্ডা-গৃহিণী প্রদত্ত পুরী, তরকারী আহার ক'রে নিশ্চিন্তে ট্রেন ছাড়বার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ষ্টেশন সীমানার দক্ষিণে বিখ্যাত মাদুরা মিল। তার গগন স্পর্শী চিম্‌নি ধুম উদ্গিরণ করছে। অন্যদিকে রাত্রির আঁধার সত্বেও বিজলী বাতির আলোকে ট্রেন থেকেই মাদুরা সহরের বহুদূর লক্ষ্য হচ্ছে। এরপর এক একখানি বিভিন্ন স্থানের ট্রেন হাজির হতে লাগল। সে সকল ট্রেনের অধিকাংশ যাত্রীরা এই ট্রেনের কামরায় স্থান দখল করাতে যাত্রীর চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল। এতেই শেষ নয়, তারপর আরও কয়েকখানি ট্রেনের যাত্রী কামরা দখল করাতে শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। এখন বাহুবলই প্রধান সহায়। রেল কোম্পানী ট্রেনের সুব্যবস্থা না করেই নিশ্চিন্তে যাত্রীদের হাতে টিকিট দিচ্ছেন।

ট্রেন মাদুরা ষ্টেশন ত্যাগ করল। আমরা গবাক্ষের বাইরে দৃষ্টি রেখে বহির্দৃশ্য দেখার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলাম। তবে রেল পথের উভয় দিকে বাঙ্‌লা দেশের মত গাঢ় তিমিরে গ্রাস করে নেই। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত সহর ও কারখানার বৈদ্যুতিক আলোকে এ প্রদেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘোষণা করছে। সারারাত্রি ক্লেশ ভোগের পর আমাদের আকাঙ্খিত তিরুনাল-ভেলি ষ্টেশনে হাজির হলাম। পৃথিবী তখনও ঘন অন্ধকারে আবৃত। রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে বাস ষ্টেশন। তিনখানি সারি সারি কন্যাকুমারীকার বাস অপেক্ষা করছে।

এখানে আর রেল কোম্পানীর উদার হৃদয়ে বত্রিশজন যাত্রীর স্থলে দেড় শত যাত্রীর স্থান দানের আইন নেই। যতগুলি আসন, যাত্রী সংখ্যা তার

অধিক একটিও লওয়ার আইন নেই। কুলিরা আমাদের মালপত্র একটি বাসের মাথায় তুলে ভিতরে আমাদের স্থানের ব্যবস্থা ক'রে দিলে।

বাস তিনখানি যাত্রীপূর্ণ হ'ল। কণ্ডাক্টর এসে মাসুল আদায় নিয়ে হাতে টিকিট দিয়ে গেলেন। মালের জন্য অতিরিক্ত কোন দাবী নেই।

এখন আরম্ভ হ'ল যাত্রী গণনা ক'রে আদায়ী ক্যাশ মিলান। যতবারই গণনা হয় কোনরূপে নির্ভুল গণনায় তাঁরা কৃতকার্য হন না। সুতরাং ক্যাশও মেলে না। পরিশেষে বহু চেষ্টার পর গণনা কার্য সমাধা হ'ল। বাস ছাড়ার সঙ্কেত চালককে দেওয়া হ'ল। তখন পূর্ব গগনে উষার রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে।

সহরের মধ্য দিয়ে বাসের রাস্তা। এখন দেখলাম তিরুনালভেলি একটি ছোটখাট সহর নয়। পথের উভয় পার্শ্বের বিরাট ভবনগুলি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। উষার আলোকে যতটুকু দেখলাম নানাবিধ দ্রব্যের দোকান পথের উভয় পার্শ্বে। তবে এখন সেগুলি নিস্পন্দ। দিবালোকের অভাবে এমন একটি সহর দেখার ব্যর্থতায় মনে দুঃখ পেলাম।

বাস সহর ত্যাগ ক'রে প্রান্তর পথে চলেছে। ফাল্গুনের শেষ কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করছিলাম। যাত্রীদের অনেকে বাসের গবাক্ষগুলি রুদ্ধ ক'রে দিলেন। কয়েকজন সদাশয় যাত্রীকে অনুরোধ ক'রে দু' একটি গবাক্ষ খুলে দিলাম। কারণ প্রাতের সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে পথের উভয় পার্শ্বে কি অপূর্ব দৃশ্য। শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে যাত্রীদের নামাবার চেষ্টা করছে। আমাদের সঙ্গে দু' একটি বাঙ্গালী পরিবার সহযাত্রীও ছিলেন।

বাস এসে থামল একটি বিশিষ্ট হোটেলের পার্শ্বে, যাত্রীদের প্রাতঃরাশের সুযোগ দিতে। আমরাও নামলাম। দোকানের কর্মচারীগণ আমাদের হাতে এক একটি কাগজের পুরিয়া দিলেন। জানলাম সেটি মাজনের পুরিয়া। বহু শৌচাগারের ব্যবস্থাও দোকানের একদিকে আছে। যাত্রীগণ ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারেন। দোকানের আহার্য বস্তু ইডলি, বড়া, ধোষা, কফি বা চা আরও আছে ডালমুট। ইডলি, বড়া, ধোষা সবই সদ্য প্রস্তুত। আমরা তৃপ্তিপূর্বক প্রাতঃরাশ সমাধা করলাম।

তিরুনালভেলি থেকে কন্যাকুমারীকা যাট মাইলের কিছু অধিক পথ। সময় লাগল প্রায় চার ঘণ্টা। বাস এসে থামল একেবারে সমুদ্র তীরে। বুঝলাম আমরা এসে গেছি পবিত্র কন্যাকুমারীকা তীর্থে কিংবা কেপ্‌ কমোরিনে। বাস ষ্টেশনে পৌঁছান মাত্র পেলাম একটি কর্মঠ যুবক আমাদের কুলির কাজে। আমার বাক্স, বেডিংয়ে ইংরাজী হরফে নামের নির্দেশ ছিল। যুবকটি অতি সহজেই বাসের মাথা থেকে মালপত্র উদ্ধার ক'রে আমাদের ইচ্ছামত এক স্বল্প ভাড়ার প্রাদেশিক সরকার পরিচালিত রেষ্ট-হাউসে পৌঁছে দিলে। এত সুলভে এমন সুন্দর বাসস্থান ভাগ্যে মিলবে আমরা কল্পনা করি নি।

সমুদ্রের তীরে একটি দ্বিতল ভবনের প্রশস্ত কামরার দৈনিক ভাড়া মাত্র এক টাকা। নিম্নতলের কক্ষগুলির ভাড়া দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা উপরে ও নিম্নে আছে। পাখার ব্যবস্থা আদৌ নেই, আবশ্যকও নেই, কারণ ভবনের পূর্বদিকে বা সম্মুখে প্রায় দুই শত ফুট স্থান নিম ও ইউক্লিপ্‌টাস গাছ বিশিষ্ট প্রাঙ্গন। তারপরই বঙ্গোপসাগর। সকল কক্ষেই একখানি তক্তাপোষ আছে। কক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত দীর্ঘ বারান্দা। সমুদ্রের রূপ দর্শনে বারান্দায় যাওয়ার আবশ্যক হয় না। কক্ষ মধ্যে তক্তাপোষ থেকে বৃহৎ গবাক্ষের সম্মুখে বসলেই সমুদ্রের বক্ষে সূর্য্যোদয় থেকে প্রকৃতির বিবিধ ক্রীড়া পরিষ্কার দেখা যায়। আরও দেখা যায় বিখ্যাত বিবেকানন্দ-রক। প্রতিদিন প্রাতে বহু পুরুষ ও মহিলা বিবেকানন্দ-রকের সম্মুখে অপেক্ষা করেন সূর্য্যোদয় দর্শনে। যা আমরা রেষ্ট-হাউসের তক্তাপোষে বসেই সম্যক দেখতে পাই।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় আধ ফার্লং দূরে কন্যাকুমারীর মন্দির। তারপরেই ভারত মহাসাগর গিয়ে মিশেছে আরব সাগরে। মধ্যে মধ্যে বারান্দা থেকে ভারত মহাসাগরের বুকে বিদেশ-গামী জাহাজও দেখা যায়। মোট কথা এই ভবনের দ্বিতল থেকে প্রকৃতির মোহনরূপ দেখে তন্ময় হয়ে থাকতে হয়।

নিম্নতলের কক্ষগুলিতে ভাড়া দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা। তার কারণ প্রতি কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম আছে। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সুবিধা নেই।

কক্ষ থেকে সমুদ্রের দৃশ্যও দেখা যায় না। উপরের কক্ষগুলিতে গৃহ-সংলগ্ন বাথরুম নেই। শৌচাগার ও পানীয় জল নিয়ে। তবে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। ছোকরা কুলি মালপত্র রেষ্ট-হাউসে পৌঁছে দিয়ে মজুরীর উপর এক টাকা বখশিস নিয়ে গেল। এর নাম ভাস্কর। কুলিগিরি এর প্রধান কাজ নয়। কন্যাকুমারী মন্দিরে কি যেন কাজ করে অবসর সময়ে বাসের স্ট্যাণ্ডে এসে যাত্রীর সাহায্য ক'রে পারিশ্রমিক আদায় করে। প্রতিদিন বৈকালে আমাদের রেষ্ট-হাউসে এসে নানা গল্প করত। হিন্দী ভালই বলতে পারে। কয়েকটি প্রচলিত ইংরাজী শব্দ একত্র ক'রে, এক প্রকার চলনসই ইংরাজীও ব্যবহার করতে দেখেছি। রেষ্ট-হাউসের যাত্রীদের অবস্থানের আইন মাত্র চার দিন। ভাস্করের ব্যবস্থায় আমরা ছিলাম পূর্ণ এক সপ্তাহ।

কক্ষে দ্রব্যাদি রেখে গৃহিণী সর্বাগ্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা ক'রে রাখলেন। কি জানি কখন আবার কলের জল বন্ধ হয়। আমাকে বললেন—এখানে ভাল হোটেল নেই শুনেছি। চলো দেখি যদি বাজারে কিছু পাওয়া যায়। রেষ্ট-হাউসের সম্মুখে কিছু দূরে কন্যাকুমারী মন্দির। সেই পথের উভয় পার্শ্বে কয়েকখানি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান। আমরা একটি দোকানে অনুসন্ধান ক'রে পেলাম আলু, অর্দ্ধ-শুষ্ক বেগুন, পিঁয়াজ, টমেটো, কাঁচাকলা, সজনে ডাঁটা ও পাতিলেবু।

গৃহিণী রেষ্ট-হাউসে ফিরে এসে বললেন—এ বেগুনে কোন কাজ হবে না। বারান্দায় হাত বাড়িয়ে গোটাকতক কচি নিমপাতা ছিঁড়ে দাও। সজনে ডাঁটা আর বেগুন দিয়ে হবে। আর আলু, টমেটো, পিঁয়াজ দিয়ে ঝোল করি।

বললাম—উপাদেয় ব্যবস্থা।

কিছুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধা এলেন দই বিক্রয়ে। চার আনা পয়সা দিয়ে এক গ্লাস দই নিলাম।

আমাদের পার্শ্বের কক্ষে আজই আমাদের সঙ্গে এসেছেন উত্তর প্রদেশের এক পরিবার। সকলে স্নান ক'রে এসে একটি কানাস্তারার আবরণ খুলে কয়েকদিন পূর্বের প্রস্তুত পুরী, লাড্ডু আর চাটনি ডিস ডিস নিয়ে খুশী

মনে আহার করছেন। আর একটি কক্ষে দেখলাম এ দেশীয় একটি সংসার। বাজারের কোন হোটেল থেকে আনলেন সংবাদ পত্রে প্যাক করা (সম্বর) ভাত। এক একজন পুরুষ ও মহিলা এক একটি প্যাকেট নিয়ে প্রফুল্ল বদনে আহারে বসেছেন। বুঝলাম বাঙ্গালী বাঙ্‌লা থেকে কন্যাকুমারীকা অন্তরীপে এসেও আহারের তরিবতের কিছুমাত্র ত্রুটী বিধানে রাজী নন। তবে আধুনিক শিক্ষিতা নাতনীরা আমার মত সেকেলে বুড়োকে ক্ষমা করবেন। তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন—ত্থ' দিনের জন্য বিদেশে বেড়াতে এসেও কি হাঁড়ি-হেসেল ঠেলতে হবে ?

ঘণ্টা কয়েক গাঢ় নিদ্রার পর শয্যা থেকেই দেখলাম গৃহিণী কেশ-বিন্যাস ক'রে বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

বললেন—চলো একবার বাজারের দিকে গিয়ে দেখি, যদি পান পাই। ভাত মুখে দিয়ে পান না খেলে গা কেমন করে।

ভাবলাম সত্যই তো। পানের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও এমন একটি স্থানে এসে দিবা নিদ্রা দিয়ে সময় কাটান অন্যায়। শয্যা ত্যাগ ক'রে গৃহিণীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এলাম।

আমাদের রেষ্ট-হাউসের পশ্চাতে একটি বহু স্তম্ভ বিশিষ্ট নাটমন্দির। এক্ষণে তার দ্বার বন্ধ। আশ্বিনে নব-রাত্রি উৎসবে অর্থাৎ মহালয়ার পর থেকে বিজয়া পর্যন্ত বিশেষ নয় দিন কন্যাকুমারীকায় মহা উৎসব হয়। সেই সময় এই নাটমন্দির উন্মুক্ত ক'রে সজ্জিত করা হয়। এই নাট-মন্দিরের সম্মুখ থেকে অর্দ্ধ ফার্লং দীর্ঘ একটি রাস্তা ও এই রাস্তার শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারী মন্দির। মন্দিরের সন্নিকটে একটি কক্ষে বিবেকানন্দ মন্দির কমিটির কার্যালয়। এই কার্যালয় সংলগ্ন একটি গেষ্ট-হাউসও আছে।

কিছু দিন পূর্বে দ্বারকায় তোতাদ্রী মঠে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি সম্প্রতি দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ ক'রে দ্বারকায় এসেছেন। ভদ্রলোক দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে নানা গল্প করলেন। কন্যাকুমারীকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভূয়সি প্রশংসা ক'রে বললেন—কন্যাকুমারীতে কয়েকটি ক্ষুদ্র বাস ভবন ব্যাতীত লোকালয়হীন সমুদ্র প্রান্তর। কোন হোটেল কিংবা আহারের

সুবিধা আদৌ নেই। আপনার আহারের জন্য সঙ্গে রাখতে হবে রন্ধনের তৈজসপত্র। নিজেদের পরিশ্রমে রন্ধন ব্যাতীত আপনাকে উপবাসী থাকতে হবে।

আমরা কিছুদিন পরে এসে স্বচক্ষে দেখলাম এ স্থানে দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে বহু হোটেল। বাজারের শেষ প্রান্তে একটি গুজরাটী হোটেল। আদেশ অনুসারে সর্ব প্রদেশীয় সর্ববিধ খাদ্য মাংস, মাছ, ডিম সবই সেখানে পাওয়া যায়। সামান্য দূরে ভারত মহাসাগরের কূলে আছে আড়ম্বরপূর্ণ বিরাট হোটেল—যেমন পুরীতে আছে বি. এন. আর. হোটেল। এগুলি কয়েক মাসের ব্যবধানে গজিয়ে ওঠে নি। তিনি কোন পুরাতন যুগের কাহিনী বললেন তাও মনে হ'ল না। আমরা নির্বাক হয়ে শুনছিলাম তাঁর ভ্রমণ কাহিনী।

রেষ্ট-হাউসের পশ্চাতে সেই নাটমন্দিরের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে এলাম কন্যাকুমারী মন্দিরের গোপুরমের দ্বারে। এখন মন্দিরে প্রবেশ না ক'রে দেবীকে প্রণাম জানিয়ে গেলাম দক্ষিণ পার্শ্বের একটি রাস্তা দিয়ে। এখানে দেখলাম একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে আমাদের স্বামীজীর কৃষ্ণ-প্রস্তরের পূর্ণ মূর্তি। স্বামীজীর মূর্তির প্রতি প্রণাম জানিয়ে এলাম সমুদ্র তীরে। এই স্থানে একটি নব নির্মিত প্রশস্ত হল্, নাম গান্ধি মন্দির। হলে প্রবেশ ক'রে দেখলাম মধ্যভাগে একটি মর্মর বেদীতে মহাত্মার একখানি চিত্র-পট সংরক্ষিত হয়েছে। এমন সুন্দর সৌধে মহাত্মার মর্মর মূর্তির পরিবর্তে একখানি সাধারণ চিত্র-পট দেখে দুঃখিত হলাম। হয়তো অচিরে সেই চিত্র-পট অপসারিত হয়ে বেদীতে মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তারও কোন সূচনা শুনলাম না। হলের দুই পার্শ্বে ছাদে যাওয়ার সোপান। ছাদে গেলাম। ছাদ থেকে উত্তর দিকে সমগ্র কন্যাকুমারীকা নগরটি দেখা যায়। আর দেখা যায় তিন দিকের তিনটি সমুদ্র। পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর আর পশ্চিমে আরব সাগর। সারা ভারতে একত্রে সমুদ্রের এমন দৃশ্য আর কুত্রাপি নেই। এই স্থান থেকে প্রাতে পূর্ব দিকের সমুদ্র গর্ভ থেকে সূর্য্যোদয়, আবার অপরাহ্নে সমুদ্র বারিতে সূর্য্যাস্ত একমাত্র কেপকমোরীন থেকে দেখার পূর্ণ সুযোগ। আমরা

সূর্য্যাস্ত দেখার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু সূর্য্যদেব সমুদ্রবারি স্পর্শ করার পূর্বেই এক খণ্ড মেঘ এসে আমাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ ক'রে দিলে।

গান্ধি মন্দিরের পশ্চাতে সমুদ্রে একটি স্নানের ঘাট নির্মিত হয়েছে। যার নাম গান্ধি-ঘাট। আমরা ঘাটটির পার্শ্বে এসে দেখলাম বহুলোক এই ঘাটের সোপানে ব'সে সমুদ্র দর্শন কিংবা বায়ু সেবন করছেন। এরই অনতিদূরে আর একটি স্নানের ঘাট। এর নাম বিবেকানন্দ-ঘাট। সায়াহ্নেও বহু লোক ও বালক এই ঘাটে স্নানে রত। ঘাটের অনতিদূরে সমুদ্র জলের মধ্যে একটি ছোট রক। লিখিত নির্দেশ দেওয়া আছে কোন স্নানার্থি রকে যাবেন না। কিন্তু দেখলাম অধিকাংশ স্নানার্থি বিশেষ বালক সম্প্রদায় সমুদ্রে নেমেই ধাবিত হচ্ছে রকের দিকে। আইন অমান্য ক'রে রকে যাওয়াটাই যেন কৃতিত্ব। এমন কি কয়েকজন যুবতীকেও দেখলাম কটিতটে অঞ্চলের শাড়ী আবদ্ধ ক'রে রক বিজয়ে উৎসাহিত হয়েছেন।

বিবেকানন্দ-ঘাটের এক ফার্লং পশ্চিমে আর একটি ঘাট আছে। এটি সন্তরণকারীদের জন্য সংরক্ষিত। ঘাটের উপরিভাগে রেলিং দিয়ে ঘেরা। মূল্য দিয়ে এর সভ্য হতে হয়। এরপর বালুচর। আরও কিছু পশ্চিমে আরব সাগর 'রণং দেহী' বিক্রমে ভারত মহাসাগরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বালুচরের সম্মুখে বিখ্যাত কেরালা হাউস বা বিলাতী পদ্ধতির হোটেল। ধনীদের বিশ্রাম ভবন। এর পাশে সরকারী রেষ্ট-হাউস। দু'টি ভবনের মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছে লাইট-হাউস। এখনও এর দ্বার উদঘাটন হয় নি। শুনলাম শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি এসে এর দ্বার উদ্ঘাটন করবেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় আজ আর অগ্রসর হলাম না। ফেরার পথে দেখলাম বিবেকানন্দ স্মৃতি-সৌধ। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখনও অসমাপ্ত। বিরাট স্থান করগেটটিন দিয়ে পরিবেষ্টিত। দ্বারে লেখা আছে "অনুগ্রহ ক'রে এসে বিবেকানন্দ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কার্য দেখে যান। সময়—প্রাতে দশটা থেকে অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্যন্ত।" আজ আর দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং রেষ্ট-হাউসে ফিরলাম।

রেষ্ট-হাউসের উত্তর দিকে আছে এক মহিলার হোটেল। আমরা এ'দিন তাঁর হোটেলে ধোষা ও বড়া খেলাম। পরদিন গুজরাটী হোটেলে অনুনয় বিনয় ক'রে কিছু আটা সংগ্রহ করলাম। এরপর মহিলার হোটেলে আমাদের দু'জনের জন্য প্রতিদিন চারখানি পাঞ্জাবী পরোটা প্রস্তুত করিয়ে নিতাম। গৃহিণী সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। রামেশ্বরে ভাল ঘি পাওয়া যায়। আমরা কিছু সঙ্গে এনেছিলাম। মহিলার ধোষা প্রস্তুত চাটুতে আমাদের পরোটা প্রস্তুত ক'রে দিতেন। পরোটা প্রস্তুত হতো গৃহিণীর ব্যবস্থাপনায়। মহিলাকে দিতাম এক টাকা। অবশ্য তাঁর দোকানের অন্য কিছুই নিতাম না। রেষ্ট-হাউসে পরোটা এনে গৃহিণী স্টোভে ডাল, তরকারী প্রস্তুত ক'রে নিতেন।

পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ক'রে বারান্দায় এসে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলাম, শত শত ডিঙ্গি পাল তুলে সমুদ্র বক্ষে ভাসমান রয়েছে। কি চমৎকার দেখতে! আরও লক্ষ্য করলাম অদূরে বিবেকানন্দ রকের সম্মুখে কয়েক শত পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ।

এঁরা এসেছেন সমুদ্র তীরে সূর্য্যোদয় দর্শনে। সূর্য্যোদয় দর্শনের জন্য আমাদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কক্ষের বারান্দায় এসে অনুগ্রহ ক'রে পূর্ব দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ভানুর বদন দর্শন হয়। এত দূর ক্লেশ স্বীকার না করেও কক্ষের জানালা উন্মুক্ত করলেই আমাদের শয্যা থেকে সম্যক দেখা যায়।

আগ্রহে গৃহিণীকে ডেকে বললাম—শীঘ্র একবার বারান্দায় এসে দেখে যাও কি চমৎকার!

গৃহিণী শয্যা থেকেই উত্তর দিলেন এত ভোরে উঠে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিও না। অসুখে পড়লে বিদেশে দেখবে কে?

আমার পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তিনি বিরক্ত হয়ে বারান্দায় এসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বললেন—ওসব জেলে-ডিঙ্গি। ও দেখে তোমার কি লাভ?

বললাম—জেলে-ডিঙির কথা নয়। রকের সম্মুখে দেখ কত লোক ও মেয়েছেলে সূর্য্যোদয় দেখতে এসেছেন।

তিনি বললেন—যত সব পাগলামী। আকাশের কোলে ঘোলাটে মেঘ

জমাট বেঁধে রয়েছে। ওঁরা এসেছেন সূর্য্যোদয় দেখতে। রামেশ্বরেও তো দু'দিন গেলাম। পোড়া মেঘের জ্বালায় কিছু কি দেখবার উপায় আছে? এই বলে তিনি এ সকল অগ্রাহ্য ক'রে কক্ষে চলে গেলেন।

আমি ধৈর্য সহকারে স্থির দৃষ্টে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরে গৃহিণীর ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতার পরিচয় পেলাম। এতগুলি দর্শকের আগ্রহ সত্ত্বেও অবাধ্য জলধর এক ইঞ্চিও সরলেন না। সূর্য্যদেব অর্ধ ঘণ্টা পরে মেঘ-মুক্ত হয়ে অনেকখানি উপরে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দর্শকরাও নিষ্কৃতি লাভ ক'রে আপনালয়ে চলে গেলেন। এ হতাশা কেবল আজই নয়, যে কয়দিন এখানে ছিলাম কোন দিনই সূর্য্যোদয় দেখতে সমর্থ হই নি।

গৃহিণী হাতের তালুতে মাজন নিয়ে এসে বললেন—তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে নাও। আজ মঙ্গলবার সংক্রান্তি। মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে হবে।

বললাম—মন্দিরের পাশেই স্নানের ঘাট। ঐখানে গিয়ে স্নান ক'রে মন্দিরে যাওয়াই তো সুবিধা।

গৃহিণী বললেন—তত সুবিধা নয়। স্নানের পর ভিজে কাপড়ে মন্দিরে যাওয়া নিষেধ। খালি পায়ে, খালি গায়ে উত্তরিয় নিয়ে মায়ের মন্দিরে যেতে পারবে? এখান থেকে স্নান সেরে পূজার বেশে সেজে যেতে হবে। আমাদের কোন বাধা নেই। তোমাকেই সাজতে হবে।

অগত্যা স্নানাদি সেরে মন্দিরে যাওয়ার পদ্ধতিতে নগ্নপদে, নগ্ন-গাত্রে প্রস্তুত হলাম। একখানি সিল্কের চাদর সঙ্গে ছিল যা এতদিন কোন ব্যবহারে আসে নি। তাকে স্কন্ধে ধারণ করলাম। গৃহিণীকে বললাম—দেখ মন্দিরে যাওয়ার বেশ ঠিক হয়েছে, না আর কিছু বাকী আছে?

গৃহিণী বললেন—ব্রাহ্মণের ছেলে একি পৈতের অবস্থা। যাও শীঘ্র ওটাকে সাবান দিয়ে পরিষ্কার ক'রে ফেল।

সত্যই লজ্জায় পড়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড সাবান নিয়ে এ বস্তুটি সূতায় প্রস্তুত, তা প্রমাণ ক'রে নিলাম।

কন্যাকুমারী মন্দিরের গোপুরমের সন্নিকটে কয়েকখানি ফুলের ও পূজার ডালির দোকান। পূজার ফুল ও ডালি নিয়ে গোপুরমের ফটকে এসে প্রতিজনের জন্য এক টাকা চার আনা দিয়ে প্রবেশ-পত্র নিলাম। প্রবেশ-

পত্রের মূল্য ব্যতীত এক টাকা চার আনা, অধিক দিতে হ'ল এক প্যাকেট বিভূতির জন্য। এ স্থানের ইহাই বিধান।

গোপুরম অতিক্রম ক'রে এলাম দেবীর মূল মন্দিরের দ্বারে। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। এই নাটমন্দির ও মূল মন্দির এমনভাবে নির্মিত যেন সিনেমা হাউস। দিবালোকে সূর্য্যের আলোক সিমীত। বেশ শীতল পরিবেশ। মূল মন্দিরের দ্বারে অসংখ্য তৈল প্রদীপ। দু'জন মশালচি তৈল পাত্র হাতে সতর্ক রয়েছে যেন তৈল অভাবে কোন বাতী নির্বান প্রাপ্ত না হয়। দেবীর দুই পার্শ্বে বৃহৎ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। দেবী মূর্ত্তি দেখে তন্ময় হয়ে গেলাম। মর্মরে প্রস্তুত এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি আর কখনও দেখি নি। এর পরও হীরক আভরণে মূর্ত্তির নয়ন বিভ্রান্ত-কারী শোভা। একমাত্র নাসিকার হীরক আভরণ যেন দেবীর সমগ্র মুখমণ্ডলকে আলোকিত করেছে। কাঞ্চিপুরমে কৈলাসনাথের ললাটে হীরক শোভা দেখেছিলাম, তারপর দেখলাম কন্যাকুমারীর হীরক আভরণ। মন্দিরে প্রবেশ অধিকার কোন যাত্রীর নেই। দ্বার থেকে দেবী দর্শন ও পূজা সমাধা ক'রে নাটমন্দিরে নবগ্রহ বেদীর পাশে এসে দাঁড়ালাম। গৃহিণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—দেখলে, দেবীর নাকের হীরক-বেসর ? ঐ রকম একখানি হীরে নাকে পরলে মুখের চেহারাই বদলে যায়। কলকাতা গিয়ে ঐ রকম একখানা হীরে আমার নাকছাবিটার জন্য দেখো তো কত দাম পড়ে।

নাটমন্দিরের চতুর্দিক পরিদর্শন করলাম। নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিকে ভাণ্ডার ও ভোগ রন্ধনশালা। এ স্থানে দেবীর অন্ন-ভোগের ব্যবস্থা আছে। যাত্রীরা ইচ্ছা করলে পূর্বাহ্নে টাকা জমা দিয়ে ভোগের প্রসাদ নিতে পারেন।

মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলাম স্বামিজীর মূর্ত্তি পূজায়। কিছু পুষ্প দিয়ে বিনা মন্ত্রে স্বামিজীর পদে অর্ঘ দিলাম। তারপর এলাম সমুদ্রতীরে। এ স্থানটি একটি বাজার বিশেষ। দেখলাম প্রচুর কচি তাল, ডাব ও কলার সমাবেশ। ডাব ও কলা বাঙ্‌লা দেশে সকল সময়ে পাওয়া যায় কিন্তু ফাল্গুনের শেষে এত তালের কাঁধি আর কোথাও দেখি নি। বিশ পয়সায়

দু'টি তাল নিলাম। দোকানদার মোকা কেটে সহজে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলে।

প্রতিদিন অপরাহ্নে এদিকে ভ্রমণে আসতাম। সকল সময় ডাব, কলা, তালশাঁস ব্যতীত আপেল, আঙুরও দেখেছি। আর ছিল শ্রেণীবদ্ধ কয়খানি দোকান। নানা আকারের ও নানা দ্রব্যের কণ্ঠ-হারের দোকান। ক্ষুদ্র শঙ্খের মালা প্রসিদ্ধ। দেশী বিলাতী সকল মহিলারাই এর আগ্রহী ক্রেতা। আরও দেখেছি নারিকেল সদৃশ একপ্রকার অদ্ভুত বস্তুর ছাই-দানী। যাকে বলে এ্যাসট্রে। দেখলে মনে হয়, যেন কোন ধাতুতে নির্মিত এ বস্তু। আসলে এগুলি এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী। ধীবরের জালে ধরা পড়ে। প্রথম অবস্থায় এ বস্তুর গায়ে সাজারুর গায়ের দু'ইঞ্চি পেরেকের মত এক প্রকার কঠিন বস্তুতে আবৃত থাকে। কিছু শুষ্ক হলে কাঁটাগুলিকে আঙুলের চাপে সহজেই পরিষ্কার করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ছাই-দানীতে পরিণত হয়। ঐ কাঁটাগুলিও অনাদরণীয় নয়। শ্লেট পেনসিল রূপে ব্যবহার করা হয়। আমরা কলকাতায় এনে পরীক্ষা ক'রে বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদের বিতরণ করেছি।

আর একটি দ্রব্য প্যাকেটে ক'রে বিক্রয় হতে দেখেছি। সেগুলি এই কন্যাকুমারী মন্দিরের সংযোগ স্থলে সমুদ্রের বালি। বাতাসের পরিবর্তনে বালির রূপেরও পরিবর্তন হয়। কখনও দেখা যায় চালের আকারে দানা বিশিষ্ট বালি। কখনও বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। কখনও অতি মিহি সাবুদানার মত গোলাকৃতি। বহু যাত্রী আগ্রহে ঐ সকল বালি সংগ্রহ করেন। ঐ বস্তুই দোকানে বিবিধ প্রকারের প্যাকেটে বিক্রয় হয়। সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে অনেকে দোকানের প্যাকেট ক্রয় ক'রে থাকেন। মূল্য অধিক নয়। বালির প্রতি প্যাকেট পাঁচ কিংবা দশ পয়সা। আর যে নারিকেল সদৃশ ছাই-দানীর কথা উল্লেখ করলাম স্থানীয় দরিদ্র ধীবর বালক বালিকারা বা ধীবর স্ত্রীলোকেরা এগুলির একমাত্র বিক্রেতা। মূল্য প্রতিটি দশ পয়সা থেকে বিশ পয়সা। তাঁরা এগুলির নাম দিয়েছেন সমুদ্রকা নারিয়েল। এগুলি অন্যান্য দোকানেও বিক্রয় হতে দেখেছি। যাঁরা কন্যাকুমারী যান নিজহস্তে সংগ্রহ করেন কিংবা দোকানে ক্রয় করেন

ঐ বালু। কয়েকটি সমুদ্রকা নারিয়েল। আর কিছু শঙ্খ কিংবা ঐ জাতীয় পদার্থের বিচিত্র কণ্ঠ-হার যেরূপে হোক সংগ্রহ ক'রে নিশ্চয় দেশে নিয়ে যাবেন।

গৃহিণী বললেন—তাড়াতাড়ি চলো। কাল বাজারে কিছু পাওয়া যায় নি। আজ দেখে শুনে কিছু নিতে হবে।

ডাল হাতে ক'রে ফিরলাম। মোড়ের মাথায় দেখলাম গুজরাটী হোটেল। ইচ্ছা করেছিলাম কয়দিন রাত্রে এই স্থানেই রুটী, পরোটা যাহোক কিছু খাওয়া যাবে। ভিতরে গিয়ে দেখলাম অতি অপরিষ্কার অনাচার ব্যবস্থা। আহারে প্রবৃত্তি হয় না। তবে হোটেলের মালিক বড় ভাল লোক। আমাদের সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতী দিলেন। আমরা এস্থানে আহারে রাজী হতে পারলাম না। তাঁর নিকট প্রার্থনা ক'রে এক কিলো আটা নিলাম। তিনি এ বস্তু দিতে রাজী ছিলেন না। বলেছিলেন—আটা এদিকে পাওয়া যায় না। বহু চেষ্টা ক'রে দূর থেকে আনতে হয়। কৃপা পরবশ হয়ে এক কিলো আটা দিলেন। দাম নিলেন দেড় টাকা। এর কয়েকদিন পরে আমরা কন্যাকুমারীর বারো মাইল দূরে নাগর কয়েল সহরে গিয়ে দেখেছিলাম প্রচুর আটা পাওয়া যায়। দাম প্রতি কিলো এক টাকা।

বাজারে এলাম সব্‌জি সংগ্রহে। দোকানগুলি অনুসন্ধান ক'রে দেখলাম অবস্থা গতকল্যের অনুরূপ। অধিকন্তু দেখলাম কয়েকটি বেলের আকারের বাঁধাকপি আর কাঁচা আম। গৃহিণী বললেন—যথেষ্ট হয়েছে। আম দিয়ে ডাল আর কপির তরকারী হবে।

রেষ্ট-হাউসের দ্বারে এসে দেখলাম এক কিশোরী এক হাঁড়ী দই নিয়ে বসে আছে। দেখলাম গতকল্যকার বৃদ্ধার নিকট যে দই নিয়েছিলাম এর দই তার তুলনায় অনেকাংশে ভাল। বিশ পয়সায় গ্লাস ভর্তি ক'রে দিলে। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে গেলাম বিবেকানন্দ স্মৃতি-সৌধ দর্শনে। মূল মন্দির প্রায় সমাপ্তের পথে। তত্রাচ এখনও ভাস্কর ও বহু কর্মচারি কার্যরত। ফটকের পাশেই কার্যালয়। সেখানে যাওয়া মাত্র আমাদের সসম্মানে বসালেন। স্মৃতি-সৌধের সমগ্র মডেলও দেখালেন। দেখলাম

সমগ্র স্মৃতি-সৌধ নির্মানে রাশি রাশি গ্রেনাইট প্রস্তর এনে স্তূপীকৃত করা হয়েছে। এগুলিকে মার্জিত ক'রে পলিশের ব্যবস্থা হচ্ছে। ইট-কাঠের সম্বন্ধ নেই। নাটমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হয়েছে। কয়েক ফুট গাথাও হয়েছে। পূর্ণ উৎসাহে কার্য সমাধা করতে অন্তত আরও তুই বৎসর সময় সাপেক্ষ। শুনলাম সৌধের নিবন্ধকর্তা সৌধ সমাধার জন্য তিন বৎসর সময় নিয়েছেন। উপর দিকে দৃষ্টি রেখে স্বামীজীকে জানালাম এ স্মৃতি-সৌধ সম্পূর্ণ হলে একবার দর্শনের জন্য অধিনকে কন্যাকুমারীতে আসার সুযোগ দিও প্রভু। মন্দির প্রায় তু'বৎসর সমাধা হয়েছে কিন্তু আমার এখনও যাওয়ার সুযোগ হয় নি। ইহজীবনে আর ঘটবে কিনা একমাত্র তিনিই জানেন।

এরপর এলাম সমুদ্র তীরে। কেরালা-হাউসের নিকটে। দেখলাম বহু পুরুষ ও মহিলা চলেছেন আরব সাগর সঙ্গমে সূর্য্যাস্ত দর্শনে। আমরা কৌতূহল বসে তাঁদের অনুগামী হলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সাক্ষাৎ হলো জোড়া বাগানের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীসুশীলচন্দ্র সাহাবাবুর সঙ্গে। ইনি আমার পরিচিত। কয়েক বার কার্যোপলক্ষে এঁদের বাড়ী গিয়েছি। ইনি বাল্যকাল থেকে ব্যায়াম চর্চা ক'রে থাকেন। এখন এসেছেন কুইলন সহরে কুস্তি প্রতিযোগিতায়। তুই এক দিনের অবসর সময়ে এসেছেন কন্যাকুমারী দর্শনে। এঁর সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত হলাম। আমরা সকলে একটি বালির টিলার উপর সূর্য্যাস্তের অপেক্ষায় বসলাম। ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব সমুদ্রবক্ষে ঢলে পড়লেন। কিন্তু আজও যথা সময়ে এক ফালি মেঘ এসে সূর্য্যদেবকে আবৃত ক'রে দিলে। সূর্য্যাস্ত দেখার পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া গেল না। রেষ্ট-হাউস অভিমুখে ফিরলাম।

বিবেকানন্দ স্মৃতি-সৌধের পাশে এসে দেখলাম বালীগঞ্জের মুখার্জী বাবু স্ত্রী ও শ্যালিকাসহ সমুদ্র তীর থেকে ফিরছেন। কয়েক দিন পরে এঁদের সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত হলাম। এঁরা মাত্বরায় মিণাক্ষী দেবী দর্শন ক'রে আজ কন্যাকুমারীকায় এসেছেন। স্থান নিয়েছেন আমাদের রেষ্ট-হাউসে। মুখার্জী মশায় বললেন—আমরা এখন এদিকে এসেছিলাম বিবেকানন্দ রকে

যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। শুনলাম রক-কমিটির কার্যালয়ে প্রস্তাব করলে তাঁরাই ব্যবস্থা ক'রে দেন।

বললাম—রক-কমিটির অফিস আমি জানি। কন্যাকুমারী মন্দিরের নিকট রক-কমিটি অফিস। আমাদেরও রকে যাওয়ার বিশেষ আগ্রহ আছে। চলুন সকলে সেদিকে যাই।

সকলে রক-কমিটি কার্যালয়ে গিয়ে আমাদের ইচ্ছা জানালাম। তাঁরা আমাদের প্রস্তাবে আনন্দিত হয়ে বললেন—কাল প্রাতে আমাদের এখানে অনুগ্রহ ক'রে আসবেন। আমরা নৌকা ও গাইড দিয়ে সকল ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমি জেনেছিলাম রক দেখার জন্য কমিটি কার্যালয়ে প্রস্তাব করলে তাঁরা সকল ব্যবস্থা ক'রে দেন। তাঁরাই নৌকা ও গাইড দিয়ে থাকেন, এর জন্য কোন চার্য নেই। রক দেখার পর কার্যালয়ের দানের খাতায় সাধ্যমত কিছু দান হিসাবে দিতে হয়। কার্যালয়ের সভ্যদের নিকট সকল ব্যবস্থা জানতে পারলাম। এঁদের বিনীত ব্যবহারে আনন্দিত হলাম। এরপর সকলে রেষ্ট-হাউসে ফিরলাম।

পরদিন প্রত্যুষে মুখার্জী বাবুদের সঙ্গে নিয়ে গেলাম রক-কমিটির অফিসে। আমাদের উপস্থিতির কয়েক মিনিট পরেই অফিসের এক ভদ্রলোক তু'টি মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনুগমণ করতে বললেন। আমাদের পাতুকা অফিস কক্ষে ত্যাগ ক'রে যাওয়ার অন্য অনুরোধ করলেন। পাতুকাসহ রকে আরোহণ নাকি বিপজ্জনক!

আমরা সকলে নৌকায় উঠলাম। সামান্যমাত্র জলপথ। মৃতু তরঙ্গ। বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় জল মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক আত্মগোপন ক'রে আছে। সে কারণ মাঝিদের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নৌকা চালনা করতে হয়।

রকের কিনারায় নৌকা লাগল। এক পার্শ্বে প্রস্তর কেটে সোপান নির্মিত করা হয়েছে। সেই সোপান অবলম্বনে রকের শীর্ষ স্থানে এলাম। চতুর্দিক সমুদ্র-বারি বেষ্টিত। এরূপ ক্ষুদ্র রকের উপরিভাগ থেকে আজ এক অতুলনীয় দৃশ্য দেখলাম। কিছুক্ষণ সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য রাখলে মনে হয় পদতলে কোন অবলম্বন নেই! পৃথিবীর মাটি, রক সমস্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে, আমি শুন্যে ভেসে চলেছি। সম্মুখে, পার্শ্বে, চতুর্দিকে অসীম জলরাশি।

কেবল জল আর জল।

রকের উপর নির্মিত হবে একটি মন্দির। সে কারণ বহু লোক নিয়োজিত হয়েছে স্থানটিকে সমতল করার জন্য। পার্শ্বে একটি ষ্টোর-রুম ক'রে নানা দ্রব্য রাখা আছে। ভিত্তির কাজ কিছু দিন পূর্বে আরম্ভ হয়েছে। শেষ হতে যথেষ্ট বিলম্ব হবে। কমিটি অফিসের কর্মচারি আমাদের সমস্তই দেখালেন। আরও দেখলাম, রকের শীর্ষ স্থানের মধ্যভাগে কাষ্ঠের আবরণের মধ্যে বহু পুরাতন মর্মর নির্মিত দেবীর ভগ্ন চরণ-যুগল। শুনলাম বহু পূর্বে এই রকে কন্যাকুমারী দেবীর মন্দির ছিল। কোন দৈব-দুর্ঘটনায় মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নিদর্শন আছে কেবল চরণ-যুগলের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। মনে মনে ভাবলাম আজও যখন সেই আদি দেবী মন্দিরের ও বিগ্রহের স্মৃতি-চিহ্ন বর্তমান, তখন কেবল মাত্র প্রদর্শনী হিসাবে না রেখে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী ও পুরোহিতগণ বিধি মত পূজার ব্যবস্থা অনায়াসে বাস্তায় রাখতে পারতেন। কি জানি কেন এঁরা এ বিষয়ে উদাসীন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল রক পরিদর্শনের পর নৌকায় এসে বসলাম।

পুনরায় এলাম কমিটি অফিসে পাদুকার প্রয়োজনে। কমিটি অফিসের জনৈক কর্মচারি তাঁদের খাতায় আমাদের নাম-ধাম লিখে নিলেন। আমরা সাধ্যমত কিছু দান লিখে রেষ্ট-হাউসের দিকে ফিরলাম। মুখার্জী বাবুরা গেলেন সমুদ্রের দিকে ডাব কিনতে।

রক-কমিটি সংলগ্ন একটি বাটীর দ্বারে এসে দেখলাম শিবাণী ও ঘেঁটু এক কাঁদি তাল দু'জনে ধরাধরি ক'রে বাটীতে প্রবেশ করছে। হঠাৎ আমাদের দেখে তালের কাঁদি দ্বারে রেখে হাসতে লাগল।

গৃহিণী তাদের দেখে প্রশ্ন করলেন—তোরা কবে এলি? কোথায় আছিস? শিবাণী বললেন—আমরা কাল রাত্রে এসেছি। এই রেষ্ট-হাউসে আছি। আপনারা কোথায় আছেন?

আমি অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে আমাদের রেষ্ট-হাউস দেখালাম।

গৃহিণী বললেন—এত তাল কি হবে? আর কাটবেই বা কে?

ঘেঁটু বললে—আমরা খাব। খুব সস্তায় পেয়েছি। ওরা কেটে দিতে রাজি ছিল।

দিদিমণি বললে—এক সঙ্গে সব কাটলে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কেটে নেব। আটটা তাল বারো আনায়, সুবিধে হয় নি ?

শিবাণী ও ঘেঁটু জোরপূর্বক নিয়ে গেল তাদের দেবস্থান রেষ্ট-হাউসে। শিবাণী কক্ষের তালা খুলে আমাদের বসতে অনুরোধ করলে। দেখলাম সে কন্যাকুমারীতে পদার্পণ করেছে কাল রাত্রে। এই অল্প সময়ের মধ্যে কক্ষটিকে রামেশ্বরের রেষ্ট-হাউসের অনুরূপ সজ্জিত করেছে। শিবাণী নিরালস কর্ম পটিয়সী জানতাম। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

গৃহিণী ঘেঁটুকে বললেন—তোর কোন কামরা ?

সে বললে—আমি সামনের লজে আছি।

গৃহিণী বললেন—এক বাড়ীতে কিম্বা এক ঘরে দু'জনের থাকার সুবিধে হ'ল না ?

শিবাণী বললে—আমার সঙ্গে থাকলে ওর সাধনার ব্যাঘাৎ হবে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন তালের গতি করি।

কথা বলা মাত্র একটি ভোজালী বিশেষ ছুরি হাতে নিয়ে এমন কৌশলে তালের গলায় ছুরি চালাতে লাগল চারটি তাল কাটতে তার পাঁচ মিনিটও সময় গেল না। আমাদের দু'জনকে দু'টি তাল দিলে। তালগুলি ভালই ছিল।

বলালম—পাইকারী হারে তাল কিনে সুবিধা কিছু হয়েছিল কিন্তু খয়রাতী ক'রে লোকসান দাঁড়াল।

শিবাণী বললেন—তীর্থস্থানে অতিথি সৎকার করলাম। আপনারা এখন কোথায় যাবেন ?

বললাম—আমরা গিয়েছিলাম বিবেকানন্দ রক দেখতে। এখন রেষ্ট-হাউসে গিয়ে তেল-গামছা নিয়ে যাব বিবেকানন্দ ঘাটে স্নান করতে। তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে স্নানে যেতে ইচ্ছা কর তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

ঘেঁটু ও শিবাণী উভয়ে আজ যেতে রাজী হ'ল না। আমরা এদের নিকট বিদায় নিয়ে বাজারের দিকে এলাম। সব্‌জির দোকান অনুসন্ধান ক'রে পেলাম লাল কুমড়া, আলু আর নটেশাক। তাই হাসিমুখে নিয়ে রেষ্ট-হাউসে ফিরলাম। কিছুক্ষণ পরে স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘাটের

দিকে গেলাম।

এ ঘাটে স্নানে বেশ আনন্দ হয়। সমুদ্র স্নানে ঢেউয়ের ধাক্কায় নাকানি-চোপানী খেতে হয় না। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের মত ঘাটের সম্মুখে কয়েকটি রকের এদিক দিয়ে সমুদ্রের জল প্রবেশ ক'রে বাম দিকে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। বেশ স্নিগ্ধ মনোরম। এ স্থানে সমুদ্র স্নানে আরাম ও আনন্দ আছে।

স্নানের পর ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বে গেলাম কয়েকটি মন্দির দেখতে। প্রথমটিতে দেখলাম প্রস্তর নির্মিত দেব মূর্ত্তি। শুনলাম ইনি বিল্বেশ্বর। পাশেই আর একটি মন্দিরে গেলাম। মন্দির অভ্যন্তরে কোন মূর্ত্তি নেই। একটি আড়াই ফুট পরিমাণ আন্দাজ দীর্ঘ আর দেড় ফুট প্রস্থ একখানি শীলা। তারই উপরিভাগে সিন্দুর রঞ্জিত ত্রিশূল। শুনলাম এটি ভদ্রকালীর মন্দির। কিছুদূরে আরও একটি মন্দির মধ্যে দেখলাম মধ্যভাগে ক্ষুদ্র একটি শীলাখণ্ড। এটি কাশী বিশ্বনাথের মন্দির। শীলাটি বিশ্বনাথের অনুরূপ। মন্দিরগুলিতে একসময় কে বা কাহারা পূজা ক'রে গেছেন। কিছু পুষ্প মন্দিরের বিগ্রহ বা শীলাখণ্ডের উপর থাকায় প্রমাণ পেলাম। উপস্থিত কোন পুরোহিত বা পাণ্ডাকে দেখলাম না। কয়েকটি স্থানীয় লোকের সাহায্যে মন্দিরগুলির পরিচয় জানলাম। গৃহিণী বিবেকানন্দ মন্দিরের পাশের দোকান থেকে কিছু ফুল এনে বেওয়ারিস দেবতাদের মাথায় বণ্টন ক'রে দিলেন।

রেষ্ট-হাউসে ফিরে গৃহিণী রন্ধনে ব্যাপৃতা হলেন। কিছু পরে দই বিক্রেতা কিশোরী এসে গ্লাস ভর্ত্তি ক'রে দই দিয়ে গেলেন।

আমাদের রেষ্ট-হাউসে কেবল দই বিক্রেতা কিশোরীই আসতেন না নানাবিধ দ্রব্যের পসরা নিয়ে আরো অনেকে আসতো বিক্রয়ের উদ্দেশে। তবে সকলের উপরে উঠবার অনুমতি ছিল না। রেষ্ট-হাউস প্রাঙ্গনের এক পাশে পসরা সাজিয়ে তারা বসে থাকতো। দুধ-দই নিয়ে অনেকেই আসতো। প্রত্যূষে দেখতাম এক ভদ্রলোক বড় ফ্লাস্ক হাতে এসে হাঁক দিতেন—চায়া-কফি, চায়া-কফি। এর কিছুক্ষণ পরে আসতো কয়েকটি বালক ও কিশোরী। মিহিগলায় তারা হাঁক দিত—ইডলি-ব্রা, ইডলি-ব্রা

এই কয়টি খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতা ব্যতীত রেষ্ট-হাউসের দ্বিতলে আসার অন্ত কোন বিক্রেতার অনুমতি ছিল না।

এই সকল বিক্রেতাদের নিকট কোন দ্রব্য লওয়ার অনুমতি আমার ছিল না। যে কয়দিন এখানে ছিলাম প্রত্যহ সওদা নিতাম এই কিশোরীর নিকট দই। আর এক বৃদ্ধের নিকট কিছু দুধ, চা প্রস্তুতের জন্য। একদিন গৃহিণীর বিনা অনুমতিতে ইডলি কিনে বিশেষ ভর্ৎসনা পেয়েছিলাম। সেদিন প্রত্যুষে তিনি নীচে শৌচাগারে গিয়েছিলেন। সেই সময় ঐ বালিকা এসেছিল ইডলি বিক্রয়ে। প্রত্যহই সে আসে। আমরা কোনদিন তার দ্রব্য ক্রয় করি নি। সেদিন সে আমার নিকট বিশেষ কাকুতি-মিনতি করায় দু'খানি ইডলি নিয়ে ঘরে রাখলাম।

গৃহিণী এসে বললেন—ইডলি কি তুমি ঐ ছুঁড়ির কাছে নিয়েছ?

ঢোক গিলে বললাম—হাঁ, আজ দেখব কেমন ইডলি!

গৃহিণী বললেন—এখনি ফেলে দাও। ও ইডলিওয়ালী সাত জন্মে চান করে না। কাপড়ও ছাড়ে না। যতদিন এসেছি দেখছি ওর ঝাঁকড়া চুলের মাথা আর এক বস্ত্র। তোমার রুচিকে ধন্য। বাধ্য হয়ে ইডলি দু'খানি ফেলেই দিয়েছিলাম। এরপর তাঁর বিনা অনুমতিতে আর কোনও দিন তার কাছে কিছু খরিদ করতে সাহস করি নি।

অপরাহ্ণে গেলাম শিবাণীর রেষ্ট-হাউসে। দেখলাম তালা বন্ধ। সামনেই ঘেঁটুর লজ। সেদিকে না গিয়ে এলাম গান্ধি-ঘাটে। আজ ঘাটে বহু বাঙ্গালী পুরুষ, মহিলা সমবেত হয়েছেন। অনেকে ঘাটের উপরে কণ্ঠ-হার ও সৌখীন দ্রব্যের দোকানগুলিতে ভীড় করেছেন। কয়েকজন স্নানের ঘাটে বসে সমুদ্রের শোভা নিরীক্ষণ করছেন।

গৃহিণী বললেন—বোধহয় স্পেশাল ট্রেন এসেছে। এরা তো শিবরাত্রের পর দিনই রামেশ্বর ছেড়ে এসেছে। এতদিন ছিল কোথায়?

বললাম—বোধহয় মাদুরায় ছিল। সেখান থেকে এদিকে এসেছে। এক প্রৌঢ়া মহিলা একটি অতি বৃদ্ধার হাত ধরে আমাদের নিকট এসে বললেন—আপনারা এখানে কিছুক্ষণ আছেন তো? ইনি রইলেন আপনাদের কাছে। আমরা সূর্য্যাস্ত দেখে এসে এঁকে নিয়ে যাব।

প্রৌঢ়া চলে গেলে গৃহিণী বৃদ্ধাকে বললেন—উনি আপনার কে হন?

বৃদ্ধা বললেন—আমার নিজের কেউ নয়। একসঙ্গে কুণ্ডু স্পেশেলে এসেছি, আমাকে দিদি বলে ডাকে। আমাকে সঙ্গে ক'রে কে আনবে মা? আমার এক মেয়ে তার বড় সংসার। জামাই পুলিসে কাজ করেন, ছুটী পান না। কুণ্ডু বাবুদের গাড়ি আসে। মেয়ের চেনা-জানা দু'চার জন এলো। মেয়ে তাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি বৃদ্ধা আমাদের নিকট এসে বসলেন। ইনি তাঁদের বললেন—তোমরা গেলে না কেন?

জনৈকা উত্তর দিলেন—বালি ভেঙ্গে অনেক দূর যেতে হবে। ঠাকুর নয়, দেবতা নয়। কেবল সূয্যি ডোবার আর কি দেখব। ওতো বারো মাস, ত্রিশ দিন ওঠে আর ডোবে।

এই সম্প্রদায়ের অনেকগুলি একত্রিত হওয়ায় আমরা সে স্থান ত্যাগ ক'রে সরে এলাম। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখলাম শিবাণী ও ঘেঁটু আমাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে।

গৃহিণী তাদের বললেন—আমরা তোমাদের রেষ্ট-হাউস ঘুরে এলাম।

ঘেঁটু বললে—আমরা গিয়েছিলাম বিবেকানন্দ স্মৃতি-সৌধের কাজ দেখতে।

শিবাণী বললেন—কি চমৎকার হবে এই স্মৃতি-সৌধ। আমার ভাগ্যে এর সম্পূর্ণ দেখা হয়তো ঘটবে না।

ঘেঁটু বললে—আর দু'বছর পরে এলেই স্মৃতি-সৌধ দেখে যেতে পারতে।

শিবাণী বললেন—সে সময় এলে তোর সঙ্গে দেখা হতো না।

গৃহিণী বললেন—সন্ধ্যা হয়েছে, চল্ বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক।

শিবাণী বললেন—আমাদের রেষ্ট-হাউস হয়ে চলুন। এখনও চারটে তাল আছে সদ্গতি হয়ে যাবে।

গৃহিণী বললেন—পরের পয়সায় দু'বেলা তাল খাওয়া ভাল নয়।

এরপর আমরা শিবাণীদের পৌঁছে দিয়ে রেষ্ট-হাউসে ফিরলাম।

সন্ধ্যার পর আমাদের কন্যাকুমারীর বন্ধু ভাস্কর এসে হাজির হ'ল। সে প্রায় প্রতিদিন একবার হাজির দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব ক'রে যায়।

আজ নানা কথার পর আরম্ভ করলে কন্যাকুমারীর পৌরাণিক আখ্যান। গৃহিণী পান মুখে দিয়ে সামনে এসে বসলেন।

ভাস্কর বললে—এই যে কন্যাকুমারী দেখছেন, ইনি সহজ দেবী নন। সত্যযুগ থেকে এঁর মহিমা প্রচার হয়ে আসছে। সে যুগে এখানে ছিল এক দুর্দান্ত অসুর। তার নাম বানাসুর। এই বানাসুরের অত্যাচারে দেবগণ, সাধু-সন্ন্যাসী, দেশের লোক অস্থির হয়ে পড়তো। দেবগণ পরামর্শ ক'রে এক মহা যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের হোমকুণ্ড থেকে কন্যাকুমারীর আবির্ভাব হয়। এই কুমারী কন্যা ব্যতীত কেহই বানাসুরকে বধ করতে সক্ষম হয় নি।

এই কন্যা বড় হ'লে শঙ্কর, কুমারী কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন। কন্যাও স্বীকৃত হলেন। দেবগণ ভাবলেন, এই কন্যার বিবাহ হ'লে আর বানাসুর বধের আশা থাকবে না। সেই সময় নারদমুনি কৌশল ক'রে শঙ্করকে কয়েকটি দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ ক'রে এক নির্দিষ্ট রাত্রে এসে বিবাহ করতে হবে এইরূপ সর্ত্ত করলেন। যদি তিনি এই সকল দুর্লভ বস্তু আনতে সক্ষম না হন তবে চিরদিনের মত কন্যার বিবাহ বন্ধ হয়ে যাবে।

মহাদেব বহু চেষ্টায় সেই বস্তু কয়টি সংগ্রহ ক'রে বিবাহ সভায় আসছিলেন। তিনি যখন সুচিন্দ্রম নগরে এলেন, দেবর্ষি নারদ পুনরায় এক কৌশল ক'রে কুক্কুটের শব্দ করতে থাকেন। শঙ্কর নিশা অবসান অনুমান ক'রে আর এদিকে এলেন না। সেই স্থানেই অবস্থান করলেন। ...মারী কন্যা মহাদেবের আগমনে নিরাশ হলেন। রাত্রে মহাদেব ও ...ার অনুচরদের জন্য যে অন্ন রন্ধন করেছিলেন, সমস্ত সমুদ্র জলে ...নক্ষেপ করেন।

...াপনারা দেখছেন এখনও সেই অন্ন চা'লের মত হয়ে আছে। যা...কলে আদর ক'রে নিয়ে যায়। আজও তাঁর মহিমার প্রমাণ পাওয়া ...ায়।

...রপর সেই কুমারী কন্যা বানাসুরকে নিধন ক'রে দেবগণ ও দেশের ...কলকে অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি দেন। আজ রাত হ'য়ে

গেল। আর একদিন বানাস্বরের যুদ্ধের কথা আপনাদের বলব।

গৃহিণী বললেন—তুমি যে বললে, মহাদেব স্থচিন্দ্রম নগরে থেকে গেলেন। সে কোথায় ?

ভাস্কর বললে—সে এখান থেকে বেশীদূর নয়। মাত্র আট মাইল পথ। সেখানে যাওয়ার জন্য সকল সময় বাস পাওয়া যায়। সেখানে বিরাট মহাদেবের মন্দির দেখতে পাবেন। বিরাট মহাদেবের মূর্তিও দেখবেন। যদি স্থচিন্দ্রম নগর দেখতে যান, স্থচিন্দ্রম থেকে আরও চার মাইল বাসে গিয়ে নাগর কয়েল দেখে আসবেন। কন্যাকুমারী জেলার অন্তর্গত নাগর কয়েলে কোর্ট, আদালত, সবই আছে। খুব বড় সহর। একদিন গিয়ে স্থচিন্দ্রম আর নাগর কয়েল দেখে আসবেন।

ভাস্কর চলে গেল।

গৃহিণী বললেন—মুখার্জী বাবুর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে বল, ওঁরা যদি স্থচিন্দ্রম দেখতে যান।

গৃহিণীর প্রস্তাবে মুখার্জী বাবুদের কামরায় গেলাম ও তাঁর নিকট ঐ সকল কথা বললাম।

তিনি বললেন—আমরা স্থচিন্দ্রম নগরের কথা জানি। আমরা আগামী কাল যাব ত্রিবেন্দ্রাম। এ স্থানে কলকাতার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁরা একখানি ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে ত্রিবেন্দ্রামে যাবেন। আমরাও অর্ধেক ভাড়া দিয়ে তাঁর গাড়িতেই যাব। গাড়ী-ওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি স্থচিন্দ্রম নগরে আধ ঘণ্টা গাড়ী রেখে আমাদের মন্দির দর্শন করিয়ে দেবে। সেই ব্যবস্থা শ্রেয় মনে ক'রে কালই কন্যাকুমারী ছেড়ে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে ত্রিবেন্দ্রাম যাব। নাগর কয়েল দেখার ইচ্ছা আমাদের নেই। তেমন আকর্ষণীয়ও কিছু নয়।

মুখার্জী বাবুদের কামরা থেকে এসে গৃহিণীকে সকল কথা বললাম।

তিনি বললেন—ওঁরা ব্যবস্থা ভালই করেছেন। তবে নাগর কয়েল দেখাও দরকার।

চলো আমরা কালই স্থচিন্দ্রম আর নাগর কয়েল দেখে আসি।

বললাম—কালই যাওয়ার প্রয়োজন কি ? শিবাণীদের বলি, ওরা যদি

যায় একসঙ্গে যাওয়া যাবে।
গৃহিণী বললেন—ওরা আমাদের সঙ্গে কোথাও যেতে চায় না। কারও তোষামোদের প্রয়োজন নেই। চলো কাল সকালে দু'জনে গিয়ে দেখে আসি।

সুচিন্দ্রম—নাগর কয়েল

পরদিন সকালে সুচিন্দ্রম দর্শনের ইচ্ছায় বাসে উঠলাম। এই বাস সুচিন্দ্রম হয়ে যাবে নাগর কয়েল। সুচিন্দ্রমের বাস ভাড়া ত্রিশ পয়সা।
কন্যাকুমারীর সীমানা শেষ ক'রে তেঁতুল ও নারকেল বাগানের পাশ দিয়ে বাস চলেছে। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়। ছায়া চিত্রের মত অবিরত দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম ক'রে বাস এসে থামল একটি গোপুরমের অগ্রভাগে। আমরা বাস ত্যাগ ক'রে গোপুরমের দিকে অগ্রসর হলাম। গোপুরমের পার্শ্বে একটি বৃহৎ সরোবর। যেমন এ প্রদেশে থাকে মন্দির সংলগ্ন সরোবর। এ সরোবরে বহু যাত্রীকে স্নান করতে দেখলাম।
এ স্থানে স্নান ক'রে মন্দিরে পূজাবিধি। এ তথ্য আমাদের জানা ছিল না। স্নানের আগ্রহ আমাদের ছিল। সুবিধাও ছিল। কিন্তু আমরা প্রভাতে স্নানাদি সেরে বাসে উঠেছি।
মন্দির সীমানায় তিন দিকে তিনটি গোপুরম। আমরা পূর্বদিকের গোপুরম অতিক্রম ক'রে মন্দির প্রাঙ্গনে এলাম। সম্মুখে বহু স্তম্ভ বিশিষ্ট নাটমন্দিরের মনোরম কারুকার্য আমাদের মুগ্ধ করলে।
প্রথম মহল অতিক্রম ক'রে দ্বিতীয় মহলে এলাম। নাটমন্দিরের মধ্যভাগে পিতলের রেলিং ঘেরা একটি বেদী। বেদীর পাশে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত দেখলাম। এটি নবগ্রহ দেবতার বেদী। বেদীর সম্মুখে একজন পুরোহিত ছিলেন। তিনি আমাদের আহ্বান ক'রে নবগ্রহের বেদীতে প্রদীপ দিয়ে পূজা করালেন।

একটি বার তের বৎসরের বালক এসে আমাদের পাণ্ডা বা গাইড হলো। ছেলেটি হিন্দি ভালই জানে। যত্ন সহকারে আমাদের মন্দিরের চতুর্দিকে ঘুরে মন্দিরের কারুকার্য দেখাতে লাগলো।

শঙ্কর মন্দিরের দ্বারে আমাদের পৌঁছে দিয়ে বালকটি আমাদের জন্য পূজার দ্রব্য ক্রয় ক'রে আনলে। শঙ্কর মন্দিরে পূজার পর কয়েকটি পৃথক পৃথক কক্ষে লক্ষ্মী, নারায়ণ, সরস্বতী ও পার্ব্বতী মন্দিরে পূজা শেষ ক'রে আমাদের নিয়ে এলো এক বিরাট শঙ্কর মূর্ত্তির সম্মুখে। কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্মিত আঠার ফুট দৈর্ঘ সর্বাঙ্গ সুন্দর এমন মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নি।

এর পর বালকটি শঙ্কর মূর্ত্তির সম্মুখে একটি স্তম্ভের পাশে এসে আমাদের বললে, স্তম্ভটি নিরীক্ষণ করতে। দেখলাম, এই স্তম্ভের মধ্যভাগে একটি স্থুল শীলা ও তার পাশে পাশে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম প্রস্তর ব্যতীত তাৎপর্য কিছুই বুঝলাম না।

এইবার বালকটি হস্তের তালুর দ্বারা মূল স্তম্ভের পাশের শীলাগুলিতে আঘাত করতে লাগলো। সেই প্রস্তরগুলি থেকে নির্গত হ'ল মধুর ধ্বনী। যেন নিপুণ শিল্পী পরিচালিত তবলা তরঙ্গের সুর। মনে দারুণ বিস্ময় জাগলো।

এবার আমি নিজে স্তম্ভের গাত্রে আঘাৎ করতে লাগলাম। একবার দক্ষিণে একবার বামে ক্রমাগত আঘাৎ ক'রে চলেছি। এদের ভাষা যেন উপলব্ধি করলাম। স্তম্ভগুলি বলছে—শঙ্করের ডমরু রুদ্রবীন আমার অন্তরে আছে। বাজাও তোমরা। এই স্তম্ভের ধ্বনীতে মহেশ্বর উঠবেন জেগে। নৃত্য করবেন নটরাজরূপে।

গৃহিণীর ডাকে চমক ভাঙলো। তিনি বললেন—অনেক বেলা হয়েছে, চলো আবার নাগর কয়েল যেতে হবে।

গাইড বালকটি বেশ ভদ্র। কথা বলতে ভালবাসে। অবিরত হাসে। নাগর কয়েল যাওয়ার জন্য বাস ষ্ট্যাণ্ডে আমাদের পৌঁছে দিয়ে সে বিদায় নিলে।

আমরা বাসের জন্য অপেক্ষায় রইলাম একটি আম গাছের শীতল ছায়ায়।

কিছুক্ষণ পরে উপর দিকে দৃষ্টি পড়তে দেখলাম বৃক্ষের শাখার পত্র অপেক্ষা ফলের সংখ্যা অধিক। আমাদের মাথার এক হস্ত পরিমাণ উর্ধে এক শাখায় কয়েক গুচ্ছ ফল ঝুলছে। নিকটে বা আশেপাশে কোন লোক না থাকায় একটি গুচ্ছ ধরে দিলাম টান। হাতে এলো দশটি অপরিপক্ক রসাল।

আমার এ হেন চৌর্য বৃত্তি আচরণে গৃহিণী চক্ষু ছু'টি এমনভাবে সঙ্কুচিত করলেন, দেখে মনে হ'ল, তিনি এরূপ হীন অপকর্ম মুক্ত চক্ষে দেখতে নারাজ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নাগর কয়েলের বাস পেলাম। ভাড়া লাগল পনর পয়সা। একটি শুষ্ক নদীর ধার দিয়ে চলেছি। নদী জলহীন, কিন্তু নদীর উভয় পার্শ্বে সুপারি ও নারিকেলকুঞ্জ দেখলে বারিহীন নদী বলে প্রত্যয় করা যায় না।

অল্পক্ষণ পরে বাস এসে গেল নাগর কয়েল সহরের এ-প্রান্তে। আমাদের নামতে হবে সহরের অপর প্রান্তে। বাস সহরে প্রবেশ করতেই দেখলাম পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্যের দোকান। প্রচুর বস্ত্রের দোকান। পিতল, লৌহ প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের দোকান। কাষ্ঠ নির্মিত আসবাব, শয্যাদ্রব্য, রেডিও প্রভৃতির দোকান। কয়েকটি হোটেল ও লজ দেখলাম। সহরের পথে ব্যস্তভাব। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী পুস্তক নিয়ে সাইকেলে ও পদব্রজে চলেছে। ব্রীফের বাণ্ডিল হাতে সাদা প্যান্ট, কাল কোট গায়ে চলেছেন উকিল, এডভোকেট। চতুর্দিকে মটরের হর্ণ। সবার উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুদীর দোকানগুলি। বিধিবদ্ধ খাদ্য নিয়ন্ত্রণের যুগে দোকানের সম্মুখে চাল-ডাল, আটা-সুজি, চিনি প্রভৃতি স্তুপাকারে সজ্জিত রয়েছে।

কয়েকদিন কন্যাকুমারীতে এসে সব্‌জির মন্বন্তর দেখেছি, এখানে সব্‌জি ও ফলের প্রাচুর্য দেখে গৃহিণী আনন্দিত হলেন। আমরা বাস ষ্টেশনে এসে গেলাম।

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য মন্দির দর্শন কিন্তু চতুর্দিকে লক্ষ্য ক'রে কোন গোপুরম দৃষ্টি গোচর হ'ল না। কয়েকজন স্থানীয় লোকের নিকট

মন্দিরের অনুসন্ধান করলাম। তাঁরাও কিছু উত্তর দিতে না পারায় হতাশ হলাম। পরিশেষে এক বিলাতি স্যুট পরিহিত ভদ্রলোক দেখে মন্দিরের সংবাদ নিলাম।

তিনি বললেন—এই পথে সোজা কিছুদূর গেলেই কয়েল পাবেন। বুঝলাম এ দেশীয় ভাষায় মন্দিরকে কয়েল বলে। তাঁর কথামত আমরা আরও কিছুদূর এলাম কিন্তু কোথাও কোন গোপুরমের চিহ্ন দেখলাম না।

গৃহিণী বললেন—বোধহয় আমরা পথ ভুল ক'রে এসেছি। নাগর কয়েল সহরে প্রবেশ করেই আমাদের বাস থেকে নামা উচিত ছিল। এখন আমাদের হয়রাণ হতে হবে। আগেই বুঝেছি। সুচিন্দ্রমের বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে যখনই পরের গাছের আম ছিঁড়েছ, তখনই জেনেছি আজ অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে।

এরপর জনৈক ভদ্রলোককে তাঁদের ভাষায় 'কয়েলের' সন্ধান করতে, তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেৎ ক'রে 'কয়েল' দেখিয়ে গন্তব্যস্থানে চলে গেলেন। উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটি ভবনের ফটকের সম্মুখে হাজির হলাম।

এ দেশে আজ পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ যতগুলি মন্দির দেখেছি গোপুরম তার প্রতীক। কেবলমাত্র এই স্থানেই দেখলাম তার ব্যতিক্রম। মন্দির সীমানার ফটকের উপর বৃহৎ নহবৎখানা। অন্যত্র মন্দির সীমানার চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীরের উপর গো-মাতা কিংবা দেব-দেবীর মূর্তি দেখেছি। এ স্থানে প্রাচীরের উপর বিরাটকায় সর্পমূর্তি ফণা বিস্তার ক'রে আছে। আমরা নহবৎখানার নিম্ন দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে এলাম।

বিস্তৃত প্রাঙ্গন। মন্দির সম্মুখে নাটমন্দির নেই। মধ্যভাগে এক বৃহৎ প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ। তার মূল দেশে প্রস্তর নির্মিত উচ্চ বেদী। বেদীর চতুস্পার্শে প্রস্তর খোদিত নাগ মূর্তি। মূল মন্দিরের উপর কোন গম্বুজ বা চূড়া নেই। একটি সাধারণ উচ্চ একতল ভবন। ভবনের দ্বারের পার্শ্বে কার্নিশে ও দেওয়ালে ঐ নাগ মূর্তি।

একজন গাইড এলেন আমাদের সাহায্যার্থে। মন্দির সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক কাহিনী তিনি শোনালেন। ভাল হিন্দি না জানায় ও তাঁর উচ্চারণ দোষে কিছুই বুঝতে সক্ষম হলাম না। গাইড আমাদের জন্য ফুল

ও পূজার ডালি নিয়ে এলেন। পূজার ডালির কোন পার্থক্য নেই। সেই নারিকেল, কলা, সিঁদুর, কর্পূর। ভাবলাম, কলা অবশ্য নাগেদের খাদ্য, নারিকেল-ভক্ত নাগের সংবাদ জানি না। দেশভেদে হয়তো সবই সম্ভব।

পুরোহিত এসে মন্দির দ্বার মুক্ত করলেন। আমরা অভ্যন্তরে গিয়ে বিগ্রহ দেখলাম। একটি বেদীর উপর বৃহৎ নাগরাজ শত ফণা বিস্তার ক'রে বিরাজ করছেন। কতকগুলি নারী মূর্তি নাগরাজের বেদীটি বেষ্টন ক'রে আছেন। এঁদের কটীদেশ থেকে উপরের অর্ধেক অংশ নারী মূর্তি, নিম্নভাগ সর্পাকৃতি।

পুরোহিত নাগরাজ ও পার্শ্বস্থ নাগিনী দেবীদের মস্তকে সিন্দুর দিলেন। আমরা বেদীর অতি নিকটে গিয়ে প্রদীপের আলোকে নাগরাজ ও নাগ কন্যা কিংবা নাগ দেবীদের নিরীক্ষণ ক'রে মন্দিরের বাইরে এলাম।

গৃহিণী প্রাঙ্গনের অশ্বত্থ মূলের বেদীর নাগদের মস্তকে সিন্দুর লেপন ক'রে প্রণাম করলেন। প্রাঙ্গনের পার্শ্বে কয়েকটি কুঠির। অনেকগুলি সন্ন্যাসী এখানে স্থায়ীভাবে রয়েছেন। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গনটির পরিবেশ বেশ শান্ত। আমরা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মন্দিরের চতুর্দিক পরিদর্শন ক'রে হৃষ্টচিত্তে নাগর কয়েল বা মনসা মন্দির থেকে ফটকের বাইরে এলাম।

পথে এসে গৃহিণী বললেন—এখনই বাস ধরব না। প্রথমে এখানকার বাজারটি দেখতে হবে। উদ্দেশ্য বুঝলাম না। প্রশ্নসূচক তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন—কন্যাকুমারীতে ভাল সব্‌জি কিছু পাওয়া যায় না। এখান থেকে কিছু নিতে হবে।

তাঁর সাধু উদ্দেশ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—লওয়া হবে কিসে? দু'টো মন্দিরের পূজার প্রসাদে আমার পকেট ভর্তি হয়ে আছে।

উনি সহজ ব্যবস্থা দিলেন—একটা র‍্যাশন ব্যাগ নিলেই হবে।

বাজারে এলাম। কয়েকটি দোকান পরীক্ষা ক'রে একটি দোকানে উঠলাম। এটিতে সব্‌জি ও মুদিখানার সকল প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়। দোকানদার মধ্য বয়স্ক সৌখীন ভদ্রলোক। পাশের মুদীখানার

দোকানটিতে বসে একটি বালক ভৃত্য। মালিক স্বয়ং বসেন সব্‌জির দোকানে। তিনি আমাদের দু'জনকে সাদরে দু'খানি চেয়ার দিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন।

গৃহিণী মুদী বিভাগ থেকে দেড় কিলো আটা ও আধ কিলো চিনির অর্ডার দিলেন। বললেন—কন্যাকুমারী অপেক্ষা এখানকার আটা অনেক ভাল।

আটা প্রতি কিলো এক টাকা। চিনি সম্মুখে থাকা সত্বেও কাল-বাজারের দরে নিতে হ'ল। অর্দ্ধ কিলো চিনির মূল্য দিলাম বারো আনা। আমার পকেটে একটি ঝাড়ন ছিল দোকানদার ভদ্রলোক আটা ও চিনি কাগজে প্যাক ক'রে ঝাড়নে বেঁধে দিলেন। এখন সব্‌জির সওদা নেব কিসে? আমি ভদ্রলোককে বললাম—আমাদের সব্‌জি লওয়ার বিশেষ আবশ্যক ছিল কিন্তু আমরা কোন ব্যাগ আনি নি।

তিনি হেসে বললেন—সে জন্য চিন্তা করবেন না। আপনাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিন। আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।

ইনি উচ্চ শিক্ষিত। ইংরাজী ও হিন্দি ভালই জানেন। বাঙ্‌লায় এরূপ কোন শিক্ষিত লোক্‌কে চাকরি না ক'রে সব্‌জির দোকানদারী করতে দেখলে, তাঁর মস্তিষ্কের দোষ কিংবা দারিদ্র দোষে মানুষ কতদূর হীন পর্যায়ে নামতে পারে তার প্রমাণ দিয়ে সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। কৌতূহলবসে তাঁর শিক্ষার মান জেনেছিলাম। ইনি ত্রিবেন্দ্রাম ইউনিভারসিটির গ্রাজুয়েট। সরকারী কাজ পেয়েছিলেন। সেদিকে মনযোগ না দিয়ে ব্যবসায় পছন্দ ক'রে নিয়েছেন। বর্তমান এঁর দু'খানি দোকান থেকে মাসিক আয় হয় প্রায় পাঁচ শত টাকা। শীঘ্রই একটি সাবানের কারখানা স্থাপনের চেষ্টায় আছেন।

গৃহিণী সব্‌জির সওদা আরম্ভ করলেন। আমাকে বললেন—কন্যাকুমারীতে আলু, পেঁয়াজ পাওয়া যায়। এখানকার আলু ভাল, এক কিলো নেওয়া হোক।

বললাম—হোক্।

তারপর একটি ছোট বাঁধাকপি, মূল ও পত্র সমেত দু'টি ফুলকপি, আধ

কিলো মটর শুঁটী, টমেটো আড়াই কিলোগ্রাম ও হু'টি বেগুণ মোট মূল্য হ'ল তিন টাকা চার আনা।

ভদ্রলোক প্রথমে কপি তিনটির গলায় রজ্জু বেঁধে সহজে হাতে ঝুলিয়ে লওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তারপর একটি মোটা কাগজের ব্যাগ নিয়ে সমস্ত দ্রব্যগুলি এবং আমার পকেটের প্রসাদ, নারিকেল, কলা ও অপহৃত আম্রগুলি একত্রে নিয়ে সযত্নে বেঁধে দিলেন। ফাউ দিলেন কিছু কাঁচা লঙ্কা।

দোকান থেকে বেরিয়ে গৃহিণী বললেন—বেলা অনেক হ'ল। এখানে এত ভাল দোকান দেখছি, ভাল খাবারের দোকান নেই ?

নিকটে তেমন কোন দোকান দেখলাম না। একটি কফির দোকানে উঠলাম। ইচ্ছা ছিল ইড্‌লি-কফি খাওয়া। হঠাৎ দেখলাম দোকানের এক দিকে একটি বৃহৎ কটাহে সদ্য প্রস্তুত বোঁদে রসে হাবুডুবু খাচ্ছে। দাম পাঁচ টাকা কিলো।

বহু দিন এ বস্তু মুখে ওঠে নি। এখন উপাদেয় বস্তু সম্মুখে দেখে আদেশ করলাম হু'টি পাত্রে হু'শ গ্রাম ক'রে দিতে। তারা চামচসহ হু'টি পাত্র আমাদের সম্মুখে দিয়ে গেল। অধিকন্তু কফির আদেশ দিলাম।

রাস্তার দিকে চেয়ে গৃহিণী বললেন—দেখ কি সুন্দর তাজা নটেশাক মাথায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু বেচবে না, দেখ না জিজ্ঞাসা ক'রে ?

লোকটিকে ডাকলাম। সে কফির দোকানের বারান্দায় শাকের বোঝা নামাতে গৃহিণী পছন্দ মত কিছু শাক হাতে নিলেন।

লোকটি এতে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। সে এক কিলো পরিমাণ শাক তুলে গৃহিণীর হাতে দিলে।

গৃহিণী তাকে বললেন—আমাদের এত প্রয়োজন নেই। অল্প কিছু হলেই আমাদের কাজ মিটবে। লোকটি হিন্দি জানে না। তার নিজের ভাষায় অনেক কথা বলে আর হাসে।

পরিশেষে দোকানের মালিক সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি আমাদের বললেন—এ লোকটি এক বাগানের মালী। বাগান পরিস্কার ক'রে আগাছা নিয়ে যাচ্ছে তার গাভীদের আহারের জন্য। এর মূল্য লাগবে না, আপনারা

ইচ্ছামত নিতে পারেন।

গৃহিণী আনন্দে এক কিলো পরিমাণ শাক আমার হাতে দিলেন। শাকওয়ালা নমস্কার ক'রে হাসতে হাসতে চলে গেল। দোকান থেকে সামান্য রশি নিয়ে শাকগুলি কপির সঙ্গে একত্রে বেঁধে নিলাম। পরে জেনেছিলাম দক্ষিণ প্রদেশে শাকের ব্যবহার ও সমাদর নেই।

কিছুদূর এসে বাস পেলাম। কন্যাকুমারীতে নামলাম বেলা একটায়। আহারাদির পর বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেরিয়ে পড়লাম গান্ধি-ঘাটের দিকে। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ পেলাম শিবাণীর ও ঘেঁটুর।

ঘেঁটু অভিমানের সুরে বললে—কাকীমা, আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন? আমি সকালে দেখে এলাম আপনাদের ঘরে তালা বন্ধ।

আমি বললাম—আজ সকালে গিয়েছিলুম শঙ্কর মন্দির দেখতে সুচিন্দ্রম। আরও কিছুদূরে গিয়ে দেখে এলাম নাগ মন্দির।

শিবাণী বললেন—আমিও শুনেছি সুচিন্দ্রম আর নাগর কয়েলের কথা। একদিন গিয়ে দেখে আসব। এখন কোথায় চলেছেন?

বললাম—চলেছি গান্ধি-ঘাটের দিকে।

শিবাণী বললেন—চলুন আমরাও যাই। সকলে গান্ধি মন্দিরের ছাদে গিয়ে বসলাম।

শিবাণী গৃহিণীকে বললেন—দিদি, কন্যাকুমারী থেকে নিলেন কিছু?

গৃহিণী বললেন—এখানে একমাত্র ভাল জিনিস দেখছি মাতুর। বেশ মজবুত আর সুন্দর দেখতে। দামও বেশী নয়। এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা। বাড়ীর জন্যে নিতে হবে মালা আর চুড়ি। এগুলো এখানে বেশ তৈরী করে। সকলেই কিছু কিছু নিয়ে যায়। সেদিন দেখলাম দু'টো মেম-সাহেব একগোছা ক'রে শাঁখের-মালা কিনে গলায় পরেছে।

শিবাণী বললেন—আমি আজ সকালে কন্যাকুমারীর ছবি আর চার প্যাকেট সমুদ্রের বালি কিনেছি। আর একটা জিনিস কিনে বিপদে পড়েছি ঐ এসট্রে নিয়েছি দু'টো। এরা যাকে বলে সমুদ্রকা নারিয়েল। আপদ জিনিস, যেখানে রাখছি বড় বড় কালো পিঁপড়েয় ঘর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

গৃহিণী বললেন—আমাদের ঘরে ডেটল আছে। এক সময় নিয়ে এসে কয়েক ফোঁটা দিলে সব পিঁপড়ে পালিয়ে যাবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। গান্ধি মন্দির থেকে নেমে এসে ঘেঁটু বললে—কাকীমা একটা কথা বলব, রাগ করবেন না? অনেকদিন আপনার হাতের রান্না খাই নি। এদিকের লজে, হোটেলে খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরেছে। একদিন আপনার হাতের রান্না খাওয়াবেন?

গৃহিণী বললেন—দিন ধার্যের প্রয়োজন কি? কাল সকালে তোমরা দু'জনেই আমাদের রেষ্ট-হাউসে গিয়ে খেয়ে আসবে। আমার সৌভাগ্য কন্যাকুমারীতে এসে দু'জন কুমারী ব্রাহ্মণ কন্যার পাতে অন্ন দেব, এর চেয়ে আর বড় পুণ্য কি আছে!

শিবাণী বললেন—আমি জানি ও মহা পেটুক, বিদেশে এসে কাকেও কষ্ট দিয়ে খেতে নেই। ঐ যাবে দিদি, আমাকে আর জড়াবেন না।

গৃহিণী বললেন—সে হয় না শিবাণী। আমি তোমাদের দু'জনকেই নিমন্ত্রণ করছি, তুমি না গেলে আমি মনে কষ্ট পাব।

শিবাণী বললেন—তাই হবে। আপনার দেহকে কষ্ট দিয়ে খেয়ে আসব। না গিয়ে মনে কষ্ট দিতে পারব না। এখানে রান্নার মত কোন ভাল জিনিস বাজারে দেখতে পাই না। আমি কয় দিন ডাল আর ভাজা খেয়ে কাটাচ্ছি।

ঘেঁটু ও শিবাণীকে তাদের রেষ্ট-হাউসে ছেড়ে আমরা ফিরলাম। রেষ্ট-হাউসে এসে গৃহিণীকে বললাম—কাল তোমার কুমারী ভোজন হবে। কিশোরী কুমারী দু'টি কখন আসবেন তাঁদের বলে দিলে না?

গৃহিণী রুষ্ট হয়ে বললেন—সকল বিষয়ে বিদ্রুপ করতে নেই। ওদের বয়স না হয় হয়েছে, কুমারী কন্যা তো বটে। কাল সকালে গিয়ে একবার বলে আসবে দশটায় আসতে।

পরদিন কুমারী ভোজনটা ভালই হ'ল। আধখানা বাঁধাকপি, একটা ফুলকপি উঠে গেল। নটেশাকের অর্ধেকের সদগতি হ'ল। সুচিন্দ্রমের অপহৃত আমের চাটনি ক'রে কুমারী ভোজন হওয়াতে মনে হয় আমার পাপের কিছুটা হ্রাস হয়েছিল।

আহারের পর ঘেঁটু সকলের উচ্ছিষ্ট পাতা একত্র ক'রে নিয়ে নীচে নেমে গেল। গৃহিণী নিষেধ করাতে উত্তর দিলে—আমি সকলের ছোট, অতএব এটা আমারই ডিউটি।

আমি বারান্দায় বসে সেই চির নূতন ও চির পুরাতন সমুদ্রের তরঙ্গের পানে তাকিয়ে রইলাম। শিবাণী ও গৃহিণী পান মুখে দিয়ে দেশের কই মৎস্যদের জন্য কতখানি বিরহ ব্যথা অনুভব করছেন উভয়ে তাই জানাতে বসলেন।

অকস্মাৎ গৃহিণী বারান্দায় এসে বললেন—আধ ঘন্টা হ'ল ঘেঁটু গ্লাস, বাটি হাতে নীচে নেমে গেল এখনও ফিরল না। কোথায় গেল একবার নীচে গিয়ে দেখ তো।

আমায় যেতে হ'ল না। গ্লাস, বাটি হাতে পাশের একটা কামরা থেকে বেরিয়ে এল ঘেঁটু।

সে আসতে শিবাণী বললেন—এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

ঘেঁটু বললে—ঐ ঘরে একদল মাদ্রাজী যাত্রী এসেছে। তাদের ঘরে বসেছিলাম।

শিবাণী বললেন—মাদ্রাজী ভাষাটা শিখে এলি?

ঘেঁটু বললে—সারা দক্ষিণ প্রদেশের ভাষা এক নয়। শেখার অনেক বাহাদুরি আছে। মাদ্রাজী ভাষা শিখতে হ'লে পাঁচ রকম ভাষা শিখতে হবে। তামিল, তেলেগু, মালয়ম, কানারা, কুন্‌কিন্। এই পাঁচটি বিভিন্ন ভাষা নিয়ে এদেশ চলছে।

আমি বললাম—আমি তো কোন পার্থক্য বুঝতে পারি না। এদেশে সকল স্থানেই শুনি এ্যাগু-ইল্লা।

ঘেঁটু বললে—সহজে বোঝার কোন উপায় নেই। উচ্চারণ এ-দেশের পাকা। মন্দিরে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ ক'রে পূজা করেন। ঐ মন্ত্র দেব-ভাষা সংস্কৃত। আপনি পুরোহিতদের মন্ত্র পাঠ শুনে বলুন দেখি ওঁরা কি ভাষায় মন্ত্র বলছেন? আমার মনে হয়, এদের ভাষার মধ্যে যদি বর্ণমালার 'ট' আর 'ম' বাদ দেওয়া হয় ভাষার হয়তো অস্তিত্ব থাকবে না।

গৃহিণী বললেন—ওঁরা যে ভাষাতেই কথা বলুন ভাষাটা তো ভারতীয়

ভাষাই ? কিন্তু ওঁদের গান শুনলে মনে হয় না যে ভারতীয় সুর বা সঙ্গীত।

শিবাণী বললেন—এই সঙ্গীতের গর্ব কত ? কেউ শুনুক বা না শুনুক, বুঝক বা নাই বুঝুক নিজেরাই আনন্দে মস্‌গুল।

বললাম—এদের দেশে বসে, এদেরই নিন্দা করা উচিত নয়।

ঘেঁটু বললে– নিন্দা আমি করছি না। এরা যেন দক্ষিণ ভারতকে অন্য প্রদেশ থেকে সতন্ত্র ক'রে রাখতে চেষ্টা করে। এ প্রদেশকে সুখ্যাতি করারও যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এ-দেশকে উচ্চ সম্মান দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া স্থাপত্য শিল্পকলায় এরা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

এদেশের লোককে আমি কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ শ্রদ্ধা করি। দক্ষিণ ভারতের যতটুকু ঘুরলাম নারীর দিকে কটাক্ষ দৃষ্টি দিতে কোন পুরুষকেই দেখি নি। বিদেশী যাত্রী ও পর্যটকদের উপকার সাধন ক'রে সুনাম অর্জন করা গৌরব মনে করেন। উপকার করবার একটা আন্তরীক ইচ্ছাও আছে। নারীর যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে থাকে। আরও একটা বিষয়ে এদের প্রশংসা না ক'রে পারি না—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

বললাম—ভারতের অন্যান্য প্রদেশ না দেখেই মন্তব্য পাশ করো না।

এই সময় 'আম্মা' বলে ভাস্কর এসে হাজির হ'ল। আজ কক্ষে দু'জন নূতন মহিলাকে দেখে সে একটু সঙ্কুচিত হয়ে প্রশ্ন করলে—মাইজী, আপনারা ত্রিবেন্দ্রাম কবে যাবেন ?

আমি বললাম—আমাদের এ স্থানে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, আমরা পরশু সকালে ত্রিবেন্দ্রাম যাব। তুমি এসে আমাদের ব্যবস্থা ক'রে দিও।

আজ সে অপেক্ষা না ক'রে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। অন্য দিনে সে এত শীঘ্র যায় না। একটা বড় রকমের গল্প ফেঁদে বসতো। আজ নবাগতদের অবস্থানেই সহজেই প্রস্থান করলে।

শিবাণী বললেন—আপনারা ত্রিবেন্দ্রামের পর কোথায় যাবেন ?

বললাম—ত্রিবেন্দ্রাম থেকে মাদুরা যাব। এখানে আসার পথে আমরা

মাদুরার মিনাক্ষী মন্দির দেখে আসতে পারতাম। ভাবলাম, পুনরায় যখন এই পথেই আসতে হবে তখন দূর পাল্লার পথটা সেরে আসাই ভাল। আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, ত্রিবেন্দ্রামের কিছু দূরে কোট্টালেম জলপ্রপাত ও দেব মন্দির আছে। যদি সুবিধা হয় যাওয়ার চেষ্টা করব। সেদিকে সচরাচর যাত্রীরা যায় না। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নাকি যাওয়া প্রশস্ত। দেখি কতদূর কি করতে পারি। তোমরা মাদুরা যাবে না ?

শিবাণী বললেন—আমরা রামেশ্বর থেকে মাদুরায় এসে এক রাত্রি থেকে মিনাক্ষী মন্দির দেখে এসেছি! আমার স্কুলের ছুটী শেষ হয়ে এসেছে। আমি হয়তো এখান থেকেই ফিরে যাব। মাইশোর দেখার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। যদি পয়সার সঙ্কুলান করতে পারি চেষ্টা করব।

ঘেঁটু বললে—দিদিমণির মত মাদুরা দেখার অপেক্ষা না দেখাই ভাল। সন্ধ্যায় ট্রেন থেকে নেমে একটা ধর্মশালায় মালপত্র রেখে চলে গেল মন্দির দেখতে। কি দেখলেন জানি না, পরদিন সকালের ট্রেনে এলেন কন্যা-কুমারী। আমি ধর্মশালায় শুয়েছিলাম, কোথাও কিছু দেখি নি। সকালে চলে এলাম কন্যাকুমারীতে।

শিবাণী বললেন—মন্দির দেখলাম। সন্ধ্যায় মিনাক্ষীর পূজা-আরতি দেখলাম। আবার কি জন্য থাকব ?

গৃহিণী বললেন—আমরা মাদুরা যাব। তুই আমাদের সঙ্গে চল। তুই তো কিছু দেখিস নি।

ঘেঁটু বললে—এ জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছে আরও কয়েকদিন থাকব। তারপর আমি মাদুরা গিয়ে আপনাদের সঙ্গে মিলব।

গৃহিণী বললেন—আমাদের ত্রিবেন্দ্রাম হয়ে মাদুরা যেতে পাঁচ ছয় দিন সময় লাগবে। তুই কি ততদিন এখানে থাকবি ? তারপর মাদুরা গিয়ে আমরা কোথায় থাকব তুই কেমন ক'রে জানবি ?

ঘেঁটু বললে—আপনারা যেখানেই থাকুন সে সন্ধান আমি ক'রে নেব। এখানে দিদিমণিও দু' চার দিন থাকতে পারেন। আমি এক সপ্তাহ পরে মাদুরা গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।

কিছু পরে বিদেশে আত্মীয়ের অধিক স্নেহ, দরদের জন্য শিবাণী ও ঘেঁটু,

গৃহিণীকে প্রশংসা ক'রে বিদায় নিলে।

গৃহিণীকে বললাম—কুমারীরা ভোজন ক'রে চলে গেল। এখন কি কোথাও যাবে, না বিশ্রাম করবে?

গৃহিণী বললেন—আজ সন্ধ্যার পর বেরিয়ে মন্দিরে আরতি দেখে আসব। বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—দেখ দেখ, ছেলেগুলোর কাণ্ড দেখ। ক'দিন ধরে দেখছি সকাল থেকে সারাদিন সমুদ্রের জলে দাপাদাপি করছে। ওদের মা-বাপ নিষেধ করে না?

বললাম—না, ওদের বাবা মায়েরা ছেড়ে দিয়েছে সমুদ্রের জলে দাপাদাপি অভ্যাস করতে। তোমরা যেমন ছেলেদের পাঠিয়ে দাও স্কুল পাঠশালায়। তারপর ছেলেরা বড় হলে লেখাপড়া শিখলে ছেলেদের বাবারা বা অবিভাবকরা নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় তাদের অফিসের চেয়ারে কিংবা উপযুক্ত কাজে। এরাও সেই রকম ছেলেদের ছেড়ে দিয়েছে সমুদ্রের জলে সাঁতার অভ্যাস করতে। বড় হ'লে সঙ্গে নিয়ে যাবে ডিঙ্গিতে, রুজী-রোজগারের জন্য।

গৃহিণী বললেন—তাই বলে এই রকম বাচ্চাদের সমুদ্রের জলে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে কি ভাবে জানি না। এখন সমুদ্রের জোয়ার এসেছে। আজ নিশ্চয়ই দু' একটা যাবে সমুদ্রের জলে তলিয়ে!

বললাম—কোন চিন্তা নেই। জোয়ারেই ওদের জোর আনন্দ। সমুদ্রে ডুবে উঠে সারাদিন ঢেউয়ের ধাক্কাকে পরাস্ত ক'রে সন্ধ্যার পর বাড়ীতে গিয়ে খেতে বসবে।

গৃহিণী বললেন—ধন্য সাহস ওদের মা বাপের। বাচ্চা ছেলে সব, বিপদ হতে কতক্ষণ। আজ এইখানে বসে ওদের কাণ্ডটা দেখব। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর পুনরায় বললেন, ওদের বাড়ী কোথায়?

বললাম—কেন? ওদের বাড়ী গিয়ে বাপ মায়েদের সাবধান হতে পরামর্শ দিয়ে আসবে না কি?

তিনি বললেন—মিথ্যা কথা নয়। ওদের একজন বড় কেউ সঙ্গে থাকা উচিত। বিপদের কথা কি বলা যায়।

বললাম—যুক্তিপূর্ণ কথা। আজ বৈকালে অনুসন্ধান ক'রে ওদের বাড়ীতে

যাওয়া যাবে। এরপর বিশ্রামের ইচ্ছায় শয্যা নিলাম।

অপরাহ্নে বারান্দায় এসে দেখলাম, গৃহিণী তখনও বারান্দায় বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন—এখন জোয়ারের জলে ছোট ছোট রকগুলো সব ডুবে গেছে। ছেলেগুলো বোধহয় ভয়ে পালিয়েছে।

বললাম—যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। রাত্রে নিদ্রা হবে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহিণী মন্দিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বললেন—তৈরী হয়ে নাও মন্দিরে যেতে হবে।

বললাম—তৈরী হয়েই আছি। জামাটা গায়ে চড়ালেই হবে।

উনি বললেন—সে দিন মন্দিরে গিয়েছিলে কি জামা গায়ে দিয়ে ?

বললাম—সেদিন গিয়েছিলাম দেবীর পূজা দিতে। এখন মাত্র আরতি দেখে আসব।

বললেন—যে কাজেই যাও, যে সময়েই যাও, মন্দিরে ঢুকতে হলে সেই বেশে যেতে হবে।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রে নগ্ন গাত্রে উত্তরীয়·কাঁধে ফেলে গৃহিণীর সঙ্গে মন্দিরের দিকে গেলাম।

রাত্রির আলোকে দেবী মূর্ত্তির নূতন শোভা দেখলাম। আরতি শেষ হ'ল। লক্ষ্য কবলাম, নাটমন্দিরের এক প্রান্তে ঘেঁটু ও শিবাণী চক্ষু মুদে ধ্যানে বসে আছে।

গৃহিণীকে দেখালাম। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করেও তাদের ধ্যান ভঙ্গের লক্ষণ না দেখে আমরা রেষ্ট-হাউসের দিকে ফিরলাম।

পরদিন প্রভাতে গৃহিণী বললেন—কাল সারাদিন কোথাও যাওয়া হয় নি। চলো আজ কন্যাকুমারী সহরটা দেখে আসি।

কেরালা-হাউসের পশ্চাত দিয়ে পশ্চিম দিকে গেলাম। কিছু দূর এসে দেখলাম এ-স্থানটি কন্যাকুমারীর পুরাতন পল্লী। অধিকাংশ দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোকের বসবাস, তার পাশেই হসপিটাল। রাস্তার পূর্বদিকে একটি গীর্জা ও একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। একটি বালিকা বিদ্যালয়ও আছে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ কিছুই নেই।

পথের পার্শ্বে কয়েকখানি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান। একখানি মুদীর দোকানে গিয়ে বসলাম, সরষের তেলের আবশ্যকে।

দোকানদার বললেন—এ প্রদেশ সরষের তেলের নামও জানে না। ভাল তিল তেল আছে নিতে পারেন। নারিকেল তেল আছে দেখতে পারেন। এদেশের সাধারণে রন্ধনে ব্যবহার করে।

গৃহিণী হাতের তালুতে কিছু নারিকেল তেল নিয়ে পরীক্ষা ক'রে বললেন—কি চমৎকার সুগন্ধ। দেখে ইচ্ছা হ'ল কিছু লওয়ার জন্য। রন্ধনের জন্য নয়, স্নানের সময় ব্যবহারে লাগতে পারে।

এরপর রেষ্ট-হাউসে ফিরে এসে দেখলাম, ভাস্কর কন্যাকুমারী দেবীর ভোগের প্রসাদ এনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। একটি পাত্রে আতপ চালের অন্ন, নারিকেল সহযোগে একটা ব্যাঞ্জন। খেঁসাড়ি কিংবা ঐ জাতীয় পাতলা ডাল ও সামান্য পরমান্ন। আজ আর আমাদের রন্ধনের আবশ্যক হ'ল না।

ভাস্কর বললে—আপনারা কাল সকালে যাবেন ত্রিবেন্দ্রামে ; আটটায় বাস। আমি এসে বেডিং বেঁধে ব্যবস্থা ক'রে দেব। এদিকে আপনাদের সব দেখা হ'ল একটা জিনিস বাকী থেকে গেল। কাল এসেছিলাম বলতে। বাইরের মাইজীরা ছিল বলতে ভুলে গেছি।

গৃহিণী আগ্রহে বললেন—কি আছে সেখানে, কত দূর ?

ভাস্কর বললে—গন্ধমাদন পাহাড়। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সময় হনুমান বিশল্যকরনীর গাছ চিনতে না পেরে, গন্ধমাদন পাহাড় মাথায় ক'রে নিয়ে যায়। পরে যখন পাহাড়টি নিয়ে আসে ঠিকভাবে আর বসাতে পারে নি। সেই থেকে ঐ পাহাড়ের একদিক নীচু আর একদিক উঁচু হয়ে আছে। এখান থেকে চার পাঁচ মাইল দূর। কালকের দিন থাকলে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিতাম।

ভাস্করকে বললাম—এরপর যদি কোন দিন এদিকে আসতে পারি গন্ধমাদন দেখে যাব। গৃহিণীর প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাঁকে কোনরূপে নিরস্ত করলাম।

আহারের পর গৃহিণী বললেন—চলো একবার গান্ধি-ঘাটের দিকে গিয়ে

বাড়ীর জন্মে গোটাকয়েক জিনিস নিতে হবে। বেশী কিছু নয় তিন চার রকমের বালির প্যাকেট, দু'টো সমুদ্রের নারকেল আর কয়েকগাছা মালা। গান্ধি-ঘাট থেকে ফেরার পথে শিবাণীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাদের রেষ্ট-হাউসে গিয়ে দেখলাম দ্বারে তালা বন্ধ। ফিরেই আসছিলাম, কিছুদূর এসে বিবেকানন্দ লাইব্রেরীর দিকে লক্ষ করতে দেখলাম ওরা উভয়ে এক একখানি পুস্তক হাতে নিয়ে পাঠে নিবিষ্ট রয়েছে। ওদের বাইরে ডেকে কাল প্রাতে আমাদের কন্যাকুমারী ত্যাগের সংবাদ জানালাম।

ঘেঁটু ও শিবাণী উভয়ে আমাদের সঙ্গে রেষ্ট-হাউসে এসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে বিদায় নিলে।

পরদিন প্রত্যুষে ভাস্কর এসে আমাদের বেডিং বেঁধে দ্রব্যাদি গুছিয়ে মালপত্র কেরালা-হাউসের বারান্দায় এনে রাখলে। ত্রিবেন্দ্রামে যাওয়ার জন্য কেরালার বাসই উৎকৃষ্ট। তার পরামর্শে আমরা কেরালা বাসে উঠলাম। ভাস্করকে বিদায় দিতে গৃহিণীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল।

ত্রিবেন্দ্রাম

বাস চলেছে। কয়েকদিন পূর্বে এই পথেই আমরা সুচিন্দ্রম গিয়েছিলাম। কয়েকখানি গ্রাম অতিক্রমের পর কাষ্ঠ-ফলকে নির্দেশ দেখলাম—"কেরালায় প্রবেশ করুন।" অনুমান করলাম, এইবার আমরা কেরালায় পৌঁছে গেছি। আরও কিছুদূর এসে একটি বাজারের পাশে বাস বিরাম নিলে। অনেকে চা বা কফি পানের জন্য নেমে গেলেন' দেখলাম এইস্থানে কয়েকটি দোকানে গ্লাস গ্লাস প্রচুর পানীয় বিক্রয় হচ্ছে। ক্রেতাও প্রচুর।

সেস্থানে গিয়ে দেখলাম, গ্লাসে বিক্রয় হচ্ছে তালশাঁসের সরবৎ। দু'গ্লাস নিলাম। চামচ দিয়ে তালের শাঁস নির্গত ক'রে কিছু সিরাপ ও বরফ সহযোগে উপাদেয় এই পানীয় প্রস্তুত হয়েছে। এরূপ বস্তুর অপূর্ব স্বাদ।

ইতিপূর্বে গ্রহণ করি নি। পরে ত্রিবেন্দ্রামে একটি দোকানে এইরূপ সরবৎ প্রস্তুত করতে দেখে গৃহিণীর আগ্রহে নিয়েছিলাম। কিন্তু তার স্বাদ এত মধুর নয়।

পুনরায় বাস চলতে শুরু করলো। কেরালার গ্রাম্য দৃশ্য অতি মনোরম। সকল সময় মনে হতে লাগলো বাস থেকে নেমে পার্শ্বের গ্রামগুলি পরিদর্শন ক'রে আসি।

এর কিছু পরেই একটি কাষ্ঠ-ফলকের নির্দেশে আমাদের ত্রিবেন্দ্রাম প্রবেশের স্বাগত জানাচ্ছে। ক্রমে বাস সহরের মধ্যভাগে নারায়ণ মন্দিরের সন্নিকটে হাজির হ'ল। কয়েকজন কুলি আমাদের অবতরণের অনুরোধ ক'রে নিকটে ভাল ধর্মশালার আশা দিলে। বাস কণ্ডাকটর আমাদের নিষেধ ক'রে পরামর্শ দিলেন বাস-ষ্ট্যাণ্ডের নিকট কোন লজে স্থান গ্রহণে। এ সকল ধর্মশালায় আমাদের সকল প্রকার অসুবিধা হবে।

বাস ষ্টেশনে এসে নামলাম। এর পাশেই রেলওয়ে ষ্টেশন। এ-স্থানের কুলিদের নিকট ধর্মশালার কথা উত্থাপন করাতে তারাও লজে যাওয়ার পরামর্শ দিলে।

কুলিরা বাস ও রেল ষ্টেশনের অতি নিকটে একটি লজে আমাদের তুলে দিলে। লজটির নাম নারায়ণ-লজ। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছোট একতল ভবন। মাত্র আট দশখানি কামরা। প্রতি কামরায় বিজলী বাতী, খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার ও আলমারি আছে। ভাড়া দৈনিক ছ'টাকা। পাখার আবশ্যক হলে আট আনা আরও অধিক। ফাল্গুনের প্রথম। তাদৃশ গরম অনুভব করি নি সুতরাং পাখারও আবশ্যক হয় নি।

এ লজের সঙ্গে কোন হোটেলের সংযোগ ছিল না। লজের কক্ষে রন্ধনের অনুমতি থাকায় আমাদের বিশেষ সুবিধা ছিল।

অপরাহ্নে রেল ষ্টেশনে গিয়ে মাদুরা যাওয়ার জন্য ত্রিবেন্দ্রাম মাদ্রাজ-এক্সপ্রেসে চার দিনের ব্যবধানে ছ'টি বার্থ রিজার্ভ করলাম। তারপর গেলাম সহরের দিকে, নারায়ণ মন্দিরে সান্ধ্য আরতি দেখার ইচ্ছায়।

কিছুদূর এসে দেখলাম প্রধান রাস্তার উপর 'মূলজী ভাই জেঠমল' গুজরাটী ধর্মশালা। এ ধর্মশালার নাম আমি পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করেছিলাম। বৃহৎ

ভবন। বহির্ভাগ থেকে দেখলাম সংস্কার অভাবে হত-শ্রী অবস্থা। ধীরে ধীরে এলাম ত্রিবেন্দ্রামের বিখ্যাত পদ্মনাভ স্বামী বা নারায়ণ মন্দিরের সন্নিকটে।

মন্দির দ্বারে এসে শুনলাম, আজ মন্দিরে কোন দর্শককে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। এখন দশ দিন ব্যাপি উৎসব চলছে। আজ উৎসবের পঞ্চম দিন। রাত্রি আটটার পর মন্দির অভ্যন্তরে নৃত্য আরম্ভ হবে। সে কারণ পূর্বাহ্ণে পূজা-আরতি সমাধা ক'রে মন্দির দার রূদ্ধ হয়েছে। পুনরায় দেব দর্শন হবে কাল প্রাতে।

মন্দির প্রহরীরা বললেন—যদি নৃত্য দেখতে ইচ্ছা করেন রাত্রি আটটায় আসবেন। সাধারণের প্রবেশে বাধা নেই।

অসময়ে মন্দিরের পূজা সমাধা ক'রে নৃত্য-গীতের উপর প্রাধান্য দেওয়াতে গৃহিণী বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। ভগবান দর্শনে বাধা দিয়ে নৃত্য দেখার নিমন্ত্রণ। দেশের কি অনাচার অব্যবস্থা। মন্দিরের প্রহরী, পুরোহিত এমন কি ভগবান পদ্মনাভের প্রতিও অশ্রদ্ধা নিয়ে আজকার মত লজে ফিরলেন।

পরদিন প্রত্যুষে মন্দিরে যাওয়ার আগ্রহে গৃহিণী প্রস্তুত হলেন। সঙ্গে নিলাম একটি র‍্যাশন ব্যাগ। ভগবান দর্শন ক'রে যাব বাজারে কিছু আহার দ্রব্যের সংগ্রহে।

গত কাল ছিল রবিবার। সহরে, দোকানে, বাজারে বিশেষ কিছুই দেখা হয় নি। এরপর নারায়ণ মন্দির প্রবেশে বাধা পেয়ে মানসিক অবস্থা গিয়েছিল বিগড়ে। আজ সহরের প্রধান রাস্তায় এসে উপলব্ধি করলাম এই কেরালা রাজধানী ত্রিবেন্দ্রাম, মাদ্রাজ সহর অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়।

মন্দির দ্বারে এলাম। এ-স্থানে কন্যাকুমারী অপেক্ষা মন্দির প্রবেশের আইন আরও দৃঢ়। সে স্থানে গাত্রাবরণটি কোটিদেশে জড়িয়ে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায়। এ মন্দিরে পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় ব্যতীত কোন দ্রব্য সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মন্দিরের পাশে দু'খানি কক্ষে পাদুকা ও বস্ত্রাদি রাখার ব্যবস্থা আছে। তার জন্য কিছু নমস্কারি দিতে হয়।

আমরা কিছু পূজার ফুল ও দ্রব্য নিয়ে কয়েকটি সোপান অতিক্রম ক'রে গোপুরমের মধ্য দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দির সীমানার মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ নাটমন্দির। তার পশ্চাতে মূল মন্দির। এ মন্দিরের দ্বার সকল সময় উন্মুক্ত থাকে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে দর্শন পাওয়া যায়।

মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। দেখলাম পদ্মনাভ নারায়ণের অনন্ত শয্যামূর্তি। এরূপ মূর্তি দেখেছি শ্রীরঙ্গমে। আরও পরে দেখেছি মহীশূরের নিকটে শ্রীরঙ্গপত্তমে। এ স্থানের মূর্তি আকারে কিছু ছোট। কিন্তু বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ। দর্শনের পর ভূমিষ্ট হয়ে প্রণামে উদ্যোগমাত্র এক পুরোহিত কিংবা মন্দির প্রহরী আমার হাত ধরে তুলে বললেন—এ বিগ্রহের সম্মুখে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম বিধি নয়। দণ্ডায়মান অবস্থায় করজোড়ে কপাল স্পর্শ ক'রে নমস্কার বিধি। কারণ নারায়ণ আছেন শয্যায় শায়িত। ভক্ত ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলে তাঁকে উপবেশন করতে হবে। আমার এ জ্ঞান ছিল না। এবার করজোড়েই নারায়ণকে প্রণাম জানালাম।

মূল মন্দিরের তিনটি দ্বার। তিনটি দ্বারে গিয়ে বিশেষভাবে না দেখলে সম্যক বিগ্রহ দেখার সুবিধা হয় না। পূজান্তে জনৈক পুরোহিত আমাদের হাতে মালপো প্রসাদ দিলেন।

বিগ্রহ দর্শন ও পূজার পর বাইরের সেই কক্ষে এসে আমাদের গচ্ছিত দ্রব্য উদ্ধার করলাম। শুনলাম অপরাহ্নে মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য হবে। উৎসবের কয়েকদিন প্রত্যহ নৃত্য হয়ে থাকে। বহু পুরুষ ও মহিলা সমবেত হন সেই নৃত্য দর্শনে।

প্রধান রাস্তা থেকে নারায়ণ মন্দির পথের অগ্রভাগে সিদ্ধিদাতা গণেশের মন্দির। দেখলাম অনেকে এ মন্দিরে পূজা দিচ্ছেন। মন্দির পথের একদিকে একটি বৃহৎ সরোবর। সরোবরের তীরে কয়েকটি ভবন। সেগুলি নাকি যাত্রীদের বিশ্রাম স্থান। ধর্ম্মশালাও হতে পারে। এ পথের অপরদিকে মন্দির সংক্রান্ত কার্যালয় ও মন্দিরের ভাণ্ডার গৃহ। প্রধান রাস্তা থেকে গোপুরম লক্ষ্য হয়।

মন্দির মধ্যে কতিপয় যমদূত সদৃশ প্রহরী বৃহৎ যষ্টি হাতে ঘোরাফেরা করছে। তাদের সঙ্গে বাক্যালাপে আতঙ্ক হয়। পরে দেখেছিলাম তাদের যেমন বিনীত ব্যবহার তেমনি ভদ্র। মন্দিরে কোন গাইড বা পাণ্ডা নেই। এই প্রহরীরা আনন্দে ও সাগ্রহে যাত্রীদের সাহায্য করেন। মন্দির মধ্যে একটি সুসজ্জিত নাটমন্দিরে উৎসবের সময় নৃত্য, গীত হয়ে থাকে। এ সকল দর্শনের জন্য সর্বসাধারণের অবারিত দ্বার।

প্রধান রাস্তা থেকে মন্দির পথের দুই পার্শ্বে নানা আকারের মূর্তি সজ্জিত রয়েছে। প্রথমে অনুমান করেছিলাম, এগুলি মৃত্তিকা নির্মিত। পরীক্ষা ক'রে দেখলাম সেগুলি প্রমাণ আকারের দারুমূর্ত্তি। দেব মূর্ত্তি নয়, ব্যাঙ্গ কৌতুকপূর্ণ মূর্তি। উৎসবের সময় এগুলিকে মন্দির পথের উভয় পার্শ্বে সজ্জিত করা হয়। নারায়ণের কৃপায় আমরা উৎসবের সময় উপস্থিত হয়ে এগুলি দেখার সুযোগ পেলাম।

গতকাল সন্ধ্যায় মন্দির প্রবেশে বাধা পেয়ে গৃহিণীর মনে যে অশ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল আজ শান্তিতে বিগ্রহ দর্শন ক'রে মন্দির প্রহরী ও পুরোহিতদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে পরম শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি মন্দির থেকে ফিরলেন।

মন্দির পথের বিপরীত ভাগে প্রধান রাস্তার উপর কয়েক একর জমির চতুর্দিকে করগেট টিনের প্রাচীর ও ফটকের উপর আলোক-সজ্জা দেখে গত রত্রিতে অনুমান করেছিলাম বোধহয় কোন সার্কেস দল তাঁবু ফেলেছে। এখন জানলাম সেটি কেরালা প্রদেশের শ্রম-জাত দ্রব্যের বিরাট প্রদর্শণী। শুনলাম প্রবেশ মুল্য জন প্রতি চার আনা।

গৃহিণী বললেন—এক্সজিবিশনটা একদিন দেখতেই হবে।

আমাদের আবশ্যক ছিল বাজারে যাওয়া। স্থানীয় ভদ্রলোকেদের নিকট জানলাম, ইষ্ট গেটের সম্মুখের পথে কিছু দূরে বাজার আছে। মন্দির সম্মুখে ত্রিমুখী প্রধান রাস্তার নাম, ইষ্ট গেট।

প্রদর্শনী মণ্ডপের পাশ দিয়ে বাজারের পথ ধরলাম। এ পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্যের অসংখ্য দোকান। ফুলের দোকানগুলি দেখলে আনন্দ হয়। প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সব্‌জি বাজারে

এলাম। সকল প্রকার সব্‌জির বিপুল সমাবেশ। বাজারের একদিকে মাছ-মাংস, ডিমও দেখলাম। একটি বিশেষ দ্রব্য দেখে সেস্থানে আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বস্তুটি পাঁচ ফুট দীর্ঘ ও তদনুরূপ পরিধির একটি কাঁটাল। দেখে মনে হ'ল সেটি অপরিপক্ক। একটি লোক কুড়ুল দিয়ে সেটিকে বিদীর্ণ করার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর কাঁটালটি দ্বিখণ্ড হওয়ার পর দেখলাম তার মধ্যে পীত বর্ণের সুপক্ক রোয়া। গৃহিণীর আগ্রহে মূল্য জানলাম আট আনা কিলো। মাত্র ছয়টি হৃষ্টপুষ্ট রোয়াতে ওজনে হ'ল পূর্ণ এক কিলো। লজে এনে মুখে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম সেগুলি সরস ও সুস্বাদু।

আমাদের লজের সন্নিকটে বাস ষ্টেশনের বিপরীত দিকে একটি বাটীর দ্বারে বিদেশী পর্যটকদের জ্ঞাতব্য অফিস। অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে একটি কক্ষে কয়েকটি ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁদের জানালাম— আমরা কয়েকদিনের জন্য ত্রিবেন্দ্রাম পরিদর্শনে এসেছি, এস্থানে বিশেষ দর্শনীয় বস্তুর একটি তালিকা আমাদের দিন।

তিনি সসম্মানে আমাদের বসালেন। ভদ্রলোকের নাম এইচ, নারায়ণ মূর্তি। ইনি সহকারী ইনফরমেশন অফিসার। বাসের টাইম টেবেল দেখে একখানি তালিকা প্রস্তুত ক'রে আমাদের হাতে দিলেন। তালিকায় প্রথমে উল্লেখ করেছেন মিউজিয়ম। বলেছিলেন এটি আজই দেখে আসবেন।

তাঁকে বললাম—আজ সোমবার। বাঙ্‌লায় ও অন্যান্য প্রদেশে দেখেছি সোমবারে মিউজিয়ম বন্ধ থাকে, এস্থানে কি তার ব্যতিক্রম হবে?

তিনি হেসে বললেন—না, আজ মিউজিয়ম বন্ধ নয়। আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান। তালিকায় লিখিত অন্যান্য সূচিগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। আমরা তালিকা পকেটে নিয়ে লজে ফিরলাম।

আহারের পর বিশ্রামে কাল বিলম্ব না ক'রে মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। বাস থেকে নেমে দেখলাম সহরের এ দিকটি প্রধান আড়ম্বরপূর্ণ স্থান। সরকারী অফিস, আদালত, রাজভবন, পুরুষ ও মহিলাদের উচ্চ বিদ্যালয়, হসপিট্যাল, বৃহৎ গীর্জ্জা, খেলার মাঠ ও রেস কোর্স প্রভৃতি। আমরা মিউজিয়ম দ্বারে এসে দেখলাম—অন্যান্য প্রদেশের মত এস্থানেও

যথা নিয়মে মিউজিয়ম দ্বার রুদ্ধ। ইনফরমেশন অফিসারকে আর এক দফা ধন্যবাদ দিলাম।

মিউজিয়মের পাশেই চিড়িয়াখানা। সামান্য পয়সায় প্রবেশ-পত্র নিয়ে চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করলাম। বিশেষ আকর্ষণীয় কিছুই দেখলাম না। চিড়িয়াখানা দেখে বাসে উঠে এলাম ইষ্ট গেটে। মন্দির সম্মুখে কেরালা রাজ্যের বিখ্যাত কথাকলি নৃত্য দেখার অভিপ্রায়ে। প্রাতে মন্দিরে এসে এ সংবাদ পেয়েছিলাম।

মন্দির পথে এসে দেখলাম নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেছে। গোপুরমের পাদদেশে বহু মহিলা নৃত্য দর্শনে পুর্বাহ্ণে স্থান সংগ্রহ করেছেন। সাধারণ পুরুষ দর্শকেরা পথের পাশেই দাঁড়িয়ে দেখছেন। আমরা মনোমত স্থান সংগ্রহ ক'রে নিলাম।

আমরা কেরালার বিখ্যাত নৃত্যের কথা শুনেছি। কতিপয় রঙ্গমঞ্চে এ নৃত্য দেখেছি। আজ এস্থানে এসে অকৃত্রিম কথাকলি নৃত্য দেখার সৌভাগ্য লাভ করলাম। প্রায় শতাধিক লোক পোষাক ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে এক হস্তে ঢাল অন্য হস্তে কৃপাণ নিয়ে নৃত্য করছেন। বাদ্যের তাল সমন্বয়ে এতগুলি শিল্পীর সমতা রক্ষা যে কিরূপ কঠিন কাজ তা ধারণা করা যায় না। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই অবিরত দুই ঘণ্টা কাল এক যোগে নৃত্য চলেছে। দর্শকের উল্লাসে করতালির ধ্বনি নেই অপলক নেত্রে নৃত্য উপভোগ করছেন।

নৃত্য শেষ হ'ল। নৃত্য শিল্পীগণ ও বাদ্যকারগণ মন্দির অফিসে চলে গেলেন। দর্শকগণ তখনও নিশ্চল। আমরাও যেন বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে আছি। আজও চক্ষের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছে সেই নৃত্য, কর্ণে আসছে তার সঙ্গত তরঙ্গের ধ্বনী।

এরপর গৃহিণীর ইচ্ছা, প্রদর্শনী মণ্ডপে প্রবেশ করা। আমি শুনেছিলাম ত্রিবান্দ্রামের মেরীন বীচ থেকে সূর্য্যাস্ত অতি সুন্দররূপে দেখা যায়। সহর থেকে মেরীন বীচ তিন মাইল পথ। বাসে যাওয়া যায়। সেই বাস এস্থান থেকেই পাওয়া যায়।

গৃহিণীকে প্রদর্শনী দেখায় নিরস্ত ক'রে বললাম—এখন বেলা পাঁচটা।

চলো, বাসে মেরীন বীচ গিয়ে সূর্য্যাস্ত দেখে আসি। ঘুরে এসে এক্সিভিবিশনে গেলেই হবে।

গৃহিণী বললেন—আবার সেই সূর্য্যাস্ত। কন্যাকুমারীতে সাত দিনেও যা দেখতে পেলে না আজ বাস ভাড়া দিয়ে সেই সূর্য্যাস্ত দেখতে যাওয়ার আবশ্যক নেই। হঠাৎ সম্মুখে মেরীন বীচে যাওয়ার বাস এসে গেল। ইতস্ততঃ না ক'রে গৃহিণীকে টেনে নিয়ে বাসে উঠে বসলাম।

গৃহিণী বললেন—এখন যাওয়া বৃথা। আমাদের সমুদ্র তীরে পৌঁছান পর্যন্ত সূর্য্য দেব অপেক্ষা করবেন না।

কিছুদূর যাওয়ার পর অনুমান করলাম গৃহিণীর বাক্যই সত্য প্রতিপন্ন হবে। প্রধান কারণ আমাদের বাসটি চলছে সহরের মধ্যবিত্ত পল্লীর মধ্য দিয়ে। বিদ্যালয়ের বালক বালিকারা ও অফিস প্রত্যাগত ভদ্রলোকগণ ফিরছেন তাঁদের গৃহে। সে কারণ এক ফার্লং অন্তর আরোহীদের ওঠা-নামায় বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। বাস যতই থামে আমরাও সেই পরিমাণ অধৈর্য হয়ে পড়ি। ক্রমে বাস লোকালয় ত্যাগ ক'রে ভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়ায়, দেখতে পেলাম ধীবর পল্লী। জেলে-ডিঙ্গিগুলি ডাঙ্গায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গৃহের দ্বারে রৌদ্রে শুষ্ক হচ্ছে মৎস্যজীবিদের জাল।

আর কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম আরব সাগরের কৃষ্ণ কান্তি। বাসের গতি পুরদমেই চলেছে। এখন আর থামবার কোন লক্ষণ নেই।

গৃহিণী বললেন—বাস আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে? মনে হয় এখনও সময় আছে। এখানে আমাদের নামিয়ে দিলে এখনও দেখার আশা আছে।

কে শোনে কার কথা।

এখন পরিষ্কার দেখতে পেলাম আরব সাগরের গাঢ় নীল বারি। আর তার তরঙ্গবেগ এসে কূলে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের উপকুলে প্রান্তর। সেই প্রান্তর অতিক্রম ক'রে আরও কিছুদূর এসে বাস থামল। তখনও সূর্য্যদেব সমুদ্র বারির অনেক উর্দ্ধে।

বম্বে মাদ্রাজে মেরীন বীচ দেখেছি। এ মেরীন বীচের শোভা সকলকে

হার মানায়। বহু পুরুষ মহিলা সন্তানদের নিয়ে এসেছেন বায়ু সেবনে কিংবা মেরীন শোভা দর্শনে বা হয়তো আমাদের মত এসেছেন সূর্য্যাস্ত দেখতে।

ধীরে ধীরে এলাম সমুদ্র কিনারে। অশ্রান্ত তরঙ্গের উদ্দীপনা দেখতে। অদূরে কয়েকখানি জেলে-ডিঙ্গিকে তরঙ্গ ভেদ ক'রে ইতস্ততঃ যেতে দেখলাম। কয়েকটি ধীবরশিশু তরঙ্গের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছে। কৌশল দেখিয়ে কিছু উপার্জ্জন করছে। তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে তীরের দর্শকদের অনুরোধ ক'রে বলছে—ছুড়ে দিন নয়া পয়সা, দু-পয়সা, সমুদ্রগর্ভে যেখানে খুসী। আমরা উদ্ধার ক'রে এনে দেখাব আমাদের কৃতিত্ব। অনেকে নিক্ষেপও করছেন। শিশুপাল নিমিষের মধ্যে সেই পয়সা উদ্ধার ক'রে তাদের সাফল্যের প্রমাণ দেখাচ্ছে।

এরপর সময় বুঝে এলাম প্রান্তরের উচ্চ স্থানে। দর্শকদের প্রায় সকলেই এলেন। এখন দেখলাম অরুণদেব বদনে আবীর মেখে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছেন। ইতিপূর্বে বহু স্থানে আগ্রহ ক'রে সূর্য্যাস্ত দেখতে গিয়েছি। কিন্তু এমন নির্ম্মল আকাশ কোথাও পাই নি।

এইবার ক্লান্ত দিবাকর স্পর্শ করলেন সাগরের নীল বারি। ধীরে ধীরে বিলীন হতে লাগলেন নীল বারিরাশীর মধ্যে। ক্রমে আরও—আরও। শেষ পর্যন্ত ক্ষীণ রাঙা রেখাটুকু ভেসে মিলিয়ে গেল বারিধি বক্ষে। মাখিয়ে দিয়ে গেল পশ্চিম গগনে এক অঞ্জলি ফাগ। প্রকৃতির মোহন রূপ দেখে বেশ কিছুক্ষণ বিস্ময় নেত্রে চেয়ে রইলাম ফাগ ছড়ান গগনের পানে।

গৃহিণীর সাড়া পেয়ে সম্বিদ ফিরে পেলাম। তিনি বললেন—তোমার অনেক দিনের খেদ মিটেছে। এখন বাসের খবর নাও। যেতে হবে এক রাজ্যি।

প্রান্তরের এক প্রান্তে দাঁড়ালাম। এস্থানে অনেকেই অপেক্ষা করছেন বাসের জন্য। এই স্থান থেকে দেখা যাচ্ছে অদূরে বনানী ঘেরা একখানি গ্রাম। গ্রাম্য দেবতার মন্দির ও গোপুরম দেখা যাচ্ছে। মনে হয় এক ফার্লং গেলেই গ্রামখানি দেখা যায়। কিন্তু অসময়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না।

কয়েকখানি বাস এসে গেল। আমাদের যেতে হবে ইষ্ট গেট অর্থাৎ নারায়ণ মন্দিরের সন্নিকট। কণ্ডাক্টর বললেন—এ বাস আপনাদের জন্য নয়। অপেক্ষা করুন পরে আসবে।

গৃহিণী আমাকে সঙ্কেৎ ক'রে বললেন—এদিকে দেখ, ঠিক যেন সেই রমন আশ্রমের ডলি। দেখলাম তারই মত একটি মহিলা চক্ষে কালো গগল্‌স্‌, স্কন্ধে বায়নাকুলার ঝুলিয়ে হাতে ভ্যানিটী ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ডলির কথা আমাদের স্মৃতি-পট থেকে একেবারে মুছে গেছে। এতদিন পরে তার সঙ্গলাভের আগ্রহে এর পাশে গিয়ে ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে চেষ্টা করলাম। সন্ধ্যার আধছায়ায় চিন্‌তে সক্ষম হলাম না। অধিকক্ষণ কোন যুবতীর পানে কৌতূহল নেত্রে চেয়ে থাকাও অবৈধ। আমি ফিরে এসে গৃহিণীকে পাঠালাম।

কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর গৃহিণী ফিরে এসে বললেন—নাঃ, এ সে নয়। এর নাক চেপ্টা।

পথে পাওয়া কয়েক দিনের জন্য সে হয়েছিল আমাদের সাথি। আজ অকস্মাৎ তার স্মৃতি মনে উদয় হওয়ায় যেন নূতন ক'রে তাকে হারালাম।

আমাদের বাস এসে গেল।

এবার বাস চলেছে সহরের ভিন্ন পথে। এ দিকে সুরম্য সৌধ শ্রেণী, বড় বড় লজ, হোটেল ও সিনেমা ভবনগুলি আলোক মালায় ঝলমল করছে। এ সকল দেখার আগ্রহ যেন হারিয়ে ফেলেছি। বম্বের ডলি আমাদের সান্নিধ্যে কয় দিনই বা ছিল। তার চিন্তা করাই আমাদের ধৃষ্টতা। এই যে শিবাণী ঘেঁটু রঙ্গমঞ্চের চরিত্রের মত এক এক দৃশ্যে অবতীর্ণ হচ্ছে, কখন যে অভিনয় ভঙ্গদেবে কে জানে? তারপর দু' দিনেই সুখ স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে।

বাস এসে থামল ইষ্ট গেটে। আরোহীগণ নামতে শুরু করলেন। সেই মহিলাটিও আমাদের বাসের অগ্রভাগে স্থান নিয়েছিলেন। এখন তিনি চশমাটি হাতে নিয়ে অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছেন।

গৃহিণীকে বললাম—এবার ভাল ক'রে দেখতো ডলি কি না?

তাঁর আর দেখার অবকাশ হ'ল না। বাসের মধ্যেই 'মাম্মী' বলে গৃহিণীকে জড়িয়ে ধরলে। ধীরে ধীরে বাস থেকে নামলাম। গৃহিণী নানা প্রশ্ন ক'রে মুখের দিকে তাকালেন।
গৃহিণীর প্রশ্নের কি সে বুঝলে জানি না। তবে সে এইটুকু জানালে যে শারীরিক কুশলেই আছে। এখানে যে এক্সজিবিশন হচ্ছে সেই স্থানে তাদের কোম্পানীর এক ধনী এজেন্ট একটি শো-রুম খুলেছেন। সে সেই শো-রুমের ভার গ্রহণ করেছে। মালিকের বাড়ীতে থাকে। প্রাতে কোন কাজ থাকে না। অপরাহ্নে দু'টোয় শো-রুম খোলা হয়। রাত্রি এগারটায় বন্ধ করে। যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা আছে।

আজ মালিকের নিকট অবসর নিয়ে এসেছিল মেরীন বীচে সূর্য্যাস্ত দেখতে। সে আনন্দে জানালে তার পরম সৌভাগ্য। আজ মেরীন বীচে আসায় আমাদের সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছে।
এখনই সে এক্সজিবিশনে তার শো-রুমে যাওয়ার জন্য আমাদের অনুরোধ করলে। আমরা রাজী হলাম না। পরদিন সন্ধ্যায় তার শো-রুমে যাওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে তাকে শান্ত করলাম। সে আমাদের কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে বলে এক্সজিবিশন প্যাণ্ডেলে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে আমার হাতে দিলে দু'খানি গেট-পাশ আর গৃহিণীর হাতে দিলে কাগজের প্যাকেটে একখানি কেক্। লজে ফিরলাম তখন রাত্রি ন'টা।
পরদিন সকালে চা-পানের পর গেলাম মিউজিয়ম দেখতে। বাসে নয়, পদব্রজে। আমাদের লজের উত্তর দিকে একটি প্রশস্ত রাস্তা ধরে চলেছি। এ দিকে সহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেদের বাস। মধ্যে মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় এক একখানি দোকান। প্রায় প্রতি দোকানে হাঁস, মুরগীর ডিম বিক্রয় হতে দেখলাম। বালক বালিকারা পুস্তক হাতে নিকটস্থ বিদ্যালয়ে চলেছে। মহিলাদের পরিধানে লুঙ্গি ও ব্লাউজ। তার উপর একখানি উত্তরীয় বক্ষে আবৃত ক'রে পথে চলেছেন। এ স্থানে মধ্যবিত্ত ভদ্র মহিলাদের এইটাই সাধারণ পোষাক। এ দিকের মহিলাদের কচিৎ পাদুকা ব্যবহার করতে দেখেছি।

এইপথে কিছুদূরে এসে আর একটি প্রশস্ত পথে এলাম। দক্ষিণ পার্শ্বে কেরালা আর্ট স্কুল ভবন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়। ক্রমে মিউজিয়মের সম্মুখে এসে হাজির হলাম।

মিউজিয়ম ভবনটির বহির্দৃশ্য অতি চমৎকার। আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। সমস্ত হলটি পরিদর্শন করতে আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগল না। চতুর্দিক পরিভ্রমণ ক'রে দেখলাম একে মিউজিয়ম বলা চলে না। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি আর্ট গ্যালারি। মর্মরে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য ও কয়েকটি সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তি ব্যতীত উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তু কিছুই নেই। ধারণা ছিল কেরালা রাজ্যের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রাম। মিউজিয়মে হয়তো আদি যুগের বহু অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শন দেখা যাবে।

অপরাহ্ণে মন্দিরে নৃত্য ও প্রদর্শনী দেখার বাসনায় এলাম ইষ্ট গেটে। আজ নৃত্য আরম্ভ হয়েছিল মধ্যাহ্ন থেকে। আমরা আসার কিছু পরেই নৃত্য শেষ হয়ে গেল। শুনলাম সন্ধ্যার কিছু পরেই মন্দির মধ্যে নর্তকীদের নৃত্য আরম্ভ হবে।

গৃহিণী বললেন—এখন এইস্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। সন্ধ্যার পূর্বেই সান্ধ্য আরতি হবে। আরতি দেখে এক্সজিবিশনে যাওয়া যাবে। আমরা গোপুরমের পাদমূলে বসলাম।

এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক পরিধানে মাদ্রাজী লুঙ্গি ও স্কন্ধে উত্তরীয় নিয়ে আমাদের নিকট এসে প্রশ্ন করলেন—আপনারা কবে এসেছেন?

অকস্মাৎ এক বাঙ্গালী ভদ্রলোককে এ বেশে দেখে কৌতূহল বোধ করলাম। ভালরূপে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলাম ইনি আমার এক সহকর্মী বন্ধু, নাম রঞ্জিত গুপ্ত। তাঁকে দেখে আনন্দিত হলাম। তিনি আরও বললেন—আজ প্রাতে আটটায় এখানে এসেছি। ষ্টেশনের পাশে একটি হোটেলে উঠেছি। আজ এখানে নারায়ণ মন্দির দেখে কাল বেলা বারোটায় যাব কন্যাকুমারী। বাসের অগ্রিম টিকিট নিয়েছি। সময় কম, সামান্য কয়েক দিনের ছুটিতে এসেছি।

বললাম—সমস্তই বুঝলাম। আপনার এরূপ বেশ কেন?

রঞ্জিতবাবু বললেন—আমি শুনেছিলাম এ পোষাক ব্যতীত মন্দিরে প্রবেশ

করতে দেয় না। সেই কারণে লুঙ্গি ও চাদর নিলাম।
তাঁকে বললাম—আপনি একা এসেছেন না সঙ্গে কেউ আছেন?
তিনি বললেন—আমি সস্ত্রীক এসেছি। তিনি মন্দির মধ্যে গেছেন। আমি মন্দিরে বিগ্রহ দেখে বহুক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি যে কেন এখনও ফিরলেন না তা বুঝতে পারছি না। আমাদের অনুরোধ ক'রে বললেন, আপনারা এই স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি গিয়ে দেখে আসি।
তিনি মন্দিরে গেলে গৃহিণী বললেন—ওঁদের জন্য এখানে অপেক্ষা ক'রে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। চলো আমরা এক্সজিবিশনে যাই। মেলাতলা নয়, বারোয়ারী পূজার মণ্ডপ নয়, দু'জনে মন্দিরে এসে একজন হারিয়ে গেল কেমন ক'রে?
বললাম—ওঁদের আসল তথ্য তুমি জান না। এঁরা প্রকৃতপক্ষে তীর্থ দর্শনে আসেন নি। এসেছেন শোকসন্তপ্ত মনের সান্ত্বনার আশায়। কিছু দিন পূর্বে ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র উপযুক্ত পুত্রকে অকালে হারিয়ে মানসিক বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। এ দম্পতির কারও মনের স্থিরতা নেই। সুতরাং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া স্বাভাবিক।
গৃহিণী শুনে বললেন—ওঁদের সঙ্গে কারো আসা উচিত ছিল। বস, একটু দেখেই যাই।
ওঁরা উভয়ে ফিরলেন আরও আধ ঘণ্টা পরে। এঁদের মুখের দিকে চেয়ে গৃহিণী কাকেও কোন কথা বলতে পারলেন না।
রঞ্জিতবাবু বললেন—আমরা এক সমস্যায় পড়েছি। আজ সকালে হোটেলে উঠেছি বেলা আটটায়। কাল আমাদের কন্যাকুমারীর বাস ছাড়বে বেলা বারোটায়। আমাদের হোটেলে চব্বিশ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হওয়ার পর দু' ঘণ্টা বেশী থাকলে দু'দিনের লজ ভাড়া দিতে হবে।
তাঁকে বললাম—বাস ষ্টেশনের সন্নিকটে আমাদের লজ। কাল সকালে অটটায় কামরা ছেড়ে দিয়ে আপনাদের জিনিসপত্র আমাদের লজে রেখে দেবেন। আমাদের সঙ্গে রান্নার সকল সরঞ্জাম আছে। আমরা এখানেও নিজেরাই স্বপাকে আহার করি। কাল আমাদের লজে যা হোক দু'টি

খেয়ে বাসে উঠবেন।

রঞ্জিতবাবু বললেন—আমাদের হোটেল থেকে আপনাদের লজ কত দূর হবে বুঝতে পারছি না।

আমরা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এলাম আমাদের লজ দেখাতে। লজে এসে গৃহিণী স্টোভ জেলে চা প্রস্তুত করলেন। গতকল্যকার ডলির প্রদত্ত কেকের অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট ছিল চায়ের সঙ্গে সকলে বণ্টন ক'রে খেলাম। কথায় কথায় রঞ্জিত-গৃহিণী এসে গেলেন তাঁর সেই মর্মান্তিক স্মৃতির দ্বারে। ব্যাপৃত হলেন তারই আলোচনায়। যাকে আর কোনদিন ফিরে পাবেন না।

রাত্রি ন'টা বেজে গেল। আমরা উভয়ে রঞ্জিত বাবুদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে একটা হোটেলে আহার ক'রে লজে ফিরলাম।

পরদিন সকালে রঞ্জিত বাবুদের অপেক্ষায় রইলাম। আটটা পর্যন্ত এঁদের আগমণ না দেখে নিজেই গেলাম তাঁদের হোটেলে। হোটেলের দ্বারেই এঁদের সাক্ষাৎ পেলাম। এখন এঁরা চলেছেন ত্রিবেন্দ্রাম সহর দেখতে। আমাদের লজে না যাওয়ায় কৈফিয়ৎ দিয়ে বললেন—কুলি ভাড়া দিয়ে আপনাদের লজে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার আবশ্যক হয় নি। রুম ছেড়ে দিয়ে দ্রব্যাদি তাঁদের অফিস কক্ষে রেখেছি। সে জন্য কোন চার্য দিতে হবে না। সহর দেখে এসে হোটেলে খেয়ে কন্যাকুমারী রওনা হব। আমরা কন্যাকুমারীতে দু'দিন থেকে মাদুরাইয়ে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে মিলবো।

ওঁদের হোটেল থেকে ফিরে এসে দেখলাম—কক্ষে হৈ-চৈ কাণ্ড। ডলি এসে কাঁউ-মাঁউ ক'রে অনেক কথাই বলছে, গৃহিণী বুঝতেও পারছেন না, বোঝাতেও পারছেন না। তাকে শান্ত ক'রে তার অনুযোগের কারণ জানলাম। গতকাল সন্ধ্যায় এক্সজিবিশন যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমার দেশস্থ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়ায় এক্সজিবিশন যাওয়া সম্ভব হয় নি। সেকথা তাকে বুঝিয়ে বললাম।

গৃহিণী তাকে চা বিস্কুট দিলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—আপনারা শীঘ্র তৈরী হয়ে নিন। আমি আজ আপনাদের কোবলাম্ বীচ দেখতে

নিয়ে যাব। সে দিন মেরীন বীচে সূর্য্যাস্ত দেখে এলেন, এ বীচ আরও সুন্দর। ভারতের শ্রেষ্ঠ মেরীন বীচ।

গৃহিণী আমাকে বললেন—সে কতদূর? ফিরে এসে আবার রান্না খাওয়া আছে।

বললাম—শুনেছি দশ মাইল হবে। মেয়েটা ঝোঁক ধরেছে, চলো। সময় থাকে রান্না হবে, না হয় হোটেলে খেলেই হবে।

লজের বাইরে এসে দেখলাম, ব্রাউন রঙের একখানা গাড়ী নিয়ে একজন ড্রাইভার অপেক্ষা করছেন। ডলি এসে ক্ষিপ্র হস্তে দ্বার খুলে আমাদের ঠেলে ভিতরে বসিয়ে দিলে। নিজে গিয়ে বসল সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে।

গাড়ী ছাড়ল।

ডলি বললে—আমি তিন চার দিন এ বীচ দেখে এসেছি। আমার খুব ভাল লাগে।

গাড়ী সহর ত্যাগ ক'রে শুপারি ও নারিকেলকুঞ্জ সমাকীর্ণ ছায়া শীতল পথে চলেছে। কিয়দ্দূর এসে গাড়ী থামিয়ে ডলি স্টিয়ারিং ধরে বসল ড্রাইভারের আসনে। ড্রাইভার স্থান পরিবর্তন ক'রে বাম ভাগে সরে বসল।

গাড়ী দ্রুত গতিতে চলেছে। গৃহিণী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আমাকে বললেন— দেখ, আজ আবার কি কাণ্ড করে। পথের মধ্যে একদল হাঁস চলেছে চরতে, পথ পরিষ্কারের জন্য হর্ণ দেওয়ার পরিবর্তে হাতের তালি দিয়ে তাদের সরিয়ে দিলে। স্টিয়ারিং ধরে সম্মুখে যত না দেখে ক্রমাগত পিছন ফিরে আমাদের পানে দেখে আর হাসে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে গেলাম কোব্‌লাম বীচে। কোব্‌লাম বার্থ হাউস নামে একটি বিলাতি ধরণের হোটেলের পাশে গাড়ী রেখে সমুদ্রের দিকে গেলাম। সত্যই সমুদ্রকুলের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ডলি সুইমিং-পোষাক পরে গেল সমুদ্র স্নানে। গৃহিণীকে ও আমাকে অনুরোধ করলে স্নানে। আমরা রাজী হলাম না। ড্রাইভারও আমাকে স্নানের জন্য অনুরোধ করলেন, তরঙ্গ ভয়ে নামলাম না। ডলি ও

ড্রাইভারের স্নান দেখে আনন্দ পেলাম।

এস্থানে কোব্‌লাম বার্থ হাউস ব্যতীত আরও কয়েকটি ছোট হোটেল আছে। আমরা একটি দোকানে চা-পানের পর গাড়ীতে উঠলাম। লজে এলাম তখন বেলা দশটা। অপরাহ্ণে এক্সজিবিশনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রে ডলি প্রস্থান করলে।

আজ আমাদের ত্রিবেন্দ্রাম বাসের শেষ দিন। আগামী কাল রওনা হব মাদুরাই। গৃহিণীর ইচ্ছা আজ সন্ধ্যায় শেষ একবার মন্দিরে নারায়ণকে দর্শন করা। তাঁর ইচ্ছায় পাদুকা, জামা মন্দির পাশে জমাঘরে গচ্ছিত রেখে মন্দিরে গেলাম। মূল মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হ'ল এক ঘণ্টা পরে। গৃহিণী আজও একদফা এঁদের অনিয়মিত কাজের জন্য ক্ষুব্ধ হলেন।

মন্দির থেকে বেরিয়ে প্রদর্শনী মণ্ডপে প্রবেশ করলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল প্রথমে ডলিদের শো-রুমে এসে বিশ্রাম ক'রে কয়েকটি স্টল দেখে বিদায় নেব। এক্সজিবিশনের অভ্যন্তরে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রত্যেক দর্শককে সমস্ত স্টলগুলি পরিভ্রমণ ক'রে দেখে যেতে হবে। আমরা বাম পার্শ্বের রজ্জু বাঁধা নির্দেশ দেওয়া পথে অগ্রসর হতে লাগলাম। কতকগুলি স্টল দেখবার পর এলাম চাষ-আবাদের সুবিধার জন্য একটি উর্বর সারের স্টলের সম্মুখে।

এই স্টলের পার্শ্বে প্রায় চারি শত স্কোয়ার ফিট জমিতে নানাবিধ ফসল ও বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। সারের উপকারিতা ও উর্বর শক্তির প্রমাণ সরূপ বৃক্ষ ও শষ্য ক্ষেত্রের উর্বরতায় সাফল্য হয়েছে। কয়েকটি বৃক্ষে ফল ধারণ করেছে। জমিটির চতুর্দিকে ঘুরে দেখলাম। মনে হয় প্রদর্শনী আরম্ভের বেশ কিছুদিন পূর্বে এই জমিতে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। সমস্ত স্থানটি নানা বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়েছে।

এরপর কয়েকটি স্টল দেখে এলাম ডলিদের স্টলে। আমাদের দর্শন মাত্র ডলি আমাদের স্টলের মধ্যে বসালে। ডলি ব্যতীত আরও দু'টি এদেশীয় যুবতীকে দেখলাম। বিলাতি পোষাকে এক সুদর্শন যুবক একদিকে একখানি টেবিল সম্মুখে নিয়ে বসেছেন। টেবিলের উপর

কয়েকখানি পুস্তক ও লিখবার সরঞ্জাম আছে। ডলি ভদ্রলোকের নিকট গিয়ে কি যেন বলে এলো। তারপরেই তিনি আমাদের নিকট এসে সম্মান প্রদর্শন ক'রে স্বস্থানে বসলেন। শো-রুমের পশ্চাৎভাগে পাঁচ-ছয়টি আলমারির মধ্যে নানা আকারের টিনের কৌটায় বিভীন্ন প্রকারের রঙ স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে। শো-রুমের বহির্ভাগে ঘুর্ণায়মান বৈদ্যুতিক আলোক দর্শকদের মন আকর্ষণ করছে।

শো-রুমের সম্মুখে দর্শকের জনতা। আমরা যতক্ষণ ছিলাম কাহাকেও কিছু ক্রয় করতে দেখি নি। সাধারণ দর্শক ক্রয় করবেই বা কি! এ শো-রুম বিজ্ঞাপনের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়। কোন ধনী বিলাসী তাঁদের বাটীর কাজের জন্য হয়তো কিছু অর্ডার দিতে পারেন। সেরূপ দর্শকই বা কয়জন আসেন। ডলি এ শো-রুমের প্রধান পরিচালিকা। অন্য দু'টি মহিলা ডলিকে সাহায্য করছেন। ডলির এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। হাস্যমুখে আনন্দে দর্শকদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

এরপর ডলি তার এক সহকারী মহিলাকে অনাবশ্যকে আমাদের সঙ্গে দিলে প্রদর্শনী মণ্ডপটি ভালভাবে দেখার জন্যে। কিংবা হয়তো পাছে আমরা পুনরায় তাদের স্টলে না ফিরে লজে চলে আসি এই আশঙ্কায়। মহিলাকে আদেশ দিলে এক্সজিবিশন মণ্ডপ পরিভ্রমণ ক'রে আমাদের সঙ্গে নিয়ে তাদের স্টলে আসতে।

মহিলা আমাদের স্টলগুলি ঘুরে দেখালেন। স্টলগুলির সকল পরিচয়, কোম্পানীদের আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করতে করতে চলেছেন। ইংরাজীতে কথাবার্তা ভালই বলেন।

ক্রমে আমরা খাদ্য দ্রব্য বিভাগ পরিদর্শনের পর একস্থানে এসে দেখলাম একটি ছোট রঙ্গমঞ্চে বৈদ্যুতিক চালিত পুতুল-নৃত্য। আমাদের বাঙ্‌লা দেশে পুতুল-নৃত্য দেখেছি। সেগুলিকে হস্ত দ্বারা কৌশলে নৃত্য দেখায়, ঐ সম্প্রদায়ের পরিচালকগণ। এ পুতুলগুলি রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করছে অন্তরাল থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির পরিচালনায়। যেরূপেই করুন দর্শকদের তন্ময় ক'রে রেখেছে। এ নৃত্য পরিকল্পনার কি উদ্দেশ্য কিংবা কোন্ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বুঝতে পারলাম না।

এরই পাশে আর একটি মঞ্চে আধুনিক যুগে সরকারি বাসে কত সুবিধা তারই নিদর্শন দেখান হচ্ছে। এটিও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায়। রঙ্গমঞ্চের একদিকে একটি পথ নির্মান ক'রে কয়েকখানি সৌখীন বাস অবিরত যাতায়াত করছে। অন্যদিকে কয়েকজন অক্ষম বৃদ্ধ যষ্ঠি হাতে কত ক্লেশে পথ ভ্রমণ করছে তারই নিদর্শন দেখান হচ্ছে। এগুলি দেখার পর মহিলা আমাদের সঙ্গে নিয়ে তাদের শো-রুমে হাজির করলে।

এখন আমাদের জন্য খাবারের ডিস সাজান হয়েছে। ডলি আমাদের সেই টেবিলের সম্মুখে বসালে। এদেশীয় বড়া, পকুরী, সিঙ্গারা, কচুরি থেকে নাম না জানা মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে দু'টি ডিস পরিপূর্ণ। আমাদের আহারের পর মালিক আর একবার সৌজন্য প্রদর্শন ক'রে আগামী কাল তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন।

তাঁকে দুঃখের সহিত জানালাম আমাদের ত্রিবেন্দ্রাম অবস্থানের আজ শেষ দিন। কাল প্রাতে আমরা ত্রিবেন্দ্রাম-মাদ্রাজ এক্সপ্রেসে মাদুরাই যাব। এ সংবাদ ডলির জানা ছিল না। সেও শুনে মর্মাহত হ'ল। অধিক রাত্রি হওয়ায় এঁদের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা লজে ফিরলাম।

পরদিন প্রাতে ট্রেনের নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই ষ্টেশনে এলাম। তখনও ট্রেন প্লাটফর্মে হাজির হয় নি। আমরা একটি দোকানে চা-পান ক'রে ট্রেনের অপেক্ষায় বসলাম। অকস্মাৎ এক হাতে বিস্কুটের প্যাকেট, অন্য হাতে সংবাদ-পত্রে আবৃত কয়েকটি আপেল নিয়ে ত্রস্ত পদে ডলি আমাদের নিকট উপস্থিৎ হয়ে আমাদের বললে—এত শীঘ্র আপনারা ষ্টেশনে এসেছেন, আমি লজে গিয়ে ফিরে এলাম।

ট্রেন প্লাটফর্মে হাজির হ'ল। সে আমাদের কিছুই করতে দিলে না। আমাদের বার্থ নম্বর অনুসন্ধান ক'রে, কুলি ডেকে মাল পত্রের ব্যবস্থা ক'রে আমাদের নিশ্চিন্তে বসালে। সেও আমাদের নিকট বসল।

আমাদের বার্থের সামনের এক ভদ্রলোক ডলিকে প্রশ্ন করলেন—আপনারা কতদূর যাবেন?

ডলি উত্তর দিলে—আমি আদৌ যাব না। আমার প্রফেসর ও মাদার যাবেন মাদুরাই। আমি সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

হুইসেল পড়ল। বিস্কুটের প্যাকেট ও আপেলগুলি গৃহিণীর সামনে রেখে ডলি প্লাটফর্মে নেমে গেল।

গৃহিণী বিহ্বল নেত্রে ডলির মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

গৃহিণীকে বললাম—তিরুবনমাল্লাইয়ের কয়েক কাপ বার্লির ঋণ ত্রিবেন্দ্রামে এসে পরিশোধ ক'রে গেল।

ট্রেন চলতে শুরু করলে। ডলি গবাক্ষের পাশে পাশে আমাদের দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে লাগল। ট্রেনের গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারও গতি দ্রুততর হ'ল। পরিশেষে প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে এসে রুমাল উড়িয়ে টা-টা ধ্বনী করতে লাগল। সেই টা-টা ধ্বনী এখনও যেন আমাদের কানে বাজছে।

মাদুরাই

(তিরুপুরণ কুন্দ্রম—আলগার কয়েল)

এক্সপ্রেস ট্রেন। সকল ষ্টেশনে থামে না। চার-পাঁচটি ষ্টেশন অতিক্রম ক'রে থামল এসে কাদাকাউরে। এতক্ষণ গবাক্ষের বাইরে দৃষ্টি রেখেছিলাম, এ দিকের দৃশ্য দেখার ইচ্ছায়। কিন্তু চক্ষে দেখছিলাম সেই সবুজ বর্ণের ছোট্ট রুমালটি। কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছিল সেই টা-টা বাণী। ট্রেন থামতে গৃহিণীর পানে চেয়ে দেখলাম তিনি বাম হাতের তালুর অপর পৃষ্ঠ দিয়ে চক্ষু মুছ্‌ছেন। মেয়েগুলো সহজেই এত কাঁদতে পারে কি ক'রে ?

আমাদের সামনের বার্থের ভদ্রলোক বললেন—প্রফেসর কি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন ?

বললাম—সাধারণের নিকট সেই কথাই বলে থাকি। সে কেবল উপলক্ষ্য মাত্র, প্রকৃতপক্ষে এসেছি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থান দেখার বাসনায়।

ডলি আমার গলদেশে যে ভুয়া খেতাবটি ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে সেটিকে মাদুরাই পর্যন্ত আমাকে বহণ করতে হ'ল। এমন কি ট্রেন কণ্ডাক্টর

মিল-গ্রাহকের তালিকা প্রস্তুত করতে এসে আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন—প্রফেসর, আপনার মিল আবশ্যক হবে কি? কি জানি আমাদের অজ্ঞাতসারে ডলি এঁকে কি অনুরোধ ক'রে বলে গেছে।

ট্রেন চলেছে। এখন একবার বাইরের দিকে তাকালাম। রেল পথের উভয় পার্শ্বে কি অপূর্ব শোভা। মাইলের পর মাইল সুপারি, নারিকেল, কলা প্রভৃতি বৃক্ষের বাগান। এ সকল বৃক্ষ সযত্নে রোপণ করা হয়েছে এমন মনে হয় না। বৃক্ষগুলি স্থানাভাবে কোনরূপে পরস্পরের গাত্রে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ সুপারী বৃক্ষের স্কন্ধে যে পরিমাণ ফল ঝুলছে দেখলে মনে হয়, যে কোন মুহূর্তে বৃক্ষটিকে ধরাশায়ী করবে। কদলী ও নারিকেল বৃক্ষের অবস্থা তথৈবচ। মধ্যে মধ্যে এক একটি স্বল্প পরিসর নদী। তার উপর ভেসে চলেছে মাল-বাহি ডিঙ্গি। পল্লীর পুরুষ, মহিলাগণ নদীর ঘাটে স্নান করছেন। হাঁসেরদল ঘাটে ঘাটে ঘুরছে। এ যেন চিত্রে আঁকা এক মনোরম দৃশ্যপট।

ট্রেন এসে থামল কুইলন ষ্টেশনে। গৃহিণী ষ্টেশনের পরিবেশ ও প্লাটফর্মে যাত্রী সংখ্যা দেখে মৌনব্রত ভঙ্গ ক'রে গলা ঝেড়ে বললেন—এ কোন ষ্টেশন?

বললাম—কুইলন।

গৃহিণী বললেন—এখানে সাহাবাবু কুস্তি দেখাতে এসেছেন। নামলে হতো।

বললাম—তাঁরা নিশ্চয়ই এতদিন ফিরে গেছেন।

গৃহিণী বললেন—এখানে জনার্দন মন্দির আছে। অনেকে দেখতে আসে। আমাদের নেমে দেখা উচিত ছিল। ষ্টেশনের উপর দিয়ে যাচ্ছি।

বললাম—জনার্দন স্বামীর মন্দির ভারকালাইয়ে। কুইলন থেকে তেইশ কিলো মিটার পথ। আমরা এই পথে পূর্বেই ভারকালাই ছেড়ে এসেছি। এখনও এ দেশে বনে জঙ্গলে বহু মন্দির বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বহু স্থানে সংস্কারও হয়েছে। সকল তীর্থ ঘুরে দেখতে হলে আরও তিন মাস আমাদের থাকতে হবে।

কুইলন দেখার লোভ আমারও ছিল। এ স্থান থেকে আরনাকুলাম আর কোচিন বন্দর যাওয়ার পথ। আরনাকুলাম বিখ্যাত মৎস্য

সংগ্রহ ভাণ্ডার, আর আছে নারায়ণ ও শঙ্কর মন্দির। কোচিন বিখ্যাত বন্দরের জন্য প্রসিদ্ধ। কেরালার নারকেলকুঞ্জের অপূর্ব শোভা দেখতে পাওয়া যায়।

ট্রেন কুইলন ষ্টেশন ত্যাগ ক'রে চলতে শুরু করেছে। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলাম এক নূতন দৃশ্য। আমাদের ট্রেন পর্বতারোহণ আরম্ভ করেছে। এরূপ পার্বত্য রেল পথ দেখেছিলাম রাজস্থানে। মাড়োয়ার থেকে নাথদোয়ারের পথে।

আমার কৌতূহল দেখে সামনের বাথের ভদ্রলোক বললেন—ট্রেন এ পথের সমস্ত শৈলশ্রেণী লঙ্ঘন ক'রে সেনকাট্টা ষ্টেশনে গিয়ে সমতল ভূমিতে পদার্পণ করবে।

ভাবলাম বড় সহজ কথা নয়। কুইলন থেকে সেনকাট্টা প্রায় এক শত কিলোমিটার পথ। দেখা যাক পাহাড়ের শীর্ষে রেল পথের দৃশ্য।

রেল পথের বামভাগে পর্বতশ্রেণী শীর উন্নত ক'রে দণ্ডায়মান। তারই কার্ণিশে রেল পথ। এই রেল পথের একদিকে পাহাড় ঢালু হয়ে সমতল ভূমিতে এসে মিলেছে। মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসীদের কুটীরের মত একটি কক্ষে রেল ষ্টেশন। কুইলন থেকে সেনকাট্টা দশ বারোটি ষ্টেশন। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ-পথ ভেদ ক'রে ট্রেন চলেছে। পাঁচটি ক্ষুদ্র বৃহৎ সুড়ঙ্গ-পথ এই শৈল পথে। পথের দৃশ্য যেমন উপভোগ্য আতঙ্কও তদ্রূপ। ট্রেন থেকে নিম্নভাগে লক্ষ্য করলাম কয়েকটি নদী। কোন্ স্থানে এদের উৎপত্তি কোন্ পথে চলেছে কে জানে। তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী নিম্নের সমতল ভূমি আবৃত ক'রে রেখেছে। অদূরে এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামও দেখা যাচ্ছে। সেই গ্রামগুলি থেকে এসেছে সূক্ষ্ম পথ পাহাড়ের উপরে। গ্রামের লোকেরা এই পথে পাহাড়ের উপর আসে ট্রেনের প্রয়োজনে।

ট্রেন পর্বতশ্রেণী লঙ্ঘন ক'রে সেনকাট্টা ষ্টেশনের সমতল ভূমিতে হাজির হ'ল। তখন বেলা একটা। এ স্থানে মিল পাওয়া গেল।

এর পর এলাম টেনকাশী ষ্টেশনে। এই স্থান থেকে কুট্টলম ও পাপনাশন যাওয়া যায়। কুট্টলমে আছে কুট্টলম নাথের মন্দির ও জলপ্রপাত।

পাপনাশনেও আছে অনুরূপ জলপ্রপাত। এই দু'টি স্থানে আমার যাওয়ার বাসনা ছিল।

ত্রিবেন্দ্রামের লজে এ দেশীয় এক ভদ্রলোক আমাদের বাধা দিলেন। এ স্থানগুলি যাত্রীবহুল স্থান নয়, যানবাহনের যথেষ্ট সংশয় আছে। আমাদের অন্য কোন সহযাত্রী না থাকায় আমরা দু'জনে যেতে সাহস করলাম না।

আরও প্রায় এক শত কিলোমিটার পরে এলাম শিব-কাশীতে। এ স্থানটি একটি তীর্থ ক্ষেত্র। আমরা ট্রেন থেকে লক্ষ্য করলাম বিখ্যাত শঙ্কর মন্দিরের গোপুরম। শিব-কাশী একটি ভাল সহর। পূর্বাহ্নে আমি স্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকায় অবতরণ সম্ভব হ'ল না। মাদুরাই থেকে শিব-কাশী আশী কিলোমিটার পথ। ইচ্ছা করলাম একদিন মাদুরাই থেকে মহাদেব মন্দির দেখে যাব। এ বাসনা আমার সফল হয় নি। আলস্যই এর প্রধান কারণ।

অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটায় আমরা মীনাক্ষী দেবীর গোপুরমের ছায়াতলে মাদুরায় এলাম। কুলিরা বললে—ষ্টেশনের সন্নিকটে রাণী-লজ আছে। ভাল যাত্রী নিবাস। দৈনিক কামরা ভাড়া এক টাকা।

কুলিদের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে আনন্দে রাণী-লজ অভিমুখে এলাম। স্থান নেই। কুলিরা আমাদের আশা দিলে নিকটে মাড়োয়ারী ধর্মশালা, স্থানের অভাব হবে না।

মাড়োয়ারী ধর্মশালায় কামরা পেলাম। রেল ও বাস ষ্টেশনের অতি নিকটে রাণী-লজের পাশে, সহরের প্রশস্ত রাস্তার উপর এই ধর্মশালা। সিংহদ্বার অতিক্রম ক'রে দেখলাম বৃক্ষ শোভিত প্রাঙ্গন। দ্বিতল ভবন। বেশ আলো বাতাসপূর্ণ কক্ষ। নিম্নে পনর কুড়িটি কামরা। যাত্রীগণ কয়েকখানি দখল ক'রে রয়েছেন। বাকীগুলি শুন্য। দ্বিতলে সাত আটটি কক্ষ। কর্তৃপক্ষের কার্যে অবহেলায় কক্ষগুলির হতশ্রী অবস্থা।

দ্বিতলের দু'টি কামরা ব্যতীত সবগুলি উন্মুক্ত দ্বার হয়ে যাত্রীর অপেক্ষা করছে। যাত্রীদের কামরা ত্যাগের পর কামরাগুলির দ্বারে তালা বন্ধ করাও হয় না। প্রশস্ত বারান্দা কিন্তু আবর্জনা ও শুষ্ক পত্র

বিচ্ছিন্ন। ধর্মশালায় নিয়মিত ঝাড়ুদার থাকা সত্বেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য নেই। এক বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ধর্মশালার আইন অনুসারে যাত্রীদের তিন দিনের জন্য স্থান দেওয়া হয়। সে বিষয়ে যেন কোন বৈলক্ষন্য না হয়। এই তিন দিনে বাহাত্তর ঘণ্টার পর যেন কোন প্রকারে তিহাত্তর ঘণ্টা না হয়। যদিও ধর্মশালায় বিশখানি কামরা শুন্য অবস্থায় আছে।

আমরা বিদেশে স্থান পেয়েছি এই পরম সৌভাগ্য। শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা ভাল। এইটুকুই মঙ্গল।

দ্বিতলের একটি কামরা নিলাম। ঝাড়ুদার ডেকে কিছু বকশিষ দিয়ে ঘর ও বারান্দাটি পরিষ্কার ক'রে নিলাম। তারপর মালপত্র গুছিয়ে চায়ের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করলাম।

ট্রেন ভ্রমণে ক্লান্ত থাকায় ইচ্ছা সত্বেও মন্দিরের দিকে গেলাম না। রাত্রি আটটার পর গেলাম কোনও দোকানে কিছু খাদ্যের প্রয়োজনে। রাণী-লজের পাশ দিয়ে একটি প্রশস্ত পথ গেছে সহরের দিকে। সে পথে এসে দেখলাম কয়েকটি লজ ও হোটেল। কলেজেস-হাউস নামে একটি সম্ভ্রান্ত লজ এই পথের প্রারম্ভে। আরও দেখলাম পথের পার্শ্বে হোটেল শ্রেণীর কয়েকখানি দোকান। আমরা একটি ব্রাহ্মিন হোটেল অনুসন্ধান ক'রে রাত্রির মত আহার সমাধা ক'রে ধর্মশালায় ফিরলাম।

পরদিন প্রাতে স্নানের পর গেলাম মন্দির অভিমুখে। সহরের মধ্যভাগে এসে উপলব্ধি করলাম, রামেশ্বর কুম্ভোকনম চিদম্বরমের মত মাদুরাই একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির প্রধান নগর। মাদুরাই সহর দক্ষিণ ভারতের কেন্দ্র। এই স্থান থেকে রেলপথ গেছে ত্রিবেন্দ্রাম, তিরুনালভেলি, কিউটিকোরিন, কয়ম্বাটুর, রামেশ্বর, মাদ্রাজ। যেমন বিরাট রেলওয়ে জংশন সহরের আয়তনও তদ্রুপ। এই সহরের প্রধান দ্রষ্টব্য সে যুগের দ্রাবীড় সভ্যতার চরম ঐতিহ্য ভারত বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির।

মন্দির সমীপে এসে দেখলাম মন্দির সীমানার চতুষ্পার্শ্বে দীর্ঘ প্রাচীর।

প্রাচীর শীর্ষে কয়েক ফুট অন্তর গোমাতার ও দেব-দেবীর মূর্তি। চার দিকে চারটি গগনচুম্বি গোপুরম। দ্বারের বহির্ভাগ থেকে যতটুকু দৃষ্টি যায় উর্ধ দিকে চেয়ে দেখলাম সেগুলি পুরাণ বর্ণিত দেব-দেবীর মুর্তি। দেব মুর্তিগুলি কেবলমাত্র গোপুরম গাত্রে সংলগ্ন করা নয়। পুরাণ কাহিনী অনুসারে সেই মূর্তিগুলির বিচিত্র ভঙ্গিমারও বিবিধ বর্ণে চিত্রিত ক'রে স্তরে স্তরে সজ্জিত করা হয়েছে। শীর্ষস্থান পর্যন্ত দৃষ্টি চলে না। বায়নাকুলারের সাহায্যে নিরীক্ষণ করতে হয়।

গোপুরম দ্বার অতিক্রম ক'রে মন্দির প্রাঙ্গনে এলাম। অপরাহ্নে এই বৃহৎ প্রাঙ্গন জনাকীর্ণ হয়ে থাকে। স্থানে স্থানে পুরাণ পাঠ হয়। কোন স্থানে ভক্তিমূলক সঙ্গীতাদি হয়ে থাকে। প্রাঙ্গন অতিক্রম ক'রে দ্বিতীয় গোপুরম দ্বারে এলাম। এ গোপুরমগুলি একই প্রকারের দেব-দেবীর মুর্তিতে সজ্জিত।

মন্দির প্রাচীরের চার দিকে চারটি দ্বার ও আটটি গোপুরম। মন্দির সীমানার মধ্যভাগে আরও একটি গোপুরম দেখলাম। এ গোপুরমটির গাত্রে দেব-দেবীর কোন মূর্তি নেই। তার পরিবর্তে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের রথ কিংবা মন্দিরের আকৃতি সম্বলিত। সর্বসমেত মন্দিরের নয়টি গোপুরম। বিশেষভাবে নিরীক্ষণে কয়েক দিন সময় লাগে।

দ্বিতীয় গোপুরম অতিক্রম ক'রে দেখলাম তুই দিকে তু'টি বৃহৎ নাট-মন্দির। দক্ষিণভাগের নাটমন্দিরে একটি বাজার। ছবি, খেলনা, চুড়ি, মনোহারি দ্রব্য, ফুল ও পূজার দ্রব্য প্রভৃতির বহু দোকান। বামভাগের নাটমন্দিরে মিউজিয়ম ও আর্ট গেলারি।

আমরা তুই দফা পূজার দ্রব্য ও ফুল নিলাম। মহাদেব সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী দেবীর পৃথক পৃথক মন্দিরে পূজার জন্য। পূজার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা এখানেও আছে। আমরা এক টাকায় তু'খানি টিকিট নিলাম।

সুন্দরেশ্বর মন্দির দ্বারে এলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগে আর একটি বহু স্তম্ভ বিশিষ্ট নাটমন্দির। স্তম্ভগুলির গাত্রে শঙ্করের বিভিন্ন প্রকারের মূর্তি। আমরা প্রথমে মন্দিরে পূজা দিলাম। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশের রীতি এখানেও নেই। ঐ দ্বার থেকেই পুরোহিতের হাতে পূজার দ্রব্য

ও ফুল স'পে দিয়ে প্রসাদ ও নির্ম্মাল্য নিয়ে ফিরতে হবে।

এখন এলাম এই নাটমন্দিরের কারুকার্য দেখতে। দেখে মনে হয় এ যেন যাদুবিদ্যার প্রভাবে নির্মিত হয়েছে এই সুরম্য মন্দির। কয়েক দিন দুপুরে ও রাত্রে দর্শনের ইচ্ছায় এসেছি। এই সুন্দরেশ্বরের নাটমন্দিরের শোভা সকল সময় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

মিউজিয়মের পাশ দিয়ে এলাম মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে। এই পথের বামভাগে একটি বৃহৎ সরোবর। উৎসবের সময় নৌকা সজ্জিত ক'রে এই সরোবর মধ্যস্থ মঞ্চে বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় সরোবরের চতুর্দিকে দীপ-মালায় সুসজ্জিত করা হয়।

দক্ষিণ ভাগে একটি বারান্দা দিয়ে মন্দিরে যাওয়ার পথ। সেই বারান্দার দেওয়ালে অজন্তার অনুরূপ তৈল-চিত্র অঙ্কিত আছে।

মীনাক্ষী দেবীর মূল মন্দির দ্বারে এসে দাঁড়ালাম। মন্দির মধ্যে নিরীক্ষণ করলাম স্বর্ণ-সিংহাসনে স্বর্ণ-ছত্র তলে রত্নালঙ্কার বিভূষিতা দেবী মীনাক্ষী অধিষ্ঠিতা রয়েছেন। পুরোহিতদের একজন এসে ফুল ও পূজার দ্রব্য নিয়ে নাম ও গোত্র লিখে নিলেন। পূজার পর আমাদের হাতে প্রসাদ ও নির্ম্মাল্য দিলেন।

পূজার পর আমরা মিউজিয়ম হলের দিকে এলাম। দ্বারে লেখা আছে মন্দির মিউজিয়ম ও আর্ট গেলারী। প্রবেশ মূল্য আট আনা। আমরা অন্য এক সময় মিউজিয়ম দেখেছিলাম।

মন্দীর সীমানা আয়তনে রামেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ। রামেশ্বর মন্দিরে গোপুরম ছিল চারটি। বর্তমানে আছে দু'টি। মীনাক্ষী মন্দিরে গোপুরম সর্বসমেত ন'টি। গোপুরমগুলি বহুবর্ণে রঞ্জিত। রামেশ্বর মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ মন্দির সম্মুখে বঙ্গোপসাগর। মহাদেব এস্থানে হয়েছেন রামেশ্বর। পার্শ্বের পৃথক মন্দিরে আছেন পার্বতী। এ মন্দিরে মহাদেব বা রামেশ্বর প্রধান। সহরের নামও রামেশ্বর।

মাদুরাইয়ে মীনাক্ষী মন্দির সহরের কেন্দ্র-স্থলে। মন্দির সীমানায় ন'টি বিশাল গোপুরম। সারা মাদুরাই সহরের যেন কীর্তি স্তম্ভ মন্দির অভ্যন্তরে ভাস্কর শিল্পীর কারুকার্য দেশ-বিদেশের জনগণকে

স্তম্ভীত করে। এখানেও বিগ্রহ আছেন মহাদেব, হয়েছেন সুন্দরেশ্বর। আর পার্বতী হয়েছেন মীনাক্ষী দেবী। মীনাক্ষী দেবী রত্নালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে সিংহাসনে বিরাজ করছেন। মহেশ্বর ভূবন মোহন সুন্দরেশ্বরের রূপ ধারণ ক'রে এসেছেন মীনাক্ষী দেবীর পাশে। এস্থানে দেবী মীনাক্ষীর প্রাধান্য যেন অধিক। মন্দিরের নাম মীনাক্ষী মন্দির।

পূজার পর মন্দির প্রাঙ্গনটির চতুর্দিকে পরিভ্রমণ ক'রে ধর্মশালায় ফিরলাম।

কাঞ্চি পুরমের পথে মাদুরাইয়ের এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর সাথে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁর বাড়ী মহল ফোর্থ স্ট্রীট। আহারের পর গেলাম তাঁর সাক্ষাতে। পথে এক ভদ্রলোকের নিকট জ্ঞাত হলাম, মহল ফোর্থ স্ট্রীট মীনাক্ষী মন্দিরের সন্নিকট।

বারানসী বিশ্বনাথের গলির মত এস্থানেও মন্দির পথের উত্তর পার্শ্বে অসংখ্য বস্ত্রের দোকান। সে স্থানে যখনই কোন বিদেশী যাত্রী বিশ্বনাথের গলির দিকে যাবেন কয়েকজন বস্ত্রের দালাল তাঁদের পশ্চাৎ অনুসরণ ক'রে নানাভাবে, নানা অনুরোধে দোকানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা যাত্রীদের ব্যবস্থা দেন, যেন অর্থের অনটনে সুলভে বস্ত্র ক্রয়ের সুযোগ না হারান। কেবলমাত্র বস্ত্র মনোনীত ক'রে নিশ্চিন্তে দেশে গিয়ে ভিঃ পিঃ খালাস ক'রে মাল ঘরে তুলবেন।

বারানসীর মত এস্থানেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নেই। এঁরাও ক্রেতাকে সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। কেবলমাত্র অনুগ্রহ ক'রে তাঁদের দোকানে বস্ত্র মনোনীত ক'রে ঠিকানা দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে যান। বাড়ীতে গিয়ে ঠিক সময়ে মাল পেয়ে যাবেন। মন্দির পথে ও মন্দিরের চতুস্পার্শে এত বস্ত্রের দোকান আর কোন তীর্থস্থানে দেখি নি। বারানসীতেও এর তুলনায় অনেক কম মনে হয়।

আমরা একটি দোকানে উঠলাম। বস্ত্রের প্রয়োজনে নয়, মহল ফোর্থ স্ট্রীটের সঠিক পথের অনুসন্ধানে। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁদের জানালাম। মহল ফোর্থ স্ট্রীট নাম উত্থাপন মাত্র দোকান মালিক ভদ্রলোক বিমর্ষ হলেন। প্রকাশ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন—

মহল স্ট্রীট যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সে স্থানে আড়তদারদের গুদাম। সকল প্রকার বস্ত্র পাবেন না। আমরা মহল স্ট্রীটের আড়তের মূল্য অপেক্ষা সুবিধা মূল্যেই দিয়ে থাকি।

তাঁকে বললাম—আমরা সেদিকে যাব এক বন্ধুর সাক্ষাতে। বস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়। আমাদের এ কথা তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। কোনরূপে মহল স্ট্রীটের পথ বলে দিলেন।

এ প্রদেশে কাহারও ঠিকানা অন্বেষণ সহজসাধ্য নয়। আঞ্চলিক ভাষা ব্যতীত হিন্দি বা ইংরাজি ভাষায় পথের নিদর্শন নেই। প্রধান রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকানে যে সাইন-বোর্ড বিলম্বিত আছে সেগুলিও আঞ্চলিক ভাষায় লেখা থাকায় বিদেশী লোকের পথের অন্বেষণের কোন সাহায্য হয় না। আরও কৌতূকের বিষয় এই সকল দোকানের সাইন-বোর্ডে দোকানের নম্বরটি ইংরাজী অক্ষরে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত স্থানীয় ভাষায় লেখা। স্থানীয় পথচারী লোকের সাহায্য ব্যতীত ঠিকানা অনুসন্ধানের দ্বিতীয় উপায় নেই।

বহু অনুসন্ধানের পর আমরা মহল ষ্ট্রীটে হাজির হলাম। এই মহল ষ্ট্রীট সহরের মেরুদণ্ড। প্রশস্ত পথ। পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ বস্ত্রের দোকান ও আড়ত। মহল স্ট্রীটের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ট্রীট অতিক্রম ক'রে চতুর্থ স্ট্রীটে এলাম অন্বেষণ ক'রে আমাদের পরিচিত ভদ্রলোকের বাটীতে গেলাম। দুর্ভাগ্য, তিনি কয়েকদিনের জন্য মাদুরার বাইরে গেছেন। এর সাক্ষাতে ব্যর্থ হলাম।

একপক্ষে আমাদের উপকার হয়েছিল। আমরা প্রায় তিন মাইল পথ পদব্রজে পরিভ্রমণ ক'রে স্থানীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করলাম। এই মহল স্ট্রীটে প্রধান প্রধান বহু বিপনি ও আড়ত। প্রধান পথ ব্যতীত গলি পথে ঝাড়ন, তোয়ালে, রুমাল, গেঞ্জি প্রভৃতির বহু আড়ত। মনে হয় মাদুরাই দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বস্ত্র কেন্দ্র।

এই সকল গলি পথে গরিব, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বাসভবনও দেখলাম। কয়েকটি বাটীর দ্বারে বালক বালিকারা ইড্‌লি, দোষা, বড়া প্রভৃতির দোকান সাজিয়ে বসে আছে। তাদের বাবা মায়েরা কিংবা অভিভাবকেরা

বাটীর মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত ক'রে এদের দোকানে সরবরাহ করছে। দু' একটি ছোটখাট মুদির দোকান দেখলাম। কৌতূহলবশে সংবাদ নিলাম বিনা রেশন-কার্ডে এঁদের নিকট চিনি পাওয়া যায়। মূল্য সামান্য অধিক। মাদুরাইয়ে চাল নিয়ন্ত্রিত নয়। সকল দোকানেই স্তূপাকারে সজ্জিত দেখলাম। ভাল হিং সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কিছুদূর এসে দেখলাম একটি বৃহৎ সরোবর। তারই সম্মুখে এক বিরাট প্রাসাদ। কয়েকজন পুরুষ ও মহিলাকে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করতে দেখলাম। শুনলাম এটি পুরাতন রাজপ্রাসাদ। তিরুমাল্লাই নায়ক হল্। প্রাসাদটি বর্ত্তমানে মাদুরাই আদালতে পরিণত হয়েছে। সাধারণের প্রবেশে বাধা নেই।

দ্বার অতিক্রম ক'রে প্রাঙ্গনে এলাম। সম্মুখে প্রস্তর নির্মিত বিরাট দরবার হল্। হলের উভয় পার্শ্বে কয়েকটি কক্ষ ও তৎসংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দা। দরবার হল্‌টির সম্মুখভাগ উচ্চতায় পঞ্চাশ ফুটের অধিক। বহির্ভাগ ও শীর্ষদেশ মনোরম সূক্ষ্ম কারুকার্যপূর্ণ। কয়েক শতাব্দীর পরও এর কারুকার্য ও সৌন্দর্য কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। দক্ষিণ পাশ দিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ। এদিকের হল্‌গুলি আদালতের বিভিন্ন বিভাগের দপ্তর।

আজ শনিবার। আদালতের বিচার বিভাগ বন্ধ হয়ে গেছে। সেরেস্তার কাজ এখনও চলছে। অভ্যন্তরে প্রবেশ মাত্র সেরেস্তার এক কর্মচারি আমাদের সাহায্যে এলেন। সদালাপি মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক। আমাদের সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় মহলে এলেন। এদিকে কয়েকটি বিচার কক্ষ। পেস্কার কিংবা আদালতের কয়েকজন কর্মচারি এখনও ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। বিচার কক্ষগুলির সম্মুখে প্রস্তর নির্মিত একটি শুষ্ক জলাধার।

আমরা হলের বারান্দা দিয়ে এসে তাঁর অফিস কক্ষে বসলাম। তাঁর অফিস কক্ষ দেখে তাঁকে পদস্থ কর্মচারি মনে হয়। ভদ্রলোক বললেন—এ প্রাসাদটি তিরুমাল্লাই নায়ক রাজার। এক সময় তিনি ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত ঐশ্বর্যশালী নরপতি। বর্তমান মীনাক্ষী মন্দির তাঁরই

অর্থে ও প্রচেষ্টায় নির্মিত। এঁর রাজত্বের কয়েক শতাব্দী পূর্বে চোল, পল্লব ও পাণ্ড্যরাজগণের প্রভূত অর্থ ব্যায়ে দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি হয়। মন্দির, রাজপ্রাসাদ, নালন্দার মত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনা করেন। সেগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বিধর্মি মুসলমানদের অত্যাচার থেকেও রেহাই পায় নি।

বর্তমানে মাদুরাইয়ের যে সকল মন্দির, গোপুরম ও শিল্পকলা দেখছেন, এগুলি চোল, পল্লব, পাণ্ড্য বংশের রাজত্বের কয়েক শতাব্দীর পর, তিরুমাল্লাই নায়ক নরপতি বহু অর্থব্যায়ে এই সকল মন্দির নির্মান ক'রে দেব ভক্তির নিদর্শন রেখে গেছেন। চোল, পল্লব যুগের কিছু ভগ্নাংশ দেখতে পাবেন মন্দির মিউজিয়মে।

আমরা রাজপ্রাসাদ দেখে ও ভদ্রলোকের ব্যবহারে পরম প্রীত হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ধর্মশালার দিকে ফিরলাম।

পথে বেরিয়ে গৃহিণী বললেন—সে যুগের মন্দিরের কিছু কিছু নমুনা মিউজিয়মে আছে। চলো সেগুলি আজই দেখে যাই। অকস্মাৎ মেঘ দেখে সে দিকে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। রেহাই পেলাম না, ধর্মশালার নিকটে এসে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। আমরা এক ভদ্রলোকের বাটীর দ্বারে আশ্রয় নিলাম। উপরের বৃষ্টি বন্ধ হতে পাদুকা হাতে নিয়ে এক হাঁটু জল ভেঙ্গে ধর্মশালায় ফিরলাম।

ধর্মশালায় এসে শুনলাম এক বাঙ্গালী মহিলা আমাদের অন্বেষণে এসেছিলেন। তিনি পুনরায় আজ রাত্রে কিংবা প্রাতে আসতে পারেন। গৃহিণী বললেন—মেয়েটা আমাদের খোঁজে এসে ফিরে গেছে। কোথায় আছে কে জানে? হয়তো আমাদের জন্য এসে বৃষ্টিতে ভিজে মরেছে।

মাদুরাই থেকে পাঁচ মাইল দূরে আছে একটি তীর্থ স্থান। নাম তিরুপরণ-কুন্ড্রম। এগার মাইল দূরে আছে আর একটি বিখ্যাত মন্দির, সেটির নাম আলগার কয়েল। যে সকল তীর্থ যাত্রী মাদুরাইয়ে মীনাক্ষী দর্শনে আসেন তাঁদের অনেকেই যান ঐ মন্দির দু'টি দেখতে। এই দু'টি মন্দির মাদুরাইয়ের বিভিন্ন দিকে। দেখতে হ'লে দু'দিন সময় লাগে। বাসে যাওয়া যায়।

পরদিন প্রাতে তিরুপরণকুন্দ্রম দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। ধর্মশালা থেকে সামান্য দূরে বাস ষ্টেশন। রেল ষ্টেশনের নিকটে এসে দেখলাম, ঘেঁটু স্কন্ধে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র হাতে নিয়ে আমাদের নিকট হাজির হয়ে বললে—কাল সন্ধ্যায় আপনারা কোথায় ছিলেন? ধর্মশালায় গিয়ে ফিরে এলাম।

বললাম—কাল গিয়েছিলাম পুরাতন রাজবাড়ী দেখতে। সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরতাম। বৃষ্টির জন্য পথে বিলম্ব হয়েছিল।

গৃহিণী বললেন—তুই কবে এলি, কোথায় আছিস? শিবাণীর খবর কি?

ঘেঁটু বললে—আমি কাল এসেছি কলেজেস্-হাউসে আছি। দিদিমণি কন্যাকুমারীতেই আছেন। মাইশোরে গিয়ে হয়তো আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারে। এখন কি বাজারে চলেছেন, না মন্দিরে?

বললাম—আমরা এখন বাজারে বা মন্দিরে যাব না। চলেছি তিরুপরণ-কুন্দ্রম মন্দির দেখতে। এখান থেকে পাঁচ মাইল দূর বাসে যাব।

ঘেঁটু আমাদের সঙ্গ নিলে। বাসে উঠলাম। ভাড়া দিলাম প্রতিজনের বাইশ পয়সা।

বাস ছাড়ল। সহর ত্যাগ ক'রে চলেছি। পথের একদিকে জলা, অন্যদিকে নাতিবৃহৎ শৈল শ্রেণী। মধ্যে মধ্যে এক একটি পল্লী। আধ ঘণ্টার মধ্যেই মন্দির সমীপে হাজির হলাম। বাস ষ্ট্যাণ্ডের সম্মুখে একটি পথ গিয়ে মন্দিরের গোপুরমের পাদদেশে ঠেকেছে। এ পথের উভয় পার্শ্বে সব্‌জি, মুদির দোকান ও ইড্‌লি, কফির হোটেল। আমরা গোপুরম অতিক্রম ক'রে নাটমন্দিরে এলাম। মন্দিরের দ্বার তখনও খোলা হয় নি। শুনলাম পূজার বিলম্ব আছে।

ঘেঁটু ভ্যানিটি ব্যাগটি গৃহিণীর স্কন্ধে চাপিয়ে আমার নিকট সংবাদ পত্রটি গচ্ছিত রেখে পথের পাশে দোকানগুলি দেখতে গেল। আমরা নাটমন্দির থেকে লক্ষ্য করলাম একটি বাস এসে সম্মুখের স্ট্যাণ্ডে থামল। কয়েকজন যাত্রী নেমে মন্দিরের দিকে এলেন। তাঁদের সঙ্গে এলেন এক সুদর্শন যুবক। প্যাণ্ট-কোট, টাই, ঘড়ি, চশমায় দস্তুর মত সাহেব।

গৃহিণী বললেন—ছেলেটা বোধহয় বাঙ্গালী। কথা বলে দেখ তো।

সাহেব নাটমন্দিরে এসে আমাদের নিকট কয়েক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর গাম্ভির্যপূর্ণ রুক্ষ মুখ দেখে কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা ছিল না। গৃহিণীর অনুরোধে তাঁকে বললাম—আপনাকে দেখে বাঙ্গালী মনে হচ্ছে। কোথা থেকে এসেছেন ?

সাহেব অবজ্ঞা সূচক উত্তর দিলেন—হুম্, বেঙ্গলী। বম্বে থেকে এসেছি। এ দু'টি বাক্য উচ্চারণ করেই ত্রস্ত পদে, কেবল ত্রস্ত পদেই নয়, স্টকিং পদে মন্দিরের পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

গৃহিণী বললেন—সাহেবের ঝাঁজ দেখ।

ঘেঁটু কয়েকটি সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ফিরল। মন্দির পথের পাশে একটা বাড়ীতে বিয়ে। এরা কন্যাপক্ষ। এর কিছু দূরেই বরের বাড়ী। দু'টি বাড়ীতেই সমানে শানাই বাজছে। তিরুপরণকুন্দ্রম মন্দিরের পেছনে যে পাহাড় আছে, তার উপর আছে গাজী সেকেন্দারের সমাধি। সকলে বলে পীর সাহেবের দরগা। অনেক মুসলমান মেয়ে পুরুষ চলেছে দরগা দেখতে। আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে সেই দরগা দেখতে যাব।

গৃহিণী আমাকে সঙ্কেত ক'রে নাটমন্দিরে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধাকে দেখালেন। আকর্ষণীয় বিষয় বটে। আশিতিপর বৃদ্ধার পরিধানে একখানি মূল্যবান ব্রোকেট বেনারসী। কর্ণে হীরক কুণ্ডল। শুভ্র কেশে পুষ্পগুচ্ছ শোভীত হয়ে নাটমন্দিরে উপবিষ্ট রয়েছেন।

গৃহিণীর কৌতূহলে ঘেঁটু দুই তিনবার বৃদ্ধাকে প্রদক্ষিণ ক'রে তাঁর বস্ত্র আভরণ পরীক্ষা ক'রে এসে বললে—শাড়ীখানার দাম কম নয়। কানের পাশা দু'টো আসল হীরে। মনে হয়, ও দু'টোর দাম হাজার পাঁচেক হবে।

গৃহিণী বৃদ্ধার কর্ণ আভরণের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

এ প্রদেশে লক্ষ্য করেছি বিবাহের সময় বরপক্ষ কিংবা কন্যাপক্ষ বিবাহের পূর্বে মঙ্গল কামনায় স্থানীয় দেব মন্দিরে বাদ্য সহকারে পূজা দিতে আসেন। এ স্থানে একটি বিবাহ বাটীর পূজা নিয়ে বাদ্যসহ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্র এই বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে দুই বাহু উর্ধে তুলে গৌরাঙ্গের মত নৃত্য শুরু করলেন।

বাদ্যসহ শোভাযাত্রা গোপুরম দ্বারে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বাটীর আত্মীয়রা কিংবা পথের দর্শক ছেলেরা নৃত্য করতে করতে হাজির হ'ল।

আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম একটি বানর গোপুরমের কার্ণিশে বসে তার শাবকের দেহের উকুন বাছছিল। মন্দির সীমানায় নৃত্যরত বালকদের প্রবেশ মাত্র কার্ণিশের সেই বানরটি তার শাবক পরিচর্যা পরিত্যাগ ক'রে কার্ণিশের উপরেই বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করতে লাগল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। যতক্ষণ মন্দিরে বাদ্য ও শিশুদের নৃত্য চলেছিল সেই বানরও সমান উৎসাহে নৃত্য করতে লাগল। বাদ্য বন্ধ হওয়ায় যেমন শিশুদের নৃত্য ভঙ্গ হ'ল সঙ্গে সঙ্গে বানরও নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়ে তার শাবকের পরিচর্যায় মন দিলে। এ যেন তার একটা কর্তব্য ছিল। সমাধা ক'রে নিশ্চিন্ত হ'ল।

বাল্যকাল থেকে বহু স্থানে বানরের নৃত্য দেখেছি। এক সম্প্রদায়ের পেশাদার লোক বানরকে নৃত্য শিক্ষা দিয়ে লোকালয়ে এদের নৃত্য দেখিয়ে কিছু উপার্জ্জন করে। সে কৃত্রিম নৃত্য। মনিব বা পালকের ভয়ে কোন রূপে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নৃত্যের অভিনয় করে। এমন স্বভাব-জাত অকৃত্রিম নৃত্য জীবনে আর কখনও দেখি নি।

পুরোহিত এসে মন্দির দ্বার খুললেন। আমরা সকলে মন্দির দ্বারে দাঁড়ালাম। মূল মন্দিরের মধ্যভাগে নারায়ণ, কার্ত্তিক ও গণপতি। পার্শ্বে মন্দির সংলগ্ন পৃথক কক্ষে শঙ্কর ও পার্বতী মূর্তি। মূর্তিগুলি দেবতারই মত আমরা কিছু ফুল ও পূজার ডালি এনে মন্দিরে পূজা দিলাম।

পূজা শেষ হলে একবার মন্দির পরিক্রমা ক'রে নাটমন্দিরের নিম্নে এসে দেখলাম—এক বিদেশী দম্পতি গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে মন্দিরের গোপুরমের দিকে চেয়ে আছেন। বম্বের সাহেব তাঁদের কি যেন বিবরণ শোনাচ্ছেন। আমরা কয়েক মিনিট অপেক্ষা ক'রে আলোচনার মর্ম উপলব্ধি করলাম।

বম্বের সাহেব বলছেন—এ সকল পূজা কেবলমাত্র অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত

লোকের আত্মতৃপ্তি। পাথরের মূর্তিকে চন্দন মাখিয়ে পুষ্প-মাল্যে সজ্জিত ক'রে কিছু খাদ্য প্রদর্শনের কোন অর্থ হয় না। সে যুগের রাজশক্তি প্রজার রক্ত শোষন ক'রে বিরাট ঐশ্বর্যশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সেই অহমিকার নিদর্শন রেখে গেছেন এই মন্দির। এঁরা বিলাসব্যসনে দিন কাটিয়েছেন। কোন চেষ্টা করেন নি এই সকল কুসংস্কার দূর ক'রে জনসাধারণের প্রকৃত হিত সাধন করতে। সেই কারণে ভারতবর্ষ আজ অন্যান্য সভ্য দেশের এত পশ্চাতে।

একজন বিদেশী ভদ্রলোকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছোকরার এই অবান্তর ভাষণ আমার অসহ্য হয়ে উঠল। তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম—আপনার এ ধারণা অমূলক।

ঘেঁটু আমাকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে বলতে আরম্ভ করলে—এই সকল মন্দির ভারতের অমর কীর্ত্তি। এঁদের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন রাজর্ষি ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ। প্রজা নির্যাতনে ঐশ্বর্যশালী হন নি। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অর্থে তাঁরা হয়েছিলেন ধনকুবের। অলস বিলাসি লোকের দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। সে যুগে দেশে খাদ্যের অভাব ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে ভারত একদিন শীর্ষস্থানে উঠেছিল। সে সময় দেশের শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণকে ও কবিদের পরম শ্রদ্ধায় তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতেন। ভাস্কর, শিল্পীদের অতি যত্নে প্রতিপালন করেছেন, যার ফলে নির্মিত হয়েছে এই সব মন্দির।

ঘেঁটুর বাক্য শেষ হওয়ার পূর্বেই বম্বের সাহেব অন্তর্ধান হয়েছেন। আমরা মন্দির থেকে বাইরে এলাম।

গৃহিণী বললেন—ঘেঁটুর কথা শুনে সাহেব-মেম বেশ খুশি হয়েছে।

বললাম—সাহেব-মেম খুশি হয়েছেন কিনা জানি না। আমি নিজে ঘেঁটুর এই যুক্তিপূর্ণ বিতর্কে সত্যই মুগ্ধ হয়েছি। তার ইংরাজীতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে।

আমরা মন্দির সন্নিকট একটি হোটেলে এসে ইড্‌লি-বড়া সহযোগে কফি খেলাম। হোটেল থেকে বাইরে এসে দেখলাম বম্বের সাহেব ঘাঁটী আগলে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাদের সাক্ষাৎ মাত্র সবিনয়ে বললেন—আপনারা এই হোটেলে ব্রেক ফাষ্ট খেলেন ?

ঘেঁটু বললে—না, ইড্‌লি-বড়া খেলাম।

সাহেব ঘেঁটুকে সঙ্কেত ক'রে দেখিয়ে আমাকে বললেন—ইনি কি আপনার কন্যা ?

বললাম—হুঁ, ডটার।

সাহেব পুনরায় বললেন—আপনারা কোথা থেকে এসেছেন ?

বললাম—মাদুরা থেকে।

সাহেব পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন—আপনারা মাদুরার কোথায় থাকেন ?

বললাম—ধর্মশালায়।

সাহেব আর কোন প্রশ্ন না ক'রে একদিকে সরে গেলেন। আমরাও তাঁর হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে এলাম মন্দিরের পশ্চাতে পাহাড় সমীপে। গৃহিণী ও ঘেঁটুর পাহাড় আরোহণের একান্ত ইচ্ছা। অনিচ্ছা সত্বেও আমি সঙ্গে গেলাম। রৌদ্রের তাপ প্রখর থাকায় বেশ ক্লেশ অনুভব করতে হ'ল।

শীর্ষদেশে পৌঁছে পরম আনন্দ পেলাম। সঙ্গে বায়নাকুলারটি থাকলে হয়তো মাদুরা সহরটি দেখতে পেতাম। সাধু সিকেন্দারের সমাধি মন্দির দর্শন ক'রে নীচে নামলাম।

মন্দিরের নিকট কয়েকটি সব্‌জির দোকান ছিল। আমরা আলু ও কয়েক প্রকার সব্‌জি নিয়ে মাদুরার বাসে উঠলাম।

বাস থেকে নেমে ঘেঁটু তার লজে চলে গেল। আমরা ধর্মশালা অভিমুখে এলাম। ধর্মশালার দ্বারে এসে দেখলাম এ স্থানে একটি ছোটখাট বাজার বসেছে। প্রত্যহই এইরূপ বসে। আমরা লক্ষ্য করি নি। সাধারণ কোন দ্রব্যের জন্য বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যহ দুপুরে ধর্মশালায় এক বৃদ্ধা আসে দই নিয়ে। প্রাতে ও বৈকালে এক কিশোরী দুধ নিয়ে আমাদের কক্ষের দ্বারে এসে বলে 'পাল' লেগা মাইজী? অপরাহ্ণে ভ্রমণ-সুচি ছিল মন্দিরে গিয়ে মিউজিয়ম ও আর্ট-গ্যালারী দেখা। আজ আকাশে মেঘ দেখে অপেক্ষা করতে হ'ল। বৃষ্টির পরিবর্তে

এলো ঝড়। তার অগ্রভাগে এলো ঘেঁটু। ঝড়ের বেগ প্রসমিত হতে আমরা মন্দির অভিমুখে বেরিয়ে পড়লাম। এখন সকলে মিউজিয়ম দেখার উদ্দেশ্যে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। আর এক দফা গোপুরমগুলি পরিদর্শন ক'রে আর্ট-গ্যালারী বা মিউজিয়মে এলাম। চতুর্দিক পরিভ্রমণ ক'রে যে স্তম্ভগুলিতে আঘাত করলে স্বরলিপির ধ্বনি শোনা যায়, সেই স্তম্ভের নিকটে এলাম। এক কর্মচারী এক খণ্ড কাষ্ঠের সাহায্যে আঘাত ক'রে আমাদের দেখালেন। সুচিন্দ্রমের স্তম্ভের মত মৃদু আঘাতে সেরূপ স্পষ্ট ধ্বনি এ স্তম্ভে শোনা যায় না।

এরপর মীনাক্ষী মন্দিরে যাওয়ার পথে দেওয়াল চিত্রগুলি ভালভাবে দেখলাম। সন্ধ্যার পর আমরা প্রাঙ্গনে এসে এক সঙ্গীতের আসরে বসলাম। বহু শ্রোতা সমবেত হয়েছেন। কিছুক্ষণ সঙ্গীত শুনলাম। উচ্চাঙ্গ কর্ণাটী সঙ্গীত।

গৃহিণী বললেন—চলো এ মাদ্রাজী গান আমার ভাল লাগে না। ঘেঁটু, তোর ভাল লাগে এ গান ?

ঘেঁটু বললে—গান যতই ভাল উচ্চাঙ্গের হোক, গান বন্ধ হলেই আমার আনন্দ হয়। কারণ গান বন্ধ হলেই সঙ্গত চলে। ঐ সঙ্গতটা আমার বেশ ভাল লাগে।

মন্দির থেকে সকলে ফিরলাম। ঘেঁটুর লজের দ্বারে এসে তাকে বললাম—কাল সকালে আলগার কয়েল যাওয়ার ইচ্ছা আছে। এখান থেকে বারো মাইল পথ। ভাল মন্দির আছে। সকালে বাস ষ্টেশনে থাকবে।

ঘেঁটুকে লজে ছেড়ে আমরা ধর্মশালায় ফিরলাম। প্রবেশ ক'রে দেখলাম প্রাঙ্গনে পঞ্চাশ ষাট জন সন্ন্যাসী আশ্রয় নিয়েছে।

গৃহিণী বললেন—কি আপদ, আজ আবার এদের ধর্মশালায় জায়গা দিয়েছে।

বললাম—ওদের জন্যই ধর্মশালা। ওরা আনন্দে প্রাঙ্গনের আকাশ তলে স্থান নিয়েছে। তোমাদের মত কোন কামরাও দখল করে নি।

তিনি বললেন—দেখবে কাল সকালে জঞ্জালে উঠানে পা বাড়াতে পারবে না।

পরদিন প্রাতে আলগার কয়েল যাওয়ার ইচ্ছায় বাস ষ্টেশনে এলাম। ঘেঁটুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কি জানি হয়তো এখনও শয্যা ত্যাগ করে নি। আলগার কয়েলের বাসের সংবাদ নিলাম। আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে।

অকস্মাৎ বম্বের সাহেব এসে নমস্কার জানিয়ে বললেন—কোথায় চলেছেন? এই অবাঞ্ছিত বন্ধুকে এড়াতে মিথ্যা কথা বলতেই হ'ল। তাঁকে বললাম —আমরা রেল ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনের সংবাদ নিয়ে যাব মন্দিরের দিকে। আমার মেয়ে কয়েক মিনিট আগেই সে দিকে গেছে।

সাহেব বললেন—আমাকেও একটা বিশেষ কাজে ওদিকে যেতে হবে। এই বলেই তিনি দ্রুত প্রস্থান করলেন।

গৃহিণী বললেন—তুমি ঘেঁটুর কাছে গিয়ে তাকে তাড়া দিয়ে নিয়ে এস, বাসের সময় বেশী নেই।

যাওয়ার আবশ্যক হ'ল না। ঘেঁটু স্কন্ধে একটা বড় ব্যাগ ঝুলিয়ে আমাদের নিকট এসে হাজির হ ল।

গৃহিণী তাকে বললেন—সেই বেহায়া লোকটা এদিকে এসেছিল। উনি তাকে মন্দিরের দিকে পাঠিয়েছেন। তোর সঙ্গে দেখা হ'ল?

ঘেঁটু বললে—দেখা হয় নি। হলে ভালই হতো। তাকে মাদুরাই হসপিটালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম। বাঙ্গালী বলে সহ্য করেছি। এক জনের জঘন্য মনোবৃত্তির জন্য সারা বাঙ্‌লা দেশের দুর্ণাম হবে এই কারণেই বিরক্তিকর প্রসঙ্গ দূরে ঠেলেই রেখেছি। এর পর দেখা হলে লজের দরোয়ান দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। চলুন বাস এসে গেছে।

বাস চলেছে। এপথে দেখার মত কিছুই নেই। মধ্যে মধ্যে এক একখানি ছোট গ্রাম। গ্রামের মধ্যে ছোট গেপুরম দেখা যাচ্ছে।

বাস এসে থামল একটি প্রান্তরে। বাস থেকে নেমে দেখলাম সম্মুখে একটি বিরাট পাহাড়। তারই পাদমূলে মন্দির বা আলগার কয়েল। এ স্থানটি কোন গ্রাম বা নগরের অন্তর্ভুক্ত নয়। অদূরে একখানি গ্রাম এ স্থান থেকে লক্ষ্য হচ্ছে।

প্রায় বারো মাইল দূরে মাদুরাই। তারপর কয়েকখানি গ্রামের পর

এই মন্দির। জন-কোলাহল বিহীন শৈল পাদমূলে এই রমণীয় দেবালয়। মন্দির সীমানায় এসে দেখলাম এক দিকে বহু কক্ষ বিশিষ্ট বৃহৎ অট্টালিকা। কয়েকটি কক্ষে যাত্রীরা রন্ধন করছেন। এঁরা বোধহয় দূরের যাত্রী। প্রাতে এসে পূজাদির পর দেবস্থানে আহারাদি ক'রে গৃহে ফিরবেন। অনেকে হয়তো পিকনিকে এসেছেন। স্থানটি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর মত। সে স্থানের আকর্ষণ ভাগিরথী, এ স্থানের আকর্ষণ মন্দিরের পশ্চাতে বিরাট শৈলরাজ।

মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন ও পূজার জন্য মন্দির সীমানায় এলাম। পাশে কয়েকটি ফুলের ও পূজার দ্রব্যের দোকান। তারই একদিকে একটি কক্ষে ইড্‌লি, দোসা, বড়া ও কফির হোটেল।

প্রাঙ্গনের সম্মুখে বৃহৎ নাটমন্দির। এক উচ্চাঙ্গের শানাই বাদক নাটমন্দিরে আসর নিয়েছেন। তার সম্মুখে বহু শ্রোতা নিবিষ্ট মনে সঙ্গত উপভোগ করছেন। অনুমান করেছিলাম, এই শানাই বাদ্য মন্দিরের স্থায়ী ব্যবস্থা। পরে জানলাম, আজ এস্থানে একটি বিবাহ কার্য সমাধা হবে। সেই কারণে এই নহবতের ব্যবস্থা।

পাদুকা ও ভ্যানিটী ব্যাগ কফি হোটেলে গচ্ছিত রেখে পূজার জন্য মন্দিরের দিকে গেলাম। প্রথম মহলে এসে দেখলাম, মন্দির মধ্যে চতুর্ভূজ নারায়ণ মূর্তি। মন্দিরের কারুকার্য দর্শনযোগ্য। এ মন্দিরে পূজার পর দ্বিতীয় মহলে এলাম। এ মহলের মন্দির মধ্যে তিনটি বিগ্রহ দেখলাম। একটি দেবমূর্তি, অন্য দু'টি দেবী মূর্তি। পুরোহিতের নিকট জানলাম, দেব মূর্তিটি সুন্দরম স্বামী। দেবী মূর্তির একটি ভাগ্য দেবী, অন্যটি ভূমি দেবী।

পূজার পর কফি হোটেলে এলাম। খাস মাদুরা সহরে দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ। গতকল্য তিরুপরণকুন্দ্রমে দেখেছি দ্রব্যাদির মূল্য অধিক নয়। মনে হয় এ হোটেলের খাদ্য দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ। এস্থানে অন্য কোন হোটেল না থাকায় এ হোটেল ব্যতীত অন্য উপায় নেই।

আমরা সেই হোটেলেই আহারের পর মন্দিরের চতুর্দিকে ঘুরলাম। মন্দির সংলগ্ন একটি ধর্মশালা কিংবা যাত্রীনিবাস দেখলাম। একটি

কক্ষে কয়েকজন সন্ন্যাসীকে বিশ্রাম করতে দেখলাম। মন্দিরের পশ্চাত দিকে একটি দ্বার দেখে ঘেঁটু বললে—এইদিকে মনে হয় পাহাড়ে যাওয়ার পথ আছে। চলুন উপরে যাওয়া যাক।

বললাম—চলো, এভারেষ্ট বিজয়ী হয়ে আসা যাক।

কিছু দূর গিয়ে গিরি আরোহণের কোন পথের চিহ্ন দেখলাম না। একটি ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর নিকট জানলাম, এ পাহাড় আরোহণের কোন ভাল রাস্তা নেই। আরোহণে কোন আনন্দও নেই। হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ অসম্ভব নয়। এদিকে দু-মাইল দূরে একটি ভাল মন্দির ও ঝরণা আছে। পথ দুর্গম।

ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম—আপনি কি মন্দির আর ঝরণা দেখতে চলেছেন ?

তিনি বললেন—অদূরে আমার গ্রাম। অমি এখন এসেছি মাদুরা থেকে। এই পথে গ্রামে চলেছি।

ঘেঁটু বললে—দু' মাইল দূরে মন্দির আর ঝরণা আছে। আজ থাক। কাল এসে ঝরণায় স্নান ক'রে যাব।

আমি বললাম—কাল আমরা এ সময় থাকব কোদাইকানালের পথে। ধর্মশালায় আমাদের থাকার অধিকার মাত্র তিন দিন। ম্যানেজারের অনুগ্রহে চার দিন গত হ'ল। আগামী কাল সসম্মানে তাঁদের কক্ষ ত্যাগ না করলে অর্দ্ধ চন্দ্রের ব্যবস্থা করবে। কাল তুমি আমাদের সঙ্গে কোদাইকানাল চলো।

ঘেঁটু বিমর্ষ বদনে বললে—আপনাদের সঙ্গে যেতে পারলে সুখী হতাম। এখানে ডাইংক্লিনিংয়ে কয়েকখানা সাড়ী কাচতে দিয়েছি, কাল সন্ধ্যার পূর্বে পাওয়ার আশা নেই। আমি পরশু মাদুরাই কোদাইকানাল বাসে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে মিলব।

আমরা মন্দির ত্যাগ ক'রে বাইরে এলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বাস পেলাম।

পরদিন সকালে কোদাইকানাল যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। সকালে সাড়ে ন'টায়, তারাপর ট্রেন সাড়ে বারোটায়। গৃহিণী প্রথম ট্রেনেই

যাওয়ার সিদ্ধান্ত ক'রে অতি প্রত্যুষে রন্ধন সমাধা ক'রে তাঁর ভাণ্ডার গুছিয়ে নিলেন। ধর্মশালার বাইরে এসে সুন্দরেশ্বরম ও মীনাক্ষী দেবীকে প্রণাম জানিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'লাম।

ষ্টেশনের পথে ঘেঁটুর সাক্ষাৎ পেলাম। সে আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে গেল। কামরায় যথেষ্ট জনতা সত্ত্বেও ঘেঁটুর সাহায্যে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নি। ত্রিবেন্দ্রাম থেকে মাদুরাই আসার সময় ডলি এসেছিল আমাদের সাহায্য করতে। ট্রেন ষ্টেশন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রুমাল উড়িয়ে বলেছিল টা-টা। মাদুরাই এসেছে ঘেঁটু। যত্ন সহকারে ট্রেন আরোহণে সাহায্য করলে। ট্রেন ছাড়া মাত্র যেন তার সকল উৎসাহ বিলীন হয়ে গেল। গৃহিণী গবাক্ষ থেকে অনেক উপদেশ দিলেন। তার কর্ণে কোন বাণী প্রবেশ করল বলে মনে হ'ল না। সে যেন বিমর্ষ বিহ্বল হয়ে উদাস নেত্রে কামরার দিকে চেয়ে রইল।

ট্রেন মাদুরাই সহরের শেষ সীমা অতিক্রম ক'রে চলেছে। গবাক্ষ থেকে অদূরে গ্রামগুলির দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলাম। চক্ষুর সম্মুখে ভেসে বেড়াতে লাগল ঘেঁটুর সেই করুণ মুখ, উদাস্ চাহনী।

এই পর্য্যটক জীবনে কয়েক মাসে কি অদ্ভুত পরিবর্তন। ভুলে গেছি দেশ, আত্মীয়, পরিজন। স্নেহের পাত্র-পাত্রিরা ঝাপসা হয়ে দূরে সরে গেছে। অথচ প্রতি মুহূর্তে মানসপটে প্রতিফলিত হচ্ছে অনাত্মীয়, সম্পর্ক হীন, পথে পাওয়া মূর্তিগুলি। সকল সময় যেন জাগ্রত স্বপ্ন দেখছি।

গৃহিণী আমার চিন্তাভঙ্গ ক'রে বললেন—শুনলাম কোদাইকানাল মাদুরার বেশী দূরে নয়। একবার সংবাদ নাও আর কত দূর।

গা ঝাড়া দিয়ে বসলাম। পার্শ্ববর্তি কয়েকজন সহযাত্রীকে প্রশ্ন ক'রে জানলাম, কোদাইকানাল আর দু'টি ষ্টেশনের পর। বাক্স-বেডিংগুলি একবার নিরীক্ষণ ক'রে স্থির হয়ে বসলাম।

কোদাইকানাল।

ট্রেন এসে থামল কোদাইকানাল রোড ষ্টেশনে। কুলি—কুলি রবে চিৎকার ক'রে কোন ফল পেলাম না। প্লাটফর্মে নামলাম। গৃহিণী এক সহযাত্রী মহিলার সাহায্যে মালপত্র দ্বারের নিকট এগিয়ে দিলেন। সেগুলি কোনরূপে প্লাটফর্মে নামাবার পর হাজির হ'ল একজন কুলি। দু'জন কুলিকে মনোনীত ক'রে মালপত্রের ভার দিয়ে বললাম—আমরা যাব কোদাইকানালে। বাস ষ্টেশনে নিয়ে চলো।

এখন জানলাম আমাদের অযথা তৎপরতার কোন প্রয়োজন ছিল না। টাইম টেবলের নির্দেশ দু'মিনিট বিরাম কিন্তু ট্রেন প্লাটফর্মে বিশ্রাম নিলে প্রায় দশ মিনিটের অধিক। বহু দেশী-বিদেশী পর্য্যটক আসেন এখানে। জমকালো ষ্টেশন। দীর্ঘ প্লাটফর্ম। নানাপ্রকার যাত্রীর সংস্পর্শে কুলিরা বেশ মার্জ্জিত ও কর্মপটু। তারা আমাদের কোদাইকানাল যাওয়ার প্রস্তাব শোনামাত্র শান্তভাবে আমাদের সকল কার্যে সাহায্য করলে।

রেল ষ্টেশনের পাশেই বাস ষ্টেশন। কোদাইকানাল রোড থেকে কোদাইকানাল যাওয়ার দু'ই প্রকার বাসের ব্যবস্থা আছে। সরকারী এক্সপ্রেস বাস আর প্রাইভেট বাস। কোদাইকানাল বাস পথে সকল বাসই কয়েক স্থানে থামে। সরকারী এক্সপ্রেস বাসগুলির বিরাম সময় অতি সামান্য। প্রাইভেট বাসের বিরাম সময় কিছু অধিক। এতদ্ব্যতীত কোন পার্থক্য নেই। সরকারী বাসের ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা। প্রাইভেট বাসের ভাড়া তিন টাকা দু'আনা। বাস তিনবার যাতায়াত করে। প্রত্যূষে ও অপরাহ্ণে সরকারী বাস, মধ্যাহ্নে প্রাইভেট বাস। আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। কোদাইকানাল রোড ষ্টেশনে এসেছি প্রাইভেট বাস ছাড়ার আধ ঘণ্টা পূর্বে। অপরাহ্ণের বাসে গেলে অধিক অর্থ দণ্ড দিয়ে কোদাইকানালে হাজির হতাম রাত্রি ন'টায়।

কুলিরা মালপত্র এনে রাখলে বাস অফিসের দ্বারে। অফিস কক্ষে ছিলেন নগ্ন গাত্রে, সাদা লুঙ্গি পরিধানে এক প্রবীন ভদ্রলোক। আমরা তাঁর নিকট দু'খানি কোদাইকানালের টিকিট চাইলাম। তিনি সসম্ভ্রমে আমাদের আহ্বান ক'রে তাঁর অফিস কক্ষে বসতে অনুরোধ ক'রে বললেন—বাস ছাড়তে কিছু বিলম্ব আছে। আপনাদের আহারাদির আবশ্যক হলে নিকটে ভাল হোটেল আছে আহার ক'রে আসতে পারেন। কুলিদের বললেন মালের ওজন দেখতে। মাল ওজনের পর তিনি হিসাব ক'রে বললেন, মালের মাসুল তিন টাকা। দু'খানি টিকিটের মূল্য ছয় টাকা চার আনা মোট ন'টাকা চার আনা দিন।

মালের মাশুল সমেত ন'টাকা চার আনা দিলাম। তিনি বললেন—আপনারা নিশ্চিন্তে বাসে গিয়ে অপেক্ষা করুন। যথা সময়ে আপনাদের টিকিট ও মালের রসিদ পাবেন। তিরুমাল্লাই-এর মত এ স্থানেও মালের মাশুল লাগে।

বাস ছাড়ার কিছু পূর্বে বাস অফিসের ভদ্রলোক আমাদের হাতে টিকিট ও মালের রসিদ দিয়ে গেলেন।

বাস কয়েকখানি দোকান ও রেল ষ্টেশন পশ্চাতে ফেলে ধরলে একটি ছায়া-শীতল পথ। আশে পাশে কোন লোকালয় নেই। কিছু কিছু ধানের ক্ষেত আর ছোট ছোট বাগান। প্রায় একটানা বারো মাইল পথ অতিক্রম ক'রে বাস এসে হাজির হ'ল একটি সহরে।

সহরের প্রবেশ পথে দেখলাম কয়েকটি মন্দির। তারপর বিদ্যালয় ভবন, খেলার মাঠ, আদালত, হসপিট্যাল প্রভৃতি।

গৃহিণী বললেন—কোদাইকানাল এসে গেছি।

বাস এসে থামল একটি জমকালো বাজারের মধ্যভাগে। ভাড়ার অনুপাতে পথের দূরত্ব বুঝলাম না। কি জানি কোন্ স্থানে কি রীতি। বাস থামতে প্রায় অর্দ্ধেক লোক নেমে গেলেন। ড্রাইভার কণ্ডাকটর বাস রেখে ঢুকলেন একটি হোটেলে। বুঝলাম পথের শেষ হয় নি। কোদাইকানাল পৌঁছতে এখনও বিলম্ব আছে। আমি বাস থেকে নেমে গৃহিণীর জন্য পান এনে দিলাম।

বাজার ত্যাগ ক'রে বাস আবার চলতে শুরু করল। সামান্য কিছু দূর যাওয়ার পর রাস্তার রূপ গেল বদলে। পথের দুই পাশে শ্রেণী বদ্ধ বৃক্ষ সরে গেছে, তার পরিবর্তে নাতি বৃহৎ পাহাড়শ্রেণী হাত ধরাধরি ক'রে বাস পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম বাস উঠবে পাহাড়ে। পাশে এক সহযাত্রী ভদ্রলোকের নিকট জানলাম—কোদাইকানাল যাওয়ার বারো মাইল সমতল পথের শেষ হয়েছে। এখন যাট মাইল পাহাড় পথে গিয়ে এক পাহাড়ের শীর্ষ দেশে কোদাইকানাল শৈল নিবাস। সেই স্থানে গিয়ে আমাদের যাত্রার শেষ।

পথের দূরত্ব ও বিবরণ শুনে গৃহিণী মহা খুশী। পাহাড় আরোহণে গৃহিণীর আনন্দ, তা সে পদব্রজেই হোক বা যানবাহনেই হোক।

জানুয়ারীতেও মাদ্রাজ প্রদেশে শীতের প্রকোপ থাকে না। মার্চ মাসে রীতিমত গরম। বাঙ্গালী বাবুর সৌখীন পোষাক আদ্দির পাঞ্জাবী কন্যাকুমারী থেকেই গাত্রে চড়িয়েছি। মাদুরাতেও তাই। সেই পোষাকে চলেছি কোদাইকানাল। রেল ষ্টেশন থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত সম অবস্থাতেই ছিলাম। এখন বাস কিছুদূর পাহাড় আরোহণে সৌখীন পাঞ্জাবীর অসারত্ব উপলব্ধি করলাম। গৃহিণী সিল্কের ব্লাউজের উপর শাড়ীর অঞ্চল দিয়ে আবৃত করেছেন।

আরও বেশ কিছুদূর বাস উর্ধে আসার পর এক স্থানে বিরাম নিলে। দেখলাম বেশ একটি বড় বাজার। কলা, পেঁপের আড়ৎ। মাল বস্তাবন্দি ক'রে রেখেছে। হয়তো লরীতে কিংবা নিম্নগামী বাসে ঐ সকল মাল রপ্তানী করবে। বাসের পাশে বিক্রয় করতে এলো হৃষ্ঠ-পুষ্ঠ কলা, সুপক্ক পেঁপে। কফি ও বিস্কুট। গৃহিণী অপ্রসন্নভাবে বললেন—জঙ্গলী দেশ। এই ঠাণ্ডায় বেচতে এলো কলা, পেঁপে। দু'কাপ কফি নাও তো।

পুনরায় বাস চলতে শুরু করল। মধ্যে মধ্যে এই পাহাড়ের উর্ধ পথে কোন একটি জনপূর্ণ লোকালয় বাজার দেখলেই অনুমান করি এইবার এসে গেছি। এখন কোদাইকানালে পেঁ ছিতে পারলে সর্বাগ্রে ট্রাঙ্ক খুলে কয়েক মাস পূর্বের পরিত্যক্ত শীত-বস্ত্র বার ক'রে সর্বাঙ্গে চাপাতে হবে। তারপর অন্য কথা। কিন্তু কোদাইকানালের সাড়া পাওয়া গেল না।

আরও কয়েক মাইল উর্ধে এলাম। আরামদায়ক শীতল বায়ু এখন অন্তরে আঘাত আরম্ভ করছে। গৃহিণী মিহি শাড়ীর অঞ্চল মাথায় তুলে কনে বউ সেজে বসেছেন। আমি তুই হাত বক্ষে চেপে ধরে পালোয়ানের বেশে তুলতে লাগলাম। বাস ক্রমান্বয়ে উর্ধ পথে চলেছে। একটি বাজারের নিকট বাস থামলে আরও তু' গ্লাস কফি পান করলাম। তু' দফা কফি পান করেও কোন সুফল পেলাম না। কম্পিত কলেবরে কোদাইকানালের প্রতীক্ষায় রইলাম। মধ্যে মধ্যে আসছে লোকালয়, বাজার কিন্তু আমাদের আকাঙ্খিত স্থানের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। কোদাই কত দূরে একমাত্র খোদাই তা জানেন। আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা উর্ধ গতির পর দেখতে পেলাম কোদাইকানালের নিশানা। রূপসী কোদাইকানাল বাহু বিস্তার ক'রে আমাদের আলিঙ্গন দিলে। আনন্দিত হলাম পথের অবসানে।

বাস এসে থামল বাজারের সন্নিকটে। এই স্থানটিতে বাজার, পোষ্ট অফিস, কয়েকটি হোটেল, বস্ত্রের ও দর্জ্জির দোকান ও বেকারি প্রভৃতি আছে। সিমলা, মুসৌরী, দার্জ্জিলিং, প্রভৃতি শৈল-বাসের রূপ ভিন্ন প্রকারের। বহু দূর থেকেই সহরের আকৃতি লক্ষ্য হয়। সে সকল স্থানে প্রধান পথের পার্শ্বে বাজার, দোকান, সিনেমা, হোটেল, স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ প্রভৃতি দেখা যায়। কোদাইকানালে সেরূপ দীর্ঘ প্রধান পথ কিছু নেই। সমস্ত সহরটি যেন পর্ব্বত শিখরে অরণ্য সমাকীর্ণ স্থানে। মধ্যে মধ্যে সুবিধা মত স্থান মনোনীত ক'রে হয়েছে লজ, হোটেল, অফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। সন্ধ্যার পর পরিভ্রমণ আনন্দদায়ক নয়। অন্যান্য সহরের মত উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে পথঘাট আলোকিত নয়। সন্ধ্যার পর শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে বিশেষ কার্য ব্যতীত রাত্রে বিশেষ কেহ গৃহের বাহিরে যান না। তবে যে পরিমাণে লজ, হোটেল প্রভৃতি ব্যবসায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, মনে হয় শীঘ্রই বৃক্ষের মূলচ্ছেদ ক'রে একটি নূতন সহর নির্ম্মান ক'রে কোদাইকানালের মৌলিকত্ব ধ্বংস হবে।

আমরা বাস থেকে নেমে এক হিন্দি-জানা যুবককে কুলি পেলাম। নাম

রামস্বামী। এর সাহায্যে কয়েকটি স্থানে অনুসন্ধানের পর প্যারাডাইস লজের দ্বিতলে একটি কক্ষ নিলাম। দৈনিক ভাড়া চার টাকা। কক্ষের সম্মুখে বারান্দা। মেঝেয় দড়ির মেটিং ছু'টী সশয্যা খাট। কয়েকখানি চেয়ার ও ড্রেসিং টেবেল। কক্ষ সংলগ্ন বাথ-রুম।

এ লজে হোটেল নেই। নিকটেও নেই। আমরা কক্ষ মধ্যে রন্ধনের অনুমতি নিয়েছিলাম। ম্যানেজারের নাম রাজন। মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক, হিন্দি ভালই জানেন। এ লজে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নি।

রামস্বামী একটি বেকারীতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কাজ করে। অপরাহ্নে বাস ষ্টেশনে এসে সুবিধা মত কিছু উপার্জ্জন করে। স্বভাবটা কন্যাকুমারীর ভাস্করের মত। আমরা যে কয়দিন এস্থানে ছিলাম প্রতিদিন অপরাহ্নে আমাদের নিকট এসে নানাপ্রকার গল্প করতো। ভ্রমণে সাহায্য করতো। সে আমাদের প্যারাডাইস লজে পৌছে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলে। প্রস্থানকালে গৃহিণী তাকে অনুরোধ ক'রে বললেন—আমাদের একটি মেয়ে কাল এস্থানে আসবে। যেন বাস ষ্টেশনে সংবাদ রাখে।

আমরা সর্বাগ্রে শীত-বস্ত্র গাত্রে আবৃত করলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বাজারের দিকে গেলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যতটুকু সম্ভব ঘুরে দেখে বেড়ালাম। সন্ধ্যার পর রাত্রের আহারের জন্য একটি হোটেলে প্রবেশ করলাম। এ হোটেলে গরম পরোটার ব্যবস্থা দেখলাম। বহুদিন পরে ইড্‌লি-ধোসার পরিবর্ত্তে পরোটার আস্বাদ গ্রহণ করলাম। ঘি ভালই মনে হ'ল।

আহারের পর লজের দিকে ফিরলাম। তখন রাত্রি প্রায় আটটা। জনবিরল অরণ্য মধ্যে অচেনা পথ। পথে আলোর সুব্যবস্থা নেই। পথেরও কোন নিদর্শন নেই। অনুমান ক'রে লজ অভিমুখে চলেছি। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্যটনের পরও আমাদের লজের সন্ধান পেলাম না।

পথ নির্জন। বেশ চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। ভাগ্যক্রমে অদূরে মানুষের কণ্ঠস্বর পেলাম। আমাদের আহ্বানে তাঁরা অপেক্ষা করলেন। নিকটে গিয়ে তাঁদের নিকট আমাদের লজের পথ জানতে চাইলাম। তাঁরা বললেন, আমরা ঐ লজেই থাকি আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন।

এরা উভয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোক। একজন স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্কে কর্ম করেন। কিছুদিন পূর্বে বদলি হয়ে এসেছেন কোচিন থেকে। অন্য জন এঁর বন্ধু। এসেছেন এ স্থানটি দেখতে। প্যারাডাইস লজে হোটেল নেই। এরা গিয়েছিলেন বেশ কিছু দূরে একটি হোটেলে আহারে। অজানা পথে এঁদের সাহায্য পেয়ে উপকৃত হলাম।

লজে ফিরে আমাদের বেডিং দু'টি খুলে দুই প্রস্থ আচ্ছাদন দিয়ে অন্তকার মত নিদ্রায় মনোনিবেশ করলাম।

পরদিন প্রভাতে বাজারে গেলাম। পূর্বেই বলেছি বাস ষ্টেশনের পাশেই বাজার। এইটি এস্থানের ব্যবসা কেন্দ্র স্থান। আমরা বাজারে প্রবেশ করলাম। এ যেন কলকাতার ডিসেম্বর মাসের বাজার। কোপি, আলু, টমেটো, মটরশুটি, বীম প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার সব্জি। মাছ, মাংস, ডিমও আছে। অধিকাংশ ক্রেতা মেম সাহেব। বাজার থেকে বেরিয়ে বেকারীতে এলাম।

বেকারী মালিক বললেন—এখন বাসী রুটী। অপরাহ্নে এসে টাটকা রুটী নিয়ে যাবেন।

পোষ্ট অফিসে এসে কাউণ্টারে একটি মহিলার কাছে রিপ্লাই-কার্ড চাইলাম। তিনি বললেন—বারোটার পর রিপ্লাই-কার্ড পাবেন।

লজে ফিরে গৃহিণী রন্ধনে ব্যাপৃত হলেন। আমি একখানি চেয়ার নিয়ে বারান্দায় রৌদ্রে বসলাম। সূর্য্যদেব এক একবার আমাকে দেখে যাচ্ছেন। পরক্ষণেই আবার দুরন্ত ছেলের মত ধূমাকৃতি মেঘের মধ্যে লুকিয়ে পড়ছেন।

নিম্নতলে গিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের ভদ্রলোকের কামরায় গেলাম। তখন তিনি সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠেছেন। কিছুক্ষণ এস্থান সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করলেন। কোদাইকানালের আবহাওয়া, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আদৌ সন্তুষ্ট নন। ভ্রম বশতঃ এ স্থানে এসেছেন। শীঘ্রই কোচিনে ফিরে যাবেন। অফিসে সে বন্দবস্ত করেছেন। আমাদের স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্কে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

তাঁর নিকট থেকে ফিরে লজের গবাক্ষ থেকে লক্ষ্য করলাম লজের অদূরে

একটি জলধারা কল কল শব্দে চলেছে। কয়েকজন রজক সেই জলে বস্ত্র ধৌত করছে। সেদিকে গিয়ে সেই জল স্পর্শ ক'রে দেখলাম জল অতি নির্মল ও শীতল। এর উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে রজকদের প্রশ্ন করলাম। তারা নিজ ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা না জানায় এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাত হতে পারলাম না। লজের ম্যানেজার রাজন বাবুকে ঐ জলধারা সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে জানলাম—কিছুদূরে একটি পাহাড়ে ঐ ঝরণার উৎপত্তি। পাহাড়ের সানুদেশে আছে একটি সুন্দর লেক। ঝরণার জল অবিরত সেই লেকে প্রবেশ করায় উদ্বৃত্ত জল এই স্থান দিয়ে অন্য একটি খালের দিকে চলেছে। লজের অতি নিকটে লেক। এখনই সেস্থানে গিয়ে আমাদের দেখে আসতে বললেন।

আহারের পর লেক দেখতে গেলাম। লজের প্রায় এক ফার্লং দূরে এই লেক। লেকের পশ্চিম দিকে বৃক্ষ সমাকীর্ণ পাহাড়। সেই পাহাড়ে এই ঝরণার উৎপত্তি। ইচ্ছা করলে সে স্থানে যাওয়া যায়। আমরা সে চেষ্টা করি নি। লেকের দক্ষিণে কতকগুলি বাস গৃহ। একটি সুইমিং ক্লাবও আছে। লেকের উত্তরেও পাহাড়। লেকের পূর্বদিক দিয়ে একটি পথ উত্তরের পাহাড়ের দিকে গেছে। জলবিহারের জন্য কয়েকখানি ছোট নৌকা দেখলাম। অনেকে সেই নৌকা ভাড়া নিয়ে জলবিহারে আনন্দ উপভোগ করেন।

এরপর পোষ্ট অফিস ও বেকারী ঘুরে লজে ফিরে দেখলাম, রামস্বামী লজের বারান্দায় বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

রামস্বামীকে গাইড নিয়ে ভ্রমণে গেলাম। কিছুদূর এসে আমাদের গাইড দেখালে একটি মোটর গ্যারেজ। আবশ্যকে এস্থানে মোটর ভাড়া পাওয়া যায়। এর পর গেলাম কক্সওয়ে নামক একটি স্থানে। এটি কোদাইকানাল পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে। এস্থানে দাঁড়িয়ে নিম্নদিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় একবার পদস্খলন হ'লে সমতল ভূমিতে পৌঁছে যাব। কক্সওয়ে থেকে নিম্নে সমতল ভূমি, বৃক্ষ, সরোবর, নদী ও তৎপার্শ্ববর্তি গ্রামগুলি দেখতে অতি চমৎকার লাগে। আমরা কিছুক্ষণ এ দৃশ্য দেখার পর এলাম একটি বাগানের মধ্যে।

রামস্বামী একটি বৃক্ষে উঠে কয়েকটি অপক্ব ফল আমাদের হাতে দিয়ে বললে, একবার জুন মাসে আসবেন। এইসব বাগানে বহু প্রকার ফল দেখতে পাবেন। তার প্রদত্ত ফল কয়েকটি পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, সেগুলি ন্যাসপাতি জাতীয় ফল। পাঞ্জাবে বা উত্তর প্রদেশে এ ফলকে আড্ডু বলে। রামস্বামী বললে—জুন মাসে এইসব ফল পাকে। আর বহু প্রকারের উৎকৃষ্ট ফল বাজারে পাওয়া যায়।

এরপর কয়েক প্রকার গাছের পাতা এনে তাদের গুনাগুন বর্ণনা ক'রতে লাগল।

গৃহিণী বললেন—সন্ধ্যা হয়ে এলো। পাহাড়ে-জঙ্গলে আর ঘোরা উচিত নয়।

ফিরলাম লজের দিকে। কিছুদূর এসে সম্মুখে একটি পাহাড়ে আলোক-সজ্জা দেখে গৃহিণী রামস্বামীকে প্রশ্ন করলেন—পাহাড়ে এত আলো কিসের ?

রামস্বামী বললে—ঐতো সুব্রহ্মাণ্য মন্দির। আপনারা দেখেন নি ? কাল সকালে গিয়ে দেখে আসবেন। অতি চমৎকার মন্দির। লোকে তো ঐ মন্দির দেখতেই কোদাইকানালে আসে। ভারি জাগ্রত দেবতা। গৃহিণী শুনে আমার উপর রুষ্ট হলেন। কাল থেকে এসে লেক আর বাজার ঘোরা হচ্ছে। এমন একটা মন্দিরের সংবাদ রাখে না।

বললাম—রাত্রের মত শান্ত হও। কাল সর্বাগ্রে গিয়ে তোমাকে মন্দির দেখিয়ে আনব। বাজারের নিকট এসে রামস্বামীকে বিদায় দিয়ে আমরা লজে ফিরলাম।

গৃহিণী বললেন—শীতে বসে থেকে কষ্ট ভোগের প্রয়োজন নেই। যা হোক খেয়ে শুয়ে পড়ো।

ঘড়ি দেখলাম মাত্র আটটা। বললাম—তোমার কথা যথার্থ। বসে থেকে কষ্ট ভোগ না ক'রে লেপ চাপা দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও। ন'টা বাজলে খাওয়া যাবে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দ্বারে আঘাৎ শুনে বাইরে এসে দেখলাম, রামস্বামী ও তার পশ্চাতে ঘেঁটু।

ঘেঁটু কক্ষে প্রবেশ ক'রে বললে—কাকীমা, শীঘ্র একটু চা ক'রে দিন,

ভীষণ ঠাণ্ডা!

রামস্বামী বললে—দিদিমণি এই মাত্র এলেন। কাল আপনারা বাস ষ্টেশনের পাশে যে লজ দেখেছিলেন সেই লজে কামরা ঠিক ক'রে দিলাম। রামস্বামী ঘেঁটুকে পৌছে দিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

গৃহিণী তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। রাত্রে ঘেঁটুর লজে একাকী যাওয়া নিরাপদ নয়। সে অনুরোধে স্বিকৃত হয়ে একখানি চেয়ারে বসলো।

গৃহিণী চা প্রস্তুত ক'রে সকলকে দিলেন। রামস্বামীকেও এক গ্লাস দেওয়া হ'ল। সেই সঙ্গে মাদুরায়ে প্রদত্ত ঘেঁটুর কেক্‌টির সদ্‌গতি হ'ল। ঘেঁটু কেক্‌টি দেখে একবার গৃহিণীর মুখের দিকে তাকালে।

গৃহিণী ঘেঁটুকে বললেন—কাল সকালে আমরা সুব্রাহ্মণ্য মন্দির দেখতে যাব, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। রাত্রে আহারের জন্য গৃহিণী ঘেঁটুকে অনুরোধ করলেন।

সে বললে—হোটেলে আমার খাবারের অর্ডার দিয়ে এসেছি। কাল সকালে দেখা হবে বলে রামস্বামীর সঙ্গে তার লজে চলে গেল।

পরদিন শয্যাত্যাগে বিলম্ব হওয়ায় মন্দির দর্শনে প্রস্তুত হতে আটটা বেজে গেল। ঘেঁটুর লজে এসে দেখলাম তার কক্ষের দ্বার তখনও বন্ধ।

গৃহিণী বললেন—ওকে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। শীতে এখনও উঠতে পারে নি।

দ্বারে আঘাৎ করতে তার নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল। আমাদের কক্ষে বসিয়ে বললে—আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি বাথ রুম থেকে আসছি। প্রায় পনর মিনিট পরে ফিরে এসে বললে, আর একটু অপেক্ষা করতে হবে, আমি পাশের হোটেল থেকে আসছি।

অপেক্ষা করতেই হ'ল।

দশ মিনিট পরে সে ফিরল একটি হোটেলের বয়কে সঙ্গে নিয়ে। বয়ের হাতে একটি ট্রেতে চায়ের কেটলী ও মাখন-রুটী।

সাজগোজ ক'রে বেরুতে ন'টা বেজে গেল। বাজারের নিকট এসে কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট পাহাড়ের পথ জেনে নিলাম।

তিনি বললেন—লেকের পূর্ব প্রান্তের পথ ধরে চলে যান। বাস ষ্টেশনের পাশ দিয়েও একটি রাস্তা পাবেন। লেকের ধার দিয়ে গেলে আপনাদের সুবিধা হবে।

ভাবলাম, বাস ষ্টেশনের পাশ দিয়ে যখন রাস্তা আছে ঐ পথে যাওয়াই শ্রেয়। লেকের দিকে যাওয়ায় অনেক সময় যাবে। বাস ষ্টেশনের পাশ দিয়ে একটি প্রশস্ত পথে অগ্রসর হয়ে কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, আমরা স্থানীয় পুরাতন পল্লীর মধ্যে এসেছি। ছোট ছোট বাড়ী। ঘন বসতি। পাহাড়ের পথের কোন চিহ্ন দেখলাম না। কাকেও জিজ্ঞাসা করি এমন কোন লোকেরও সাক্ষাৎ পেলাম না। ক্লান্ত হয়ে পরিশেষে লেকের দিকে যাওয়া মনস্থ করলাম।

পথিমধ্যে মজুর শ্রেণীর এক বৃদ্ধকে পেলাম। তাকে আমাদের অভিপ্রায় জানাতে আমাদের সাহায্য করলে।

ঐ ঘন বসতি পল্লীর সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম ক'রে পেলাম সুব্রাহ্মণ্য মন্দিরের পথ। এখন বৃদ্ধকে বিদায় দিয়ে অগ্রসর হলাম। এটি বৃক্ষ সমাকীর্ণ পাহাড় নয়। চড়াইয়ে উঠতে তাদৃশ ক্লেশ হয় না। শীর্ষ স্থানে এসে নিম্ন দিকে অবলোকন ক'রে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পাহাড়ের নিম্নভাগে রাশী রাশী তুলা পুঞ্জিভূত হয়ে পৃথিবীকে আবৃত করেছে। নিম্নের ভবনগুলি, বৃক্ষ, নদ-নদী সমস্তই এই তুলা রাশীর অভ্যন্তরে। এ দৃশ্য অবশ্য দার্জিলিং, মুসৌরীতেও দেখা যায়। এ স্থানের দৃশ্য আরও চমকপ্রদ। যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল পুঞ্জিভূত তুলার রাশী।

ঘেঁটু বললে—নেমে গিয়ে ঐ তুলার উপর শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

গৃহিণী বললেন—যখন নামবে ও কুয়াশা সরে গিয়ে দেখতে পাবে সবুজ জঙ্গল আর পাহাড়ের কালো মাথা।

আমরা মন্দির সমীপে এলাম। মন্দির দ্বারে যথারীতি গোপুরম ও তার পাশে ফুলের দোকান। মূল মন্দিরে সুব্রাহ্মণ্য দেবের মূর্তি। আরও কয়েকটি বিগ্রহের মূর্তি দেখলাম।

আমরা মন্দির থেকে ফিরলাম তখন বেলা এগারটা। ফিরলাম লেকের

পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা ধরে। লজের নিকটে এসে ঘেঁটু বললে—কাকীমা, আজ আমি আপনাদের কাছে খাব, দু'টি চাল নেবেন। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।

গৃহিণীকে বললাম—কালকের বাজারের অবশিষ্ট যা আছে এ বেলার মত চালিয়ে নাও।

স্টেট ব্যাঙ্কের বাবু এসে বললেন—সকালে কোথায় ছিলেন? এদিকে এসে দেখলাম আপনাদের কামরায় তালা বন্ধ।

বললাম—সকালে গিয়েছিলাম পাহাড়ের উপর সুব্রাহ্মণ্যের মন্দির দেখতে।

ভদ্রলোক বললেন—এদিকে এসেছেন কোদাইকানাল রোড থেকে কিছু দূরে পালনিতে নেমে পাহাড়ের উপর সুব্রমনিয়ম মন্দির দেখে যান। মন্দিরের এমন সুব্যবস্থা, আর কোন স্থানে দেখবেন না। পাহাড়ে উঠতে অসমর্থ হলে লিফটে চলে যাবেন। মন্দিরে যাওয়ার জন্য এমন চমৎকার লিফ্‌ট আর কোথাও দেখবেন না। লিফ্‌ট ভাড়া বিশেষ কিছু নয়। পাহাড়ে যাওয়ার জন্য সতন্ত্র সোপান আছে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আপনার ইচ্ছা হলে সোপন বেয়ে অনায়াসে পাহাড়ে যেতে পারবেন। পালনি মন্দির না দেখে যাবেন না।

গৃহিণী আগ্রহে বললেন—সেখানে থাকার জন্য ভাল জায়গা পাওয়া যাবে?

ভদ্রলোক বললেন—পালনি সহরের মধ্যে বিরাট ধর্মশালা। ত্রিতল ভবন। সকল সময় স্থান পাবেন। কোন চিন্তা করবেন না। আমার অনুরোধ পালনি বাদ দিয়ে যাবেন না।

গৃহিণী বললেন—জায়গার নামটা ভাল ক'রে লিখে নাও। ওখানে নেমে মন্দির দেখে যেতেই হবে।

বুঝলাম, ব্যয়ের ফর্দে আর এক দফা আইটেম বাড়লো।

ভদ্রলোক বললেন—আমার যে বন্ধু কয়েক দিন এখানে এসেছিলেন আজ তাঁকে পালনি পাঠালাম। সে কারণে আমার অফিস যেতে বিলম্ব হয়ে গেল। সন্ধ্যায় আবার সাক্ষাৎ হবে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ঘেঁটু এসে হাজির হ'ল। পশ্চাতে হোটেলের এক বয়ের হাতে ডেকচি।

সে বয়কে বললে—ডেকচি এখানে রেখে যাও। আমি পরে নিয়ে যাব। বয় সেলাম ক'রে চলে গেল।

গৃহিণী বললেন—তুই এসে গেছিস ? এখনও আমার রান্নার কিছু হয় নি। মাত্র ভাত বসিয়েছি। স্টেট ব্যাঙ্কের এক বাবু এই লজেই থাকেন। তিনি এতক্ষণ এখানে ছিলেন। ভদ্রলোক বললেন, কোদাইকানালের কিছু দূরে পালনি সহরে পাহাড়ের উপর মন্দির আছে। দেখবার মত। পাহাড়ে যাওয়ার জন্য না-কি লিফ্‌ট আছে। ওঁর এক বন্ধু আজ সেখানে গেলেন। আমরাও কাল যাব পালনি দেখতে।

আমি বললাম—পালনির চিন্তা পরে করা যাবে। ডেকচি থেকে যে আঘ্রান আসছে সেইটাই এখন দেখা দরকার। ডেকচির ঢাকা খুলে আহ্লাদে গদ গদ হয়ে গেলাম। দক্ষিণ ভারতে এমন উপাদেয় বস্তুর মুখ দেখি নি। আঘ্রানও পাই নি। পূর্ণ এক ডেকচি মাংসের কারী।

গৃহিণী বললেন—ভালই হয়েছে। অনেকখানি বেলা হ'ল আর কিছু রান্নার দরকার নেই।

আমি বললাম—সে পরে হবে। এখন দাও তো ভাতের সঙ্গে মহাপ্রসাদ। আহারের পর ঘেঁটু শুন্য ডেকচি হাতে নিয়ে বললে—এখন আপনারা বিশ্রাম করুন। বৈকালে আমাদের লজে যাবেন। এক সঙ্গে বেড়াতে যাব।

গুরু ভোজনের পর লেপের তলায় আশ্রয় নিলাম।

অপরাহ্ণ পাঁচটায় গেলাম ঘেঁটুর লজে। দেখলাম তার দ্বার বন্ধ। গৃহিণী ডাক দিতে দ্বার খুলে আমাদের বসতে অনুরোধ ক'রে পুনরায় শয্যা গ্রহণ ক'রলে।

গৃহিণী বললেন—আবার যে শুয়ে পড়লি, বেড়াতে যাবি না ?

ঘেঁটু বললে—আজ আর কোথাও যাব না কাকী মা। শরীর ভাল নেই।

গৃহিণী কপাল, বুক পরীক্ষা ক'রে বললেন—জ্বর হয়েছে ?

ঘেঁটু বললে—না, অমনি শরীর ভাল নেই।

রামস্বামী এসে হাজির হ'ল। সে বললে—প্যারাডাইসে গিয়ে দেখলাম আপনাদের ঘরে তালা বন্ধ। এখানে এলাম। কাল সকালের বাসে

ছ'খানি সিটের ব্যবস্থা করেছি। ছ'টায় বাস ছাড়বে। আমি আপনাদের বাসে তুলে দেব।

ঘেঁটু বললে—আপনারা কালই যাবেন? পালনি যাবেন বোধহয়? আমার পালনি যাওয়া হবে না। পাহাড়ে মন্দিরে যেতে পারব না। এখানে দিনকয়েক থেকে উটি যাব।

রামস্বামী বললে—বেড়াতে যাবেন না?

গৃহিণী বললেন—আমাদের ইচ্ছা ছিল। দিদিমণির শরীর ভাল নেই।

রামস্বামী বললে—বোধহয় হিল্-সিকনেস্। আমার জানা ভাল ডাক্তার আছে। সাহেব ডাক্তার। এক শিশি ওষুধ খেলে ভাল হয়ে যাবেন।

ঘেঁটু বললে—ডাক্তার দরকার হবে না। ওষুধ আমার সঙ্গেই আছে। প্রয়োজন বুঝলে খাব।

আমরা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর রামস্বামীর সঙ্গে গেলাম অফিস কোয়ার্টারের দিকে। তারপর আরও কয়েক স্থান ঘুরে লজে ফিরলাম।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্বে বেডিং বাঁধলাম। রামস্বামী এসে আমাদের বাসে তুলে দিলে। মালের ওজন হ'ল। রামস্বামী তদারক ক'রে ব্যবস্থা করলে। এখন মালের মাশুল দিলাম এক টাকা।

প্রায় মিনিট পনর পূর্বে আমরা বাসে উঠেছিলাম। আমাদের বিদায়কালে রামস্বামী ছ'গ্লাস কফি আর ছ'খানি রুটী দিয়ে অতিথি সৎকার করলে। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে তাকে এক টাকা বখশিষ দিতে হ'ল।

গৃহিণী দিদিমণির সংবাদ নিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করলেন। বাস ছাড়ল। আমরা সুব্রাহ্মণ্য মন্দিরের দিকে নমস্কার জানিয়ে কোদাইকানাল থেকে নামতে শুরু করলাম।

নিম্নাভিমুখে বেশ কিছুদূর এসে একটি বাজারের পাশে বাস থামল। স্থানটি বেশ মনোরম। কোদাইকানালের মত শীতের তাদৃশ প্রকোপ এখানে নেই। অনেকগুলি বাস-ভবন দেখলাম। বড় বাজার। একটি লোক কতকগুলি হৃষ্ট-পুষ্ট কলা ও পেঁপে বিক্রয় করতে এসেছে। কৌতূহল-বশে মূল্য জানতে গেলাম। লোকটি পেঁপের দাম বললে, বিশ পয়সা। প্রথম বুঝতে পারলাম না। পুনরায় প্রশ্ন ক'রে, একই উত্তর পেলাম।

আমি বললাম—পনর পয়সা। লোকটি আনন্দে এক কিলো ওজনের পেঁপেটি আমার হাতে তুলে দিলে। প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা ও সেই পরিমাণ পরিধি। কলার ডজন আট আনা। বিনা দ্বিধায় চার আনায় ছ'টি কলা নিলাম।

আনন্দে বাসে এসে গৃহিণীকে দেখালাম। তিনি এক নজরে দেখে বললেন —ও পেঁপেটি দু' আনায় দিত। কলা এখানে সস্তা। দু' আনাতেই কলা ছ'টা পাওয়া যেত। তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ে দর বাড়িয়ে দিলে। পেঁপেটা শেষ করতে আমাদের তিন দিন লেগেছিল। প্রতি দিনই আমার ব্যাকুবীতে অধিক মূল্য দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বাস এখন শৈল শিখর থেকে ধরা পৃষ্ঠে অবতরণ মাত্র আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হ'ল। গৃহিণী ইতিমধ্যে তাঁর লেডিজ শালটি হাতে নিয়েছেন। আমার অসুবিধা সত্বেও গরম কোট গায়েই রাখতে হ'ল। প্রায় বেলা এগারটায় কোদাইকানাল রোড ষ্টেশনে হাজির হলাম।

এবার আমাদের যেতে হবে পালনি। কোয়েম্বাটুর পেসেঞ্জার ট্রেন এখানে আসে অপরাহ্ণ দু'টোয়। ষ্টেশনের পাশে কয়েকটি ভাল হোটেল আছে। আমরা ওয়েটিং রুমে মাল-পত্র রেখে স্নান ক'রে নিলাম। তারপর হোটেলগুলি অনুসন্ধান ক'রে উদিপুরী হোটেলের সাইন বোর্ড দেখে আহার সমাধা ক'রে ট্রেনের অপেক্ষায় রইলাম।

পালনি :

যথাসময়ে আমরা ট্রেনে উঠলাম। দক্ষিণ ভারতে সকল স্থানে ট্রেন অতি অল্প, সকল ট্রেনেই জনতা। দিন্দিগল জংশনে এলাম বেলা প্রায় চারটায়। বেশ বড় ষ্টেশন। এ স্থান থেকে মাদ্রাজ লাইন পরিবর্তন ক'রে আমাদের ট্রেন যাবে কোয়েম্বাটুর লাইনে। দিন্দিগলে কফি খেলাম। সকল প্রকার খাদ্যই এখানে পাওয়া যায়।

ট্রেন পালনি ষ্টেশনের নিকটবর্তি হ'লে আমরা পাহাড়ের উপর বিখ্যাত মন্দির দেখতে পেলাম। ট্রেন পালনিতে উপস্থিত হ'ল সন্ধ্যা ছ'টায়।

পালনিতে সাধারণ যানবাহন দেখলাম সাইকেল-রিক্স ও ঝটকা। আমরা একটি ঝটকা নিয়ে দেবস্থান রেষ্ট-হাউসে এলাম।

দক্ষিণ ভারতে বহু স্থানে দেবস্থান রেষ্ট-হাউস আছে। দৈনিক সামান্য ভাড়ায় কক্ষ পাওয়া যায়। সেগুলি ধর্মশালার পর্যায়ে পড়ে। এ স্থানে শ্রীদণ্ড উথাপানি স্বামী দেবস্থান রেষ্ট-হাউসটি ভিন্ন প্রকারের।

সহরের প্রধান রাস্তার উপর বিরাট ভবন। প্রাঙ্গনে মনোরম উদ্যান। সকল সময় পানীয় জলের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নিম্নতলে কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম ও রন্ধন স্থান, বৈদ্যুতিক আলো পাখা আছে। দৈনিক চার্য আড়াই টাকা। দ্বিতলে দু'টাকা। বৈদ্যুতিক আলো, পাখা সমস্তই আছে। কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম নেই। তবে সৌচাগার ও পানীয় জলের কল উপরেই আছে। কোন অসুবিধা হয় না।

রেষ্ট-হাউসের বহির্ভাগে একটি প্রশস্ত হলে দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতির হোটেল।

আমরা রেষ্ট-হাউসের দ্বিতলে একটি কক্ষ পেলাম। মাল-পত্র রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সহরের দিকে গেলাম।

আমরা যে সময় পালনিতে এসেছিলাম তখন সেখানে উৎসব চলছে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম, সমগ্র সহরটি আলোক মালায় সজ্জিত। পাহাড়ের উপর মন্দিরের দিকে লক্ষ্য করলাম। মন্দিরটি বৈদ্যুতিক আলোকে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। পথে বিপুল জনতা। সহর ও সহরতলি থেকে এসেছেন বহু ভক্ত মন্দিরে পূজা দিতে। অনেকে মুণ্ডিত মস্তকে একটি তাম্র কিংবা পিতলের জলপূর্ণ পাত্র মস্তকে নিয়ে বাদ্যসহ মন্দিরাভিমুখে চলেছেন। রামেশ্বরে শিব রাত্রির উৎসবের মত রথ ও চতুর্দোলে আলোক সজ্জিত ক'রে বিগ্রহ নিয়ে পরিভ্রমণ করছে। পথিমধ্যে পুরোহিতগণ ভক্তদের নিকট দেবতার পূজা গ্রহণ করছেন। আরও দেখলাম কয়েকটি সঙ্গীত সম্প্রদায় গীত-বাদ্য সহকারে নগর পরিভ্রমণ করছেন।

এস্থানে বৎসরে চারটি উৎসব হয়। এটি বৎসরের শেষ উৎসব বা চতুর্থ উৎসব। ভাগ্যক্রমে আমরা উৎসবের সময় এস্থানে এসে উৎসব দর্শনের

সৌভাগ্য লাভ করলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলাম, রেষ্ট-হাউস থেকে পাহাড় ও মন্দির যত নিকটে অনুমান করেছিলাম তা মোটেই নয়। তত্রাচ আরও কিছুদূর এসে দেখলাম গোপুরমসহ একটি বৃহৎ দেবালয়। মন্দিরে সান্ধ্য আরতি আরম্ভ হয়েছে। আমরা মন্দির প্রাঙ্গনে এসে আরতি দর্শন করলাম। মূর্তি দেখে অনুমান করলাম নারায়ণ মূর্তি। আরতি দেখে এক ভদ্রলোকের নিকট জানলাম এটি শ্রীপিরিয়ন্নকী আম্মন দেব মূর্তি।

অদ্যকার মত এইস্থান থেকে রেষ্ট-হাউস অভিমুখে ফিরলাম। পথিমধ্যে এক ভদ্রলোককে প্রশ্ন ক'রে জানলাম, ভক্তেরা এই সকল জলপূর্ণ পাত্র আনছেন পালনি থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে কাবেরী নদী থেকে। যেমন এ দিকে গঙ্গা-জলপূর্ণ পাত্র নিয়ে যায় তারকেশ্বরে।

পরদিন প্রাতে মন্দিরে পূজা দিতে গেলাম। আজও জল-পাত্র মস্তকে নিয়ে ভক্তবৃন্দ চলেছে মন্দিরে। আমরা পাহাড়ের পাদমূলে গিয়ে পূজার দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি দোকানে প্রবেশ করলাম পূজার দ্রব্য সর্বনিম্ন মূল্য দু' টাকা আট আনা। এস্থানের নিয়ম একটি সুন্দর বেতের চুপড়িতে পূজার দ্রব্য নিতে হয়। সে কারণ মূল্যও অধিক দিতে হয়। আমরা দ্রব্যাদি ও কিছু ফুল নিয়ে পাহাড়ের সোপান পথে এলাম। পাহাড় হাজার ফিট উচ্চ। ছয় শত নব্বইটি সোপান অতিক্রম ক'রে মন্দির দ্বারে পৌছান যায়।

গৃহিণী প্রথমে ভীত হয়েছিলেন। বহু পুরুষ ও মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও বালক বালিকাদের সোপান পথে যেতে দেখে, সাহস পূর্বক অগ্রসর হলেন। এ পাহাড় আরোহণ তাদৃশ ক্লেশকর নয়। প্রতি এক শত সোপান অতিক্রমের পর একটি বিশ্রামের স্থান। সেস্থানে বিশ্রামের পর নূতন উদ্যমে পুনরায় আরোহণ। এইরূপে সাত আটটি স্থানে বিশ্রাম নিয়ে আমরা মন্দির সমীপে হাজির হলাম। মন্দির দ্বারে বহু ভক্ত অপেক্ষা করছেন। এক একটি দলের পূজা শেষ হ'লে অন্য ভক্তদের পর্যায়ক্রমে বিগ্রহের সম্মুখে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

মন্দিরের সম্মুখে অপেক্ষা ক'রেও আরাম আছে ভক্তদের ক্লেশ

নিবারণার্থে এয়ার কণ্ডিশন ব্যবস্থা আছে। পূজার মন্দিরে এমন রাজসিক ব্যবস্থা আর কুত্রাপি দেখি নি।

এরপরও আছে লিফ্‌ট ব্যবস্থা। অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পঙ্গু, অক্ষম কিংবা ক্লেশ-কাতর বিলাসী ব্যক্তিদের আরামে মন্দিরে আরোহণের জন্য আরাম-দায়ক লিফ্‌ট। লিফ্‌ট এসে থামে একেবারে মন্দিরের পশ্চাতে। লিফ্‌ট আরোহণের পথ পাহাড়ের উত্তর দিকে কিছু দূরে।

প্রায় বিশ মিনিট পরে আমরা মন্দির দ্বারে এলাম। দেখলাম মন্দির মধ্যে কার্ত্তিক মূর্তি। মূল্যবান পোষাকে ও রত্নখচিত আভরণে শোভিত দেব সেনাপতি কার্ত্তিক দণ্ডায়মান আছেন। এক দক্ষিণ ভারত ব্যতীত দেবগণের মধ্যে কার্ত্তিকের এত সম্মান ও পরম শ্রদ্ধায় আড়ম্বরপূর্ণ পূজা অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতে প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে শঙ্কর-পার্বতী, গণপতি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, কালী, শীতলা প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে কার্ত্তিকের সমান সম্মান। কোন কোনও স্থানে প্রাধান্যও দেওয়া হয়েছে। দেশ ভেদে বিভিন্ন নামে।

এ স্থানে দেব সেনাপতি কার্ত্তিক হয়েছেন দণ্ডউথ্থাপানী স্বামী। দক্ষিণ-ভারতে মহাবীর বা হনুমান মূর্ত্তির বিশেষ সমাদর নেই।

পাহাড়ের উপর থেকে সমগ্র পালনি সহরটি দেখলাম। সহর ব্যতীত অন্যান্য দিকের দৃশ্যও মনোরম।

এরপর আমরা পাহাড় থেকে অবতরণ ক'রে লিফ্‌ট দেখতে গেলাম। মন্দির থেকে প্রায় এক ফার্লং উত্তরে এই লিফ্‌ট ষ্টেশন। আমরা সে স্থানে গিয়ে দেখলাম লিফ্‌ট ষ্টেশন থেকে ট্রাম লাইনের মত একটি লাইন পাহাড়ের শীর্ষ দেশে চলে গেছে। ছোট বাসের আকারে দু'টি কামরা এক সঙ্গে উর্ধ পথে যাতায়াত করে। প্রতি কামরায় আট দশজনের অধিক যাত্রী লওয়া হয় না। মাশুল যাতায়াতে দু' টাকা আট আনা। কেবলমাত্র উর্ধে যাওয়ার জন্য মাশুল দেড় টাকা।

আমরা কয়েকজন যাত্রীকে পাহাড়ে যেতে দেখলাম। হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ের গাত্রে খাড়াই দীর্ঘ লাইন দেখলে আতঙ্ক হয়। কয়েকবার যাতায়াত দেখার পর মনে সাহস আসে, আরোহণে ইচ্ছা হয়।

অপরাহ্নে সহরের দিকে গেলাম। দেখলাম পালনি, মাদুরা জেলার একটি অন্যতম বৃহৎ সহর। এ স্থানে প্রধান আকর্ষণ পাহাড়ের উপর এই মনোরম মন্দির। পাহাড়ে যাওয়ার জন্য সোপানের সুবন্দোবস্ত ও লিফ্‌ট্ দেখলে প্রত্যেক যাত্রীই আনন্দ পেয়ে থাকেন।

পাহাড় শীর্ষে মন্দির ব্যতীত সহরের মধ্যে শ্রীপিরিয়ন্নকী আম্মন দেবের মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির প্রভৃতি দর্শনযোগ্য দেবালয় আছে। সহর-তলিতেও কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির আছে। অনেকে সেগুলি দেখতে যান। সহরের মধ্যভাগে বিরাট বাজার। প্রধান পথের উভয় পার্শ্বে নানা দ্রব্যের অসংখ্য দোকান।

উৎসবের জের এখনও চলছে। এখনও প্রচুর যাত্রী দৈনিক আসছেন। পথের পার্শ্বে এক স্থানে একটি মণ্ডপ দেখে কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম সে স্থানে হবে নাটকম্। বুঝলাম উৎসবের সময় বহিরাগত লোক সমাগমে কোন এক সম্প্রদায় অভিনয় প্রদর্শন ক'রে কিছু উপার্জ্জন করেন। রাত্রি দশটায় নাটকম্ আরম্ভ হবে। আমরা নাটক দেখার ইচ্ছা করলাম না।

পরদিন গেলাম বাজারের দিকে। বাজারটি তিন চারটি বিভাগে সকল প্রকার দ্রব্যই দেখলাম।

প্রধান রাস্তার পার্শ্বে নানাবিধ বস্ত্রের দোকান। ভেলভেট, ব্রোকেটেরও স্টক্ দেখলাম। তবে দালালদের সাদর আহ্বান দেখলাম না।

আজ আমাদের রেষ্ট-হাউসে একটি বিবাহ কার্য সম্পন্ন হবে। প্রাতঃকাল থেকে অবিরত সানাই বাজছে। অপরাহ্নে অভ্যাগত নিমন্ত্রিত আসতে আরম্ভ করলেন। রেষ্ট-হাউসের বারান্দা থেকে সমস্তই দেখা যায়। আমি বারান্দায় বসে কন্যা সম্প্রদান, অতিথিদের পান-সুপারি বিতরণ, আত্মীয় ও নিমন্ত্রিতদের উপঢৌকন প্রদান সবই দেখলাম। কেবল 'মিষ্টান্ন বিতরে জনার' কোন লক্ষণ দেখলাম না। গৃহিণী বিবাহ বাসরে গিয়ে দক্ষিণ পদ্ধতির বিবাহ দর্শন ক'রে এলেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত বিবাহ কার্য সমাধা দেখে ফিরে এসে বললেন—চলো গো রাত হয়েছে, হোটেলে ঘুরে আসা যাক।

বললাম—বিয়ে বাড়ী থেকে এসে হোটেলে যেতে হবে? লুচির ধামার অবশিষ্ট কিছু আসবে অনুমান করেছিলাম। গৃহিণী কোন উত্তর দিলেন না।

এরপর এস্থান থেকে আমাদের ভ্রমণ-সূচী নীলগিরি উপত্যকা উটাকামণ্ড মধ্য পথে কোয়েম্বাটুর সহরটি দেখা মনস্থ করলাম।

পরদিন প্রাতে রেষ্ট-হাউসের সম্মুখে একটি হোটেলে আহারাদি ক'রে একটি ঝটকায় উঠে ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম।

কোয়েম্বাটুর ঃ

পালনি থেকে কোয়েম্বাটুর এক শত কিলোমিটারের কিছু অধিক। এ দিকের রেল পথের কোন বাহার নেই। প্রান্তর, মাঠ, আগাছা। অদূরে ছোট ছোট পল্লী। ট্রেনে বসে শিবাণীর কথা মনে এলো। উটি সে যাবে না, মাইশোর যাওয়ার পথে কোয়েম্বাটুরে হয়তো নামতে পারে। ঘেঁটু উটি আসবে, তবে এত শীঘ্র সে আসবে মনে হয় না। এলেও কোয়েম্বা-টুরের মত সহরে ওদের কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়। রামেশ্বরের পাণ্ডা মহাশয়ের ভাগিনা থাকেন টি, ভি, স্বামী রোডে। তাঁর ঠিকানা আমার সঙ্গে আছে। পকেট অনুসন্ধান ক'রে একবার দেখে নিলাম। এঁর সাহায্যে সহর পরিদর্শনে সুবিধা হতে পারে। এখন প্রধান চিন্তা ভাল বাসস্থান। সেটা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে।

অপরাহ্ণ আড়াইটায় কোয়েম্বাটুর ষ্টেশনে হাজির হলাম। কুলিদের নিকট জানলাম। টি, ভি, স্বামী রোড ষ্টেশন থেকে দু'মাইল দূর। ধর্মশালা এস্থানে নেই। ষ্টেশনের নিকট ভাল লজ আছে। তাদের কথা মত লজে যাওয়াই স্থির করলাম। ষ্টেশনের সন্নিকটে একটি লজে দৈনিক তিন টাকা ভাড়ায় একটি কামরা নিলাম।

লজ মালিকের প্রধান ব্যবসা ফটোগ্রাফারের কাজ। এই বাড়ীর নিম্নে বড় হলটিতে তাঁর ফটোগ্রাফার কারবার। বাটীর মধ্যে তাঁর আর একটি

কারবার বেকারী। দ্বিতলে ছয়খানি কামরা লজ হিসাবে ভাড়া দেওয়া হয়। কোয়েম্বাটুর তীর্থস্থান নয়। সেজন্য কোন যাত্রী এখানে সচরাচর আসেন না। উটি যাওয়ার পথে ট্রেনের জন্য অনেকে রাত্রি যাপন করেন। ষ্টেশনের প্লাটফর্মে রাত্রি বাস না ক'রে এইসব লজেই আসেন। লজের এ কক্ষটি আমাদের মনোমত না হলেও দু' একদিনের জন্য স্থিতি হতে বাধ্য হলাম। কক্ষে সশয্যা খাট, বিজলী বাতী আছে। পাখার ব্যবস্থা নেই।

কুলিদের বিদায় দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চা পানের ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়লাম। পথিমধ্যে একটি দোকানে ইড্‌লি-বড়া ও কফি খেলাম।

কোয়েম্বাটুর ব্যবসা প্রধান স্থান। প্রধান ব্যবসা বস্ত্র শিল্প। পথের উভয় পার্শ্বে বৃহৎ সম্ভ্রান্ত হোটেল। নানা দ্রব্যের অসংখ্য দোকান। সহরের কেন্দ্র স্থলে লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির। কিছুদূরে একটি বৃহৎ গীর্জা। আরও কিছুদূরে এক বিরাট মস্‌জিদ। মুসলমান ও কৃশ্চান নাগরীকের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে।

আমরা অনুসন্ধান ক'রে লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির সমীপে এলাম। ভিতরে এসে দেখলাম মূল মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ নাটমন্দির। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকায় গৃহিণী মন্দির ফটকের পাশে একটি ফুলের দোকানে কিছু ফুল ও দু'গাছি মালা ক্রয় ক'রে আনলেন। মন্দির দ্বারে এসে দেখলাম, চমৎকার মূর্তি। গৃহিণী পুরোহিতের হাতে ফুল ও মালা দু'টি দিলেন। পুরোহিত আমাদের দেওয়া মালা দু'টি বিগ্রহের গলায় অর্পন ক'রে, বিগ্রহের গলার মালা দু'টি খুলে গৃহিণীকে দিলেন। বেল ফুলের মালা। টাটকাই ছিল।

মন্দির থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে গীর্জার ফটকের সম্মুখে এলাম। বৃহৎ কম্পাউণ্ড। বহু পুরুষ ও মহিলাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেখলাম। আমরা গীর্জার প্রাঙ্গনে এলাম।

গৃহিণী বহু স্থানে গীর্জা দেখেছেন। মাদ্রাজের বিখ্যাত গীর্জা দেখতে গিয়ে হলে প্রবেশ করেন নি। এস্থানে সুসজ্জিত হল্ দেখে আমাকে বললেন— ভিতরে গিয়ে দেখতে দেয় না?

বললাম—অবারিত দ্বার, প্রবেশে কারও বাধা নেই।

বললেন—চলো না, আমরাও যাই। কে আর চেনে আমাদের যে জাত যাবে!

কমলাকান্তের বাণী আবৃত্তি ক'রে বললাম—'মারে কোন্ শালা!'

গৃহিণী এখন উদার বাণী শোনালেন—মন্দির, মস্‌জিদ, গীর্জা সবই তো এক। চলো ভিতরে যাই। গৃহিণীর ইচ্ছায় হলে প্রবেশ করলাম।

এখন বুঝলাম, আজ এখানে এক পরিণয় কার্য সমাধা হবে। পাত্র-পাত্রী ও তাঁদের আত্মীয়-বন্ধুরা আছেন। মধ্যভাগে উচ্চ বেদীর উপর ফাদার এক নাতিদীর্ঘ বাণী শোনালেন। পাত্র-পাত্রী তার বেদীর সম্মুখে দাঁড়ালেন।

গৃহিণী বললেন—শাদা আলখিল্লা পরে বেদীতে বসে উনি কে?

বললাম—উনি ফাদার, যাকে আমরা বলি মন্দিরের-পুরোহিত। অপেক্ষা কর, আজ এখানে একটা বিবাহ সম্পন্ন হবে।

গৃহিণী বললেন—বর-কনে এসেছে?

আমি সঙ্কেত ক'রে পাত্র-পাত্রীকে দেখলাম।

গৃহিণী বললেন—এখানে তো মেম সাহেবদের বিয়ে হয়। এরা তো দেখছি মোষের মত কালো।

বললাম—গীর্জায় শাদা-কালোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেই। এরা দেশী মেম সাহেব।

গৃহিণী বললেন—এখানে ওদের কি করতে হবে?

বললাম—এদের বিয়ে গীর্জাতেই হোক কিংবা কোন বিবাহ রেজেষ্টারী অফিসেই হোক, দলীলে দম্পতিকে সই করতে হয়। এখানেও তাই হবে।

এরপর ফাদারের প্রার্থনা আরম্ভ হ'ল। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়ালাম। গৃহিণীর সঙ্কেতে আর উপবেশন না ক'রে পশ্চাতের দ্বার দিয়ে হলের বাইরে এলাম।

গৃহিণী বললেন—একি আবার বিয়ে?

বললাম—সত্যই তো, উলুধ্বনী নেই, শাঁখের বাদ্য নেই, ভোজ নেই, এ বিয়ের কোন মূল্যই নেই।

গৃহিণী বললেন—ভোজ না থাক। কাল যে পালনির্তে বিয়ে দেখে এলাম

নারায়ণের সাক্ষে পূজা-পাঠ, কন্যা-সম্প্রদান সবই তো হ'ল।

বললাম—সে হ'ল হিন্দু-আইন। কৃশ্চানদের বিবাহের এই পদ্ধতি দলীল রেজেষ্টারী বিবাহের প্রধান অঙ্গ। আবার দলীল নাকোচ করতেও বেশী সময় যায় না।

এরপর এলাম সহরেব কেন্দ্র স্থলে। দুইপাশে জমকাল দোকান। বিশেষত বস্ত্রের দোকানগুলির শোভা দেখবার মত। গৃহিণীর অনেক দিনের বাসনা ছিল, কোয়েম্বাটুরের শাড়ী ক্রয় করা। এ টাকা আমার অপব্যায় নয়। গৃহিণীর গচ্ছিত অর্থ। আমার আপত্তির কোন কারণ ছিল না।

একটি দোকানে উঠলাম। মালিক আমাদের সসম্মানে দোকানে বসালেন। হরেক রকম বস্ত্র আমাদের সম্মুখে স্তুপাকার ক'রে ফেললেন। তন্মধ্যে গৃহিণী দু'খানি শাড়ী মনোনীত করলেন। শাড়ী দু'খানির মোট মূল্য বাহান্ন টাকা।

দোকানের কর্মচারীকে বললাম—আমরা পর্যটক হিসাবে সারা দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করছি। ব্যায়-শক্তি আমাদের আদৌ নেই। আমরা বহু কষ্টে মাত্র চল্লিশ টাকা গচ্ছিত রেখেছি। এই মূল্যে যদি সম্ভব হয় আমাদের দিতে পারেন। আমাদের ক্রয় শক্তির অক্ষমতা শুনেই হোক, বা যে কোন কারণেই হোক কর্মচারী মালিকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শাড়ী দু'খানি বেঁধে দিলেন। গৃহিণীর মুখে আর হাসি ধরে না। তাঁদের দোকানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা ক'রে লজ অভিমুখে ফিরলেন।

পরদিন আলস্য বশতঃ অনাবশ্যক কোয়েম্বাটুরে থেকে গেলাম।

গৃহিণী বললেন—কাল লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে কেবল ফুল মালা দিয়ে এসেছি আজ গিয়ে পূজা দিয়ে আসতে হবে।

মন্দিরে পূজা দিয়ে বাজারের দিকে এলাম। প্রথম গেলাম সব্‌জি বাজার। সকল প্রকার দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে দেখলাম। এরপর গোলদারি মুদীখানার দোকানগুলি দেখে সত্যই আনন্দ পেলাম। খাদ্য নিয়ন্ত্রিতের দিনে চাল, ডাল ও চিনির বস্তাগুলি মুখ উন্মুক্ত ক'রে খরিদ্দারের অপেক্ষা করছে।

গৃহিণী বললেন—এ যে সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বের কলকাতার বাজার।

বললাম—দোকানের শোভা সে যুগের মত। মূল্য দিতে হবে এ যুগের। এক পয়সার গরম মশলা চাইলে ছটা ছোট এলাচ, কিছু দারচিনি আর এক মুঠো লবঙ্গের প্যাকেট আর কোন দিন পাওয়া যাবে না। চিনি আমাদের আবশ্যক ছিল, দেড় টাকায় ভাল মোটা দানা চিনি এক কিলো নিলাম।

বাজারের শেষ প্রান্তে এসে মৃৎ-পাত্রের দোকানগুলি দেখে কিছু ক্রয়ের জন্য উৎসুক হলেন। তাঁকে বললাম—দোকানদারকে প্রশ্ন ক'রে দেখ যদি পোষ্ট পার্শেলে পাঠাতে পারে।

অপরাহ্নে ইচ্ছা করলাম কোয়েম্বাটুরের সিল্ক ফ্যাক্টরী দেখা। বাস ষ্টেশনে এসে জানলাম শনিবার ব্যতীত সাধারণকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না।

কাল প্রত্যুষে সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে যেতে হবে মেট্টুপলিয়ম জংশনে। সেখান থেকে ট্রেন বদল ক'রে যেতে হবে উটাকামণ্ড। সুতরাং মাল-পত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্বাহ্নে কুলির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ভাগ্যক্রমে আমাদের পূর্ব পরিচিত কুলিদের সাক্ষাৎ পেলাম। কাল প্রত্যুষে আমাদের ট্রেনে তুলে দেওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ ক'রে লজে ফিরলাম।

উটাকামণ্ড ঃ

কোয়েম্বাটুর থেকে সমতল ভূমিতে রেলপথ মেট্টুপলিয়ম পর্যন্ত। ছত্রিশ কিলোমিটার পথ। তারপর পঞ্চাশ কিলোমিটার ঊর্ধগতি পার্বত্য পথ। কুলিরা অতি প্রত্যুষে লজে গিয়ে আমাদের মাল-পত্র ষ্টেশনে এনে হাজির করলে। বুকিং অফিসে গিয়ে উটির টিকিট নিয়ে জনবিরল কামরায় নিশ্চিন্তে বসলাম। ট্রেন ষ্টেশন ত্যাগ করতে তখনও বিশ মিনিট বাকী। চা কিংবা কফির জন্য প্লাটফর্মের দিকে তাকালাম। এমন সময় গৃহিণী অতি মূল্যবান এক প্রশ্ন করলেন—রাত্রে যে টাকার প্যাকেট বালিসের

তলায় রেখেছিলে সেগুলি ঠিকভাবে নেওয়া হয়েছে তো? এ বাণী শ্রবণমাত্র আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল।

গৃহিণীকে বললাম—তুমি ট্রেনে অপেক্ষা কর। যদি আমার ফিরতে বিলম্ব হয়, কুলি ডেকে মাল-পত্র প্লাটফর্মে রাখবে। তিলমাত্র অপেক্ষা না ক'রে উর্ধশ্বাসে লজ অভিমুখে ছুটলাম।

লজের দ্বারে এসে দেখলাম, আমাদের লজের দ্বার তখনো উন্মুক্তই আছে। কয়েকজন কর্মচারী দ্বারদেশে নিদ্রামগ্ন। আমি ক্ষিপ্রগতিতে দিতলে গিয়ে আমাদের পরিত্যক্ত কক্ষে প্রবেশ ক'রে উপাধানটি তুলে দেখলাম, আমার পথের সম্বল পরম নিধি, আমার শালগ্রাম নিশ্চিন্তে আরামে নিদ্রা দিচ্ছেন। প্যাকেটটি হাতের মুঠোয় নিয়ে কপালে স্পর্শ ক'রে ষ্টেশন অভিমুখে দৌড় দিলাম। ট্রেন তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছে। দূর থেকে দেখলাম, গৃহিণী কোটি দেশ পর্যন্ত গবাক্ষে ঝুলিয়ে দিয়ে শ্বাস-রুদ্ধ অবস্থায় কাতর দৃষ্টিতে প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে আছেন। দূর থেকেই সঙ্কেতে তাঁকে শুভ সংবাদ জানালাম।

কামরায় এসে দেখলাম, এই প্রত্যুষে শীতের আমেজ সত্বেও তাঁর ব্লাউজ ঘর্ম-সিক্ত হয়ে গেছে। চা কিংবা কফি পানের সময় পেলাম না। ট্রেন চলতে শুরু করল।

প্রসঙ্গক্রমে পাঠকদের জানাই, যদি তাঁরা আমার মত এক যাত্রায় কয়েক স্থানে দেখার অভিলাস করেন, লজে স্থান নিলে কক্ষ ত্যাগের সময় সতর্ক থাকবেন। শয্যার নীচে টাকার থলি কিংবা খাটের তলায় স্লীপার পরিত্যাগ ক'রে আশার বিশেষ সম্ভাবনা। ধর্মশালায় সে ভয় থাকে না। কারণ কক্ষ ত্যাগের সময় নিজেকেই শয্যা তুলে কামরা পরিষ্কার ক'রে দেখে শুনে আসা হয়।

আমাদের ট্রেন চলেছে নীলগিরির উপত্যকা অভিমুখে। তাই এ ট্রেনের বর্ণ নীল। কোয়েম্বাটুর থেকে এলাম কোয়েম্বাটুর নর্থ জংশনে। এই রেল পথের উভয় পার্শ্বে বড় বড় কারখানা। এই স্থানে আমাদের ট্রেন থেকে নেমে বহু লোককে ঐ সকল কারখানার দিকে যেতে দেখলাম। এঁদের মধ্যে বহু ছাত্রকেও দেখলাম, টিফিন কেরিয়ার ও পুস্তক হাতে

চলেছেন। অনুমান করলাম হয় তো এঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা টেক্‌নিক্যাল কলেজের ছাত্র।

ট্রেন সাতটার মধ্যে মেট্টুপলিয়ম ষ্টেশনে হাজির হ'ল।

রেল ষ্টেশনের পাশেই বাস ষ্টেশন। অনেকে বাসের দিকে গেলেন। বিচিত্র লাইন। ন্যারোগেজ। উটাকামণ্ড বা উটি ট্রেনে চারখানি মাত্র ক্ষুদ্র কামরা। এই প্লাটফর্মের নিম্নে ট্রেনখানি অপেক্ষা করছে। আমরা মাল-পত্র নিয়ে উটিগামি ট্রেনে উঠে বসলাম।

শীর্ণকায় ট্রেনখানি একটা জোরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে উর্ধ পথে অগ্রসর হ'ল। প্রতি কামরায় একজন রেল কর্মচারী লাল ও সবুজ পতাকা হাতে ও বগলে নিয়ে কামরার পা-দানিতে দাঁড়িয়ে ট্রেনচালককে নিরাপদ সঙ্কেত জানাচ্ছে। কামরা কয়খানির পশ্চাতে সংযোগ করা হয়েছে ইঞ্জিন।

ট্রেনের গতি ঘণ্টায় দশ মাইল। স্থানে স্থানে গতি হ্রাস ক'রে পাঁচ মাইলও করা হয়। পার্বত্য দৃশ্যের তুলনা নেই। প্রতি ফার্লং অন্তর এক একটি সেতু।

সেতুর নিম্নে ঝরণার জল সূক্ষ্ম নদীর আকারে বয়ে চলেছে। সেতুর আকৃতি দেখে মনে হয় সময় সময় এগুলির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এই সামান্য পথের মধ্যে ষোলটি সুড়ঙ্গ পথ। কোন কোন সুড়ঙ্গ পথ এত দীর্ঘ যে কামরার মধ্যে বসে বাইরের বাতাসের অভাবে শ্বাস-রোধের উপক্রম হয়। পর্বত-গাত্রের ঝরণাধারা ট্রেনের কামরায় অনুপ্রবেশ ক'রে যাত্রীদের বস্ত্রাদি সিক্ত ক'রে দেয়। ট্রেন ষ্টেশনে যে সময় আসে কিংবা উর্ধে যায় পাছে পশ্চাৎ অপসারণ না করে সে কারণ কামরার তলদেশে সুদৃঢ় চেন, গিয়ারে সংলগ্ন করা আছে। আমাদের চক্ষে ট্রেন পরিচালনার এই ব্যবস্থা এক অভিনব কৌশল মনে হয়। দার্জিলিংয়ের কিংবা সিমলার পথেও এ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়তো হয় না। পাঁচটি ষ্টেশনের পর এলাম কুন্নুর ষ্টেশনে। ট্রেন থেকে লক্ষ্য হয় একটি ঝরণাধারা পাহাড় শীর্ষ থেকে কল-কল শব্দে নিম্নাভিমুখে চলেছে। ষ্টেশনের চতুর্দিকে পাহাড়। পাহাড় শীর্ষে বহু হোটেল, লজ ও বাস-ভবন। একটি বড় কারখানাও

দেখলাম। উটির পথে কুন্নুর সহরটি প্রাকৃতিক দৃশ্যে, স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় একটি মনোরম শৈল নিবাস। ট্রেনের ধারে সকল প্রকার খাদ্যই বিক্রয় হতে দেখলাম। ষ্টেশনে দশ মিনিটের অধিক ট্রেন থামে।

এরপর আরও চারটি ষ্টেশন অতিক্রম ক'রে হাজির হলাম উটাকামণ্ড সহরে। ষ্টেশনে নেমে সর্বপ্রথম গেলাম বুকিং অফিসে আমাদের প্রত্যাগমণকালে রিজার্ভেশনের জন্য। এ স্থানে রিজার্ভেশনের কোটা সীমিত।

এরপর আমাদের গন্তব্য স্থান মহীশুর। এখান থেকে মহীশুর যাওয়ার জন্য আমাদের রিজার্ভেশনের সুবিধা পাওয়া যাবে মেট্রুপলিয়ম থেকে জালারপেট্টাই পর্যন্ত। তারপর জালারপেট্টাই থেকে মাদ্রাজ-বাঙ্গালোর ট্রেনে বাঙ্গালোর। আবার সেখান থেকে গাড়ী বদল ক'রে মহীশুর।

আমাদের যেতে হবে রাত্রের ট্রেনে। যতটুকু সুবিধা হয়, সেই কারণে তিন দিনের ব্যবধানে মহীশুর পর্যন্ত টিকিট নিয়ে রিজার্ভেশনের আবেদন করলাম। রিজার্ভেশনের পাকা খবর আসবে কাল কিংবা পরশু মেট্রুপলিয়ম থেকে।

পরে এখানে এসে জেনেছিলাম উটাকামণ্ড থেকে মহীশুর যাওয়ার জন্য বাস যাতায়াত করে। প্রত্যহ প্রাতে ছাড়ে। মহীশুরে পৌছায় সন্ধ্যার পর। সেখান থেকেও অনুরূপ একখানি বাস প্রত্যহ এখানে আসে। অতি সাবধানতায় পুর্বাহ্নে রেলের টিকিট নিয়ে আমাদের অদৃষ্টে দুর্ভোগ ঘটেছে।

মাল-পত্র নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এলাম। এক ঝটকাওয়ালাকে ডেকে মাদ্রাজ সরকারের রেষ্ট-হাউসে যেতে বললাম। আমি ইতিপূর্বে জেনেছিলাম এ রেষ্ট-হাউসের দৈনিক হার অতি সুলভ। অগ্রিম আবেদন পত্র পাঠাতে হয়, নচেৎ স্থান পাওয়া যায় না। আমি কোদাই-কানাল থেকে একখানি পোষ্টকার্ডে যথারীতি সংবাদ দিয়েছিলাম।

ঝটকাওয়ালা বললে—রেষ্ট-হাউস চড়াই পথ। মাল-পত্র নিয়ে একখানি ঝটকায় সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

অগত্যা তাকে আর একখানি ঝটকার আদেশ দিলাম।

একটিতে আমাদের মাল-পত্র তুলে অন্য ঝটকায় আমরা উঠে বসলাম। মিনিট পনেরর মধ্যে এক প্রাসাদতুল্য ভবনের ফটকে এসে ঝটকা থামিয়ে বললে—এই রেষ্ট-হাউস। অফিসে গিয়ে অনুসন্ধান করুন।

অফিস কক্ষে এসে আমার বক্তব্য জানালাম। এক কর্মচারী ফাইল অনুসন্ধান ক'রে আমার পত্রখানি বার ক'রে বললেন—আপনাদের কামরার ব্যবস্থা করা আছে। দৈনিক ভাড়া তের টাকা। আহারের মূল্য সতন্ত্র। আমার বদনে বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল। বাইরে এসে ঝটকাওয়ালাকে জানালাম।

সে বললে—এ স্থানের ভাড়া পূর্বে সুলভ ছিল। এখন এই ব্যবস্থাই হয়েছে। ষ্টেশনের নিকটে স্বল্প ভাড়ায় লজ পাওয়া যায়। আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।

ঝটকাওয়ালা একটি লজের দ্বারে এনে বললে—ম্যানেজারের অফিসে দেখা করুন।

তাঁদের নিকট গিয়ে ব্যবস্থা করলাম। একখানি কামরার দৈনিক ভাড়া আট টাকা। কক্ষ সংলগ্ন বাথ-রুমের ব্যবস্থা আছে। তাদের হোটেলে খাওয়ার কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না।

ঝটকাওয়ালা ভাড়া দাবী করলে আট টাকা। অনেক অনুনয় বিনয়ে ছয় টাকায় রফা ক'রে বিদায় করলাম।

লজের একটি বালক কর্মচারী আমাদের বললে—ষ্টেশন থেকে রেষ্ট-হাউস ও এই লজ পর্যন্ত এসেছে এর জন্য ছয় টাকা ভাড়া আপনাদের সুবিধা হয়েছে। অন্য ঝটকাওয়ালা হলে দশ টাকা আদায় ক'রে ছাড়তো। ট্যাক্সি নিলে বিশ টাকা ভাড়া চার্য করতো।

ষ্টেশন থেকে মাদ্রাজ রেষ্ট-হাউস অর্দ্ধ মাইলের অধিক নয়, আর সে স্থান থেকে অর্দ্ধ মাইল এসে ঝটকার এত উচ্চ দাবী আর কোন স্থানে দেখি নি। আমাদের লজ বা হোটেলটি রেল ও বাস ষ্টেশনের নিকটে। এক অনুচ্চ টিলার উপর এই হোটেল। আমরা কেবলমাত্র লজের একটি কক্ষ নিয়েছিলাম। এঁদের হোটেলের কোন খাদ্য দ্রব্য কিংবা চা-ও গ্রহণ করি নি।

হোটেলের সম্মুখে রেস্কোর্স। তখন রেস্ চালু হয় নি। শুনলাম, এপ্রিলের শেষে রেস্ আরম্ভ হবে। রেস্কোর্সের বিপরীত দিকে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও স্থানীয় মধ্যবিত্ত পল্লী, ছ'টি দেবালয়ও আছে। আমাদের হোটেলের নিকটেই মাইশোরগামী বাস ষ্ট্যাণ্ড। আরও জানলাম উটি থেকে মাইশোরের বাস ভাড়া প্রতিজনের ছয় টাকার কিছু অধিক। আমি এই বাস পথের দৃশ্য দেখার অতিশয় আগ্রহী হয়েও অগ্রীম রেল টিকিট ব্যবস্থা করায় আর মনোযোগ দিলাম না।

হোটেলের ম্যানেজার উটির আকর্ষণীয় দর্শন বস্তুর একটি ছাপান তালিকা আমার হাতে দিলেন। যে সকল আকর্ষণীয় দর্শন বস্তু তালিকায় দেখলাম, সেগুলির অধিকাংশ সহরতলীতে। সহজে যেগুলি দেখার সুবিধা আছে তন্মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মহীশূর ও বরদারাজ প্রাসাদ, সিল্ক ফ্যাক্টরী এল্ক্ হিলের পার্বত্য দৃশ্য, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও উটি লেক। লেকটি ট্রেন থেকেই দেখা যায়। একটি বৃহৎ পানাপুকুর। তন্মধ্যে দু' চারখানি ক্ষুদ্র বোটও দেখেছি।

উটির একমাত্র উপভোগ্য মনোরম আবহাওয়া। সহরের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই সেখানে পাওয়া যায়। সহরের চতুর্দিকে নাতিবৃহৎ পর্বত শ্রেণী। পাহাড়ের উপর মনোরম বাস-ভবন। ধনী সৌখীন বিলাসীদের পক্ষে আরামদায়ক স্থান। এতদ্ব্যতীত চমকপ্রদ আকর্ষণীয় কিছুই নেই। প্রতি বৎসর লোক সমাগম হয় প্রচুর। লজ ও হোটেল মালিকরা এখনও ক্ষ্যান্ত হন নি। ক্রমান্বয়ে লজের কক্ষ বৃদ্ধি করছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, কুলি, যানবাহন সমস্তই দুর্মূল্য। আনন্দ পেয়েছিলাম মেট্টু-পলিয়ম থেকে উটির রেল পথের দৃশ্য দেখে।

অপরাহ্নে লজ থেকে নেমে গেলাম মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে। সকল প্রকার সব্জি, মাছ-মাংস, ডিম প্রচুর। মুড়ি-চিঁড়েও যথেষ্ট পরিমাণে। মার্কেটের পশ্চাৎ দিক দিয়ে গেলাম উটির স্থানীয় মধ্যবিত্ত পল্লীর দিকে। গৃহিণী একটি মন্দির লক্ষ্য ক'রে সেই পথে যেতে বললেন। মন্দির দ্বারে এসে দেখলাম প্রাঙ্গনে একটি চমৎকার নাটমন্দির। নাটমন্দিরের

পশ্চাতে মূল মন্দিরে আছেন লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ। বেশ শান্ত পরিবেশ। কয়েকটি মহিলাকে পূজা দিতে দেখলাম।

এই পথেই কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ঘন বসতিপূর্ণ পল্লীর মধ্যে এলাম। অত্যন্ত নোংরা পল্লী। এ স্থান ত্যাগ ক'রে নিম্ন দিকে অগ্রসর হলাম। দেখলাম অন্য একটি দেবমন্দির। এ মন্দির বেশ কারুকার্যপূর্ণ। মন্দির সম্মুখে নাটমন্দির নেই। মন্দির মধ্যে দেখলাম সুব্রমনিয়ম বিগ্রহ, অর্থাৎ কার্ত্তিক মূর্তি। মন্দির ও বিগ্রহ দেখে রেস্‌কোর্সের চতুর্দিক পরিভ্রমণ ক'রে সন্ধ্যার প্রাক্কালে লজে ফিরলাম।

হোটেল কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি পুষ্পোদ্যান ও টেনিস গ্রাউণ্ড। হোটেলে আগত বহু লোক ও মহিলা প্রাতে ও অপরাহ্নে উদ্যানে বিশ্রাম উপভোগ করেন। কয়েকজনকে টেনিস খেলতেও দেখেছি।

লজে ফিরে দেখলাম, উদ্যানের পাশে রয়েছে দু'খানি বৃহৎ টুরিষ্ট বাস। দ্বিতলের কক্ষগুলি থেকে বিজলি বাতির আলো এসে উদ্যানটিকে আলোকিত করেছে। অনুমান করলাম কোন টুরিষ্ট পার্টি হোটেলে এসেছেন। গৃহিণী বাস দু'খানি দেখে বললেন—যত ভবঘুরের দল ব্লাক মার্কেটের পয়সায় আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছে। আমাদের মত গরীবকে অল্প পয়সায় জায়গা দেবে কেন। যাত্রীর কি অভাব আছে?

বললাম—যেরূপেই হোক পয়সা যখন হয়েছে ব্যয় ক'রে আমোদ তো করবেই। এখন চলো ঘরে গিয়ে চায়ের মুখ দেখি।

চা পানের পর কোন স্থানে যাওয়ার সুবিধা এখন না থাকায় উদ্যানে এসে একটি বেঞ্চে বসলাম। সহরের দিকে লক্ষ্য করলাম। রাতের আঁধার ভেদ ক'রে অসংখ্য আলোক মালায় সারা সহরটি যেন নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে। রেস্‌কোর্সের ওপারে বাস-ভবনগুলি ও তার পশ্চাতে টিলার উপর হোটেল, লজ কিংবা ধনী ব্যক্তিদের বাস-ভবনগুলির উজ্জল আলোকে উটির সৌভাগ্যের পরিচয় দিচ্ছে। কিছুক্ষণের পর ঠাণ্ডার তীব্রতা অনুভব ক'রে কক্ষে ফিরলাম।

পরদিন মার্কেটে গেলাম কিছু ক্রয়ের উদ্দেশ্যে। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি। তত্রাচ বাজারে ফুলকোপি, বাঁধাকোপি, মটর শুঁটী, বিট, টোমাটো প্রভৃতি

প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত রয়েছে। এ যেন বাঙ্‌লাদেশের পৌষ মাসের বাজার। সব্‌জি বিক্রেতাদের পোষাকের কি বাহার। দামি প্যান্ট, সিল্ক বা টেরিলিন সার্ট। কেতা-দুরস্ত টাই। ঝক্‌ঝকে পাদুকা। মুখে বিচিত্র ইংরাজী বুলি।

মুদীর দোকানগুলিতে আটা, ময়দা, চিনি সবই আছে। সাবু কিংবা কেশে দানার মত এক বস্তু লক্ষ্য করলাম প্রায় সকল দোকানেই প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। গৃহিণী প্রশ্ন করতে তাঁরা বললেন—এগুলি চালের বিকল্পে ব্যবহার করা হয়।

বাজারের পশ্চাতে মনিহারি ও ধাতু নির্মিত তৈজস প্রভৃতির দোকান। দর্জি ও নানাপ্রকার পোষাকের দোকান। আমরা একটি দোকানে বিস্কুট ও ডালমুটের প্রয়োজনে দাঁড়ালাম। দেখলাম দোকানে জাম, জেলী, হাস-মুরগীর ডিম প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দোকান মালিক বললেন—চিকেন আবশ্যক হলে পাবেন। আপনারা মনোনীত ক'রে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেই পরিষ্কার ক'রে প্যাক ক'রে দেব।

আমরা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিয়ে লজে ফিরে দেখলাম, সম্মুখের উদ্যানে ও টেনিস গ্রাউণ্ডে একদল যুবতি আনন্দ কোলাহলে সারা লজটি মাতিয়ে তুলেছে। অনুমান করলাম, এরাই গত কল্যকার টুরিষ্ঠ বাসের যাত্রী।

আহারের পর গেলাম, বরোদার রাজ-প্রাসাদ দেখতে। আমাদের হোটেল থেকে প্রায় এক মাইল পথ। একটি পাহাড়ের উপরিভাগে এই প্রাসাদ। বর্তমানে রাজা, মহারাজাদের রাজাগিরী বিলুপ্ত হয়েছে। খাস গায়কোয়ার রাজ-প্রাসাদ আমরা বরোদায় দেখে এসেছি। প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভীত হয়েছি। এস্থানের অবস্থা দেখে আনন্দ পেলাম না। প্রাঙ্গনে আগাছা জন্মেছে। শার্সির কাচগুলির ভগ্ন অবস্থা। এক সময় যে রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল এ প্রাসাদ এখনো সেই লুপ্ত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এক প্রবীন মুসলমান কর্মচারীর সাক্ষাৎ পেলাম। বেশ সৌজন্যপূর্ণ কথাবার্তা। তিনি বললেন—এ প্রাসাদ বিক্রয়ের জন্য ক্রেতার অনুসন্ধান চলছে। বহু হোটেলের মালিক ক্রয়ের জন্য চেষ্টা করছেন। হোটেল

ব্যবসায়ীকে বিক্রয়ে অনিচ্ছা। আরও সমস্যা এই সকল প্রাসাদের সংস্কার কাজের উপযুক্ত লোকের অভাব।

বর্তমানে যুবক ও বালকেরা বিনা পরিশ্রমে আশাতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে। একটি স্যুটকেশ কিংবা সাধারণ একটি বেডিং স্থানান্তরিত ক'রে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা দাবী করে। ভাল কাজ শিক্ষার আগ্রহ নেই। এখন বৎসরের সকল সময় ভ্রমণকারীদের কৃপায় এখানে অর্থোপার্জন সহজ হয়েছে।

রাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের দিকে অগ্রসর হলাম। এখানে এসে দেখলাম, স্থানটি মঠের উপযুক্ত। স্বামীজী মঠে ছিলেন না। মঠের অন্য এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেলাম। এঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপের পর বারান্তরে স্বামীজীর দর্শনের প্রস্তাব ক'রে পাহাড় থেকে নামলাম। এখন আর একবার পশ্চাৎ ফিরে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকালাম। অস্তগামী সূর্য্য কিরণ প্রাসাদের জানালার সার্শিতে প্রতিফলিত হয়ে যেন ম্লান হাসি হাসছে।

লজে ফিরে দেখলাম হৈ-হৈ কাণ্ড। টুরিষ্ট বাসের সেই নারী-বাহিনী সারা লজটিকে শরগরম ক'রে তুলেছে। কয়েকজন লজের বাইরে মাইকের হর্ণ ফিট করছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় আমাদের ঘেঁটু করছে তাদের সর্দারী। আমরা কক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্র ঘেঁটু আমাদের নিকট এসে বললে—কাকীমা, আপনাদের কামরা খুলুন আমি এখনই আসছি। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে কোদাইকানাল ছেড়ে তার সঙ্গ থেকে দূরে সরে এসেছি। এ কয়দিন অদর্শনের পর আজ এখানে তার সহজভাবে কথা শুনে আশ্চর্য বোধ করলাম।

গৃহিণী প্রশ্ন করলেন—এখানে কখন এসেছিস, কোথায় রয়েছিস?

ঘেঁটু বললে—কাল রাত্রে এসেছি। এই হোটেলেই আছি। আপনাদের কোদাইকানাল থেকে আসার পর আর আমার সেখানে ভাল লাগে নি। পরের দিন চলে এসে কয়দিন কুন্নুরে ছিলাম।

আমি বললাম—কুন্নুরে ঠাণ্ডা বোধহয় কম। অনেকে কুন্নুরে থাকতে ভালবাসেন।

ঘেঁটু বললে—ঠাণ্ডা উটিতেও যেমন কুন্নুরেও তাই। বাজার, হাট, ভাল হোটেল আছে, চার্য উটির চেয়ে সুবিধে। ভাল ঝরণা আছে; অনেকে দেখতে যায়।

আমি বললাম—এই পার্টির সঙ্গে কেমন ক'রে তোমার মিলন হ'ল?

সে বললে—ওরা বাঙ্গালোরের ছাত্রী সম্প্রদায়। আজ দুপুরে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সন্ধ্যায় এদের একটা ফাংশন আছে। আমি একটু দেখাশুনা করছি। আপনারা ঘরে চলুন আমি এখনই যাচ্ছি।

গৃহিণী বললেন—আমাদের কামরা সন্ধান ক'রে যাওয়া সহজ নয়।

ঘেঁটু বললে—অফিসে সংবাদ নিয়ে আপনাদের কামরা দেখে এসেছি। আপনারা চলুন। এই কথা বলে ব্যস্তভাবে হোটেলের মধ্যে চলে গেল।

আমরা কক্ষে এলাম। পরক্ষণেই ঘেঁটু একটি কাগজের প্যাকেট এনে আমাদের সামনে প্যাকেটটি খুললে। দেখলাম, হাফ্ ডজন ডিম।

আমি বললাম—এ হোটেলে হয়তো আমিষ নিষিদ্ধ।

ঘেঁটু বললে—সে জন্য চিন্তা করবেন না। কাল কুন্নুরে এক টাকায় কিনেছি। সবগুলো ভেঙ্গে ওমলেট বানান, আর চা।

ঘেঁটুর অনুরোধে গৃহিণী ওমলেট ও চা প্রস্তুত করলেন। চা পানের পর ঘেঁটু ডিমের খোলাগুলি প্যাক ক'রে নিয়ে বললে—আজ সন্ধ্যার পর ফাংশনে আসুন। গান, আবৃত্তি ও নাটক না কি হবে। আমরা আনন্দে সম্মত হলাম।

ঘেঁটুর প্রস্থানের পর আমরা আর একদফা বাইরে গেলাম একখানি রুটী ক্রয়ের জন্য। রুটীর দোকানে গিয়ে দেখলাম, সালোয়ার পাঞ্জাবী পরিহিতা এক পাঞ্জাবী তরুণী পূর্ণ উদ্যমে খরিদ্দারদের রুটী সরবরাহ করছেন। ছিপ্‌ছিপে আঁট-সাঁট গঠন। প্রফুল্ল মুখ। দূর থেকে দেখলে বম্বের ডলিকে অনুমান হয়। মেয়েটির নিকট রুটী নিলাম।

লজে ফিরে ফাংশন হল্‌টি দেখতে গেলাম। অফিস কক্ষ অতিক্রম ক'রে বামভাগে একটি বৃহৎ হলে দর্শক বা শ্রোতারা বসেছেন। আমরাও একপাশে বসলাম। আরম্ভ হতে আর বিলম্ব নেই। সে কথা মাইকে ঘোষণা করা হ'ল।

ঘেঁটু আমার নিকট এসে সংবাদ দিলে, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এক প্রৌঢ়া মহিলাকে সভাপতির জন্য ব্যবস্থা করেছেন। প্রয়োজন একজন প্রধান অতিথি। সে আমাকে অনুরোধ করলে, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতে। এদের এই মহৎ প্রস্তাবে আমার পরিধেয় ধুতি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হ'ল। ঘেঁটুকে আমার অক্ষমতা জানালাম। সময় অপব্যায় না ক'রে অন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলাম।

সভাপতি ও প্রধান অতিথি নির্বাচন, মাল্যদান প্রভৃতি সমাধা হ'ল। সভাপতি স্থান-কাল ও শিক্ষা-সমাজ আলোচনার মাধ্যমে কিছু উপদেশ ও বাঙ্গালোরের ছাত্রীবৃন্দের উদ্যোগে এই সংগঠনের জন্য প্রসংশা ও ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন এই লজের ম্যানেজার। ভদ্রলোক সভাপতির ভাষণের পর পনর মিনিটকাল এমন কেতাদুরস্ত সারগর্ভ ভাষণ দিলেন শ্রোতৃবৃন্দ পরম আনন্দিত হলেন। আমিও আনন্দিত হলাম এই বিপদ থেকে অব্যাহিত লাভ ক'রে।

এখন আবাহন সঙ্গীতের পর ধারাবাহিক প্রোগ্রাম চলতে লাগল। কানাড়া ভাষায় এক তরুণী আবৃত্তি করলেন। তারপর দু'টি গুজরাটী ছাত্রী মীরার ও কবিরের ভজন গীতের পর নাম ঘোষণা হ'ল, এবার বঙ্গ মহিলা শঙ্করী দেবী আবৃত্তি করবেন।

শঙ্করী দেবী ওরফে দেখলাম ঘেঁটুকে। সে প্রথমে ইংরাজিতে একটি ছোট ভাষণ দিলে। তার মর্ম—আজ এই ছাত্রীবৃন্দের তরফ থেকে আমাকে অনুরোধ করেছেন একটি আবৃত্তির জন্য। আমি বাঙ্গালী। আবৃত্তি করতে হ'লে আমাকে বাঙ্‌লা ভাষাতেই করতে হবে। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। বাঙ্‌লার এক প্রখ্যাতা অমর কবি মানকুমারী বসুর "কুসুমাঞ্জলী" থেকে কবিতা কুসুমের একটি পাপড়ি তুলে আপনাদের সম্মুখে ধরছি।

আমি অন্যমনস্ক বশতঃ কবির নামটি বুঝতে পারলাম না। গৃহিণীকে প্রশ্ন করলাম—কার কবিতা আবৃত্তি করবে বললে?

গৃহিণী বললেন—মানকুমারী বসু না, কি যেন বললে।

জীবনে সাহিত্য কিংবা কাব্যের সংস্পর্শে কোন দিন যাই নি। তবে বাঙ্‌লার কয়েকজন বিখ্যাত কবির নাম অবশ্য শুনেছি? তাঁদের মধ্যে কোনও কবির কবিতা আবৃত্তি করা উচিত ছিল। যা করে করুক, কে আর বুঝছে।

আবৃত্তি আরম্ভ হ'ল। শেষও হ'ল। আমরা দু'জন ব্যতীত সকল শ্রোতাই অবাঙ্গালী। আবৃত্তি শেষ হওয়ার পরও সমস্ত হল্ স্তম্ভীত। আবৃত্তির বাণী তখনও প্রতিধ্বনীত হয়ে ঘুরছে শ্রোতাদের কর্ণে। প্রতিটি পদের উচ্চারণের সঙ্গে ভাবের পরিবর্তন ও বাক্যের উত্থান-পতন যেন হলের শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। উদাস মনে চিন্তা করলাম, এ কি কবিতা আবৃত্তি না, আবৃত্তিকারিণীর প্রাণের মর্মান্তিক উচ্ছাস।

ঘেঁটু শিক্ষিতা সত্য। বাঙ্‌লা কবিতাবলীর মধ্যে এমন নির্বাচন বিশেষ জ্ঞানের পরিচয়। প্রথম কয়েক লাইন আজও আমি ভুলতে পারি নি। সে কয়টি লাইন না বলে পারছি না, পাঠক ক্ষমা করবেন।

আবৃত্তির বিষয় ছিল—"একা"

"একা আমি চিরদিন একা
সে কেন দু'দিন দিল দেখা?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেন বা জ্বালিল আলো?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা
ভুলে ভুলে ভালবাসা
ভুলে ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা।"

এরপর কয়েকখানি সঙ্গীতের পর ঘোষণা শুনলাম, শঙ্করী দেবী আপনাদের টেগর-সঙ্‌ শোনাবেন।

আমি উঠেই আসছিলাম। এতক্ষণ কোনরূপে ধৈর্য নিয়ে এঁদের সম্মান রক্ষার্থে অপেক্ষা করছিলাম এরপর আবার রবীন্দ্র সঙ্গীত। রেডিওর কৃপায় প্রতিনিয়ত এ গান বাজছে।

গৃহিণী বললেন—শেষটা শুনেই চলো।

অগত্যা বসলাম।

ঘেঁটু সঙ্গীত আরম্ভ করলে। যা বহু কণ্ঠে, বহু আসরে ও বহুবার রেডিওতে শুনেছি।

গানটি—"তার বিদায় বেলার মালাখানি আমার গলে রে…"

আজকার আসরে ঘেঁটুর কণ্ঠে এ সঙ্গীত যেন এক করুণ স্মৃতির স্পর্শ মর্মে মর্মে সাড়া দিয়ে গেল। এটি যেন তার পূর্ব আবৃত্তির শেষ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর তখনও শয্যা ত্যাগ করি নি। মনে মনে আজকার একটা ভ্রমণ-সূচী প্রস্তুত করছিলাম। প্রথম যেতে হবে রামকৃষ্ণ মঠে। তারপর মার্কেটে একবার ঘুরে আসতে হবে। এমন সময় দ্বারে শব্দ পেয়ে বাইরে এসে দেখলাম ঘেঁটু ও তার পশ্চাতে এক প্রৌঢ়া মহিলা। ঘেঁটু পরিচয় ক'রে দিলে, ইনি একজন শিক্ষয়িত্রী। ছাত্রীদের নিয়ে এসেছেন। এখন আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।

ভদ্র মহিলা নমস্কার ক'রে বললেন—আজ প্রাতে ছাত্রীদের টেনিস প্রতিযোগিতা হবে। আপনাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। আর একটা বিশেষ অনুরোধ, আজ মধ্যাহ্নে আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজে যোগ দিতে হবে।

মধ্যাহ্ন-ভোজে যোগ দিতে আগ্রহী হয়েছিলাম। সেই সঙ্গে টেনিস গ্রাউণ্ডে হাজিরা দিতেও স্বীকৃতি দিলাম।

আশা করেছিলাম একবার টেনিস গ্রাউণ্ডে দেখা দিয়ে মঠের দিকে যাব। আমরা সেস্থানে যাওয়ামাত্র আমাদের যেভাবে সমাদর ক'রে বসালেন, সত্বর স্থান ত্যাগ করা কঠিন হ'ল। ফুটবল ও ক্রিকেট সর্বসাধারণের আকর্ষণীয় খেলা। দেখে আনন্দ পাওয়া যায়। সময় সময় অর্থব্যয় করেও মাঠে গিয়েছি। জীবনে টেনিস গ্রাউণ্ডের ত্রিসীমানায় কখনও যাই নি, এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি। আজ এক অবাঞ্ছিত স্থানে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর গৃহিণী স্মরণ করিয়ে দেন, বেলা হচ্ছে মঠে চলো। আমিও প্রায় উঠতে প্রস্তুত

হয়েছিলাম, এমন সময় হোটেলের বয় ট্রে হাতে সম্মুখে হাজির হ'ল কফি ও টোষ্ট নিয়ে। এরপর স্থান ত্যাগ করা সহজ হ'ল না।

ক্রমাগত মনে হতে লাগল, এই ক্রৌঞ্চকায় বলটি যেমন এ প্রান্তে আঘাত খেয়ে পুনরায় অপর প্রান্তে আঘাত খাচ্ছে; আমার অবস্থাও তদ্রুপ। নির্জীব বলের মত একবার গৃহিণীর ধাক্কা, অন্যদিকে ভদ্রতার ঠেলা। দু' দিকেই আঘাত খেতে হচ্ছে।

খেলা শেষ হ'ল প্রায় এগারটায়। জেল-মুক্ত আসামীর মত নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। তারপর কক্ষে গিয়ে স্নান ক'রে এদের ডিনার টেবিলে যোগ দিলাম।

প্রাতে ভ্রমণে বাধা পেয়ে গৃহিণীর মনের অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁকে বললাম—বিশ্রামে আবশ্যক নেই, চলো মাইশোর রাজবাড়ী দেখে আসি। ঘেঁটু এসে হাজির হ'ল, সেও আমাদের সঙ্গ নিলে।

লজের কিছু দূরে লেক। এর আকর্ষণ কিছু নেই। শোভাও নেই। এ স্থানে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ালাম। লেক দেখার জন্য নয়, আমাদের হোটেলের টুরিষ্ট সম্প্রদায়ের কয়েকটি যুবতী নৌকা নিয়ে জল-বিহার করছেন। তাঁদের কসরৎ দেখার ইচ্ছায়।

এস্থান থেকে একটি পাহাড়ের গা দিয়ে অগ্রসর হলাম। অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম ক'রেও রাজ-প্রাসাদের কোন চিহ্ন পেলাম না।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পাহাড় আরোহণের একটি পথ দেখলাম। সেই পথে গিয়ে দেখলাম রাজ-প্রাসাদের বৃহৎ ফটক। পরে মহীশূর এসে এ স্থানের রাজ-প্রাসাদের অনুরূপ ফটক দেখেছিলাম।

এই পাহাড়ের উপরিভাগ বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে পরিণত ক'রে রাজ-প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। ফটক অতিক্রম ক'রে প্রাসাদ অভিমুখে গেলাম। প্রথম একটি মহলে উপস্থিত হয়ে অনুমান করলাম এইটি রাজ অন্তঃপুর। মহলটির শেষ প্রান্তে এসে দেখলাম অনুরূপ আর একটি মহল। এইরূপ চারটি মহল অতিক্রম ক'রে এলাম একটি মনোরম উদ্যানে। উদ্যানের মধ্যভাগে প্রশস্ত বারান্দা ও তার সংলগ্ন রাজপুরীর প্রবেশ দ্বার।

এস্থানে পৌঁছবার পূর্বে আমাদের হোটেলের টুরিষ্ট সম্প্রদায়ের কতিপয় মহিলা রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। প্রাসাদের এক কর্মচারী বললেন—আপনাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। পূর্বাগত দর্শকেরা নিষ্ক্রান্ত হলে আপনারা ভিতরে যাবেন। আমরা বারান্দায় একটি সোফায় বসলাম।

ঘেঁটু বললে—আর একদিন পরেই মাইশোর যাওয়া হচ্ছে। সেখানকার সব কিছুই দেখা হবে। মাইশোরের পর আপনারা কোথায় যাবেন?

বললাম—মাইশোর যাওয়ার পথে প্রথমেই বাঙ্গালোর। আমরা বাঙ্গালোরে অপেক্ষা না ক'রে প্রথমে মাইশোর দেখে, ফেরার পথে আসব বাঙ্গালোরে। তারপর যাব হায়দ্রাবাদ। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

ঘেঁটু বললে—হায়দ্রাবাদে কি দেখবার আছে? তার চেয়ে বাঙ্গালোর দেখে, বাঙ্গালোর-বম্বে মেলে বম্বে চলুন। অনেক কিছু দেখবার আছে।

বললাম—কিছু দিন আগে দশ দিন বম্বেতে ছিলাম। এখন আর যাব না।

গৃহিণী বললেন—সহজে ধর্মশালা পাওয়া যায় না। লজের ভাড়া অনেক।

ঘেঁটু বললে—সে সব চিন্তা করবেন না। আমি ভাল ব্যবস্থা ক'রে দেব।

গৃহিণী বললেন—আমাদের বম্বে নিয়ে গিয়ে টাকার থলি হালকা করবি? তোর টাকায় আমরা নবাবী করব না। তুই আমাদের সঙ্গে হায়দ্রাবাদ চল্।

ঘেঁটু বললে—দেখি ভেবে, গুরুদেবের কি ইচ্ছা। সোহং বাবা এই মাসেই ফিরবেন বলেছিলেন। এতদিন হয়তো ফিরেছেন। আমার আর ঘুরতে বিশেষ ইচ্ছা নেই।

প্রাসাদ অভ্যন্তর থেকে মহিলা সম্প্রদায় নিষ্ক্রান্ত হলেন। আমরা প্রবেশের অনুমতি পেলাম। প্রাসাদের আসবাব ও ব্যবস্থা দেখে অনুমান করা যায় না যে রাজাবাহাদুর সাময়িকভাবে এখানে এসে অবস্থান করেন। তাঁর শয়ন কক্ষ, ভোজন কক্ষ, লাইব্রেরী, মাননীয় অতিথিদের বিশ্রাম কক্ষ, প্রমোদ মহল প্রভৃতি এমন সুচারুভাবে সজ্জিত, যেন এইমাত্র তাঁরা প্রাসাদের বাইরে গেছেন। হয়তো এখনই প্রত্যাগমণ

করবেন। এমন কি আহারের টেবিলের আচ্ছাদন বস্ত্রটি পর্যন্ত পরিপাটি সজ্জিত আছে।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এই পাহাড়ের একস্থান থেকে নিম্নে রেল পথটি দেখলাম। একখানি ট্রেন মন্থর গতিতে চক্রাকার পথে উটিতে প্রবেশ করছে। এই পাহাড় শীর্ষ থেকে উটি সহরটি সম্যক দেখা যায়। আমরা প্রায় দু' ঘণ্টা এইস্থানে কাটিয়ে নীচে নামলাম।

পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, টুরিষ্ট পার্টির মহিলাবৃন্দের কলরবে। প্রধান চিন্তা এল, আজকার রেল পথের সমস্যা। মনে পড়ল মেট্টুপলিয়ম —জালারপেট্টাই। শেষ রাত্রে নামতে হবে এই জালারপেট্টাইয়ে। তারপর বাঙ্গালোরের ট্রেন। ওদিকে আমার রিজার্ভেশন নেই। কুলিদের তোষামদ ক'রে দেখতে হবে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।

বাঙ্গালোরে নামব সকালে সাতটায়। সাড়ে সাতটায় মাইশোরের ট্রেন, বেলা প্রায় বারোটায় নামব মাইশোর ষ্টেশনে। নূতন জায়গা। অদৃষ্টে কিরূপ ধর্মশালা জুটবে কে জানে? ঘেঁটু থাকবে সঙ্গে। সে কি আমাদের মত ক্লেশ স্বীকার ক'রে হাসি মুখে যাবে। তবে সে বেশ কাজের মেয়ে। হয়তো চেষ্টা ক'রে কিছু সুবিধাও করতে পারে।

গৃহিণী চা দিলেন। চা পানের পর বেডিং বাঁধতে মন দিলাম। ট্রেন বেলা সাড়ে বারোটায়।

আহারের পর ঘেঁটুর সংবাদ নিলাম। সে প্রস্তুত হয়েছে। একটি ঝটকা ডেকে সকলের মাল-পত্র ঝটকায় তুলে তিনজনেই ভিতরে বসলাম। ষ্টেশনে এসে তাকে ভাড়া দিলাম এক টাকা।

এ ট্রেনে একখানি প্রথম শ্রেণী, বাকী তিনখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থাকে। ঘেঁটু তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট নিয়ে আমাদের সঙ্গেই বসলে।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম—তুমি কি মাইশোরের টিকিট নিলে? আমরা এখান থেকে একেবারে মাইশোরের টিকিট নিয়েছি।

ঘেঁটু বললে—আমি এখন মেট্টুপলিয়মের টিকিট নিলাম। সেখানে গিয়ে ওদিকের জন্যে বার্থ রিজার্ভ ক'রে টিকিট নেব। বুকিং-ক্লার্ক বললে, প্রচুর বার্থ খালি থাকে। সহজেই রিজার্ভেশন পাওয়া যায়।

ট্রেন ঝিক-ঝিক ক'রে চলতে শুরু করল।

গৃহিণী বললেন—উটাকামণ্ডকে নমস্কার। আর কখনও আসছি না। না আছে ভাল দেবালয়, না ভাল ধর্মশালা। দিন কয়েক থাকতে হ'লে হোটেল ভাড়া দিতে সর্বস্ব ফুরিয়ে যাবে।

ঘেঁটু বললে—পাহাড়ের উপর ঠাণ্ডা জায়গা। গ্রীষ্মে লোকে এখানে আসে আরামের জন্যে। ধর্মশালা তো কোদাইকানালেও নেই।

গৃহিণী বললেন—সেখানকার লজের ভাড়া এর তুলনায় অর্দ্ধেক। পাহাড়ের উপর কি চমৎকার সুব্রাহ্মণ্য দেবের মন্দির। একবার দেখলে আসতে ইচ্ছে করে না। কি চমৎকার মেঘের খেলা। কোদাইকানালও ঠাণ্ডার জায়গা। বাজারে সব জিনিস পাওয়া যায় কেমন সস্তা। এ যেন রাক্ষসপুরী! লজ, হোটেলওয়ালা থেকে কুলি, মুটে, ঝটকাওয়ালা, যেন হাঁ ক'রে আছে। কুলিরা দু'টাকার কম কথা বলে না। ঝটকা, ট্যাক্সি নাও, এক মাইল হোক আধ মাইল হোক, দশটি টাকা হাতে নিয়ে গাড়ীতে বসতে হবে। বাজারে জিনিস থাকলে কি হবে, তাতে হাত দেয় কার সাধ্য! পয়সা ওড়াতে ইচ্ছা হয় এসে আরাম কর। আমাদের মত গরীব লোকদের জায়গা এ নয়।

ঘেঁটুর যেন কেমন উদাসভাব। চপলতা তার কোনদিন দেখি নি। নানাবিধ আলোচনায় বেশ সময় কাটিয়ে দেয়। সামান্য সূত্র ধরে চমকপ্রদ গল্পের অবতারণা করে। এস্থানে বিশেষ কৌতূকপূর্ণ দৃশ্য দেখেও নির্বাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হাসে। তার মানসিক পরিবর্তন দেখে প্রশ্ন করলাম—শরীর কি ভাল নেই?

সে সংক্ষেপে উত্তর দিলে—না; ভালই আছি।

ট্রেন এসে মেট্টুপলিয়ম ষ্টেশনে হাজির হ'ল। কুলি ডেকে মাল-পত্র নিয়ে বড় লাইনের প্লাটফর্মে এলাম।

ঘেঁটু বললে—আপনারা প্লাটফর্মে অপেক্ষা করুন আমি টিকিট নিয়ে আসি। কিছুক্ষণ পরে এসে বললে, টিকিট নিলাম। রিজার্ভেশন অফিস থেকে লিষ্ট চলে গেছে কণ্ডাকটারের হাতে। তিনি কোয়ার্টারে খেতে গেছেন। ফিরে না এলে রিজার্ভেশন হবে না।

কিছুক্ষণ পরে কুলি এসে সংবাদ দিলে, কণ্ডাকটার বাবু এসেছেন। ঘেঁটু গেল রিজার্ভেশন করতে। আমিও সঙ্গে গেলাম আমাদের বার্থ নম্বর জানতে। অতি সহজেই ঘেঁটুর বার্থ পাওয়া গেল। আমাদের বার্থ নম্বর দু'টি জেনে নিয়ে কণ্ডাকটার বাবুকে অনুরোধ ক'রে একই স্থানে ব্যবস্থা ক'রে নিলাম।

গৃহিণী বললেন—এই তো এখানে এসেই ঘেঁটু রিজার্ভ ক'রে এলো। আর তুমি সব জায়গায় এক ঘণ্টা খোসামোদ ক'রে দরখাস্ত লিখে রিজার্ভ কর। তাও সেখানে সিট নম্বর পাও না। ঘেঁটু এক কথায় রিজার্ভ ক'রে সিট নম্বর নিয়ে এলো।

ট্রেন এসে প্লাটফর্মে লাগল।

ট্রেনে বসে গৃহিণী আদেশ করলেন—ঘেঁটুর জন্যে চা, কফি যা পাও নিয়ে এস। ঐ সঙ্গে কিছু খাবারও আনবে।

কফি আর ইড্‌লি-বড়া আনলাম।

গৃহিণী বললেন—আর কিছু পেলে না, সেই আস্কে-পিঠে।

বললাম—এখনও ইড্‌লির দেশ। এরপর মাইশোর বাঙ্গালোরে যদি কিছু পরিবর্তন হয়।

ট্রেন হাজির হ'ল কোয়েম্বাটুর ষ্টেশনে। এখানে ট্রেন কণ্ডাকটার এসে মিল গ্রাহকের তালিকায় আমাদের নাম লিখে নিলেন।

ঘেঁটু বললে—আমার মিলের আবশ্যক নেই। আমি হোটেল থেকে রাত্রের খাবার নিয়ে এসেছি।

তারপর সে প্লাটফর্মে নেমে একটি অর্দ্ধ কিলোগ্রাম দ্রাক্ষাগুচ্ছ এনে গৃহিণীর হাতে দিলে। তিনি সেগুলি তিন অংশে বিভক্ত ক'রে এক অংশ আমার হাতে দিলেন। মুখে দিয়ে দেখলাম "দ্রাক্ষাফল বিস্বাদ ও অম্ল-রসে পরিপূর্ণ।" ট্রেন তখন ষ্টেশন ত্যাগ ক'রে চলেছে।

আমি বললাম—এগুলি হয়তো এখনও খাওয়ার উপযুক্ত হয় নি; দু'চার দিন পরে খাওয়া উচিত। সেগুলি সযত্নে বালতির মধ্যে রাখা হ'ল।

ট্রেন এরোদ ষ্টেশনে হাজির হ'ল। মিলের থালা আসতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলাম। ঘেঁটু তার ব্যাগ উন্মুক্ত ক'রে প্রচুর খাবার বের

করলে। নিজের জন্য সামান্য কিছু রেখে, অধিকাংশ আমাদের দিকে ঠেলে দিলে।

প্রচুর সম্পত্তি ওর ব্যাগের মধ্যে লুকান ছিল জানা থাকলে আমাদের অর্থ ব্যয় ক'রে মিল লওয়ার আবশ্যক ছিল না।

আহারের পর পান মুখে দিয়ে গৃহিণী বললেন—এরোদের পর কি বড় ষ্টেশন আছে ?

বললাম—এরোদ আর জালারপেট্রাইয়ের মধ্যে আর একটি ষ্টেশন আছে সালেম্।

গৃহিণী বললেন—এরোদ কি সালেমে দেখবার মত কিছু নেই ?

বললাম—এরোদ বা সালেমে বিখ্যাত মন্দির আছে কিনা জানি না। তবে সালেম থেকে বৃধাচলম যাওয়ার রেলপথ আছে। সেখানে মহাদেব মন্দির আছে। সালেম থেকে দূরত্ব একশ' কিলোমিটার। সালেমের কিছুদূরে একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত আছে। অনেকে দেখতে যায়।

ঘেঁটু বললে—ষ্টেশনের পাশে জলপ্রপাতটা থাকলে, নেমে গিয়ে স্নান ক'রে আসতাম।

ট্রেন সালেম ত্যাগের কিছু পরেই ঘেঁটু চক্ষু বুজলে। গৃহিণীকে সঙ্কেত ক'রে তার অবস্থা দেখালাম।

তিনি বললেন—যা করে করুক। জালারপেট্রাইয়ে ব্যবস্থা করা যাবে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ট্রেন জালারপেট্রাইয়ের সন্নিকটে এসে গেল। ট্রেনের গতি মন্থর হতে আমাদের বাক্স-বেডিং, ব্যবস্থা ক'রে রাখলাম। ট্রেন এসে জালারপেট্রাই প্লাটফর্মে হাজির হ'ল। ঘেঁটুর দিকে চেয়ে দেখলাম সে ঘোর নিদ্রামগ্ন। কয়েকবার জোরে ডাকলাম, কোন ফল পেলাম না। গৃহিণীকে বললাম, দেখ চেষ্টা ক'রে যদি ওর নিদ্রাভঙ্গ করতে পার।

গৃহিণী বললেন—তোমার দ্বারা হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি। এই কথা বলে তার বেনী ধরে তুলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, জালারপেট্রাই এসে গেছে নামতে হবে।

ঘেঁটু দু'হাতে চক্ষু মর্দন ক'রে বললে—আমি আজ কাটপাড়ি যাব। কাটপাড়ির টিকিট নিয়েছি। সোহং বাবা এতদিনে নিশ্চয় ফিরেছেন।

তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে দু'দিন পরে আমি মাইশোর যাব। এখন তিরু-মাল্লাইয়ের আবহাওয়া খুব ভাল। আপনারাও চলুন না। তিরুপতি দর্শন ক'রে সোহং বাবার সংবাদ নিয়ে দু'দিন পরে সকলে একসঙ্গে মাইশোর যাব।

এই সময় তার এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হলাম।

গৃহিণী বললেন—তুই আমাদের সঙ্গে মাইশোর যাওয়া স্থির ক'রে কাটপাড়ির টিকিট নিলি কেন? তোর মাথার ঠিক নেই। মতলবেরও ঠিক নেই। তোর যা খুশি হয় কর। আমাদের কিছুই বলার নেই। আজ তোর এ ব্যবহারে আমরা মনে খুব কষ্ট পেলাম। আমার দিকে ফিরে বললেন, বিলম্ব করো না। মাল-পত্র নামাও। গাড়ী ছেড়ে দেবে।

ক্ষুন্ন মনে কুলি ডেকে বাক্স, বেডিং নামালাম।

প্লাটফর্মে নেমে গৃহিণী বললেন—আমি জানি ও মেয়ে একটা শয়তান। টিকিট কেনার সময় তুমি তো সঙ্গে ছিলে। দেখ নি কোন্ ষ্টেশনের টিকিট নিলে?

উদাসভাবে বললাম—টিকিট কেনার সময় সঙ্গে ছিলাম না। রিজার্ভেশনের সময় ছিলাম। কোন সন্দেহ ছিল না। তাই লক্ষ্যও করি নি। ট্রেন চলতে শুরু করল। আর একবার কামরার দিকে তাকালাম। দেখলাম সে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছে।

ট্রেন আমাদের উপহাস ক'রে ধ্যেৎ-ধ্যেৎ শব্দে অন্ধকারে মিশে গেল। গার্ডের কামরার পেছনের বাতীটি বহুক্ষণ আমাদের দিকে রক্ত চক্ষু ক'রে দেখতে দেখতে চলে গেল।

কুলিরা এসে জানালে—মাদ্রাজ মেল অন্য প্লাটফর্মে আসবে। মাল নিয়ে সে দিকে যেতে হবে।

গৃহিণী মৃদু কণ্ঠে বললেন—এখন কি করবে?

গলা ঝেড়ে বললাম—মাইশোর যাব।

কুলিদের বললাম—আমরা মেট্রূপলিয়ম থেকে শ্লীপারে এসেছি। এখানে যদি তা বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পার ভাল বখ্‌শিস মিলবে। তারা আশা দিলে, ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

মাদ্রাজ মেল প্লাটফর্মে পৌঁছানমাত্র আমাদের কুলি স্লিপিং কামরায় উঠে গেল। ছু' মিনিট পরে শুভ সংবাদ দিলে, কামরার শেষ প্রান্তে বার্থ খালি আছে।

মাল-পত্র নিয়ে কুলিদের সঙ্গে কামরার শেষ প্রান্তে এসে দেখলাম, কতকগুলি মিলিটারী যুবক এদিকের সব কয়টি বার্থ দখল ক'রে অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে।

কুলিরা মাল-পত্র নামিয়ে কয়েকজনের নিদ্রা ভঙ্গ ক'রে বললে—এখানে ছু'টি বার্থ রিজার্ভ আছে। আপনারা বার্থ ছেড়ে দিন।

তারা কোন কথা না বলে নীচেয় শয্যা রচনা ক'রে শুয়ে পড়লে। আমরা নির্বিঘ্নে বার্থ দখল করলাম।

কুলিরা বখ্‌শিস নিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল—আপনারা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন। একটু পরে কণ্ডাকটার সাহেব এসে আপনাদের রসিদ দিয়ে যাবে।

আমরা বাঙ্গালোর পর্যন্ত শান্তিতে এসেছিলাম। কোনও সাহেবের সাক্ষাৎ পাই নি।

ট্রেন চলেছে। বার্থে শুয়ে চক্ষু বুজে নিদ্রার চেষ্টা করলাম। চক্ষের সম্মুখে ঘুরতে লাগল জালারপেট্টাইয়ের সেই বিয়োগান্ত দৃশ্য। সমস্তই যেন ছুঃস্বপ্ন। পর্যটক হয়ে বাঙ্‌লার বাইরে এসে কতরকম বাঙ্গালী পুরুষ মহিলার সঙ্গলাভে কতই আনন্দ পেয়েছি। ছু'দিনের পর সে সব স্মৃতি মুছে গেছে। উত্তর ভারতে, সৌরাষ্ট্রে পেয়েছিলাম নন্দীমশাইকে। সখীকে। সেও যেন স্বপ্ন। মনে এলো কবিগুরুর 'ছবি' কবিতার কয়েক লাইন—

"এক সাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি
কত ছুঃখে সুখে
রাত্রি দিন চলেছি সম্মুখে।"

এই দাক্ষিণাত্যেও কতই লোকের সংস্পর্শে এলাম। শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হই নি। তারপর স্থান পরিবর্তনে দৃশ্যের পরিবর্তন। কিছুদিন তাদের অদর্শনের পর সে সব স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে।
শিবাণী, লাখপতিয়া, মুখার্জ্জী দম্পতি প্রভৃতির স্মৃতি মনে স্পষ্ট জাগরূক থাকলেও তাঁদের অদর্শনে, বেদনাদায়ক কিছু অনুভব ক'রি নি। বম্বের ডলি স্নেহের প্রতিদানে ভক্তি শ্রদ্ধায় আমাদের মনকে জয় করেছিল। ত্রিবেন্দ্রামে তাকে ত্যাগ ক'রে আসতে মনে যথেষ্ট বেদনা অনুভব করেছি তার উপসমে বেশ সময় লেগেছিল।
এই ঘেঁটু যেন একটা প্রহেলিকা। যে মুহূর্তে সংস্পর্শে এসেছে নিমিসে আমাদের মন জয় ক'রে নিয়েছে। শিশুর মত আব্দারে, আনন্দে আমাদের মুগ্ধ করেছে। তারপর অকস্মাৎ নাগা সন্ন্যাসীর ধুনীর অঙ্গারের মত স্মৃতি চিহ্নটুকু রেখে অদৃশ্য হয়েছে। কুড়িয়ে পেলাম শ্রীপুরমবদুরের পথে। কয়েক দিন পরে মাদ্রাজ থেকে সরে গেল দূরে। আবার অতর্কিতে ধরা দিলে তিরুমাল্লাইয়ে। সেখান থেকেও মায়ার জাল ছিন্ন ক'রে হ'ল সে নিরুদ্দেশ।
পুনরায় দেখা পেলাম রামেশ্বরে। সেখানে সে শিবাণীর সংস্পর্শে থাকায় আমরা ছিলাম দূরে। কন্যাকুমারীতেও তাই। নূতন ক'রে আকর্ষণ করলে মাদুরায়, কোদাইকানালে, শেষ উটাকামণ্ডে। জানি না আবার হয়তো ধুমকেতুর মত উদয় হবে মাইশোরে কিংবা বাঙ্গালোরে।
আমি বেশ লক্ষ্য করেছি সে আমাদের সঙ্গে গাঢ় ঘনিষ্টভাবে মিশেছে। কন্যারূপে স্নেহ, আব্দার করেছে। আজকের দিন ব্যতীত কোনস্থানে একত্রে রেল ভ্রমণ কিংবা এক গৃহে বাস করে নি। উটিতে সে এক হোটেলে ছিল কিন্তু ভিন্ন অংশে। এবার মাইশোর গিয়ে কোনরূপে মনকে শিথিল হতে দেব না। আর কোনদিন ওর আব্দারে ভুলব না।
ট্রেনের গতি মন্থর হতে চিন্তারাশী দূরে ঠেলে চোখ খুলে বাইরের দিকে তাকালাম। রাতের আঁধার তখন ফিকে হয়ে গেছে। ট্রেন থামতে প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে দেখলাম বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশন। আমাদের সহযাত্রী মিলিটারীদল পোষাক পরিবর্ত্তন ক'রে নামবার জন্য প্রস্তুত

হয়েছে। ট্রেন থামামাত্র সকলে প্লাটফর্মে নেমে মিলিটারী কায়দায় মার্চ্চ ক'রে ক্যান্টনমেণ্টের দিকে অগ্রসর হ'ল। নীচের বার্থের দিকে চেয়ে দেখলাম, গৃহিণী আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত ক'রে নিদ্রা দেবীর আরাধনা করছেন।

ভাবলাম এখন আর নিদ্রার বৃথা চেষ্টা না ক'রে বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে চায়ের চেষ্টা দেখি। বার্থ থেকে নামামাত্র গৃহিণী মুখের আবরণ উন্মোচন ক'রে বললেন—ঘেঁটুর আঙ্গুরগুলো বালতি থেকে বার ক'রে বাইরে ফেলে দাও। ওর গন্ধে সারারাত্রি ঘুম হ'ল না। মাথা কেমন করছে। অনুমান করলাম, উনিও আমার মত জাগ্রত স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁকে বললাম—সে পরে হবে। এখন একটু চা কিম্বা কফি খাবে?

তিনি বললেন—চা-কফি যাহোক নাও, গরম দেখে নিও।

আমরা বাঙ্গালোর সিটিতে এসে নামলাম। কুলিদের বললাম—আমরা মাইশোরে যাব। তার পূর্বে আমাদের রিজার্ভেশন অফিসে যেতে হবে। কুলিরা বললে—হুব্‌লী-মাইশোর মেল প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। আধ ঘণ্টা পরে ছাড়বে। ব্যস্ত হবেন না। আমার সঙ্গে আসুন রিজার্ভেশন অফিসে। রিজার্ভেশন অফিসে গিয়ে আট দিনের ব্যবধানে হায়দ্রাবাদের জন্য দু'টি বার্থ রিজার্ভ করলাম।

কয়েক দিন পরে আমাদের মাইশোর থেকে আসতে হবে বাঙ্গালোর। সে সময় রিজার্ভেশন করতে পারতাম কিন্তু তখন হয়তো স্বল্প সময়ে বার্থ পাওয়া যাবে না। সুতরাং ভবিষ্যতের আশা না ক'রে নিশ্চিন্ত হওয়াই শ্রেয়।

গৃহিণী বললেন—কয়দিন পরে আমাদের হায়দ্রাবাদ যেতে হবে?

বললাম—আট দিন পরে। মাইশোরে থাকব ছয় দিন। তারপর বাঙ্গালোরে এসে দু'দিন থেকে হায়দ্রাবাদে যাওয়া হবে।

আমরা হুব্‌লী-মাইশোর মেলে উঠে বসলাম। ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা ছিল সামান্য। এখন আমার একমাত্র চিন্তা উপযুক্ত বাসস্থান। আমাদের কামরায় এক প্রবীন ভদ্রলোক সস্ত্রিক মাইশোর যাচ্ছিলেন। তিনি মাইশোরেই থাকেন। তাঁর নিকট জানলাম, মাইশোরে কয়েকটি ধর্মশালা

আছে তন্মধ্যে নন্দরাজ ধর্মশালাটি শ্রেষ্ঠ। বহু কামরা, ব্যবস্থা ভাল, ষ্টেশনের নিকটেই এ ধর্মশালা। আপনাদের সুবিধা হবে।
বেলা প্রায় বারটায় আমরা মহীশূরে নামলাম।

মহীশূর ঃ

সমস্ত দাক্ষিণাত্য ঘুরে এখানে এসে টাঙ্গার বহুল প্রচলন দেখলাম। পরে বাঙ্গালোরেও দেখেছি। কিছু কিছু ঝটকাও আছে। একটি টাঙ্গাওয়ালাকে ডেকে নন্দরাজ ধর্মশালা যাওয়ার জন্য বললাম। টাঙ্গাওয়ালা দাবী করলে, চার টাকা। কারণ এ সময় এখানে মরসুম।
গৃহিণী ক্রুদ্ধ হয়ে টাঙ্গা চালককে বিশুদ্ধ হিন্দিতে অনেক কথা বললেন। তাঁর হিন্দি বুলিতে কিছু উপকার হ'ল। টাঙ্গাওয়ালা একমুদ্রা অব্যাহতি দিয়ে তিন টাকায় রাজী হ'ল।
পরে জেনেছিলাম, সত্যই এ সময় মহীশূরে মরসুম। মহীশূর থেকে প্রায় এক শত কুড়ি কিলোমিটার দূরে শ্রবণবেলগোলা জৈন তীর্থ স্থান। এই স্থানে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমাধি আছে। তিনি শেষ জীবনে জৈন ধর্মে দিক্ষীত হন। এই স্থানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। সেই কারণে শ্রবণবেলগোলা একটি বিশেষ জৈন তীর্থ।
প্রতি বৎসর এই সময় সেখানে উৎসব হয়। মহীশূর এই শ্রবণবেলগোলা পথের কেন্দ্রস্থল। বহু জৈন মহীশূরে এসে বাস পথে শ্রবণবেলগোলা যান। এই সময় প্রতিদিন কয়েকখানি বাস শ্রবণবেলগোলা যাতায়াত করে। সেই কারণে এই সময় মহীশূরে বেশ জনতা হয়। ধর্মশালায়ও স্থানাভাব ঘটে।
টাঙ্গাওয়ালা আমাদের নন্দরাজ ধর্মশালায় এনে হাজির করলে। প্রাচীর বেষ্টিত বড় কম্পাউণ্ড। তন্মধ্যে পাশাপাশি দুইটি একতল ভবন। টাঙ্গাওয়ালা আমাকে অফিসে অনুসন্ধান করতে বললে।
ম্যানেজারের সাক্ষাৎ পেলাম, তিনি জানালেন কামরা খালি নেই।

অদৃষ্ট ভাল, ঠিক সেই সময় এক ভদ্রলোক কামরা ত্যাগ ক'রে চলেছেন। ম্যানেজারকে আবেদন ক'রে সেইটি দখল করলাম। ম্যানেজারের খাতায় নামধাম লিখিয়ে কক্ষে মাল-পত্র তুলে নিশ্চিন্ত হলাম।

গৃহিণী বললেন—অনেক বেলা হয়েছে। অন্য কিছু রান্নার আবশ্যক নেই। আলু-কোপির ঝোল আর ভাত হোক। উটিতে কোপি নিয়েছিলাম আজও আছে। কয়েকটা আলু দরকার। ঘরে তালা দাও আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখে আসি।

ধর্মশালার পাশে প্রধান পথে কিছুদূর গেলেই বাজার। আমরা সেই দিকে গেলাম। পথের পাশে কয়েকখানি সব্জির দোকান। আলু নেই। বাজারেই যেতে হ'ল। বাজারের মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে আলুর দোকান পেলাম। কয়েকটি বিশিষ্ট দোকান ব্যতীত আলু পাওয়া যায় না। এই বৃহৎ বাজারের মধ্যে মাত্র তিনটি দোকানে আলু পাওয়া যায়। বাজারটি দেখতে আনন্দ হয়। বাজারের একদিকে বিরাট মাছের স্টল। সকল প্রকার মাছ পাওয়া যায়। মাছের স্টলের পশ্চাতে হাঁস, মুরগী ও ডিমের দোকান। ক্লান্তিবশতঃ এখন আর সময় অতিবাহিত না ক'রে আলু ও টমেটো নিয়ে ধর্মশালায় ফিরলাম।

ধর্মশালায় ফিরে দেখলাম, ধর্মশালা ভবনের বারান্দায় কয়েকজন বাসের দালাল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁদের নিকট জানলাম, প্রতি রবিবার ও বুধবার কয়েকখানি বে সরকারী বাস মহীশূরের আকর্ষণীয় স্থানগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। বিদেশী লোকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। একদিনেই সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা যায়। এই বাস প্রাতে আটটায় রওনা হয়ে প্রথমে যায় চামুণ্ডা পাহাড়ে, চামুণ্ডা দেবীর দর্শনে। তারপর ললিতা দেবীর প্রাসাদ ও দর্শনের পর বিরতি। পুনরায় অপরাহ্নে তিনটার পর শ্রীরঙ্গপত্তম, কৃষ্ণা কাবেরী সঙ্গম ও বৃন্দাবন উদ্যান দেখান হয়।

প্রতি রবিবার ও বুধবার, বৃন্দাবন উদ্যানে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা আছে। এই বাসে আরও দেখান হয় মহীশূরের বিখ্যাত রেশম ও চন্দন তেলের কারখানা। বুধবারে গেলে রেশম কারখানা দেখা যায়। রবিবারে

এ কারখানা বন্ধ থাকে, সুতরাং দেখার কোন সুযোগ থাকে না। রবিবারে গেলে চন্দন তেলের কারখানা দেখা যায়। বুধবারে কারখানটি বন্ধ থাকে। এই বাসের ভাড়া প্রতিজনের জন্য সাত টাকা।

দালালদের বাস নম্বর ও তাঁদের দর্শনীয় বিষয়গুলির মুদ্রিত ইস্তাহার হাতে নিয়ে, পরে মতামত জ্ঞাপন করা হবে জানিয়ে তাঁদের বিদায় করলাম। পরে বুঝেছিলাম তাঁরা যত সুবিধা আমাদের দেখাচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মাত্র কয়েক মাইল পথ ভ্রমণের জন্য এ ভাড়া অসঙ্গত। তবে যে সকল যাত্রী দুই এক দিনের জন্য এখানে থেকে এ সকল দর্শন ক'রে স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ সারতে ইচ্ছা করেন তাঁদের জন্য এ ব্যবস্থা সমিচীন মনে হয়।

অপরাহ্নে শান্ত মনে ও সুস্থ দেহে গেলাম বাজারের দিকে। এখন একবার বাজারে প্রবেশ ক'রে দেখলাম বিবিধ পণ্য সম্ভারে দোকানগুলি সুসজ্জিত। সকল প্রকার সব্‌জি, মৎস্য, মাংস, ডিম প্রচুর। মূল্যও সুলভ। প্রচুর ফুলের দোকান। ফলের স্টল ঘুরে দেখলাম, পেঁপেকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া চলে। কাঁঠাল ভেঙে খুচরা বিক্রয় করতেও দেখলাম।

বাজারের কিছু দূরে রাজপ্রাসাদ। বাজার থেকে বেরিয়ে আমরা এলাম রাজপ্রাসাদের ফটকের দ্বারে। দুই পার্শ্বে দু'টি দেবমন্দির। মন্দিরে সান্ধ্য আরতি আরম্ভ হয়েছে। দর্শকদের মধ্যে মহিলার সংখ্যাই অধিক।

প্রাসাদের সন্মুখ দিয়ে চলে গেছে চার পাঁচটি প্রশস্ত পথ। পথের কেন্দ্রস্থলে প্রাক্তন রাজপুরুষদের প্রতিমূর্তি। দর্শকদের সুবিধার জন্য মূর্তিগুলির পাদদেশে সহস্র বাতি শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। অদূরে চামুণ্ডা পাহাড় সহরের শোভাবর্দ্ধন করছে। প্রশস্ত পথের পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্যের দোকান। লজ, হোটেল। সকলপ্রকার যানবাহন পাওয়া যায়। ছবির মত সহরটি দেখে বেশ আনন্দ হয়।

পরদিন সকালে স্নানের পর গেলাম বাস ষ্টেশনে। পাহাড়ের উপর চামুণ্ডা দেবীর দর্শনে। রাজপ্রাসাদের নিকটে বাস ষ্টেশন। প্রাতে প্রতি পনর মিনিট অন্তর চামুণ্ডা পাহাড়ে বাস যায়। বাস ভাড়া প্রতি জনের পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

বাসে উঠে দেখলাম, মহিলা যাত্রীর সংখ্যাই অধিক।

পাহাড়ে যাওয়ার বাস পথ, পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে। সহরের বিপরীত দিকে। সুন্দর পথ। স্থানে স্থানে পথের পার্শ্বে এক একটি মৃত্তিকা কিংবা কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি। যেন তারা পথের নির্দেশ জ্ঞাপন করছে।

সামান্য কিছুদূর পাহাড়ের পাশ দিয়ে এসে বাস পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চামুণ্ডা দেবীর মন্দির দ্বারে উপনীত হ'ল। বাস থেকে নেমে দেখলাম এক অপূর্ব শোভা। এস্থান থেকে সমগ্র মহীশূর সহরটি স্পষ্ট দেখা যায়।

পাহাড়ের শীর্ষস্থান একখণ্ড প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র। এস্থানে বাজার, দোকান, মন্দির সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র সহর। মন্দিরের উত্তরভাগে একটি প্রাসাদ। অনেক সময় রাজ পরিবারের মহিলারা এস্থানে এসে দেবীর পূজা দেন। আহার ও বিশ্রাম করেন।

আমরা একটি দোকানে কিছু ফুল ও পূজার দ্রব্য নিয়ে মন্দিরে পূজা দিলাম। দক্ষিণভারতীয় পদ্ধতিতে পূজার ব্যবস্থা। পূজার পর দেখলাম মন্দিরের দক্ষিণে কিছুদূরে অন্য একটি মন্দির। মূল মন্দির থেকে চতুর্দোলে বিগ্রহ নিয়ে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা ক'রে দক্ষিণ দিকের মন্দিরে গেলেন। অগ্রভাগে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র কিংবা দেবীর স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে গেলেন। চমৎকার লাগে এই ভক্তির রূপ দেখতে।

পাহাড় শীর্ষের প্রাসাদটির পাশ দিয়ে নিম্নাভিমুখে গেছে একটি সোপান পথ। কয়েকজনকে সেদিকে যেতে দেখে আমরাও তাঁদের অনুসরণ করলাম। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি তাও বুঝলাম না। কেবলমাত্র অনুমান করলাম এদিকেও দর্শনীয় কিছু আছে।

বেশ কিছু দূর সোপান বেয়ে নিম্নাভিমুখে আসার পর দেখলাম দু'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, একটি মহিলা ও একটি শিশুসহ একখণ্ড শিলার উপর বিশ্রাম করছেন। এস্থানে তাঁদের দেখে আনন্দিত হলাম। পরিচয়ে জানলাম, এঁদের মধ্যে জনৈক ভদ্রলোক মহীশূরের নিকটে কোন কার-খানায় কর্ম করেন। অন্য ভদ্রলোক তাঁর বন্ধু, সস্ত্রীক সন্তানসহ এসেছেন মহীশূর দর্শনে বা ভ্রমণে।

এখন বুঝেছিলাম এইপথে পাহাড়ের নিম্নদেশে যাওয়া যায়। কৌতূহলে চলেছিলাম। এঁরা আমাদের পদব্রজে নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প শুনে বললেন —এ পাহাড়ে পদব্রজে আরোহণ, অবরোহণ দুইই অসম্ভব।

পাহাড়ের উচ্চতা তাদৃশ মনে হ'ল না। এঁদের এ উপদেশ আমাদের মনঃপুত হ'ল না। আমরা সোপান বেয়ে নেমে চললাম।

আরও কিছুদূর এসে সোপান পথের পার্শ্বে দেখলাম কাল পাথরে নির্মিত এক অতিকায় ষণ্ড বা নন্দী। মনে হয় এই পাহাড়ের একটি বৃহৎ শীলাকে ষণ্ডাকারে নির্মিত করা হয়েছে। অতি নিখুঁত মূর্তি। কে বা কাহারা ফুল-জল দিয়ে পূজা ক'রে গেছেন। রামেশ্বরে একটি বৃহৎ নন্দীমূর্তি ও তাঞ্জোরের শঙ্কর মন্দিরের সম্মুখেও অনুরূপ মূর্তি দেখেছি। মনে হয় এ মূর্তিটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পথের এ পার্শ্বে একটি শঙ্কর মন্দিরও দেখলাম। স্থানটি বেশ মনোরম।

আমাদের আরও কিছুক্ষণ এস্থানে বিশ্রামের ইচ্ছা ছিল কিন্তু দেখলাম স্থানীয় এক ফিল্ম্ কোম্পানী আজ এখানে আউট-ডোর স্যুটিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের সাজ-সরঞ্জামসহ এসেছেন অভিনেতা, অভিনেত্রীরাও। মনে হয় কোন প্রণয় দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হবে। নায়ক-নায়িকাকে সেইভাবে তালিম দেওয়া হচ্ছে। আমরা আর অপেক্ষা না ক'রে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হলাম।

আরও কিছুদূর নেমে এসে দেখলাম, কয়েকটি বিদ্যালয়ের বালক পুস্তকের ব্যাগ স্কন্ধে নিয়ে পাহাড় পথে চলেছে। আমাদের দেখে আগ্রহে কয়েকটি সংবাদ জানতে ইচ্ছা করলে। কিন্তু তাদের ভাষা আমরা বুঝলাম না। তবে স্যুটিং শব্দটি অবলম্বন ক'রে তাদের সঙ্কেৎ ক'রে বললাম, আরম্ভ হয়েছে জলদি যাও। বাঙ্লাতেই বললাম। তাদের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হ'ল না। আনন্দে ও উৎসাহে দ্রুতগতিতে তারা ঊর্ধপথে অগ্রসর হ'ল।

গৃহিণী বললেন—বাচ্চাগুলো স্যুটিংয়ের সংবাদ পেলে কিভাবে?

বললাম—বিষাক্ত গ্যাস আপনি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা প্রায় পথের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছে গেলাম। এস্থানে দু'টী যুবতীকে নিয়ে এক প্রৌঢ়া চলেছেন মন্দিরে দেবী দর্শনে পূজার

উদ্দেশ্যে। সামান্য কিছু সোপান অতিক্রম ক'রে তাঁদের সারা দেহ ঘর্ম সিক্ত হয়ে গেছে।

গৃহিণী প্রৌঢ়াকে দেখে হেসে বললেন—তুমি কি এঁদের নিয়ে উঠতে পারবে মা ?

প্রৌঢ়া হাসি মুখে দুই বাহু উর্ধে তুলে অনেক কথাই বললেন।

বুঝলাম তিনি হয়তো বললেন—ভগবান দর্শনে ক্লেশ স্বীকার করেই যেতে হয়। কিংবা হয়তো বললেন, তাঁর দর্শনে যাব, কোন ক্লেশ হবে না।

আমরা হাসতে হাসতে পাহাড় থেকে নীচে নামলাম। সেই বাঙ্গালী বাবুটীর কথা এখন মনে পড়ল। মনে হয় তিনি কখনও পদব্রজে পাহাড়ে ওঠেন নি। নিম্নে আসাতে আমাদের কিছুমাত্র শারীরিক ক্লেশ হয় নি। হবেই বা কেন ? এ পাহাড়ের উচ্চতা হাজার ফিটের অধিক নয়। পাহাড় আরোহণেই পরিশ্রম। অবতরণে সেরূপ ক্লেশ কোন দিনই অনুভব করি নি। এই চামুণ্ডা পাহাড় থেকে নিম্নে আসতে আমাদের আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে নি। একদিন পদব্রজে চামুণ্ডা মন্দিরে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখার বাসনা ছিল, সময় কত লাগে। সে বাসনা আমাদের পূর্ণ হয় নি।

আহারের পর গেলাম 'জু' দেখতে। রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে একটি উদ্যান পার হয়ে জু-গার্ডেন। উদ্যানটির সম্মুখে একটি সিংহের চিত্র জুয়ের পথ নির্দেশ করছে। দেখলাম এস্থানের প্রধান আকর্ষণ হিংস্র পশু। সিংহ, বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি। এক স্থানে এসে দেখলাম, জনৈক জু-কর্মচারী একটি সিংহকে পিঞ্জরের বাহিরে এনে দর্শকদের সামনে হাজির করেছে। সিংহটি আকারে ছোট কিংবা রুগ্ন বা দুর্বল নয়। অনেকে সেই সিংহের গাত্রে হাত বুলিয়ে কর্মচারীকে কিছু পুরস্কার দিচ্ছেন। সিংহটি অর্দ্ধ নিমিলিত নয়নে এক একবার দর্শকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। মনে হয় চিন্তা করছে—এরা অজ্ঞান, অসহায়। এদের ক্ষমা করাই পশুরাজের ধর্ম।

'জু' দেখে সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরলাম। গৃহিণী ধর্মশালায় প্রবেশ ক'রে বললেন—ম্যানেজারকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে এস তো, শিবাণী কি ঘেঁটু

আমাদের খোঁজে এসেছিল কিনা।

বললাম—শিবাণীর আসা হয়তো সম্ভব। ঘেঁটু যে এতশীঘ্র ফিরবে তা আশা করি না। ওরা যে এই ধর্মশালাতেই আসবে তারও কোন স্থিরতা নেই।

তবুও গেলাম ম্যানেজারের নিকট জানতে। তিনি বললেন—আপনারা ব্যতীত কোন বাঙ্গালী এ ধর্মশালায় এখনো আসেন নি।

চা পানের পর আর একবার বাজারের দিকে গেলাম। বাজারের সন্নিকট দু-তিনটি বেকারী আছে। জেনেছিলাম সন্ধ্যার পর টাটকা রুটী এখানে পাওয়া যায়। রাত্রের আবশ্যকে আনতে গেলাম।

বাজারের পথের পার্শ্বে একটি কক্ষের বারান্দার উপর সাধনা ঔষধালয়ের সাইনবোর্ড দেখে থমকে দাঁড়ালাম। কক্ষ থেকে এক ভদ্রলোক বাঙ্‌লা ভাষায় আহ্বান ক'রে কক্ষ মধ্যে উপবেশনের অনুরোধ করলেন। ভদ্রলোকের নাম ডাক্তার জে, সি, সরকার। ইনি এই ঔষধালয়ের ম্যানেজার। আমরা কক্ষে প্রবেশ ক'রে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় করলাম। ইনি বারানসীর আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ থেকে কবিরত্ন উপাধি পেয়েছেন।

আমি ভ্রমণ পথে সাধনা ঔষধালয়ের যে সকল শাখা দেখেছি সেগুলিতে এঁদের নিযুক্ত যে সকল ম্যানেজার আছেন, তাঁদের সকলেরই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। তাঁরা কেবলমাত্র দন্তমাজন, মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাস প্রভৃতি ঔষধের সেলস্-ম্যান্ নন। রোগীর চিকিৎসার জন্য এঁদের পরামর্শ গ্রহণে ও ঔষধ নির্বাচনে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। আমরা অবসর সময়ে এঁর নিকট এসে সময় কাটাতাম।

এঁর সংসারে এক অদ্ভূত বিষয় লক্ষ্য করলাম। এঁর সন্তানেরা বাঙ্‌লা ভাষায় একেবারে অজ্ঞ। প্রথমে অনুমান করেছিলাম ওঁর সহধর্মিনী হয়তো এ দেশীয় মহিলা। সেই কারণেই বাঙ্‌লার পরিবর্তে ছেলেগুলি কানারা-ভাষী হয়েছে। পরে দেখেছিলাম সন্তানদের জননী বিদুষী লক্ষ্মীস্বরূপা খাঁটী বাঙ্গালী গৃহস্থ কন্যা। কিরূপে যে সন্তানদের এমন ভাষা বিপর্যয় ঘটল, বুঝতে সক্ষম হলাম না।

এই কবিরাজ মহাশয়ের সাহায্যে আমরা একদিন মাইশোর হস্‌পিটাল দেখে এসেছিলাম। মাইশোর রাজকুমারীর অবদান, শিশু হস্‌পিটাল ও হস্‌পিটালের সুব্যবস্থা দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম।

গৃহিণী প্রস্তাব করলেন—কাল রবিবার। চলো, বৃন্দাবন-গার্ডেন দেখে আসি। শুনেছি আলোই ওর প্রধান শোভা। রবিবার ও বুধবার ভিন্ন আলোর ব্যবস্থা থাকে না। ওদের বাসে গেলে সুবিধা হত না?

বললাম—সে চিন্তা আমি করেছি। ওদের বাসের সুবিধা আমরা নেব না। সকালে তাঁরা যেগুলি দেখাবেন সেগুলি আজই আমরা দেখে এসেছি। অবশ্য রেশম কিংবা চন্দন তেলের কারখানা আমি দেখি নি। সেগুলি দেখার আগ্রহও আমার নেই। কাল সরকারী বাসে বৃন্দাবন-গার্ডেন দেখতে যাব। সেখানে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে সন্ধ্যার পর আলোকসজ্জা দেখে ধর্মশালায় ফিরব।

প্রতি রবিবার ও বুধবার আধ ঘণ্টা অন্তর সরকারী বাস বৃন্দাবন-গার্ডেন যায়। আমরা আহারের পর প্রস্তুত হলাম। একটি ব্যাগে কয়েকটি কলা, লেবু, মুড়ি ও নারকেল নিলাম। একটি ফ্লাস্কে নিলাম চা। বেলা হু'টোর পর বাস ষ্টেশনে গেলাম। কয়েক মিনিট পরেই বাস ছাড়ল।

উদ্যানের অনতিদূরে বাস থেকে নামলাম। সম্মুখে কাবেরী নদীর সুদীর্ঘ বাঁধ। বাঁধের নিম্নে বহুখ্যাত বৃন্দাবন উদ্যান। বাঁধের উপরে যেতে বিশ পয়সা দিয়ে অনুমতি-পত্র নিতে হয়। ছু'খানি অনুমতি-পত্র নিয়ে বাঁধের উপরে গেলাম।

পর্বতপ্রায় উচ্চ, প্রস্তর নির্মিত সুদৃঢ় বাঁধ। বাঁধের একদিকে ঘন নীল জলরাশি বাঁধের পাথরে মাথা ঠুক্‌ছে। অপর দিকে উদ্যান। বাঁধটি একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলাম। বাঁধ থেকে লক্ষ্য করলাম, উদ্যানটীর দৈর্ঘ এক মাইল, প্রস্ত এক ফার্লংয়ের অধিক। বাঁধটি সমগ্র উদ্যানের বামভাগ বেষ্টন ক'রে আছে। উদ্যানের দক্ষিণে কয়েক প্রকার পুষ্পবৃক্ষ। আর আছে মেট্রোপোল হোটেল।

বাঁধ থেকে সোপান বেয়ে উদ্যানে এলাম। সমস্ত উদ্যানটি কয়েক অংশে বিভক্ত। এক একটি অংশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সজ্জিত। মধ্যভাগে ও

পার্শ্বে উদ্যানের অপর প্রান্তে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাঁধের অবরুদ্ধ জল, জলপ্রপাতের আকারে নিম্নে আছাড় খেয়ে উদ্যান পথের উভয় পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই জলের মধ্যে নানা বর্ণের কাচের আবরণে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা আছে। এক একটি অংশের মধ্যভাগে পাঁচ সাতটি শ্রেণী-বদ্ধ কৃত্রিম উৎস। সেগুলি এমন কৌশলে নির্মিত, যে মধ্যভাগের উৎসটির জলোচ্ছাসশক্তি সর্বোচ্চ। তার দুই পাশের উৎসগুলি ক্রমান্বয়ে নিম্নতর হয়ে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। উৎসগুলির পাদদেশে বিভিন্ন বর্ণের বাতীর সাহায্যে নয়নতৃপ্তিকর ব্যবস্থা হয়েছে।

উদ্যানের শেষ প্রান্তে একটি মন্দির। মন্দিরের উপর আলোর কৌশলে নির্মিত হয়েছে রাষ্ট্রিয় পতাকা। মন্দির মধ্যে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজীর প্রতিমূর্তি। মন্দিরের দুই পাশে কতকগুলি দর্শকদের বসবার আসন।

আমরা একটি আসন দখল ক'রে উদ্যান সৃষ্টির কৌশলগুলি মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলাম। যেন সুন্দরী কাবেরীকে কঠিন প্রস্তরে আবদ্ধ করার প্রয়াস। কয়েক শত ফুট উপর থেকে কাবেরীর জল বেগে নিম্নে পড়ছে। এ যেন অসহায় ললনা দুর্দ্ধর্ষ লম্পটের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় প্রবল আর্তনাদে কঠিন শিলার বুকে আছড়ে পড়ছে। সেই অসহায় নারীর বেদনাকাতর বদনের রূপান্তর দেখার লোভে এই তীব্র বৈদ্যুতিক আলোক সম্পাত। যেন নির্মম অত্যাচারের চরম নিদর্শন।

পাশ থেকে গৃহিণী বললেন—অনেকক্ষণ চা দিয়েছি খেয়ে নাও। অবাক হয়ে দেখবার কি আছে? আলো আর জলের কায়দা। নামেই বাগান। তেমন গাছের শোভাও নেই, ফুলেরও বাহার নেই।

আমরা আরও কিছুক্ষণ এস্থানে বিশ্রাম ক'রে, নন্দরাজ ধর্মশালায় ফিরলাম। তখন রাত্রি ন'টা।

মাইশোর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে শ্রীরঙ্গপত্তম। ট্রেনেও যাওয়া যায়। আমরা পরদিন বাসে শ্রীরঙ্গপত্তম গেলাম।

শ্রীরঙ্গপত্তমের প্রধান আকর্ষণ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির ও নবাব হায়দারআলী ও তাঁর যোগ্য সন্তান অমর শহীদ টিপুসুলতানের সমাধি-সৌধ। শ্রীরঙ্গনাথ

মন্দিরের কিছুদূরে বাস থেকে নামলাম। বাস কণ্ডাক্টার পরামর্শ দিলেন টাঙ্গা নিয়ে মন্দিরে যেতে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও টাঙ্গা পেলাম না। অগত্যা চৈত্র মাসের রৌদ্র অগ্রাহ্য ক'রে মন্দির অনুসন্ধানে অগ্রসর হলাম। কিছুদূরে এসে দেখলাম একটি দীর্ঘ প্রাচীর বেষ্টিত স্থান। তারই অপর দিকে মন্দির চুড়া লক্ষ্য ক'রে সে দিকে এলাম। মন্দির দ্বারে ফুল ও পূজার দ্রব্য বিক্রয় হচ্ছে। ফুল ও পূজার ডালি নিয়ে মন্দির সীমানার ফটক অতিক্রম ক'রে নাটমন্দিরে এলাম। নাটমন্দিরের চতুর্দিকে ছোট ছোট মন্দিরে নানা দেব-দেবীর মূর্তি। একটি রথ ও একটি চতুর্দোল নাটমন্দিরের একপাশে রাখা হয়েছে। মনে হয় উৎসবে এগুলি ব্যবহার করা হয়।
মূল মন্দিরে এলাম। মন্দিরের মধ্যভাগে নারায়ণ, নাগরাজের অঙ্কে অনন্ত শয্যায় শায়িত আছেন। নাগরাজ শত ফণা বিস্তার ক'রে নারায়ণের মস্তকে ছত্র ধারণ করেছেন।
মন্দিরের পশ্চাতে টিপুসুলতানের কারাগার। এই কারাগারে নাকি এক সময় পরাজিত ইংরাজ সৈন্যদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া দেখার মত আর কিছুই নেই। একটি দ্বিতল ভবন। নিম্নে ও দ্বিতলে এক একটি প্রশস্ত হল্। অব্যবহার্য ও সংস্কারহীন অবস্থায় এখনও খাড়া আছে। আমরা একবার উপরে ও একবার নিম্নে এসে দেখলাম।
এরপর এলাম, যে স্থানে বীর সহীদ টিপু ইংরাজের গুলীতে নিহত হন। সামান্য একখণ্ড জমি। তারই পশ্চাতে একটি প্রাচীর গাত্রে একটি লিখিত নির্দেশ দেখলাম, 'এইস্থানে টিপুসুলতান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন'। ভূমি খণ্ডের উপর কয়েকটি গাভী শয়ন ক'রে রোমন্থন করছে! বীর শহীদের চরম সম্মান এই পর্যন্ত। এই স্থানটিতে কোন বেদী কিংবা প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা কি এই স্বাধীন যুগের দেশ নেতারা বিবেচনা করেন নি!
এ স্থান থেকে প্রায় দু' ফার্লং দূরে একটি উদ্যান। তন্মধ্যে কাষ্ঠ নির্মিত একটি দ্বিতল হর্ম্য। মূল্যবান গালিচায় গৃহতল আচ্ছাদিত, নবাবের জীবদ্দশার বহু আলেক্ষ্য দেওয়াল গাত্রে বিলম্বিত। দ্বিতলের হলে টিপুর শেষ স্মৃতির কয়েকখানি করুণ চিত্র দেখলাম, যা প্রতি ভারতবাসীর মনে

দারুণ আঘাত করবে। একখানি চিত্রে টিপুর দুই শিশু পুত্রকে ইংরাজের হস্তে অর্পণ করা হচ্ছে। রাজপ্রাসাদের মহিষী ও অমাত্যগণ সজল নেত্রে দণ্ডায়মান রয়েছেন। চিত্রটি এত করুণ ও মর্মস্পর্শী যে প্রত্যেক দর্শকের চক্ষে অশ্রু আনবে। এই কক্ষটি দেখার জন্য সামান্য পয়সার অনুমতি-পত্র নিতে হয়।

এর কিছুদূরে নবাবের মস্‌জিদ। এ মস্‌জিদটি এখনও ব্যবহারযোগ্য আছে। মস্‌জিদ মধ্যে গিয়ে আমাদের দেখার ইচ্ছা ছিল। সে সময় নমাজের সময় তাই ভিতরে যাওয়ার সুবিধা হয় নি।

এ স্থান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে নবাব হায়দারআলী ও টিপুর সমাধি-সৌধ। প্রশস্ত রাস্তার উপর পুষ্পবৃক্ষ শোভিত একটি উদ্যান। উদ্যানের শেষ প্রান্তে একদিকে একটি মস্‌জিদ অন্যদিকে সমাধি-সৌধ।

একজন চৌকিদার লণ্ঠন হাতে এলেন আমাদের সমাধি বেদী দেখাবার উদ্দেশ্যে। হলের মধ্যভাগে নবাব হায়দারআলী তাঁর প্রিয় পুত্র টিপুকে নিয়ে চির নিদ্রায় মগ্ন আছেন। সমাধি-সৌধের চতুর্দিকে কাল পাথরে নির্মিত বারান্দা। আমরা একবার সৌধটি পরিক্রমা ক'রে বাইরে এলাম।

এর কিছু দূরে আছে কৃষ্ণা-কাবেরী সঙ্গম। আমরা সেই দিকে গেলাম। বেশ ছায়া শীতল পথ। কাবেরী উপকূলে এলাম। স্থানটির দৃশ্য অতি মনোরম। পিক্‌নিকের সুন্দর স্থান। নদী তীরে একটি দেবালয়। এই দেবালয়ের পাশে কয়েকটি বৃক্ষ সমাকীর্ণ ছোট ছোট কুঞ্জ। গ্রীষ্মের দিনে স্নান পরম আরামদায়ক। এক দিক থেকে কৃষ্ণার স্বচ্ছ বারি শিলাখণ্ড বিধৌত ক'রে এদিকে আসছে। অন্য দিক থেকে কাবেরী এসে কৃষ্ণার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এই সঙ্গমে অনেকে স্নান করছেন। অনেকে দেবালয়ের পাশে কুঞ্জে শয্যা রচনা ক'রে আরাম উপভোগ করছেন। অনেকে নদী তীরে রন্ধন করে আহারাদি করছেন।

স্থানটি দেখে গৃহিণী বললেন—আজ ঘেঁটু সঙ্গে থাকলে তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হ'ত। এখানে স্নান ক'রে একটা কুঞ্জে ভাল ক'রে নিদ্রা দিয়ে সন্ধ্যা হ'লে বাড়ী ফিরতো।

এদিকে এসে দেখলাম সঙ্গম স্থানে একটি পাকা স্নানের ঘাট আছে। কাবেরী নদীর অপর কূলে শৈলশ্রেণী যেন কাবেরীর রূপের জৌলুস বৃদ্ধি করেছে। আমরা ঘাটের সোপানে বসে এক এক অঞ্জলী জল মস্তকে দিলাম। এই স্থানে একটি ঝটকা নিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এলাম। ধর্মশালায় ফিরলাম অপরাহ্ণ পাঁচটায়।

সন্ধ্যার পর একবার গেলাম বাজারের দিকে। গৃহিণীর জন্য কিছু ক্রয়ের আবশ্যকে। এ স্থানের প্রধান দ্রব্য চন্দন কাঠ, চন্দনের বোতাম, ছড়ি, সিন্দুর কৌটা, চিরুণী প্রভৃতি সৌখীন দ্রব্য। আর আছে গোলাপ কাঠের নির্মিত খেলনা। গৃহ শয্যার আসবাব। আমার ইচ্ছা ছিল বাড়ীর ঠাকুর ঘরের জন্য নেব একখণ্ড চন্দন কাঠ। একটি দোকানে গিয়ে মূল্য জানলাম, পঞ্চাশ গ্রাম ওজনের একখণ্ড কাঠের মূল্য আঠার টাকা। তাঁরা সরকারের ছাপ দেখিয়ে বললেন—এ বস্তুর অধিক মূল্য নেওয়ার উপায় আমাদের নেই। প্রতি খণ্ডের মূল্য এতে দেওয়া আছে। চন্দনের বোতামের দাম বারো টাকা। সিন্দুর কৌটার মূল্য পাঁচ টাকা। কষ্টে-শ্রেষ্টে গৃহিণীকে একটি সিন্দুর কৌটা কিনে দিলাম।

এখানে সুলভে মহিলাদের একটি প্রিয় বস্তু দেখলাম। ললনাদের ললাট শোভা নানা বর্ণের সিন্দুর। বস্তুটি ফাগের অনুরূপ। গৃহিণী কয়েক প্রকার বিবিধ বর্ণের সিন্দুর বা ফাগ নিলেন। প্রতি প্যাকেটের মূল্য বিশ পয়সা।

আরও কয়েকটি দোকান ঘুরে এলাম রাজপ্রাসাদের সম্মুখে। এ স্থানে কয়েকটি চতুর যুবক প্ল্যাষ্টিকের-চিরুণী নিয়ে, হস্তি-দন্তের চিরুণী ব'লে লোক ঠকাচ্ছে। গৃহিণী আমার নিষেধ সত্বেও এক টাকায় এক ডজন মহীশূরের অকৃত্রিম হস্তি-দন্তের চিরুণী ক্রয় করলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা মাইশোরের পার্শ্বে জঙ্গলে অসংখ্য হাতীর বাস। তারা দেহরক্ষা ক'রে মানুষের উপকারে যে অস্থি দান ক'রে যায়, এগুলি সেই দ্রব্যেই নির্মিত। সেগুলি সযত্নে কলকাতায় এনে বুঝলেন, এ চিরুণীগুলি অকৃত্রিম প্ল্যাষ্টিকে নির্মিত।

চিরুণী ক্রয়ের পর রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এসে গৃহিণী বললেন—উটিতে

এঁদের প্রাসাদ দেখেছি। এখন এঁদের স্বদেশের প্রধান প্রাসাদ দেখতে হবে।

সে ইচ্ছা আমারও ছিল। সংবাদ নিয়ে জানলাম, অনুমতি-পত্র ব্যতীত রাজপুরীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। বিনা মূল্যেই অনুমতি-পত্র পাওয়া যায়। রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎ দিকে মহীশূর ষ্টেটের কার্যালয় ভবন। এক পদস্থ কর্মচারীর নিকট আবেদনে অনুমতি-পত্র পাওয়া যায়। অনুমতি-পত্র দেওয়া হয় প্রাতে ন'টায়। এ সকল তথ্য সংগ্রহ ক'রে ধর্মশালায় ফিরলাম।

পরদিন প্রাতে চা পানের পর গেলাম প্রাসাদ প্রবেশের অনুমতি-পত্রের আশায়। রাজ ভবনের পাশ দিয়ে অর্ধ মাইল পথ গিয়ে পেলাম কার্যালয় ভবন। এ যেন কলকাতার রাইটার্স বিল্ডীং। আরদালিদের নিকট সংবাদ নিয়ে প্রাসাদ দর্শনের অনুমতি দাতার কক্ষের দ্বারে এসে লিখিত নির্দেশ দেখলাম—"বিদেশী পর্য্যটকদের প্রাসাদ প্রবেশের অনুমতি নাই"। সন্দিগ্ধ মনে আবেদন-পত্র লিখে তাঁর কামরায় হাজির হলাম। তিনি সহাস্য বদনে আবেদন মঞ্জুর ক'রে আমাদের লিখিত আবেদন পত্রটি অন্য এক কক্ষে কেরাণী বাবুদের নিকট পাঠালেন। তিনি ছ'খানি যথারীতি মুদ্রিত কার্ডে আমাদের নাম-ধাম টাইপ ক'রে সেই অফিসারের কামরায় পাঠালেন। সেই কার্ডে তাঁর সাক্ষর হওয়ার পর আমাদের হাতে দেওয়া হ'ল। দেখলাম প্রবেশের সময় অদ্য অপরাহ্ন তিনটা থেকে পাঁচটা।

আহারাদির পর গেলাম রাজপ্রাসাদ দর্শনে। ফটক ও প্রাঙ্গন অতিক্রম ক'রে রাজপ্রাসাদের দ্বারে এলাম। প্রাঙ্গনের একদিকে কয়েকটি দেবালয়। সেগুলির দ্বার এ সময় বন্ধ থাকে।

আমরা প্রাসাদ অন্তঃপুরের দ্বারে আসামাত্র এক কর্মচারী এসে আমাদের একটি কক্ষে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন অভ্যন্তরে গেছেন। তাঁদের প্রত্যাগমণের পর গাইড এসে আমাদের পুরীর মধ্যে নিয়ে যাবেন।

কয়েক মিনিট পরে এক গাইড এসে আমাদের অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।

বহু স্থানে বহু রাজপ্রাসাদ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। পুরাণ বর্ণিত

এমন অমরাবতী আর কখনও দেখি নি। হর্ম্যতলে মূল্যবান গালিচা পাতা। পা রাখতে সমীহ হয়। যদি একবার ওই গালিচায় শয়নের অনুমতি পাই গড়াগড়ি দিয়ে দেহকে ধন্য করি। সুবর্ণ রঞ্জিত ফ্রেমযুক্ত দেওয়াল চিত্রগুলি দেখলে চক্ষে ধাঁধা লাগে। উর্ধে বিজলী ঝাড়-বাতিগুলি হীরা, মাণিক-মুক্তার মত ঝলমল করছে। একটি হলে কয়েকটি বৃহৎ তৈল-চিত্র বিলম্বিত রয়েছে। সেগুলি এস্থানে দশহরা বা দুর্গা-পূজার সময় উৎসবে শোভাযাত্রার চিত্র। মনে হয় ফটো থেকে এই সকল তৈল-চিত্র প্রস্তুত হয়েছে। শোভাযাত্রার বহু আসবাব একটি হলে সংরক্ষিত রয়েছে।

দ্বিতলে গেলাম। কি বিস্ময়কর নয়ন মুগ্ধকর চিত্রকলা! মূল্যবান আসন, গালিচা, নানাদেশের আনিত মনোহর আসবাবে প্রাসাদটি অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। এক প্রাক্তন রাজপুরুষের প্রতিমূর্তি দেখলাম। সজীব মূর্তি বলে ভ্রম হয়। সম্মুখের বারান্দায় উপবেশন ক'রে চামুণ্ডা পাহাড়ে মন্দির ললিতাদেবীর প্রাসাদ সমস্তগুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সমগ্র প্রাসাদটি অবলোকন ক'রে কেবল 'কী সুন্দর' ব্যতীত আর কিছুই মুখে আসে না। আমরা প্রাসাদের কর্মচারী বা গাইডকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

এখান থেকে ফিরে মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। অপরিচিত রাস্তা। অনুসন্ধান ক'রে যেতে বেশ সময় লাগল। একটি উদ্যানের মধ্যে মিউজিয়ম ভবন। সামান্য পয়সা দিয়ে প্রবেশ-পত্র নিতে হয়। প্রাচীন নিদর্শন অতি সামান্য। মিউজিয়ম দেখে ফেরার পথে সহরের মধ্যবিত্ত পল্লীর মধ্য দিয়ে পল্লী-বাসীর গৃহসজ্জা দেখতে দেখতে ধর্মশালায় ফিরলাম।

ধর্মশালায় এসে গৃহিণী বললেন—এস্থানে এসে বেশ শান্তি পেলাম। ভাল দেবালয়, সুন্দর ছবির মত সহর। দৈনিক দেড় টাকা কামরা ভাড়া দিয়ে ইচ্ছামত থাকা যায়। ঘেঁটু, শিবাণী কারও দেখা পেলাম না। পরে হয়তো আসতে পারে।

আমরা মহীশূরের মায়া কাটিয়ে মাল-পত্র টাঙ্গায় তুলে ষ্টেশনে এলাম। এখন টাঙ্গা ভাড়া দিলাম এক টাকা।

বাঙ্গালোর

মহীশূর থেকে বাঙ্গালোরের দূরত্ব একশো চল্লিশ কিলোমিটার পথ। রেল পথের উভয় পার্শ্বে নারকেল বাগান আর তালগাছ। স্থানে স্থানে জলা। দূরে ছোট ছোট পাহাড় ও গ্রাম দেখা যায়।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন এসে বাঙ্গালোরে পৌঁছে গেল। আমাদের কামরায় এক ভদ্রমহিলা দু'টি শিশু সন্তান নিয়ে মহীশূর থেকে আসছিলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ষ্টেশনে এসে অপেক্ষা করছিলেন। এখন মহিলাকে দেখামাত্র উল্লাসে প্লাটফর্ম মাতিয়ে তুললেন। মহিলা তাঁর সন্তানসহ আত্মীয় পরিবেষ্টিত হয়ে ষ্টেশনের বাইরে চলে গেলেন।

আমরা দীর্ঘকাল আত্মীয় পরিজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পথে পথে ঘুরছি। আজকের এ দৃশ্যটি আমাদের বাড়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। কি জানি কত দিনে আমরা গিয়ে আবার হাওড়া প্লাটফর্মে নামব আমাদের ভ্রমণ স্পৃহা শেষ ক'রে। আমাদের জন্য কি কেউ আসবে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করতে।

কুলি ডেকে মাল-পত্র নামালাম। তাদের নিকট শুনলাম, ধর্মশালা এ স্থানে নেই। ষ্টেশনের নিকটে একটি যাত্রী নিবাস আছে। ভাড়া সামান্য। কুলির মাথায় মাল-পত্র দিয়ে যাত্রী নিবাসে এলাম। প্রধান রাস্তার উপর দ্বিতল বাড়ী। বাড়ীর সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গন ও পুষ্পোদ্যান। প্রশস্ত বারান্দা বিশিষ্ট পনর বিশটি কামরা। শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা ভাল নয়। বাড়ীখানি বহুদিন সংস্কার অভাবে বাসের অযোগ্য হয়েছে। আমরা দৈনিক তিন টাকা ভাড়ায় একখানি কামরা নিলাম।

ষ্টেশন থেকে একটি প্রশস্ত পথ যাত্রী নিবাসের পাশ দিয়ে সহরের দিকে গেছে। যাত্রী নিবাসের সামনে পথের পার্শ্বে প্রায় পঞ্চাশ ফিটের অধিক এক বিস্তৃত নিম্ন ভূখণ্ডে একটি নূতন কলোনী নির্মাণ হতে দেখলাম। এই নিম্ন ভূমিকে দেখলে মনে হয় পূর্বে এটি লেক কিংবা বৃহৎ জলাশয়

ছিল। সেই স্থানটিকে সমতলে পরিণত না ক'রে এই কলোনী করার তাৎপর্য বুঝলাম না। বর্ষায় এর কি পরিণতি হবে বাঙ্গালোর পৌর-প্রতিষ্ঠানই তা জানেন।

এই নিম্ন ভূখণ্ডের অপর দিকে উচ্চ প্রশস্ত পথ ও সহর। সেই পথের পার্শ্বে বিবিধ হোটেল, লজ, বাজার, বাস ভবন ও কয়েকটি দেবালয় আছে। এই কলোনীর দক্ষিণ ভাগে ষ্টেশনের রাস্তাটি সহরের দিকে গেছে। বাস ও ঝটকা সহরের প্রধান যানবাহন।

যাত্রী নিবাসে দ্রব্যাদি রেখে কলোনীর দক্ষিণ দিকের পথ অবলম্বনে সহরের দিকে গেলাম। যাত্রী নিবাসের সম্মুখ দিয়েও কলোনীতে নেমে সংক্ষিপ্ত পথে সহরে যাওয়া যায়। আমরা সহরে কিছুদূর গিয়ে একটি স্থানীয় দেবালয়ে নারায়ণের সান্ধ্য আরতি দেখলাম। এখানে একটি মিষ্টান্নের দোকান। এ দোকানে সিঙ্গাড়া, কুচুরি, পুরি, মিষ্টান্ন বিক্রয় হতে দেখলাম। যা দক্ষিণ প্রদেশে সচরাচর দেখা যায় না। আমরা এ স্থানে কিছু পুরি ও কালাকাঁদ নিয়ে যাত্রী নিবাসে ফিরলাম।

আমাদের যাত্রী নিবাসের মধ্যে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের হোটেল। ভদ্রলোকের বৃদ্ধা মাতা সেই হোটেলের পরিচালিকা। আমরা এই হোটেলে কখন কখনও চা কিংবা কফি খেতাম। আজ সন্ধ্যার পর সেই হোটেলে এসে বসলাম। হোটেল পরিচালিকা গৃহিণীর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছায় তাঁর নিকটে এসে বসলেন। উভয়ের ভাষা সম্পূর্ণ সতন্ত্র, তত্রাচ আলাপ পরিচয়ে তাঁদের কোন অসুবিধা দেখলাম না।

আমি কিছুক্ষণ ওঁদের কথাবার্ত্তা শুনলাম। উভয়েই হিন্দিতে বাক্যের আদান-প্রদান করছেন। গৃহিণী বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করলেন—হোটেলকা ভাত কয় বাজে মিলেগা ?

তিনি উত্তর দিলেন—দশ ঘণ্টা—এগার ঘণ্টা।

এইরূপ ভাষার মাধ্যমে বৃদ্ধার কয়টি পুত্র, কোথায় পিত্রালয়, কতদিন স্বামী গত হয়েছেন প্রভৃতি বহু তথ্য সংগ্রহ ক'রে ফেললেন। আরও কিছুক্ষণ হয়তো গল্পালাপ চলতো। আজ ট্রেন ভ্রমণে ক্লান্ত থাকায় হোটেল ত্যাগ ক'রে আরামের আশায় আমরা শয্যা গ্রহণ করলাম।

বাঙ্গালোরে শীতের স্থায়ীত্বকাল অতি অল্প। আমাদের যাত্রী নিবাসে কোন কক্ষেই পাখার ব্যবস্থা নেই। আমাদের কক্ষটির একদিকে মাত্র একটি গবাক্ষ। বায়ু প্রবেশের কোন অধিকার নেই। প্রথম অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল গৃহে থাকার পর অসহ্য গরম বোধ করলাম। তাঞ্জোর ষ্টেশনে গৃহিণী একখানি হাত-পাখা কিনেছিলেন। বেডিংয়ে আবদ্ধ থাকায় সেটি দ্বিখণ্ডে পরিণত হয়েছে। তারই এক এক খণ্ড উভয়ে নিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করার বৃথা চেষ্টা করলাম। গৃহে তালা বন্ধ ক'রে বারান্দায় শয়নের প্রস্তাব করলাম, গৃহিণী রাজী হলেন না।

কিছুক্ষণ যন্ত্রণা ভোগের পর গৃহিণীর বাধা অগ্রাহ্য ক'রে বাইরের বারান্দায় এসে বসলাম। গৃহিণীও শাড়ীর অঞ্চলে ঘাম মুছতে মুছতে এসে বললেন—আর একরাত্রি এখানে এ ভাবে থাকলে সুস্থ দেহে দেশে প্রত্যাগমনের সংশয় আছে।

বারান্দায় কিছু দূরে এক যুবক একখানি মাতুর পেতে বালিশ রেখে আমাদের নিকটে এসে বললে—আপনারা কি আজ এসেছেন ?

গৃহিণী বললেন—হাঁ বাবা, আমরা মাইশোর থেকে আজ বিকালে এখানে এসেছি। ঘরে পাখা নেই। টিকতে পারছি না।

যুবকটি কিছু হিন্দি জানে। আমাদের জন্য দুঃখিত হয়ে বললে—আপনারা এ ঘর নিয়ে ভুল করেছেন। দক্ষিণ সাইডে ছোট ছোট ঘর আছে। দু'দিকে দু'টো ক'রে তার জানালা। পাখার দরকার হবে না। কাল সকালে ম্যানেজারকে বলে ঘর বদলে নেবেন। আমি একটা দোকানে কাজ করি। ন'টায় চলে যাই। তার আগে ব্যবস্থা করবেন। আপনাদের মাল-পত্র আমি সে ঘরে তুলে দেব। আজ আপনারা বারান্দায় শুয়ে থাকুন। কোন ভয় নেই আমি সজাগ থাকব।

এর ভরসা পেয়ে বারান্দায় একখানি সতরঞ্চে দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে শুলাম। এদিকেও কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। রাস্তার জোর আলো চক্ষে পড়ায় প্রথমটা নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

পরদিন প্রাতে ম্যানেজারকে অনুরোধ ক'রে ঘর বদল করলাম। ছোট হোলেও আলো বাতাসের অভাব হয় নি। ভাড়া দৈনিক দু'টাকা।

বলা বাহুল্য যুবকটি আনন্দে আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল।

পরদিন প্রাতে বৃদ্ধার হোটেলে চা পানের পর গেলাম সহরের দিকে। পথে এক ভদ্রলোকের নিকট জানলাম এ স্থানের দর্শনীয় রাজ্যপাল ভবন ও বিধানসভা ভবন। প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় নবাব হায়দারআলীর লালবাগ উদ্যান। বাঙ্গালোর সহরের কিছুদূরে আছে বৃহৎ স্টীল ফ্যাক্টরী। লৌহ নির্মিত বিবিধ আসবাব প্রস্তুতের কারখানা। আর আছে ঘড়ির কারখানা। এখন এ ঘড়ি সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আরও কিছুদূরে আছে কোলা স্বর্ণআকর।

তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন—এখন বিধানসভা ভবন ও রাজ্যপাল ভবন দেখে যান। অপরাহ্নে বাসে চলে যাবেন লালবাগ দেখতে।

আমরা বাসে উঠে গেলাম রাজ্যপাল প্রাসাদ দেখতে। সহরের প্রান্তভাগে বাস থেকে নামলাম। এদিকে অধিকাংশ সরকারী অফিস বাড়ী। সম্মুখে টীলার মত উচ্চ স্থানে একটি পুষ্পোদ্যান। তারই পশ্চাতে রাজ্যপাল ভবন। আমরা কিছুক্ষণ উদ্যানটির মধ্যে পরিভ্রমণ ক'রে বিধানসভা ভবনের সম্মুখে এলাম।

এক বিরাট দ্বিতল সৌধ।

আমরা ভবনের দ্বারে এসে দ্বারবানের নিকট বিধানসভা হল্ দেখার প্রস্তাব করলাম। তারা আমাদের পরামর্শ দিলে, অপরাহ্নে এসে সভা-কক্ষ ও সভার কার্যাবলী দেখে যাবেন। এখন দেখা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে আমাদের মত আরও কয়েকজন বিধান-সভা কক্ষ দেখার জন্য হাজির হলেন। তাঁদের চেষ্টায় দ্বারবানকে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় আমরা ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। একজন কর্মচারী আমাদের সঙ্গে এলেন। প্রথমে নিম্নতলে কার্যালয়গুলি দেখে দ্বিতলে গেলাম। সভা-কক্ষে প্রবেশ ক'রে দেখলাম যেন বাদশার দরবার হল্। হলের মধ্যভাগে সুসজ্জিত কাষ্ঠ মঞ্চ, তারই দুই পাশে কয়েক সারি সভ্যবৃন্দের আসন। হলের মেঝে মূল্যবান গালিচায় আবৃত। ছাদে বৃহৎ ঝাড়বাতী। কক্ষের দেওয়াল তৈল-চিত্রে শোভিত। কক্ষের বারান্দায় এসে এদিকের দৃশ্য দেখলাম। এরপর অন্যান্য কক্ষগুলি দেখে যাত্রী নিবাস

অভিমুখে ফিরলাম।

প্রখর রৌদ্রের তাপ সত্বেও পদব্রজে সহর দেখতে দেখতে এলাম। পথে কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট বৃহৎ ভবনগুলির ও রাস্তার পরিচয় নিয়ে এলাম বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সম্মুখে। কয়েকজন মহিলা ছাত্রীকে প্রবেশ করতে দেখলাম।

এই স্থানে গৃহিণী আর একদফা ঘেঁটুর অভাব অনুভব করলেন। তিনি বললেন—ঘেঁটু সঙ্গে থাকলে কোন চিন্তা ছিল না। বাঙ্গালোরের বহু মেয়ে তাকে চেনে। আমাদের থাকার জন্য কোন অভাব হ'ত না। তুমিও তাদের দেখেছিলে, তাদের দিদিমণিদের সঙ্গে আলাপ করেছিলে। তাদের বলে রাখা উচিত ছিল, আমরা কয়েকদিন পরে বাঙ্গালোরে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব ?

বললাম—এ ব্যবস্থা আমার অপেক্ষা তুমিই ভাল পারতে। মেয়েছেলে মেয়েদের সঙ্গে মেলা মেশা করার সুবিধা তোমারই ছিল।

তিনি আক্ষেপ ক'রে বললেন—আমাকে কি ভাল ক'রে লেখাপড়া করতে দিয়েছ, যে ওদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলব।

এরপর আর কোন কথা না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। এ ভবনটির সম্মুখভাগ দেখলে কলকাতার দ্বারভাঙ্গা বিল্ডীং স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের পাশে একটি বাটীতে একটি বিশেষ বিজ্ঞান বিভাগ।

আমরা ভিতরে গেলাম। প্রধান অধ্যক্ষ তখন ছিলেন না। এক ভদ্রলোক আমাদের সাদরে আহ্বান ক'রে উপরে নিয়ে গেলেন। বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্য-রশ্মির দ্বারা যথাযথ সময় নির্দেশ-সঙ্কেত দেখালেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা যাত্রী নিবাসে এলাম।

অপরাহ্নে গেলাম নবাব হায়দারআলীর সাধের লালবাগ দেখতে। বাস থেকে নেমে লালবাগ উদ্যানে প্রবেশ করলাম। দ্বারের দুই পাশে দু'টি উদ্যানের মানচিত্র ও পূর্ণ বিবরণ লেখা আছে। দুই শত চল্লিশ একর লালবাগের পরিধি। উদ্যানের এক একটি মহল অতিক্রম ক'রে দেখছি যেন রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য-পটের পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। নানা দেশ-বিদেশের

বিভীন্ন বৃক্ষের এমন সমাবেশ আর কোথাও দেখি নি। নানা পুষ্প বৃক্ষে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। উদ্যানের এক একটি বিভাগে বিভীন্ন প্রদেশের বহু মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। কৃত্রিম কুঞ্জবন নির্মান ক'রে তন্মধ্যে ঝরণা ও সুন্দরী রমণীর মূর্তি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। প্রতি বিভাগের উদ্যান প্রাঙ্গন যেন সবুজ গালিচায় আবৃত।

সর্বোপরি নবাবের প্রমোদ-কাননটির অপূর্ব শোভা দেখে মুগ্ধ হলাম। একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গন নানাপ্রকার তরুলতায় আচ্ছাদিত ক'রে একটি হলে পরিণত করা হয়েছে। মাথার উপর ঝাড়বাতীও ঢুলছে। এর কিছু দূরে একটি বৃহৎ লেক, কয়েকখানি বোটও লেকের কিনারায় বাঁধা রয়েছে দেখলাম। লেকের অপর পারে আম, নারিকেল প্রভৃতি বিবিধ ফলের গাছ. একটি উদ্যানের শোভা বর্ধনের বা আরামের জন্য আর কিছু প্রয়োজন হয় এমন মনে হয় না।

ফেরার পথে বাস থেকে নেমে বাজারের দোকানগুলি দেখে বেড়ালাম। মিষ্টান্নের দোকান প্রচুর। সেগুলির মালিক মাড়োয়ারী কিংবা গুজরাটী। লজ, হোটেলের মালিক সবই স্থানীয় লোক। অনেকগুলি দেবালয়ও দেখলাম। আরও দেখলাম মহিলাদের আদরের সামগ্রী বাঙ্গালোর শাড়ী। এ শাড়ী কলকাতার বাজারে দেখি নি। প্রকৃত বাঙ্গালোর শাড়ী কি বস্তু বাঙ্গালোরে এসে তা দেখলাম। মূল্য জানলাম এক শত টাকা থেকে উর্দ্ধে। উজ্জ্বল আলোকে ধরলে দৃষ্টি রাখা যায় না।

গৃহিণীকে বললাম—এমন সুন্দর বাঙ্গালোর শাড়ী হয় ধারণা ছিল না।

গৃহিণী বললেন—তুমি ছাই জান। ও শাড়ী বাঙ্গালোরের নয়। মাইশোরে যে সিল্ক ফ্যাক্টরি আছে, এসব শাড়ী সেইখানে তৈরী হয়। খুব সস্তায় পাওয়া যায়। পাছে আমি একখানা কিনি সেই ভয়ে ওদিকে তুমি গেলে না।

বললাম—দুঃখ করো না। এবার লটারির প্রাইজ পেলে এই শাড়ী একখানি তোমাকে উপহার দেব।

এর পর একটি মিষ্টান্নের দোকানে কিছু গজা ও কালাকাঁদ নিয়ে যাত্রী নিবাসে ফিরলাম।

সন্ধ্যার পর আমাদের সাহায্যকারী যুবক এসে আমাদের সংবাদ নিলে। এখন তার নাম জানলাম রমন। সে আমাদের কক্ষের বারান্দায় বসে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত নানা গল্প করলে। কাল আমরা দশটা চল্লিশের ট্রেনে হায়দ্রাবাদ যাব শুনে সে বিশেষ ক্ষুন্ন হ'ল। অনুরোধ ক'রে বললে—ভাল কামরা পেয়েছেন দু'চার দিন থেকে যান। অন্য বৎসর এসময় এত গরম হয় না। এ বৎসর তাড়াতাড়ি গরম পড়েছে। মনে হয় শীঘ্রই বৃষ্টি হবে। এখানে সময় সময় খুব বৃষ্টি হয়।

এরপর সে কোনো হোটেলে খেতে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, আপনারা বারান্দায় বসবেন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি। কাল আমি আপনাদের ট্রেনে তুলে দেব। দোকানে যেতে কিছু বিলম্ব হবে। তা হোক গে।

রমন চলে যাওয়ার পর গৃহিণী বললেন—এই যমপুরীতে মানুষে থাকে। না আছে ভাল দেবালয়, না আছে সমুদ্র, নদী। একমাত্র লালবাগ ছাড়া দেখবার মত কিছুই নেই। যা-ও আছে তা সহরের মধ্যে নয়। যেতে হবে কোন্ দিকে তার ঠিক নেই। মাইশোর থেকে এখানে এসে কোন আনন্দই নেই। বারান্দায় শুয়ে ভাবলাম, গৃহিণীর একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তীর্থপথে বেরিয়ে অবধি অনেক কিছু সংগ্রহ করেছিলাম। বিনা আয়াসে অনেক পেয়েছিলাম। এখন এদিকে এসে যেন সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছি। মাইশোরে যতটুকু উৎসাহ ছিল বাঙ্গালোরের পথে তাও খোয়া গেছে। আর কোন দিন সে সম্পদ ফিরে পাব না। এখন ফিরে গিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে সেই পুরাতন দিনের ছবি। ক্ষীণ স্মৃতি হয় তো কখনও ভেসে উঠবে মানস পটে। সব মরীচিকা!

গৃহিণী বললেন—চলো বুড়ির হোটেলে।

পর দিন প্রাতে আহারের পর আমরা হায়দ্রাবাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। রমন এসে আমাদের ট্রেনে তুলে দিলে।

রমনের যত্নে আমরা ধীরে-সুস্থে নির্দিষ্ট বার্থে বসলাম। আমাদের সম্মুখের বার্থে এলেন এক মাড়োয়ারী মহিলা। সঙ্গে তাঁর চার পাঁচটি সন্তান। সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়স অনুমান পনর ষোল। মহিলার স্বামী এসেছেন

এদের মাল-পত্র তুলে ব্যবস্থা ক'রে দিতে। ভদ্রলোক বাঙ্গালোরের স্থায়ী অধিবাসী। জুয়েলারী ব্যবসা করেন। দেশ মাড়োয়ারের সন্নিকট কোনো স্থানে। দেশে তাঁদের এক আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে স্ত্রী ও সন্তানদের দেশে পাঠাচ্ছেন। আমাদের অনুরোধ করলেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের উপর লক্ষ্য রাখতে। এই সুদূর রেলপথে স্ত্রী ও সন্তানদের নিশ্চিন্তে পাঠাচ্ছেন। ভদ্রলোকের সাহসকে ধন্যবাদ।

মহিলা আমাদের সহযাত্রী হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত। তার পর তাঁরা যাবেন ওয়েষ্টার্ণ রেলপথে খাণ্ডোয়া-আজমীর লাইনে। দূরত্ব ও ঝামেলা কিছুমাত্র কম নয়। মহিলা বেশ মার্জিত ও বুদ্ধিমতী। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সঙ্গে বেশ সৌহার্দ স্থাপন করলেন।

ট্রেন ষ্টেশন ত্যাগ ক'রে চলেছে। শেষ একবার বাঙ্গালোর সহরটি দেখে নিলাম। দু' তিনটি ষ্টেশন অতিক্রম করার পর মহিলাটি ব্যাস্তভাবে কি যেন অন্বেষণ করতে লাগলেন। তাঁর মাল-পত্র পরীক্ষা ক'রে যেন হতাশ ভাবে বসলেন।

প্রশ্ন ক'রে জানলাম, তিনি পথে সন্তানদের আহারের জন্য প্রচুর খাদ্য প্রস্তুত ক'রে একটি চুবড়ী ভর্তি ক'রে রেখেছিলেন। ট্রেনে আরোহণকালে সে বস্তুটির জন্য সতর্ক ছিলেন না। স্বামী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর মাল-পত্রের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন অনুসন্ধান ক'রে দেখলেন সেই খাদ্য বস্তুর চুবড়ীটি তাঁদের সঙ্গে আসে নি। হয়তো তাঁদের বাড়ীতে কিংবা ষ্টেশনের প্লাটফর্মে মালিকের জন্য অপেক্ষা করছে। আক্ষেপ সহকারে আমার গৃহিণীকে বললেন—কাল সারা রাত্রি পরিশ্রম ক'রে পুরী, কচুরী, আলুর দম, চাটনি প্রস্তুত করেছেন। আরও কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন চুবড়ীতে নিয়েছিলেন।

গান্টাকাল ষ্টেশনে সন্ধ্যা হ'ল। এ পথের আকর্ষণীয় দর্শন বস্তু কিছুই নেই। রেল পথের উভয় পার্শ্বে শুষ্ক পাহাড়। অদূরে পল্লীগুলিরও কোন শোভা নেই। রাত্রি আটটার পর দ্রোনাচলম্ জংশনে এসে নৈশ ভোজন সমাধা ক'রে শয্যা নিলাম।

ায়দ্রাবাদ

ঊষার আলোকে নিদ্রাভঙ্গের পর দেখলাম একটি বড় ষ্টেশনে হাজির হয়েছি। ট্রেনের সকল যাত্রী ব্যস্ত হয়ে নামছেন। আমরাও কুলি ডেকে মাল-পত্র নিয়ে নেমে পড়লাম।

এখন চৈতন্যের উদয় হ'ল। এটি কোন্ ষ্টেশন? হায়দ্রাবাদ, না সেকেন্দ্রাবাদ। প্লাটফর্মের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ষ্টেশনের নামটি দেখলাম, এটি হায়দ্রাবাদ না সেকেন্দ্রাবাদ নয়। কাচাগুড়া। সর্বনাশ! আমাদের গন্তব্য স্থানের কোনটিই নয়। গৃহিণীকে আমার নির্বুদ্ধিতার সংবাদ না জানিয়ে কুলিকে বললাম—আমরা যাব হায়দ্রাবাদ। এ ষ্টেশনের নাম দেখছি কাচাগুড়া। এখন হায়দ্রাবাদ যাওয়ার ব্যবস্থা কিরূপে করা যাবে?

কুলি বললে—এই তো হায়দ্রাবাদ। কাচাগুড়া আর হায়দ্রাবাদ একই ষ্টেশন। যাক, বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম।

কুলিকে বললাম—আমরা কয়েকদিন এখানে থাকতে ইচ্ছা করি। যদি ভাল ধর্মশালা থাকে আমাদের সেখানে নিয়ে চলো।

কুলি বললে—ষ্টেশনের নিকটে ভাল ধর্মশালা আছে। ধর্মশালার দরজা এখনও খোলা হয় নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন ধর্মশালার ফটক খোলা মাত্র আপনাদের পৌঁছে দেব।

ষ্টেশনের সামনেই একটি ময়দান, তার পাশেই বাস ষ্ট্যাণ্ড। ময়দানের পশ্চাতে ধর্মশালা। দ্বিতল ভবন। বাটীর বহির্ভাগে নিম্নতলে কয়েকখানি দোকান ও হোটেল। উপরে কয়েকটি ভদ্র পরিবার স্থায়ীভাবে বাস করেন। এই বাটীর পশ্চাৎ দিকে দ্বিতলে থাকেন সপরিবারে বাটীর মালিক। নিম্নের কয়েকখানি কক্ষ ধর্মশালা হিসাবে বিদেশী যাত্রীদের স্থান দেওয়া হয়। কুলিরা আমাদের মাল-পত্র ধর্মশালায় পৌঁছে দিলে। কামরা পেলাম। দৈনিক চার্য মাত্র বারো আনা।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী। আলো বাতাস যুক্ত প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষগুলির পশ্চাতে সতন্ত্র রন্ধনের স্থানের ব্যবস্থা আছে। পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। প্রাঙ্গনের একদিকে একটি ট্যাঙ্কে সারাদিন রাত্রে যে জল সঞ্চয় হয়, সেই জল প্রাতে ও অপরাহ্নে দু'ঘণ্টার জন্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। বাটীর বহির্ভাগের ভাড়াটিয়া পরিবারবর্গও এদিকের ধর্মশালার যাত্রীগণের ঐ সময়ের মধ্যে ট্যাঙ্কের সম্মুখে লাইন দিয়ে জল সংগ্রহ করতে হয়। ধর্মশালার যাত্রীদের কথা সতন্ত্র। বহির্ভাগের ভদ্রলোকদের বারো মাস এইভাবে জল সংগ্রহ দূর্বিসহ ব'লে মনে হয়। কিন্তু এই ভাবেই চলছে।

গৃহিণীর রন্ধনের জল সংগ্রহের পর বাজারের দিকে গেলাম। অন্যান্য সহরের মত এস্থানে সব্‌জি বা মাছ, মাংসের নির্দিষ্ট কোনো বাজার নেই। পথের পাশে কয়েকটি সব্‌জির দোকান, তাতেই আবশ্যকীয় কিছু কিনতে হয়। কয়েকটি ভ্রাম্যমান ঠেলা গাড়ীতে ফল ও সব্‌জি বিক্রয় করতে দেখলাম। শুনলাম, কিছুদূরে সহরের মধ্যে মতি বাজারে বড় সব্‌জি-বাজার আছে। আমরা একদিন সেদিকে গিয়ে দেখেছি প্রায় একই অবস্থা, তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। আজ অধিক দূর যাওয়ার অনিচ্ছায় এই দোকানগুলিতে আবশ্যকমত কিছু নিয়ে ধর্মশালায় ফিরলাম। হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র-প্রদেশের রাজধানী হলেও মাদ্রাজী প্রভাব এস্থানে ম্লান হয়ে গেছে। পথের পার্শ্বে ইড্‌লি-বড়া, কফির দোকান আছে। তারই পাশে আছে ডিম, মাংস, রুটীর দোকান। আমাদের ধর্মশালার অনতিদূরে ভারত লজ নামে একটি হোটেল ও লজ দেখলাম।

সকল প্রকার খাদ্যই এখানে পাওয়া যায়। এই লজের পাশেই একটি মিষ্টান্নের দোকান। আমরা প্রতিদিন সকালে এই দোকন থেকে গরম জিলিপি ও দই নিয়ে যেতাম।

লজের নিকট কয়েকখানি গোলদারী মুদীর দোকান। চাল, চিনি সবই খোলা বাজারে বিক্রয় করতে দেখলাম। পথের পাশে ফল বিক্রেতারা ঠেলা গাড়ীতে তরমুজ, খরমুজা, আপেল, কলা, আঙ্গুর প্রভৃতি বিক্রয় করছে। মূল্য সুলভ মনে হয়। ফল বিক্রেতারা অধিকাংশই মুসলমান। আহারের পর গেলাম সহর পরিভ্রমণে। এপ্রিলের মাঝামাঝি। রৌদ্রের

াপ প্রখর। মধ্যাহ্নে পদব্রজে বিচরণ অসাধ্য। বাসের আশায় র্মশালার নিকট বাস ষ্ট্যাণ্ডে এলাম। বাসের সংখ্যা অতি অল্প। প্রায় াক ঘণ্টা অপেক্ষার পর বাস পেলাম।

ায়দ্রাবাদের একটি দর্শনীয় বস্তু 'চার-মিনার'। বাস কনডাক্টার আমাদের ার-মিনারের সম্মুখে নামিয়ে দিলেন। আমরা মিনারের সম্মুখে এসেও কান হদিস না পেয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম—চার-মিনার কান্ পথে ?

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—চার-মিনার আপনার সম্মুখে। এই কথা বলে তিনি অঙ্গুলী সঙ্কেতে চার-মিনার দেখিয়ে বললেন, ঐ দেখুন—এক দু'ই তিন চার। এরই নাম চার-মিনার। আমি চার-মিনার দেখে হতাস হয়ে মিনারের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এই সেই বিখ্যাত চার-মিনার। আমার ধারণা ছিল তাজমহলের মত কোনো বিরাট সৌধের উপরিভাগে কিংবা পার্শ্বে দীর্ঘ মিনার। তার পরিবর্তে রাজপথের মধ্যভাগে একটি বড় ফটক। আর সেই ফটকের চার কোনে চারটি মিনার। ভাবলাম দেখাই যাক বিখ্যাত বস্তুটি। বৃহৎ ফটকটির মধ্যে প্রবেশ ক'রে উপলব্ধি করলাম এটি তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। ফটকটির ছাদের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম মধ্যভাগে বিরাট গম্বুজ। চমৎকার খিলানের ছাদ। পথের কেন্দ্রস্থলে গেটটিকে দেখে যত সামান্য অনুমান করেছিলাম তা নয়। ফটকের নিম্নভাগে দু'ই পার্শ্বে দু'টি হল্। সেই হলে স্থানীয় পুলিস অফিস।

মিনার আরোহণে চার কোনে চারটি সোপান। উপরে যাওয়ার জন্য সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে অনুমতি-পত্র নিতে হয়। অনুমতি-পত্র নিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। সোপান অতিক্রম ক'রে ফটকের ছাদে এসে দেখলাম এই স্থান থেকে সম্যক হায়দ্রাবাদ সহরটি দেখা যায়। আমি ফটকের ছাদ পর্যন্ত এসেই মিনার শীর্ষে যাওয়ায় নিরস্ত হলাম।

গৃহিণী বললেন—পয়সা খরচ ক'রে টিকিট কিনেছি, উষুল না ক'রে যাচ্ছি না।

তিনি পয়সা উষুল করতে মিনারে উঠতে অগ্রসর হলেন। আমি ফটকের

ছাদ থেকে যতটুকু সম্ভব সহরটির দৃশ্য দেখলাম।

মিনার থেকে নেমে এসে গৃহিণী বললেন—পয়সা দিয়ে মধ্য পথে থেকে গেলে, উপরে উঠলে দেখতে, কী সুন্দর! মিনারের উপর থেকে হায়দ্রাবাদ সহরটি সমস্ত দেখা যায়।

এখান থেকে নেমে মস্‌জিদ দেখতে গেলাম। শুনেছি নিজাম বহু অর্থ ব্যায়ে মক্কার অনুকরণে এই মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। আমরা মস্‌জিদে প্রবেশমাত্র এক গাইড আমাদের নিকটে এলেন। প্রথমে দেখলাম একটি নাটমন্দিরের মত লম্বা হলে বহু সমাধি বেদী। তন্মধ্যে একটি সমাধি বেদী দেখিয়ে গাইড বললেন—মহাসাধু মহাবুব শাহের সমাধি। ইনি ছিলেন সর্প-দংশনের বিখ্যাত রোজা। কোন বিষধর সর্পের দংশনে এঁর নাম জপ করলে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

তারপর নমাজের হল্ দেখলাম। বাদশাহী কায়দায় যেরূপ হওয়া উচিত তার কিছুমাত্র ত্রুটি নেই। হলের ঝাড়বাতিগুলি বেস মূল্যবান বলে মনে হয়। মস্‌জিদ প্রাঙ্গনের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ ক'রে বাইরে এলাম।

এরপর গেলাম শালারজঙ্গ মিউজিয়ম দেখতে। এখানে প্রতি জনের জন্য দেড় টাকা দিয়ে প্রবেশ-পত্র নিতে হয়। আমরা কাউণ্টারে এসে প্রবেশ-পত্র চাইলাম। কাউণ্টারের ভদ্রলোক আমাদের বললেন—পাঁচটায় মিউজিয়ম বন্ধ হয়। এখন অপরাহ্ণ চারটা। এই অল্প সময়ের মধ্যে দেখা সম্ভব নয়। আপনারা কাল প্রাতে এসে দেখে যাবেন। ফিরতে বাধ্য হলাম।

ধর্মশালার নিকট বাস থেকে নেমে ভারত লজে এসে চা ও সিঙ্গাড়া নিয়ে বসলাম।

গৃহিণী সিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়ে বললেন—হায়দ্রাবাদে কি দেখতে এলে? এখানে না আছে ভাল দেবালয়, না আছে দেখার মত বিখ্যাত কিছু। বাঙ্গালোরের অধম জায়গা হায়দ্রাবাদ।

বললাম—মাইশোর থেকে দেশে ফিরতে হলে একটা পথ বেছে নিতেই হবে।

তিনি বললেন—এদিক ছাড়া আর কোন রাস্তা ছিল না?

ালাম—প্রথম রাস্তা, মাইশোর থেকে বাঙ্গালোর না এসে অন্যপথে যেতে । আরসিকিয়ার জংশন। সেখান থেকে পুণা-মেলে, পুণা ও বম্বে হয়ে ওড়া। দ্বিতীয় পথ—মাইশোর থেকে বাঙ্গালোর এসে একদিকে মাদ্রাজ, ার একদিকে হায়দ্রাবাদ। আমরা বম্বে ও মাদ্রাজ দেখেছি, বিখ্যাত াক্তন নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদটাই বা বাদ দেব কেন ?

িনি বললেন—বেশ, কাল মিউজিয়ম আর যেন একটা কি দুর্গ আছে ়ই দেখে সোজা কলকাতা চলো।

ালাম—হায়দ্রাবাদ থেকে বাড়ী যাওয়ার দু'টি পথ আছে। প্রথমটি রঙ্গাবাদ—মানমাদ হয়ে এলাহাবাদ দিয়ে হাওড়া। অন্য পথটি আমাদের াভনীয়। এদিকে একখানি ভাল ট্রেন আছে পূরী যাওয়ার। য়দ্রাবাদ থেকে পূরীর পথে আছে গোদাবরী। এই স্থানের গোদাবরী ারে কভুর নামে একটি সহর আছে। সেখানে আছে গৌড়ীয় মঠ। ত্াহলে কভূরে গৌড়ীয় মঠে থেকে গোদাবরীতে স্নান ক'রে যেতে পারি। ার আছে ওয়ালটিয়ারের পাশে সীমাচলম্। এখানে আছে পাহাড়ের পর বিখ্যাত নৃসিংহ-দেবের মন্দির। তারপর পরম তীর্থ পুরীধাম তো াছেই।

হিণী বললেন—সীমাচলমে নেমে আবার পুরীর রিজার্ভেশনের জন্যে য়ালটিয়ারে এসে থাকতে হবে। অনেক মন্দির তো দেখলাম। সীমাচলমে খন আর নামবার দরকার নেই। নাসিকে গিয়ে গোদাবরীতে স্নান রেছি। এদিকে আর নামতে হবে না। ফেরার পথে দিনের আলোয় াদাবরী দেখা যাবে না ?

লাম—টাইম টেবলে দেখেছি বেলা দশটায় রাজমন্দরী যাবে। রাজ ন্দরীর পর গোদাবরী সেতু।

হিণী বললেন—নাসিকে গোদাবরী দেখেছি। ওখানেও দিনের আলোয় াদাবরী দেখে যাবো, সোজা পুরীই চলো।

লাম—বেশ চলো, আজই ষ্টেশনে গিয়ে পুরীর রিজার্ভেশন করা যাক। তন চার দিনের মধ্যে যাওয়া যাবে কিনা জানি না।

ষ্টশনে গিয়ে রিজার্ভেশন অফিসে সংবাদ নিলাম, পুরী-এক্সপ্রেসের জন্য

যে কোন দিন রিজার্ভেশন পাওয়া যায়। আমরা তৃতীয় দিনের জন্য দু'খানি বার্থ রিজার্ভ ক'রে টিকিট নিলাম।

তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং হলের দিকে এসে লক্ষ্য করলাম, আমাদের পরিচিতা বাঙ্গালোরের মাড়োয়ারী মহিলা সন্তানাদি নিয়ে সারাদিন প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছেন। এঁদের ট্রেন সন্ধ্যায়।

ষ্টেশনের এত নিকটে ধর্মশালা, সেখানে গিয়ে অনায়াসে স্নান-আহার, বিশ্রাম ক'রে সন্ধ্যায় এসে ট্রেনে উঠতে পারতেন। এই সামান্য অভিজ্ঞতার অভাবে সারাদিন ক্লেশভোগ করছেন। বাঙ্গালোরে মহিলার স্বামী আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের দিকে নজর রাখতে। বেইমান বাঙ্গালীবাবুর সকল সময় নজর ছিল নিজের স্বার্থে।

পর দিন প্রাতে দেখলাম আজ হায়দ্রাবাদে নব বর্ষ উৎসব। বাঙ্‌লা দেশে চৈত্রের শেষ। দোকানগুলি ও গৃহস্থ বাটীর দ্বারে আম্রশাখা এবং নিমের পাতা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। আমাদের ধর্মশালার পাশে একটি দেবালয় আছে। দেবালয়টি একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর। মূল মন্দিরে ও নাটমন্দিরে রঙিন পরদা আর আম ও নিম পাতায় সজ্জিত হয়েছে। প্রভাত থেকেই সানাই শুরু হয়েছে। দলে দলে পুরুষ ও মহিলা ফুল ও পূজার দ্রব্য হাতে নিয়ে আসছেন। বালক-বালিকারা পূজা প্রাঙ্গনে আনন্দে হৈ-চৈ করছে। আমার গৃহিণীও স্নান ক'রে পূজা দিয়ে এলেন।

শালারজঙ্গ মিউজিয়ম দেখার অভিপ্রায়ে সত্বর আহারাদি সমাধা ক'রে বাসে উঠলাম। চার-মিনারের কিছুদূরে গিয়ে শালারজঙ্গ মিউজিয়ম পেলাম। প্রবেশ-পত্র নিয়ে প্রথমে নীচের একটি হলে এলাম। এই হল্‌টি শিশু-বিভাগ।

প্রথমে দেখলাম শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত বিবিধ প্রকারের শিশু মূর্তি। ছোট ছোট নানাপ্রকার কাষ্ঠ নির্মিত পুতুল। একটি কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্র পরিকল্পনা ক'রে কাষ্ঠ নির্মিত সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জিত করা হয়েছে।

এরপর ক্ষুদ্রাকারে নৌকা ও জাহাজগুলি দেখলে সত্যিই আনন্দ হয়। বাচ্চারা সঙ্গে থাকলে বিপদে পড়তে হবে। বায়না ধরবে ঐ সকল নৌকা

জাহাজের জন্য। অন্য একটি কক্ষে এসে দেখলাম পুতুলের মেলা। ধাতু ও কাষ্ঠ নির্মিত নানা জীব-জন্তুর মূর্তি। কক্ষের এক অংশ হস্তি-দন্তে নির্মিত অনুরূপ পুতুল ও জীব-জন্তুর মূর্তি। গৃহিণী বললেন—একবার ছাদের দিকে চেয়ে দেখ। এমন ঝাড়লণ্ঠনের বাহার আর কখনো কোথাও দেখ নি।

উপর দিকে চেয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভীত হয়ে গেলাম। দেবালয়ে, মস্‌জিদে, রাজপ্রাসাদে বহু ঝাড়বাতী দেখেছি কিন্তু এমন বিবিধ আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের ঝাড়বাতী আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। দ্বিতলে এসে দেখলাম নানা আকারের হস্তি-দন্ত নির্মিত তরবারির খাপ। চিনের ড্রাগণ মূর্তি। বিবিধ বর্ণে চিত্রিত চায়না ডিস ও আসবাব। একটি কাষ্ঠ নির্মিত শিশু-ট্রেন।

অন্য একটি হলে এসে আমরা উভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। হীরক, পান্না, মুক্তা খচিত আভরণ, কাঁচের আবরণের মধ্যে বড় বড় টেবলের উপর সাজান রয়েছে। ঝক্‌ঝকে সাদা ও রঙিন কাঁচের টুকরো বসান অলঙ্কার পথের ধারে বসে বেচতে দেখেছি তার সঙ্গে এর কোন পার্থক্য বুঝতে পারলাম না।

গৃহিণীকে বললাম—ওসব দেখার কোন প্রয়োজন নেই। বোধোদয়ে বিদ্যাসাগর মশায় বলেছেন, "হীরে কেনা নির্বুদ্ধিতা। একমাত্র কাঁচ কাটা ব্যতীত এ বস্তু কোনো কাজে লাগে না।" তুমি তো পড়েছ বোধোদয়।

গৃহিণী সরোষে বললেন—জীবনে দিতে তো পারলে না এক টুকরো। দেখতেও কি দোষ ?

এরপর এলাম মূল্যবান জরি, ব্রোকেট প্রভৃতি পোষাক ও বস্ত্র বিভাগে। এগুলি কতদিনে নির্মিত জানি না। আজও এগুলি মলিন কিংবা বিবর্ণ হয় নি। দেখলে চক্ষু ফেরান যায় না।

ঘুরতে ঘুরতে এলাম হস্তি-দন্তের নির্মিত গৃহসজ্জা আসবাবের হলে। এগুলি নির্মান কৌশল অপূর্ব। বিশেষ আকর্ষণীয় আইভরি নির্মিত মালাগুলি। এগুলি আদৌ কৃত্রিম বলে মনে হয় না। যেন সদ্য

প্রস্ফুটিত জুঁই বা বেলের মালা।

এই সময় মিউজিয়মের এক কর্মচারী আমাদের নিকট এসে বললেন—এখন বারোটা বাজে। এ স্থানের প্রধান আকর্ষণ ঘড়ি। সেই ঘড়িটি বাজা দেখে আস্থন। পরে এ সকল দেখবেন।

শালারজঙ্গ মিউজিয়মে এক অদ্ভুত ঘড়ি আছে আমরা শুনেছিলাম। দেখার বিশেষ আগ্রহ সত্বেও এদিকে মন দেওয়ায় এতক্ষণ বিস্মরণ হয়েছিলাম। অন্বেষণ ক'রে দ্রুত সেদিকে গেলাম।

এই অদ্ভুত ঘড়িটি সাধারণের দেখবার জন্য একটি প্রশস্ত বারান্দায় ওটিকে রাখা হয়েছে। এর সম্মুখে চল্লিশ পঞ্চাশখানি চেয়ার। দর্শকদের সুবিধার জন্য রাখা হয়েছে। বহু দর্শক পূর্বাহ্ণে সেই আসনগুলি দখল ক'রে বসেছেন। আমরা তাঁদের পশ্চাতে সুবিধামত স্থানে দাঁড়ালাম।

ঘড়িটির দিকে চেয়ে দেখলাম, ঘড়ির পেণ্ডুলামের স্থানে একটি পুতুল প্রতি সেকেণ্ডে একটি হাতুড়ীর আঘাতে সেকেণ্ডের সময় নির্দেশ করছে। তখনও বারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল।

ঠিক বারোটা বাজার সময় নির্দেশে একটি কৃত্রিম ইংরাজ মহিলা ঘড়িটির মধ্যে একটি কক্ষ থেকে অকস্মাৎ আবির্ভাব হ'য়ে একটি হাতুড়ি দিয়ে তার সম্মুখে বিলম্বিত একটি ঘণ্টাতে আঘাত করতে লাগল।

এক, দুই, তিন এইরূপ বারো বার আঘাতের পর তেমনি অতর্কিতে তার কক্ষের দ্বার বন্ধ ক'রে প্রস্থান করলে। ঘড়িটির বিচিত্র নির্মান কৌশল দেখে আমরা সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম।

কৌতূকপূর্ণ ঘড়িটি দেখে একটি কক্ষে প্রবেশ ক'রে দেখলাম, দেশী-বিদেশী প্রখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রাবলী। এ সকল চিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী উপলব্ধি করার শক্তি সাধারণ দর্শকের নেই।

এরপর এলাম শালারজঙ্গ পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ কক্ষে। বহু ফার্সী, আরবি প্রভৃতি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আলমারীগুলির মধ্যে স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। এ সকল পুস্তক পাঠের ইচ্ছা করলে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। আমরা কেবল আলমারীগুলি চোখ বুলিয়ে হলের বাইরে এলাম।

শালারজঙ্গ মিউজিয়ম দেখে এলাম হায়দ্রাবাদ মহাকরণের দ্বারে। ইচ্ছা ছিল ভিতরে প্রবেশ ক'রে বিচার-কক্ষ পরিদর্শন করা। কিন্তু আজ এস্থানে নব বর্ষ উৎসব উপলক্ষে আদালত বন্ধ থাকায় দেখা সম্ভব হ'ল না। মহাকরণ ভবনের কিছুদূরে ওস্‌মানিয়া হস্‌পিটাল ভবনটি দেখে ধর্মশালায় ফিরলাম।

পরদিন আমাদের ধর্মশালার কয়েকজন যাত্রী গান্ধী-ট্যাঙ্ক দর্শনের জন্য উৎসুক হলেন। আমরাও তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। বাসে স্থান পাওয়া গেল না। সকলে পরামর্শ ক'রে গোলকুণ্ডা দুর্গ দর্শনে গেলাম।

প্রথমে বাসে এলাম চার-মিনার। সেস্থান থেকে বাস পরিবর্তন ক'রে দুর্গাভিমুখে গেলাম। কয়েক মাইল দূরে সহরতলিতে এই দুর্গ। পথের দৃশ্য অতি মনোরম। একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে এই দুর্গ। একজন গাইড এলেন আমাদের দেখার সাহায্যে। অধিকাংশ কক্ষ ভগ্নপ্রায়। দুর্গটি এক সময় যে চিত্তাকর্ষক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেক কক্ষের কেবলমাত্র স্তম্ভগুলি বর্তমান আছে। দুর্গের শূন্যকক্ষগুলি পরিদর্শন ক'রে নীচে নামলাম। শুনলাম, দুর্গ সমীপে একদিন ছিল হীরকের আকর। বিশ্ব-বিখ্যাত কহিনূরের জন্ম হয় এই গোলকুণ্ডায়।

প্রায় পাঁচটায় আমরা চার-মিনারের নিকট এসে বাস থেকে নামলাম। এখন বুঝলাম আরও কয়েকদিন এখানে থাকলে হায়দ্রাবাদ দেখার পূর্ণ আনন্দ পেতাম। পদব্রজে বস্ত্রের দোকানগুলি দেখতে দেখতে এলাম আফজলগঞ্জে। এদিকের দোকানগুলি মহিলাদের চরম আকর্ষণীয়। এমন বিপুল রেশম বস্ত্র, মখমল ও ব্রোকেটের সমাবেশ দাক্ষিণাত্যের কোনো সহরে দেখে নি। আমার কিছু মখমল ক্রয়ের ইচ্ছা ছিল আর গৃহিণীর ঝোঁক ছিল রেশমজাত শাড়ীর দিকে। কিন্তু রাত্রে দোকানে তীব্র বিজলী বাতীর আলোকে বর্ণ বিভ্রাট ঘটবে সে কারণে দোকানে প্রবেশ করলাম না। গৃহিণীকে বললাম—কাল সকালে সময় বুঝে একবার এদিকে আসা যাবে।

পরদিন প্রাতে গৃহিণী বললেন—চলো একবার বাজারের দিকে যাই। সন্ধ্যায় ট্রেন। গাড়ীতে রাত্রের জন্য কিছু ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে।

কিছু ফল সঙ্গে রাখা ভাল। আর কোথায় মতিবাজার আছে চলো দেখে আসি।

মতিবাজারের উদ্দেশ্যে গেলাম। আমাদের ধর্মশালা থেকে মতিবাজার প্রায় দেড় মাইল পথ। পদব্রজেই গেলাম। এদিকে ঘন মুসলমান পল্লী। তবে বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

আমরা কিছু ফল নিয়ে ধর্মশালায় ফিরলাম।

অপরাহ্নে কুলি ডেকে মাল-পত্র নিয়ে ষ্টেশনে এলাম।

ট্রেন প্লাটফর্মে হাজির হ'ল। স্লিপার কামরার দ্বারে বার্থ নম্বর ও নামের তালিকা দেখলাম না। ট্রেন কণ্ডাকটারও নেই। মাল-পত্র কামরায় রেখে এক রেল কর্মচারীকে প্রশ্ন ক'রে জানলাম, সেকেন্দ্রাবাদে ট্রেন কণ্ডাকটার আসবেন। সেখানে বার্থ নম্বর জানতে পারবেন।

বললাম – সাধু, সাধু! এখন কুলিদের মজুরী দিয়ে কামরার একপ্রান্তে বসব। তারপর সেকেন্দ্রাবাদে সাহেব এসে কামরার অপর প্রান্তে আমাদের বার্থের নির্দেশ দেবেন। পুনরায় কুলির মজুরী দিয়ে যেতে হবে স্বস্থানে, চমৎকার ব্যবস্থা।

সেকেন্দ্রাবাদে ট্রেন আসতে কণ্ডাক্টার প্রভুর জন্য সতর্ক থাকতে হ'ল। তিনি যথা সময়ে ব্যাগ বগলে হাজির হলেন। তাঁর নিকট বার্থের তালিকায় বার্থ নম্বর জানলাম। ভাগ্যক্রমে আমাদের স্থান পরিবর্ত্তন করতে হয় নি।

রাত্রি প্রায় দশটায় আমরা হাজির হলাম কাজিপেট ষ্টেশনে। বড় জংশন ষ্টেশন। অনেকে এখানে মিল নিলেন। আমাদের সে আবশ্যক ছিল না। গৃহিণী হায়দ্রাবাদ থেকে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা ক'রে এনেছিলেন।

গৃহিণী প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে বললেন—এ কোন ষ্টেশন, অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে?

বললাম—কাজিপেট জংশন।

তিনি বললেন—মাদ্রাজ যাওয়ার সময় আমরা কাজিপেটে এসে মিল নিয়েছিলাম। এখন আবার সেই কাজিপেট। এরপর কি মাদ্রাজ যেতে হবে?

বললাম—না, মাদ্রাজ যেতে হবে না। আমরা হায়দ্রাবাদ লাইন ছেড়ে

এখন হাওড়া-মাদ্রাজ মেন লাইনে এসেছি। মাদ্রাজ মেন লাইন পুরীর পাশ কাটিয়ে খুরদা রোড হয়ে চলে যায়। এ ট্রেন হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেসের মত একেবারে পুরীধামে যাবে।

এরপর বার্থে শয্যা রচনা ক'রে চক্ষু বুজলাম।

যাত্রী কোলাহলে প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে দেখলাম, বিজওয়াদা এসে গেছি। ঊষার আলো প্লাটফর্মে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম প্রায় ছ'টা।

গৃহিণী আগেই উঠেছিলেন। মুখ হাত ধুয়ে আর একদফা শুয়েছেন। বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে এসে আমি চায়ের আদেশ দিলাম।

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে গৃহিণী বললেন—বিজওয়াদা খুব বড় সহর। এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে। নামলেই হতো।

বললাম—ইচ্ছা আমার ছিল, এখানে কৃষ্ণা নদীতে স্নান লোভনীয় আর কি আছে আমার জানা নেই।

এ স্থানে ট্রেন কণ্ডাক্টার বদলী হয়ে নূতন কণ্ডাক্টার আমাদের নাম মিল গ্রাহকদের তালিকায় লিখে নিলেন।

গৃহিণী বললেন—মিল দেবে কোথায় ?

কণ্ডাক্টার উত্তর দিলেন—মিল রাজমন্দরীতে দেওয়া হয়। কিংবা সামালকোটেও পেতে পারেন।

ট্রেন ছাড়ল। গৃহিণী বললেন—রাজমন্দরীতে গোদাবরী দেখতে পাওয়া যাবে বলেছিলে। নৈমিষারণ্যের স্বামিজী রাজমন্দরী মঠের স্বামিজীকে আমাদের জন্য পত্র দিয়েছিলেন নয় ?

বললাম—রাজমন্দরীতে গৌড়ীয় মঠ নেই। মঠ আছে কভূরে। কভূর মঠ থেকে গোদারবী নিকটে। এ ট্রেন কভূরে থামে মনে হয় সাড়ে ন'টায়। রাজমন্দরীতে যায় দশটার কিছু পরে।

কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা এলাম কভূরে। গৃহিণী একবার গবাক্ষের বাইরে চেয়ে দেখলেন যদি মঠ দেখতে পাওয়া যায়। কিছু পরে এলাম গোদাবরীর সেতুর উপর। এ স্থানে গোদাবরীর বিপুল বিক্রম। নদীর উপর বহু নৌকা ভাসছে। দু' একখানা স্টীমারও দেখলাম। অনেকে

নদীকে শ্রদ্ধা ক'রে কিংবা গোদাবরীর বিক্রম দেখে নির্বিঘ্নে সেতু পার হওয়ার প্রার্থনায় দু' চার পয়সা জলে নিক্ষেপ করলেন।

তারপর এলাম সামালকোটে। সামালকোট বেশ সমৃদ্ধশালী নগর। ষ্টেশনও তদ্রূপ। এক্সপ্রেস ট্রেন থামে প্রায় আধ ঘণ্টা। আমরা এখানে মিল পেলাম।

ট্রেন ছাড়ল। আমরা দিবা-নিদ্রা না দিয়ে গবাক্ষ-পথে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে ওয়ালটিয়ারে এসে হাজির হলাম। তখন অপরাহ্ণ চারটা।

গৃহিণী বললেন—একবার খোঁজ নিয়ে দেখ যদি এখানে কোন ভাল খাবার পাওয়া যায়।

প্লাটফর্মে নেমে দেখলাম, বেশ বড় ক্যান্টিন, সব রকম খাবার পাওয়া যায়। গরম পুরী ভাজতে দেখে রাত্রের জন্য কিছু পুরী, ঘুগ্‌নী ও ধোঁকার তরকারী নিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে হাজির হলাম সীমাচলম্ ষ্টেশনে। গৃহিণী বললেন—এখানে নাকি পাহাড়ের উপর শঙ্কর মন্দির আছে?

আমাদের সম্মুখের বার্থের এক সহযাত্রী বললেন—পাহাড়ের উপর মন্দিরে আছেন শ্রীনৃসিংহ দেব ও শঙ্কর পার্ব্বতী মূর্তি। পাহাড় থেকে অতি চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। এ স্থানে একটি বিশেষ সৌখীন দ্রব্য পাওয়া যায় যা অন্যত্র দেখতে পাবেন না। নারিকেল খোলে নির্মিত নানা প্রকার কৌটা, নস্যদানী ও ফুলদানী। এগুলি বেশ আকর্ষণীয়।

নৌপাড়া জংশনে এসে আহারাদি সেরে শয্যা নিলাম।

পুরী ঃ

(সাক্ষীগোপাল—ভূবনেশ্বর - কোণারক।)

শেষ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হ'তে বুঝলাম খুরদা জংশনে এসে গেছি। এর কিছু পরে ট্রেন এসে হাজির হ'ল পুরীধামে। উষার আলো তখনও অস্পষ্ট। দু'খানি সাইকেল রিক্সা ডেকে মাল-পত্র ভাগাভাগি ক'রে তুলে একটিতে গৃহিণীকে বসিয়ে অন্যটিতে নিজে বসলাম। রিক্সাওয়ালাদের আদেশ করলাম 'দেবদত্ত দুধওয়ালা' ধর্মশালায় চলো।

পুরী আমাদের নূতন স্থান নয়। একাধিকবার এখানে এসেছি। ষ্টেশন থেকে একটি প্রধান পথ পুরী সহরের বুকের উপর দিয়ে সমুদ্র তীর স্বর্গদ্বার পর্যন্ত গেছে। সেই পথে মাইলখানেক গিয়ে মন্দির সন্নিকটে পথের দুই পার্শ্বে দু'টি ধর্মশালা। রাস্তার দক্ষিণে গোয়েঙ্কা ধর্মশালা, উত্তর দিকে দেবদত্ত দুধওয়ালা ধর্মশালা। এ দু'টিই ত্রিতল ভবন। সহজেই স্থান পাওয়া যায়। দুধওয়ালা ধর্মশালার সম্মুখভাগে আর একটি নব নির্মিত ধর্মশালা। শেঠ টোলারাম পুরাণমল বাগারী প্রচুর অর্থব্যায়ে সম্প্রতি নির্মাণ করেছেন এই নূতন ভবনটি। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি ধর্মশালা আছে। স্বর্গদ্বারে আছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। সে স্থানেও যাত্রীরা স্থান পেয়ে থাকেন।

মন্দিরের পুরোহিত মধুসূদন সিঙ্গারী আমাদের পৈতৃক পাণ্ডা। মন্দিরের নিকটেই তাঁর বাস ভবন। তাঁর গৃহেও সমাদরে যাত্রীদের স্থান দিয়ে থাকেন। আমাদের কখনও পাণ্ডাভবনে থাকার আবশ্যক হয় নি।

আমাদের বিবাহের কয়েক বৎসর পরে কর্মসূত্রে একবার পুরী এসেছিলাম। গৃহিণীও কান্নাকাটি ক'রে আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। তখন আমরা কর্তা-গৃহিণীর পর্যায়ে পড়ি নি। নবদম্পতিই বলা চলে। গৃহিণীর সঙ্গে সেই আমার প্রথম তীর্থ পথে পদক্ষেপ। সেবার এসে রাজসিকভাবে ছিলাম বি, এন, আর হোটেলে। এখন যার নাম সাউথ ইষ্টার্ণ হোটেল।

আমরা দুধওয়ালা ধর্মশালায় দ্বিতলে একটি কক্ষ পেলাম। গৃহে মাল-পত্র

তোলার পর গৃহিণী বললেন—ঘর বন্ধ কর। মন্দিরে যেতে হবে। ধুলো পায়ে জগবন্ধু দর্শন করতে হয়।

বললাম—ধুলো পায়ে যা দর্শন করা উচিত ছিল তা হয় নি। ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নেমে ধুলো পায়ে রিজার্ভেশন বাবুর চাঁদমুখ দর্শন ক'রে কাজ সেরে আসা উচিত ছিল। বিলম্বে বিপদে পড়তে হবে। চলো মন্দির থেকে বেরিয়ে ষ্টেশনের দিকে যাই।

মন্দির ফটকের পাশে একটি কক্ষে জুতা, জমা রেখে টিকিট নিলাম। এ স্থানে প্রতি জোড়া জুতা জমা রাখতে পাঁচ নয়া পয়সা দিতে হয়।

ফটক অতিক্রম ক'রে মূল মন্দির দ্বারে হাজির হ'লাম। চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠল সেই দারুময় মোহন মূর্তি। যে মূর্তি দেখে চৈতন্য দেব 'এমন রূপ কখনও দেখি নি' ব'লে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন।

মন্দিরের পশ্চাতে গণেশ মন্দিরে এসে আমাদের পাণ্ডা মধুসূদন সিঙ্গারীর সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁকে সকল কথা জানালাম।

তিনি বললেন—এখন ধর্মশালায় বিশ্রাম করুন। যদি ইচ্ছা করেন অপরাহ্নে পুরুষোত্তমের ভোগ পাঠাব। এ বেলায় সামান্য বাসী অন্ন প্রসাদ পাঠাব। পুরীধামে এসে পাঁকাল প্রসাদ মুখে দিতে হয়।

গৃহিণী বললেন—শুনেছিলাম, সরকার হাতে নিয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। অপরাহ্নের পরিবর্তে সকালে দশটার পর ভোগের প্রসাদ পাওয়া যায়। এখন দেখছি প্রসাদ বিতরণের সেই সনাতন রীতি এখনো বজায় আছে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে একখানি রিক্সা নিয়ে রেল ষ্টেশনের দিকে গেলাম, রিজার্ভেশনের উদ্দেশ্যে।

আট দিনের ব্যবধানে পূরী-হাওড়া এক্সপ্রেসে দু'টি বার্থ রিজার্ভ ক'রে ধর্মশালায় ফিরলাম। ধর্মশালায় আমাদের কক্ষের দ্বারে কয়েকজন পুলিস প্রহরীকে দণ্ডায়মান দেখে গৃহিণীকে বললাম—লক্ষণ ভাল নয়। সাত সমুদ্র, তের-নদী পার হ'য়ে পুরীতে এসে পুলিসের সুনজর কেন, বুঝতে পারলাম না।

কক্ষের নিকটে আসতেই তাঁরা সসম্ভ্রমে আমাদের নমস্কার জানিয়ে বললেন—আপনারা আজ এই কক্ষে এসেছেন?

আমি ভীত অবস্থায় মৌন হয়েই ঘাড় নেড়ে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তাঁরা সবিনয়ে নিবেদন করলেন—এখন পুরীধামে মহাপ্রভুর চন্দন-যাত্রা উৎসব চলছে। প্রতি বৈশাখে শুক্ল পক্ষে অক্ষয় তৃতীয়াতে শুরু হয়। শেষ হয় বৈশাখী পুর্ণিমার পর। আমরা উৎসবে মিছিল বার ক'রে থাকি। সে কারণ কিছু চাঁদা ভিক্ষায় এসেছি।

এঁদের মহৎ প্রস্তাব শুনে ধাতস্থ হলাম। গৃহিণীর সঙ্কেতে তাঁদের হাতে একটি টাকা দিয়ে অব্যাহতি লাভ করলাম।

এ যন্ত্রণার এখানেই শেষ নয়। এর পর অপরাহ্নে একদল, সন্ধ্যায় আর এক দল এলেন। আমরা পূর্বেই চাঁদা দেওয়ার উল্লেখ করায় তাঁরা বললেন—ওরা সকালের ডিউটির লোক আমরা মধ্যাহ্নের। আবার সন্ধ্যার পর অন্য এক দল হাজির হলেন এঁরা রাত্রি ডিউটির দল। ক্রমে এঁদের চারি আনা থেকে শুরু ক'রে দশ নয়া পয়সা দিয়ে নিস্কৃতি লাভ করি।

অপরাহ্নে এলাম সমুদ্র সৈকতে স্বর্গদ্বারে। পুরী ভ্রমণে বা জগন্নাথ দর্শনে যে সকল বাঙ্গালী আসেন বৈকালে প্রায় সকলেই সমুদ্র দর্শনে কিংবা, বায়ু সেবনে এই স্থানে সমবেত হন। মনে হয় যেন বাঙ্‌লা দেশেই এসেছি। পুরীর প্রধান আকর্ষণ দু'টি। প্রথম মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন, দ্বিতীয় আকর্ষণ সমুদ্র স্নান বা সমুদ্র তীরে বায়ু সেবন।

আজ এস্থানে কিছু নূতনত্ব লক্ষ্য করলাম। কয়েকজন লোক বাঁক কাঁধে এ্যালুমিনিয়মের ডেকচিতে নিমকি, সিঙ্গাড়া, সন্দেশ, রসোগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন এনে বিক্রয় করছে। সহরের মধ্যে বাঙ্‌লার প্রিয় মিষ্টান্নের দোকানও হয়েছে।

গৃহিণী বললেন—সন্দেশ, রসোগোল্লার আবির্ভাব হয়েছে দেখছি। এর পূর্বে পুরীর মিষ্টান্ন ছিল একমাত্র এস্থানের তৈরী খাজা, মালপো, ঝালনাড়ু।

বললাম—কালের গতিতে আবির্ভাব ও তীরোভাব জগতের নিয়ম এগুলির যেমন আবির্ভাব হয়েছে তেমনি দু'টি প্রধান দ্রব্য অন্তর্ধ্যান হয়েছে

গৃহিণী বললেন সে আবার কি ?

বললাম—এখন দেখছি পাণ্ডারা জজমানের নাম-ধাম খাতায় লিপিবদ্ধ করছেন অফিসের মত রেজিষ্টার খাতায়। পূর্বে পাণ্ডারা জজমানের নাম

তীর্থ প

ধাম লিখতেন সুচের সাহায্যে তাল পাতায় এক প্রকার সাঙ্কেতিক অক্ষরে। এখনকার ছেলেরা সে লেখা পরিত্যাগ করেছে। আর সরে গেছে মোটা কাগজের উপর কিংবা কাপড়ে হাতে আঁকা জগবন্ধুর মূর্তি। মনে হয় প্রিন্টিং মেসিন তাদের অন্ন মেরে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

পরদিন প্রাতে গেলাম মন্দিরে। মূল মন্দির ব্যতীত মন্দির সীমানায় অন্যান্য যে মন্দির ও বিগ্রহ আছেন পাণ্ডা মশায় প্রথমে সেগুলি দর্শনে নিয়ে গেলেন। সত্যনারায়ণ, গণেশ মন্দির, অক্ষয় বট, নৃসিংহদেব, যমেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটি বিগ্রহ দর্শনের পর এলাম রৌহিণ কুণ্ডের নিকটে। এ কুণ্ডের জল অতি পবিত্র। এ সম্বন্ধে বহু আখ্যান আছে। আমরা সেই পুত-বারি এক অঞ্জলি মস্তকে দিয়ে বিমলা দেবীর মন্দিরে এলাম। একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে উৎকলে এটি একটি পীঠস্থান। এ স্থানে সতীর নাভি পড়েছিল এইরূপ আখ্যান আছে। আমরা বিমলা দেবীর পূজার পর মূল মন্দিরে এলাম।

তখন মন্দিরে প্রথম পূজা সমাধা হয়েছে। এ পূজা প্রত্যুষে প্রথম মন্দির দ্বার খোলার পর, ভগবানের জাগরণ, দন্তধাবন, বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি হয়। এ সময় সাধারণ দর্শকের প্রবেশ অনুমতি দেওয়া হয় না। মন্দির মধ্যে এ সকল দর্শনে পূর্বদিনে প্রত্যেকের জন্য এক টাকা জমা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি-পত্র নিতে হয়।

এ স্থানে 'আটকিয়া' বাঁধা একটি বিশেষ রীতি আছে! পাণ্ডারা বলেন—আটকিয়া বাঁধা টাকার সুদে প্রত্যহ জগন্নাথের ভোগ দেওয়া হয়। আটকিয়া বাঁধা টাকার পরিমাণ দেড় শত থেকে পাঁচ হাজার। সাধারণ মধ্যবিত্ত যাত্রীরা সাধ্যমত ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

এখন পাণ্ডা মশায় আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন ভগবানের বেদীর সম্মুখে। চার ফুট উচ্চ, ষোল ফুট দীর্ঘ ও তের ফুট প্রস্থ বেদীর উপর জগন্নাথ ও বলদেব আছেন, মধ্যভাগে আছেন ভগ্নি সুভদ্রা দেবী। প্রবাদ, এক লক্ষ শালগ্রাম শীলা দিয়ে এই বেদী নির্মিত হয়, বেদীর নাম রত্ন বেদী। আমরা বেদী স্পর্শ ক'রে ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে মন্দিরের বাইরে এলাম।

পাণ্ডা মশায়কে আজ অপরাহ্নে আমাদের জন্য ভোগের প্রসাদ পাঠাতে

অনুরোধ ক'রে এলাম আনন্দ বাজারে। অন্যান্য স্থানে সাধারণ শাক-মাছের বাজারের মত এ বাজারে ভোগের প্রসাদ বিক্রয় হয়। জাতিভেদ বিচার না থাকায় বাজারের বিক্রেতাদের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। আনন্দ বাজারের পার্শ্বে একটি নব নির্মিত একতল ভবন। শুনলাম রাজ্য সরকার ভোগের প্রসাদ আহারের জন্য এই কক্ষ নির্মাণ করেছেন।

গৃহিণী বললেন—সরকার হাতে নিয়ে উন্নতির মধ্যে এইটুকুই দেখলাম। মন্দির সীমানার মধ্যে ভোগ রন্ধন গৃহ। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। আমরা ইতিপূর্বে রন্ধন কক্ষের পাশে একটি অলিন্দ দিয়ে রন্ধন ব্যবস্থা দেখেছি। এক একটি চুল্লিতে উপরি-উপরি আট দশটি মৃত্তিকা নির্মিত হাঁড়িতে এক সঙ্গে রন্ধন হয়। (ইক-মিক কুকারের ব্যবস্থায়)

মন্দিরের উত্তর ফটক অতিক্রম ক'রে গেলাম লক্ষী বাজারে। এটি এ স্থানের একটি প্রসিদ্ধ বাজার। লক্ষী বাজারের উত্তর দিকের রাস্তা ধরে গেলাম মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর ও মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব দর্শনে। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এলাম সরোবর তীরে। চতুর্দিকে ইষ্টক বাধান একটি বৃহৎ সরোবর। সরোবরের মধ্যভাগে একটি মঞ্চ। সরোবরের দক্ষিণ দিকে মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দির দ্বারে প্রস্তর নির্মিত একটি নন্দী বা বৃষ মূর্তি। আকারে ছোট। মন্দির অভ্যন্তর ঘন অন্ধকার। মন্দিরের এক পুরোহিত একটি প্রজ্জলিত প্রদীপ হাতে নিয়ে আমাদের মন্দির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

মন্দিরে পূজার পর একখানি রিক্সা নিয়ে গেলাম গৌড়ীয় মঠে। আমাদের পূর্ব পরিচিত স্বামিজী শ্রীমদন মোহন মহারাজ মায়াপুর বদলী হয়েছেন। তাঁর স্থানে রয়েছেন শ্রীঅনন্ত কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মহাশয়। আমাদের পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলেন। আজ মধ্যাহ্নে ভোগের প্রসাদ আহারের নিমন্ত্রণ করলেন।

গৃহিণী বললেন—ভালই হ'ল। এ বেলা এখানে প্রসাদ পাওয়া যাবে। রাত্রে জগন্নাথের ভোগে আজকার দিন চলে যাবে। চলো এখন সমুদ্র স্নানে যাই। একজন নুলিয়াকে আট আনা পারিশ্রমিক দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে তীরে উঠলাম।

সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে গৃহিণী বললেন—এত জায়গায় সমুদ্র দেখলাম এমন শোভা আর কোথাও নেই। ত্রিবেন্দ্রামে 'কব্‌লেম বীচ'এর কাছে হার মানে। তবে মনে হয়, পূর্বের মত সমুদ্রের ঢেউয়ের জোর অনেক কমে গেছে। সে রকম গর্জনও আর নেই।

আহারের বিলম্ব থাকায় একখানি রিক্সা নিয়ে গেলাম পুরীর বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি দেখতে। প্রথমে গেলাম নিমাই চৈতন্য মঠে। এ স্থানে মহাপ্রভুর কাষ্ঠ-পাদুকা ও একখানি জীর্ণ উত্তরীয় তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ অতি যত্নে রক্ষিত আছে। মঠের এক দিকে একটি অন্তঃসার শূন্য বকুল বৃক্ষ। এর নাম সিদ্ধ বকুল।

এই বৃক্ষটি কেবল বল্কলের সাহায্যে জীবিত আছে। বিপরীত ভাগে গম্ভীরা গ্রন্থাগার।

এরপর বিদুরাশ্রম, কানপাত হনুমান ও সুদাম পুরী দেখে শঙ্করাচার্য্যের মঠে এলাম। এখানে শঙ্করাচার্য্যের একটি প্রস্তর মূর্তি আছে।

এরপর গেলাম অন্যান্য স্থানগুলি দর্শনে। পথিমধ্যে রাজবাড়ীর নিকটে নির্মিত হচ্ছে তিনখানি রথ।

গৃহিণী বললেন—রথের এখনও তিন মাস বাকী। এখনই বিরাট কাঠ এনে রথ তৈরী আরম্ভ হয়েছে। এ রকম মজবুত রথ এক বৎসর করলে বেশ কিছু দিন চলে যায়। প্রতি বৎসরের নূতন রথ নির্মাণের কি প্রয়োজন। আর তিনখানা রথের জন্য এত চাকা কেন ?

বললাম—রথের সময় আসা ভাগ্যে ঘটে নি। দেখিও নি। শুনেছি জগন্নাথের রথের ষোল চাকা। বলদেবের রথ চৌদ্দ চাকায়। আর সুভদ্রার রথ বারো চাকায়।

কিছু দূরে এসে দেখলাম একটি বিরাট উদ্যান। এই উদ্যানে জগন্নাথ দেবের সঙ্গে রুক্মিনী দেবীর বিবাহ হয়। উদ্যানটির নাম জগন্নাথ বল্লভ।

আরও কিছু দূরে নরেন্দ্র সরোবর। প্রতি বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়ায় যে চন্দন যাত্রা উৎসব হয় সেই সময় প্রতি অপরাহ্লে, মন্দির থেকে বিগ্রহকে শোভা যাত্রা ক'রে এনে এই সরোবরে নৌকা বিহার, পূজা-আরতি ও দেব দাসীর নৃত্য হয়ে থাকে। আমরা একদিন শোভা যাত্রার সঙ্গে এসে

নরেন্দ্র সরোবরে চন্দন উৎসব দেখেছিলাম।

এরপর গেলাম পরম বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠে। এটি একটি পুষ্প কানন বিশেষ। মধ্যভাগে সমাধি মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দিরটি দেখলাম। তার বিপরীত ভাগে এঁর প্রধান শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর মঠ। স্থানটি বেশ নির্জন শান্তিদায়ক।

এখন এলাম পুরীর সহর সীমানার প্রান্তভাগে। দেখলাম আঠার-নালা নামে কয়েকটি জলা। সেগুলির জল অব্যবহার্য। পূর্বে ছিল কোন নদী, এখন বদ্ধ জলায় পরিণত হয়েছে। জলার পাশে পাশে কৃষি ক্ষেত্র। যার নাম লক্ষ্মী জলা।

এরপর এলাম গুণ্ডিচা বাড়ী বা অন্নপূর্ণা মন্দির। এটি মহাপ্রভু জগন্নাথের মাসীর বাড়ী নামে খ্যাত। মন্দির সীমানায় দুই পাশে দু'টি ফটক। জগন্নাথ রথে আসেন এই মন্দিরে। তাঁকে রথ থেকে নামিয়ে একটি ফটক দিয়ে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। রথের কয়েক দিন পরে পুণর্যাত্রার দিন নিয়ে যাওয়া হয় অন্য একটি ফটক দিয়ে।

মূল জগন্নাথ মন্দিরের মত এ স্থানেও মাসীর মন্দিরের সম্মুখে একটি অনুরূপ বেদী আছে। এই বেদীতে বলদেব, সুভদ্রা দেবী ও জগন্নাথকে কয়েক দিন স্থাপনা করা হয়। এখন সে বেদীটি শূন্য। এ মন্দিরেও রান্না বাড়ী প্রভৃতি সবই আছে। রথের সময় সেগুলি ব্যবহার হয়। এই মন্দির সীমানায় প্রবেশের জন্য দশ নয়া পয়সা দিয়ে প্রবেশ অনুমতি নিতে হয়।

মন্দির সীমানার মধ্যে একটি কাঁচের ঘরে কয়েকটি মৃত্তিকা নির্মিত দেব মূর্তি আছে। সেগুলি দর্শনের জন্য দশ নয়া পয়সা দিতে হয়। এই কাঁচের কক্ষটির নাম দ্বারাবতী।

এর কিছু দূরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এটি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নাম অনুসারে এই সরোবরের নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এ সম্বন্ধে পাণ্ডাদের নিকট এক বিরাট উপাখ্যান শোনা যায়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবগণের সাহায্যে এই স্থানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই সরোবরের তীরে নারায়ণ বিগ্রহ আছেন। সঙ্কল্প ক'রে সরোবরের জল মস্তকে দিয়ে এক অঞ্জলি জল সেই মন্দিরের বিগ্রহের পদে দিয়ে পূজা বিধি।

সেখান থেকে ফিরলাম গৌড়ীয় মঠে ভোগের প্রসাদের আকর্ষণে। আহারের পর নাটমন্দিরে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে এলাম স্বর্গদ্বারের সমুদ্র তীরে। গৃহিণী কয়েকগাছা শাঁখের মালা ক্রয় ক'রে সমুদ্র তীরে বসে এগুলির মূল্যের আধিক্যের বিচার করতে বসলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বাড়ীর ছেলেদের জন্য হরিণের চামড়ার জুতা ও মোষের সিংয়ে নির্মিত কয়েকগাছি ছড়ি, ধূপ-দানী ও ফুল-দানি লওয়ার। আমি বাধা দিলাম।

এই স্থানে গৃহিণী তাঁর এক বন্ধু আবিষ্কার করলেন। এক গৌরবর্ণা প্রৌঢ়া মহিলাকে দেখিয়ে বললেন—এঁর বাপের বাড়ী কলকাতায় শ্যাম-বাজারে। বাড়ী বলাগড়ে। এখন এখানেই থাকেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখলাম তিনি শিক্ষিতা ও মার্জিতা মহিলা। এইটিই এঁর আসল পরিচয় নয়। জানলাম তিনি এক বিচক্ষণা হোটেল পরিচালিকা। তাঁর বৃহৎ বাড়ীর নাম 'রেণুকা ভবন'। সমুদ্রতীর থেকে তাঁর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তৎসংলগ্ন হোটেলের নাম 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। অফিসের কার্য পরিচালনা করেন মহিলার স্বামী। অন্য যাবতীয় কার্য পর্যবেক্ষণ করেন মহিলা নিজে।

আমরা ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে দু'দিন এঁর আলয়ে ছিলাম। সুলভে এরূপ আহার ও ভাল বাসস্থান পুরীতে আর পাওয়া যায় কিনা জানি না।

স্বর্গদ্বার থেকে ফিরে ধর্মশালায় এসে দেখলাম পাণ্ডা মহাশয়ের ছড়িদার আমাদের জন্য প্রসাদ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

পরদিন স্বপাক ভোজনের ইচ্ছায় লক্ষ্মী বাজারে গেলাম। আবশ্যক মত কিছু সব্‌জি নিয়ে ধর্মশালায় ফিরলাম।

অপরাহ্নে গৃহিণীর ইচ্ছায় গেলাম চক্রতীর্থ সমুদ্রতীরে। এখানে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধান্তে বালুকার পিণ্ড দেওয়া বিধি। আমরা সোনার গৌরাঙ্গ ও বীর হনুমান মন্দির দর্শন ক'রে মালপো ও ছানার পোলাও নিয়ে ধর্মশালায় ফিরলাম।

রাত্রে গৃহিণী প্রস্তাব করলেন—এ ধর্মশালায় তিন দিন কেটেছে। এ কয়দিনে এস্থানের যতটুকু দেখা সম্ভব তা দেখা হয়েছে। এইবার চলো কাল সকালে সাক্ষিগোপাল দেখে ভুবনেশ্বরে যাই।

পরদিন পাণ্ডাগৃহে ট্রাঙ্ক ও রন্ধন সরঞ্জাম রেখে একপ্রস্থ বেডিং ও কিছু আবশ্যকীয় দ্রব্য সঙ্গে নিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এলাম। কিছু পরেই সাক্ষী-গোপালের বাস পেলাম।

সাক্ষীগোপাল মন্দিরের সন্নিকটে বাস থেকে নামলাম। কয়েকজন পাণ্ডা এলেন আমাদের সাহায্যে। মন্দিরের পাশে একটি ছোট পুকুর। এই পুকুরে সংকল্প ক'রে স্নান ও মন্দিরে পূজা বিধি। আমরা স্নান করতে রাজী হলাম না।

পাণ্ডারা ব্যবস্থা দিলেন স্নানের আবশ্যক নেই। পুকুরের জল এক অঞ্জলি মস্তকে দিলেই হবে কিন্তু সংকল্প করতেই হবে।

ঘাটের একটি ধাপে বসে সংকল্পের মন্ত্র পাঠ আরম্ভ হ'ল। শেষ ক'রে দক্ষিণা গ্রহণ ক'রে দ্বিতীয় দফা সংকল্প শুরু হ'ল; এরপর তৃতীয় দফা। এঁদের সংকল্প ব্যবস্থায় আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। পরিশেষে কোনরূপে আমাদের নিষ্কৃতি দিয়ে মন্দিরে আনলেন।

মন্দিরে পূজা শেষ হ'ল। কালো কষ্টি-পাথরের বিগ্রহ দেখলে প্রকৃতই ভক্তির উদয় হয়। মূল মন্দিরে পূজার পর আরও কয়েকটি বিগ্রহের সম্মুখে ফুল-তুলসী দিয়ে মন্দিরের বাইরে এলাম।

পাণ্ডা মহাশয় বললেন—মন্দিরের পশ্চাতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে সাক্ষী-গোপালের কাহিনী শুনতে। আমরা তাঁর মুখে সাক্ষীগোপালের পুরাণ কাহিনী শুনলাম। ভগবান নাকি এক ব্রাহ্মণের অনুরোধে বৃন্দাবন থেকে পুরী চলেছিলেন কোন এক বিতণ্ডার সাক্ষী হয়ে। তিনি ব্রাহ্মণের পশ্চাতে ছিলেন। প্রতিজ্ঞা ছিল পশ্চাৎ ফিরে না দেখা। কিন্তু এই স্থানে ব্রাহ্মণ সন্দিহান হয়ে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিমাত্র তিনি আর অগ্রসর না হয়ে এই স্থানে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মণের সাক্ষীরূপে এসেছিলেন, এই কারণে এঁর নাম সাক্ষীগোপাল। মন্দির সীমানার বাইরে এসে দেখলাম স্থানটি বেশ নির্জন। কয়েকটি পুরাতন ধর্মশালাও আছে। এস্থানে নারিকেল কুঞ্জ ও নারিকেলের গুদাম দেখলে কেরালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমারা একটি দোকানে চা খেয়ে পরবর্ত্তি বাসে ভুবনেশ্বর যাত্রা করলাম। ভুবনেশ্বরে যোগীন পাণ্ডা আমাদের পূর্ব পরিচিত পাণ্ডা। দুধওয়ালা ধর্মশালার

দ্বারে যোগীন পাণ্ডার সাক্ষাৎ পেলাম। আমাদের ধর্মশালায় পৌঁছে দিয়ে বললেন—এখন আর মন্দিরে যাওয়ার আবশ্যক নেই। কাল সকালে মন্দিরে পূজাদি করবেন। একটু পরে অন্নভোগ প্রসাদ দিয়ে যাব। আহার ক'রে বিশ্রাম করুন। বলা বাহুল্য এখানে বেলা এগারটার মধ্যেই ভোগের প্রসাদ পাওয়া যায়।

অপরাহ্নে একখানি রিক্সা নিয়ে গেলাম উদয়গিরি, খণ্ডগিরি দেখতে। ভুবনেশ্বর সহরের পশ্চিমে চার মাইল দূরে দু'টি পাহাড়, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি নামে খ্যাত।

পাহাড়ের সানুদেশে রিক্সা রেখে রিক্সাওয়ালা আমাদের পাহাড়ের উপর গিয়ে দেখতে বললে। এক শত আশি ফিট উচ্চ এই পাহাড়। অধুনা রাজ্য সরকার যাত্রীদের সুবিধার জন্য সোপান নির্মাণ করেছেন। ঢালু পথও আছে। পাশাপাশি দু'টি পাহাড়ে কতকগুলি গুহা। এগুলির লিখিত কোন নির্দেশ নেই। পাহাড়ের পশ্চাৎভাগে অনুরূপ কতকগুলি গুহা। এই গুহাগুলিতে কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি দেখলাম। মনে হয় এগুলি বুদ্ধ কিংবা জৈন তীর্থাঙ্করদের মূর্তি। গুহার সম্মুখভাগে স্থাপত্য শিল্পগুলি অভিনবত্বের দাবী রাখে।

পাহাড় থেকে নেমে সেই রিক্সাতেই গেলাম নব রাজধানী ভুবনেশ্বর দেখতে। দূর থেকে যতটা আকর্ষণ ছিল সহরের মধ্যে গিয়ে তাদৃশ কিছু দেখলাম না। সহরের একদিকে এরোড্রাম। তার পরেই কৃষি শিক্ষা ভবন, রেডিও আরও কয়েকটি সরকারী ভবন। পথিমধ্যে আছে স্বর্গীয় গোপবন্ধু দাসের মর্মর মূর্তি। একটি জমকাল বাজার। সাধারণ বাসভবনগুলির কোন শোভা নেই। কয়েকটি মোটর গ্যারেজ ও কারখানা ব্যতীত কোন উন্নত ধরণের ফেক্টরী দেখলাম না।

এরপর এলাম কেদারেশ্বর গৌরীদেবীর মন্দির সীমানায়। পূর্বকার বহু খ্যাত দুধ-কুণ্ডাটি যেন শ্রীহীন অবস্থায় এসেছে। জলের বর্ণ আর তাদৃশ দুধের বর্ণ নেই। পূর্বে এই দুধ-পুকুরের জল পানে উদরাময় রোগী রোগমুক্ত হতেন। শুনলাম অধুনা দুধ-কুণ্ডার জলের সে গুণ বিলুপ্ত হয়েছে।

সন্ধ্যায় ভুবনেশ্বরের আরতি দেখে ধর্মশালায় ফিরলাম। পাণ্ডা আমাদের

জন্য ছানার মালপো ও কলার পায়েস প্রসাদ দিয়ে গেলেন। এটি এস্থানের উপাদেয় খাদ্য বলে মনে হয়।

পরদিন প্রাতে গেলাম ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ মন্দিরে। এ মন্দিরের উচ্চতা এক শত সাতাশ' ফুট। মন্দির গাত্রের স্থাপত্য শিল্প পুরীর মন্দিরের অনুরূপ। প্রথম মন্দির সীমানায় দেউল জগমোহন ও গণেশ মুর্তি দেখে নাটমন্দিরে এলাম। মূল মন্দিরে লিঙ্গরাজের পূজার পর বাইরে এলাম। একটি দোকানে চা পান ক'রে গেলাম গৌড়ীয় মঠের দিকে। স্বামিজীর দর্শন পেলাম। তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন কিছুদূরে কপিলেশ্বর মন্দির দর্শন ক'রে আসুন। কয়েকবার ভুবনেশ্বর এসেছি কিন্তু এ মন্দিরের হদিস জানা ছিল না। তিনি পথের নির্দেশ বলে দিলেন।

আমরা প্রধান রাস্তা ছেড়ে গ্রাম্য পথে অগ্রসর হলাম। এ দিকটা বেশ গ্রাম্য পরিবেশ। পল্লীর মেয়েরা ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটছেন। গৃহিণী তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে এঁদের সন্তোষ বিধানার্থে অনাবশ্যকে কিছু চিঁড়ে নিলেন। এক মাইলের অধিক পথ অতিক্রম ক'রে কপিলেশ্বর মন্দির সীমানায় এলাম। ভুবনেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ উচ্চ মন্দির। একদিকে দুধ-পুকুরের মত চতুর্দিক পাথরে বাঁধান একটি ক্ষুদ্র সরোবর। অনেককে সেই পুকুরে স্নান করেতে দেখলাম।

একজন পাণ্ডা এসে আমাদের পূজা করালেন। তিনি লিঙ্গরাজের ভোগের জন্য অনুরোধ করায় গৃহিণী স্বীকৃত হলেন। একটি দোকানে গিয়ে মালসা, চা'ল প্রভৃতি ক্রয় ক'রে দিলাম মোট মূল্য তিন টাকা।

এরপর লিঙ্গরাজের চরণামৃত মুখে দিয়ে ধর্মশালায় ফিরলাম।

পুরীর নরেন্দ্র সরোবরের মত এস্থানেও একটি বৃহৎ সরোবর আছে। এর মধ্যভাগেও মঞ্চ আছে। এটির নাম বিন্দু সরোবর। শুনলাম এই সরোবরের জলে দেবালয়ে নিত্য পূজা হয়। এ সরোবরটি আমাদের ধর্মশালার সম্মুখে।

আহারের পর স্থানীয় কয়েকটি মন্দিরে গেলাম। প্রথমে গেলাম পরশু-রামেশ্বর মন্দির। পরে স্বর্ণ-জলেশ্বর। ক্রমে লক্ষণেশ্বর, ভরতেশ্বর মন্দির প্রভৃতি। বিন্দু সরোবরের উত্তর তীরে পার্শ্বদেবতার মন্দির দেখে ধর্মশালায়

ফিরলাম।

সন্ধ্যার পর গৃহিণী বললেন—এদিকে চিল্কা হ্রদ একটি প্রধান দর্শনীয় বস্তু। নিকটেই চিল্কা। চলো কাল দেখে আসি।

আমাদের চিল্কা যাওয়ার প্রস্তাব শুনে যোগীন পাণ্ডা মশায় বললেন—চিল্কার অপূর্ব শোভা। তীরে দাঁড়িয়ে চিল্কার রূপ দেখে বিশেষ আনন্দ পাবেন না। একখানি ডিঙ্গি নিয়ে কিছুক্ষণ চিল্কা হ্রদে বিহার করবেন। পরম আনন্দ পাবেন। ওখানে অনেক জেলের বাস। একজন ডিঙ্গি-ওয়ালাকে ডেকে নেবেন। দু'তিন টাকা ডিঙ্গি ভাড়া নেবে। কয়েক ঘণ্টা বেড়িয়ে আসবেন।

তিনি আরও বললেন—সকালে আটটায় ট্রেন। চিল্কা দেখতে গেলে চিল্কা ষ্টেশনে নামবেন না। বেলুগাঁয়ের টিকিট নেবেন। সাড়ে দশটায় বেলু-গাঁয়ে নামবেন। চিল্কা দেখে মাদ্রাজ-হাওড়া জনতায় ফিরবেন। দু'টোয় বেলুগাঁয়ে উঠবেন। ভুবনেশ্বরে নামবেন সাড়ে চারটায়।

বললাম—পুরী থেকে চিল্কায় বাস পাওয়া যায়, ভাড়া প্রতি জনের পনর টাকা। এখান থেকে ট্রেনে গেলে কত লাগবে?

পাণ্ডা বললেন—প্রতি জনের যাতায়াত ব্যয় হবে চার টাকার মধ্যে। পর দিন প্রত্যুষে ষ্টেশনে গিয়ে বেলুগাঁয়ের টিকিট নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। দশটার কিছু পরে নামলাম বেলুগাঁয়ে। ষ্টেশন থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে দু'ফার্লং গেলেই চিল্কার তীরে হাজির হওয়া যাবে। ষ্টেশনের পাশে দর্মা-ঘেরা খড়ের আচ্ছাদনযুক্ত একটি কক্ষে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণের হোটেল। ব্রাহ্মণ তাঁর হোটেলে আমাদের আহারের অনুরোধ করলেন।

গৃহিণী বললেন— চিল্কা দেখে এসে আপনার হোটেলেই আমাদের খেতে হবে।

ব্রাহ্মণ বললেন—আপনাদের ফিরতে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা সময় যাবে। বারোটায় আমার হোটেল বন্ধ হবে। যদি এখানে খাওয়া আপনাদের মত হয়, এখনই আহার শেষ ক'রে নিশ্চিন্তে চিল্কা দেখতে যান।

অগত্যা আহারেই বসলাম। ডাল, তরকারী পরিবেশনের পর ব্রাহ্মণ বললেন—আজ আর আমার খরিদ্দারের আশা নেই। আমি প্রতিদিন চিল্কার চিংড়ি রান্না করি। আজকের অবশিষ্ট যা আছে আপনারা খেয়ে নিন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গেলাম চিল্কার দিকে। পথিমধ্যে কয়েকটি বাঙ্গালী যুবকের সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁরাও চিল্কা ভ্রমণে গিয়েছিলেন। আমাদের পরামর্শ দিলেন, ভুবন মাঝিকে নিতে! সে নাকি বেশ ভদ্র। তিন টাকা পারিশ্রমিক নেবে।

চিল্কার তীরে ভুবন মাঝির সাক্ষাৎ পেলাম। সে তার ডিঙ্গির দাঁড় ঘাড়ে ক'রে এসে হাজির হ'ল। চিল্কার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় তরঙ্গহীন নীল বাড়ী। হাজারখানেক মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম খাটান হয়েছে চিল্কার জলে। আর দেখলাম বিল-হাঁস প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষীর সমাবেশ।

বিহঙ্গের ঝাঁক দেখে গৃহিণী বললেন—এ সব পাখীরা থাকে কোথায়?

ভুবন বললে—সামনের পাহাড়ের উপর ওরা রাত্রে থাকে। সারা দিন চিল্কার উপর উড়ে বেড়ায়। বর্ষা পড়লে এরা এদিকে থাকে না। কোথায় চলে যায়!

আমরা আনন্দে ভুবনের নৌকায় উঠে বসলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর গৃহিণীর আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হ'ল। বললেন—এত হাওয়ায় সমুদ্রে গেলে ডিঙ্গি উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভুবনকে বলে সত্বর ডিঙ্গি ফেরাও। বাধ্য হয়ে ডিঙ্গি ফিরিয়ে ডাঙ্গায় এসে উঠলাম। গৃহিণী ম্লান মুখে হাঁসি টেনে বললেন—ডাঙ্গা থেকেই চিল্কা দেখতে বেশ ভাল লাগে। সাঁতার জানি না। হাওয়ায় ডিঙ্গি উল্টে গেলে পাথর-বাটির মত ডুবে যেতে হবে।

অগত্যা ভুবনকে তিন টাকা খেসারত দিয়ে ডাঙ্গায় বসে চিল্কার শোভা দেখে ভুবনেশ্বর ফিরলাম।

পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে কোণারক যাওয়ার সুবিধা হয়ে গেল। ধর্মশালায় আমাদের পাশের কক্ষে দু'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক একটি মহিলা সমেত এসেছিলেন। তাঁরা কোণারক যাওয়ার জন্য একখানি ট্যাক্সি ব্যবস্থা করেছেন। যাতায়াতের ভাড়া ত্রিশ টাকা। তাঁদের তিনজনের জন্য ত্রিশ টাকা দিতে হ'লে ভাড়া অধিক বিবেচনায় সাথী অন্বেষণ করছিলেন। আমাদের নিকট প্রস্তাব করতে আনন্দে রাজী হলাম। এখন আমাদের প্রতি জনের ভাড়া ছয় টাকা হিসাবে হয়ে যাবে। ট্যাক্সি-

ওয়ালাকে ডেকে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে যাওয়া স্থির হ'ল।

ট্যাক্সি চালক বললেন— আমাদের যেতে হবে প্রত্যুষে পাঁচটায়। বিলম্বে রৌদ্র তাপে কষ্ট হবে। অধিকন্তু পুরী থেকে প্রত্যহ নিয়মিত কয়েকখানি বাস যাত্রী নিয়ে ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, কোণারক প্রভৃতি দর্শনের জন্য যাতায়াত করে। সে বাসের ভাড়া প্রত্যেকের দশ টাকা। সেই সকল বাসের যাত্রী এককালীন কোণারক পৌঁছে গেলে দেখার অসুবিধা হবে। সেই কারণ প্রত্যুষে গিয়ে ঠাণ্ডায় ও শান্তিতে দেখতে পারবেন। কোণারক মন্দিরের নিকটেই কয়েকটি হোটেল আছে আহার সমাধা ক'রে নিশ্চিন্তে ফেরা যাবে।

অতি প্রত্যুষে দ্বারে ট্যাক্সিওয়ালার হাঁক শুনলাম। তখনও ধর্মশালার দ্বার খোলা হয় নি। আমরা একপ্রকার প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। নীচে এসে ম্যানেজারকে অনুরোধ ক'রে দ্বার খুলিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম।

গাড়ীতে বসে সাথীদের পরিচয় পেলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের নাম রাজেন্দ্র তালুকদার। আদি নিবাস পাবনা। দেশ বিভাগের পর স্থায়ীভাবে কলকাতাবাসী হয়েছেন। সঙ্গে আছেন তাঁর এক পুত্র ও পুত্রবধূ। গাড়ীতে যাতায়াতকালে সমস্ত সময় তাঁর পাবনার সম্পত্তি আর দুধ-ঘি, মাছের খেদ করতে করতে গেলেন।

প্রায় এক ঘন্টা পরে একটি বাজারে এসে এক চায়ের দোকানের পাশে গাড়ী রেখে চালক আমাদের চা পান ক'রে আসতে সময় দিলেন। আমরা সকলে গরম সিঙ্গাড়া ও চা খেলাম। রাজেন্দ্রবাবু খেলেন একটি ডাব।

এর পর গাড়ী এসে থামল একেবারে কোণারকের সূর্য্য মন্দিরের পাশে— যার সভ্য নাম হয়েছে 'ব্ল্যাক-প্যাগোডা' তখন বেলা প্রায় আটটা।

ট্যাক্সি চালক পরামর্শ দিলেন—পাশেই সরকারী রেষ্ট-হাউস। ইচ্ছা করলে এখানেও খেতে পারেন। ভাল বাথরুম আছে স্নান করতে পারবেন। ওদিকের অন্যান্য হোটেল অপেক্ষা চার্য কিছু বেশী। এ স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছনতা ও খাদ্য দ্রব্য অনেকাংশে ভাল।

সরকারী রেষ্ট-হাউসে মিলের অর্ডার দিয়ে সকলে এলাম আমাদের বহু আকাঙ্খিত সূর্য্য মন্দির দেখতে। মন্দির ফটকের পাশে কয়েকজন ব্রাহ্মণ

কতকগুলি মূর্তি সংগ্রহ ক'রে নবগ্রহ মন্দির স্থাপনা করেছেন। মন্দির অর্থে একটি একতল গৃহ।

গৃহিণী সর্বাগ্রে সেই মন্দিরের দিকে গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। দেখলাম কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড একত্র ক'রে নবগ্রহ দেবতার স্থাপনা করা হয়েছে। পূজারও ব্যবস্থা আছে। এ স্থানে মৃত্তিকা গর্ভ থেকে সংগৃহিত বহু ভগ্ন মূর্তি সযত্নে রক্ষিত আছে। নালন্দার মত সংগ্রহশালাও বলা চলে।

এর পর এলাম সূর্য্য মন্দিরের ফটকের দ্বারে। উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এক বৃহৎ কম্পাউণ্ড। এর চতুর্দিকের জমি থেকে কমপাউণ্ডটি প্রায় বিশ ফুট নীচে। মন্দির সীমানায় এসে গৃহিণী বললেন—এ-যে খাজুরাহের মত মন্দিরশ্মশান। মন্দিরটি মুণ্ডহীন হয়ে, হাড়-পাঁজর ভেঙে কোনরকমে খাড়া হয়ে আছে।

মন্দির ফটকের সন্নিকটে এক মন্দির পরিচালকের সাক্ষাৎ পেলাম। লোকটি শিক্ষিত ও ভদ্র। নাম সুরেন্দ্র বেওয়া। আমরা তাঁকে গাইড-রূপে নিলাম।

তিনি বললেন—এ মন্দির শীর্ষে কয়েক মণ ওজনের একটি বৃহৎ গম্বুজ ছিল কয়েকবার ভূমিকম্পে সেটি বিনষ্ট হয়েছে। শোনা যায় সেই গম্বুজের উপর ছিল একটি বৃহৎ চুম্বক-পাথর। নিকটের সমুদ্রে জাহাজ যাতায়াতে ঐ চুম্বকের জন্য নাবিকেরা দিকভ্রান্ত হ'ত। সেই কারণে এক নাবিক মন্দির শীর্ষে উঠে সেটিকে ধ্বংশ করে। তবে কাহিনীটি অবিশ্বাস্য মনে হয়। এক সময় মন্দিরের দক্ষিণ পাশে ছিল চন্দ্রভাগা নদী। এখন সেটি বালু প্রান্তরে পরিণত হয়েছে।

মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ দেখলাম। গাইড বললেন—পুরাণে আছে সূর্য্যদেবের দুই পত্নী। মায়াদেবী ও ছায়াদেবী। মন্দিরের সম্মুখে যে ধ্বংশাবশেষ দেখছেন সেটি মায়াদেবীর মন্দির ছিল। মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে অনুরূপ আর একটি ভগ্ন মন্দির দেখবেন সেটি তাঁর অপরা পত্নি ছায়া দেবীর।

মন্দিরের উত্তর দিকে কালো পাথরে নির্মিত দু'টি বৃহদাকার হস্তীর পূর্ণ মূর্তি। এর নির্মাণ কৌশল এত সুন্দর দূর থেকে দেখলে সজীব বলে মনে হয়। মন্দিরের দক্ষিণভাগে দেখলাম সুসজ্জিত অশ্বযুগল। এরও নির্মাণ নৈপুণ্য

দেখলে চমৎকৃত হতে হয়।

একবার মন্দিরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ ক'রে এলাম। মন্দিরের তিন দিকে প্রস্তর নির্মিত বৃহদাকার চব্বিশটি চক্র। মন্দিরের সম্মুখভাগে মন্দির সোপানের দুই পাশে হস্তী পৃষ্ঠে দু'টি বৃহৎ সিংহ মূর্তি। সমস্ত মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, এটি একখানি চব্বিশটি চক্রবিশিষ্ট অতিকায় রথ। লৌহ শৃঙ্খলে টানতে পারলে হয়তো একে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব নয়। মন্দির রথের চক্রগুলিতে অজানা ভাষায় কি সব সঙ্কেৎ লেখা আছে। মনে হয় সূর্য্যের আলোক সম্পাতের কোন নিদর্শন খোদাই ছিল। আজ কে তার মর্ম উদ্ধার করবে। স্থানীয় গাইড কতকগুলি বাঁধা বুলি আউড়ে থাকেন। আসল তথ্য মন্দিরের অন্তরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

মন্দিরের সম্মুখভাগে সেই হস্তী পৃষ্ঠে সিংহ-দ্বারের মধ্যভাগে কয়েকটি সোপান বেয়ে উপরে উঠলাম। মন্দির দ্বার কঠিন প্রস্তর দিয়ে চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়েছে। পার্শ্বের বারান্দা দিয়ে এলাম মন্দিরের পশ্চাৎভাগে। এ স্থানে একটি সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে নীচে নামলাম। দেখলাম একফালি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন। সেই প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে একটি সিংহাসন স্থাপনের বেদী। বেদীটির চতুর্দিকে নিপুণ স্থাপত্য শিল্পকলার পরিচয় দিচ্ছে। সমস্ত মন্দিরটি প্রদক্ষীণ ক'রে দেখলাম মন্দিরের দক্ষিণভাগ সামান্য কিছু সংস্কার হয়েছে। পূর্বেকার সেই শিল্পকলাও কিছু বিনষ্ট হয়েছে। মন্দির গাত্রের অন্য তিন দিকে সে যুগের প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলি স্থাপত্য শিল্পের ঐতিহ্যের প্রমাণ দিচ্ছে।

এরপর মন্দিরের পশ্চিম দিকে একটি সোপান বেয়ে কিছুদূর উঠলাম। তারপর আর সোপান দেখলাম না। কোন সময়ে ছিল এমনও মনে হয় না। এখন দেখলাম বেশ কিছু উপরে উঠতে পারলে একটি প্রশস্ত কার্নিসে দাঁড়ান যায়। সেই কার্নিসের ধারে ধারে দেব-দেবীর মূর্তি মন্দির গাত্রে লাগান আছে। পণ করলাম, যে কোন প্রকারে উপরে উঠতে হবে। হামাগুড়ি দিয়ে মন্দির শীর্ষে হাজির হলাম। উনিশ শ' সত্তর সাল থেকে উড়িষ্যা সরকারের নির্দেশ অনুসারে কার্নিস পর্যন্তও আরোহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়েছে।

আগ্রহে ও আতঙ্কে সতর্কতার সহিত শীর্ষে উঠে এলাম। অন্য দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সবুজের ঢেউ। দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে পাগল হ'য়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে সে দিকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলাম ঝাউবনের পরে নীল আকাশের নীচে নেমে এসেছেন সেই নীলকান্ত নারায়ণ। যে রূপ দেখে শ্রীচৈতন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নীলকান্তের বুকে।

তারপর কি ভাবে নেমেছিলাম জানি না। হয়তো মন্দির পরিচালকের সাহায্যে আর গৃহিণীর সতর্কতায়। শেষ সীমানায় এসে হয়তো লাফ দিয়ে নীচে নেমেছিলাম তারপর দৌড়ে গেলাম দক্ষিণ দিকে সেই প্রস্তর নির্মিত অশ্ব যুগলের মধ্য দিয়ে।

গৃহিণী পশ্চাতে এসে বললেন—ওদিকে কোথায় চলেছ? বাইরে যাওয়ার পথ এদিকে নেই।

সম্বীত ফিরে পেয়েও আমি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে আছি। বললাম—পথ যে দিকেই থাক উপরে গিয়ে দেখেছি সেই নীলকান্তের মোহন মূর্তি। আমাকে যেতে হবে তাঁর চরণ পাশে। নয়নভরে দেখব তাঁর মোহন মূর্তি। আমাকে বাধা দিও না। হাতছানি দিয়ে তিনি আমাকে ডেকেছেন।

গৃহিণী বললেন—তুমি পাগল হয়েছ! সে রূপ দেখেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সে ভাগ্য তোমার নয়। আগে চৈতন্য লাভ কর। তারপর দেখতে পাবে সেই নীলকান্ত নারায়ণকে।

ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হলাম। বুঝলাম, বিভ্রান্ত হ'য়ে সারাজীবন ভ্রান্ত-পথেই ঘুরেছি। চৈতন্যের স্পর্শ কখনও পাই নি। কেমন ক'রে তাঁর দর্শন পাব! হে মহাপ্রভু কৃপা ক'রে চৈতন্যের স্পর্শ আমাকে দাও। আমি একবার দেখি সেই চতুর্ভুজ ভুবন মোহন মূর্তি।